একশ বছরের সেরা হাসি

অরুণ মুখোপাধ্যায়

মনীষা

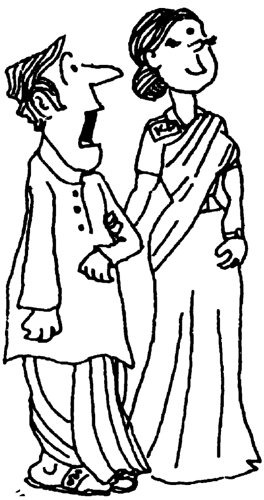
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী, ১৯৬১

প্রকাশক
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
কালান্তর প্রেস,
৩০/৬, ঝাউতলা রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৭

সূচিপত্র

একশ বছরের সেরা হাসি



শিরোমণি মহাশয়ের কথকতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



কিছু কাল পূর্বে, এই পরম পবিত্র গৌড়দেশে কৃষ্ণহরি শিরোমণি নামে এক সুপণ্ডিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁরা তাঁহার কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী, প্রত্যহ তাঁহারা কথা শুনিতে যাইতেন। কথা শুনিয়া এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি অবাধে সন্ধ্যার পর তাঁহার বাসায় গিয়া তদীয় পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া অবশেষে, ঐ বিধবা রমণী গুণমণি শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

একদিন শিরোমণি মহাশয় ব্যাসাসনে আসীন হইয়া স্ত্রীজাতির ব্যভিচার বিষয়ে অশেষবিধ দোষ কীর্তন করিয়া পরিশেষে কহিয়াছিলেন, 'যে নারী পরপুরুষে উপগত হয়, নরকে গিয়া তাহাকে অনন্তকাল যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলি বৃক্ষ আছে। তাহার স্কন্ধদেশ অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যমদূতেরা ব্যভিচারিণীকে সেই ভয়ঙ্কর শাল্মলি বৃক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া বলে, তুমি জীবদ্দশায় প্রাণাধিকপ্রিয় উপপতিকে নিরতিশয় প্রেমভরে যেরূপ গাঢ় আলিঙ্গনদান করিতে; এক্ষণে এই শাল্মলি বৃক্ষকে উপপতি ভাবিয়া সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গনদান কর। সে ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিলে যমদূতেরা যথাবিহিত প্রহার ও যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলপূর্বক তাহাকে 'ালিঙ্গন করায়; তাহার সর্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়; অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকে; সে যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া অতিকরুণ স্বরে বিলাপ, পরিতাপ ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া কোনও স্ত্রীলোকেরই অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণিক সুখের অভিলাষে পরপুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে' ইত্যাদি।

ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগবৃত্তান্ত শ্রবণে কথকচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যাহা করিয়াছি, তাহার আর

চারা নাই; অতঃপর আর আমি প্রাণান্তেও পরপুরুষে উপগতা হইব না।' সেদিন সন্ধ্যার পর তিনি পূর্ববৎ শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া যথাবৎ আর আর পরিচর্যা করিলেন; কিন্তু অন্যান্য দিবসের মত তাঁহার চরণসেবার জন্য যথাসময়ে তদীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন না।

শিরোমণি মহাশয়, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলেন; অবশেষে বিলম্ব দর্শনে অধৈর্য হইয়া তাঁহার নামগ্রহণপূর্বক বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেবাদাসী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া গলদশ্রু লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিলেন, 'প্রভো! কৃপা করিয়া আমায় ক্ষমা করুন। শিমূল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি। আপনকার চরণসেবা করিতে আর আমার কোনওমতে প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছে না। না জানিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি।'

সেবাদাসীর কথা শুনিয়া পণ্ডিতচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং দ্বারদেশে আসিয়া সেবাদাসীর হস্ত ধরিয়া সহাস্য মুখে কহিলেন, 'আরে পাগলি! তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছ না? আমরা পূর্বাপর যেরূপ বলিয়া আসিতেছি, আজও সেইরূপ বলিয়াছি। শিমূলগাছ পূর্বে ঐরূপ ভয়ঙ্কর ছিল যথার্থ বটে; কিন্তু শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে, লৌহময় কণ্টকসকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে শিমূলগাছ তেল হইয়া গিয়াছে। এখন আলিঙ্গন করিলে সর্ব শরীর শীতল ও পুলকিত হয়'। এই বলিয়া অভয়প্রদান ও প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক শয্যায় লইয়া গিয়া গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে পূর্ববৎ চরণসেবায় প্রবৃত্ত করিলেন।



সুবর্ণগোলক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



কৈলাসশিখরে নবমুকুলশোভিত দেবদারুতলায় শার্দূলচর্মাসনে বসিয়া হরপার্বতী পাশা খেলিতেছিলেন। বাজি একটি স্বর্ণগোলক। মহাদেবের খেলায় দোষ এই—আড়ি মারিতে পারেন না—তাহা পারিলে সমুদ্রমন্থনের সময়ে বিষের ভাগটা তাঁহার ঘাড়ে পড়িত না। গৌরী আড়ি মারিতে পটু—প্রমাণ, পৃথিবীতে তাঁহার তিন দিন পূজা। আর খেলায় যত হউক না হউক, কান্নাইয়ে অদ্বিতীয়া, কেন না, তিনিই আদ্যাশক্তি। মহাদেবের ভাল দান পড়িলে কাঁদিয়া হাট বাঁধান—আপনার যদি পড়ে পাঁচ দুই সাত, তবে হাঁকেন পোয়া বারো। হাঁকিয়া তিন চক্ষে মহাদেবের প্রতি কটাক্ষ করেন—যে কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেব দান দেখিয়াও দেখিতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে, দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই রীতি।

তখন মহাদেব পার্বতীকে স্বীকৃত কাঞ্চনগোলক প্রদান করিলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিয়া, পঞ্চানন ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "আমার প্রদত্ত গোলক ত্যাগ করিলে কেন?"

উমা কহিলেন, "প্রভো, আপনার প্রদত্ত গোলক অবশ্য কোন অপূর্ব শক্তিবিশিষ্ট এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে। মনুষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি।"

গিরিশ বলিলেন, "ভদ্রে! প্রজাপতি, বিষ্ণু, এবং আমি, এই তিন জনে যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া সৃষ্টিস্থিতিলয় করিতেছি, তাহার ব্যতিক্রমে কখনও মঙ্গল হয় না। যে মঙ্গল

হইবার তাহা সেই সকল নিয়মাবলির বলেই ঘটিবে। কাঞ্চনগোলকের কোন প্রয়োজন নাই। যদি ইহার কোন মঙ্গলপ্রদ গুণ হয়, তবে নিয়মভঙ্গ দোষে লোকের অনিষ্ট হইবে। তবে তোমার অনুরোধে উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত করিলাম। বসিয়া উহার কার্য দর্শন কর।"

কালীকান্ত বসু বড় বাবু। বয়স বৎসর পঁয়ত্রিশ, দেখিতে সুন্দর পুরুষ, কয় বৎসর হইল, পুনর্বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী কামসুন্দরীর বয়ঃক্রম আঠার বৎসর। তাঁহার পত্নী তাহার পিতৃভবনে ছিল। কালীকান্তবাবু স্ত্রীর সম্ভাষণে শ্বশুরবাড়ি যাইতেছিলেন। শ্বশুর বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি—গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামে বাস। কালীকান্ত, ঘাটে নৌকা লাগাইয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একটা পোর্টমান্টো বহিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে কালীকান্তবাবু দেখিলেন, একটি স্বর্ণগোলক পড়িয়া আছে। বিস্মিত হইয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন। দেখিলেন, সুবর্ণ বটে। প্রীত হইয়া তাহা ভৃত্য রামাকে রাখিতে দিলেন; বলিলেন, "এটা সোণার, কেহ হারাইয়া থাকিবে। কেহ খোঁজ করে, বাহির করিয়া দিব। নহিলে বাড়ি লইয়া যাইব। এখন রাখ।"

রামা বস্ত্রমধ্যে গোলকটি লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে, পথে পোর্টমান্টো নামাইল। পরে কালীকান্তবাবুর হস্ত হইতে গোলকটি গ্রহণ করিয়া বস্ত্রমধ্যে লুকাইল।

কিন্তু রামা আর পোর্টমান্টো মাথায় তুলিল না। কালীকান্তবাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় করিলেন। রামা অগ্রসর হইয়া চলিল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন রামা বলিল, "ওরে রামা!"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞা?"

রামা বলিল, "তুই বড় বেআদব, দেখিস যেন আমার শ্বশুরবাড়ি গিয়া বেআদবি করিস না। তাহারা ভদ্রলোক।"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে তা কি পারি? আপনি হচ্ছেন মুনিব—আপনার কাছে কি বেআদবি করিতে পারি?"

কৈলাসে গৌরী বলিলেন, "প্রভো, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার স্বর্ণগোলকের কি গুণ এ?"

মহাদেব বলিলেন, "গোলকের গুণ চিত্তবিনিময়। আমি যদি নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী ভাবিবে, আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী; আমি ভাবিব, আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব। রামা ভাবিতেছে, আমি কালীকান্ত বসু, কালীকান্তকে ভাবিতেছে, এ রামা চাকর। কালীকান্ত ভাবিতেছে, আমি রামা খানসামা, রামাকে ভাবিতেছে, কালীকান্তবাবু।"

কালীকান্তবাবু যখন শ্বশুরবাড়ি পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার শ্বশুর অন্তঃপুরে। কিন্তু বাহিরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। দ্বারবান্ রামদীন্ পাঁড়ে বলিতেছে, "আরে ও খানসামাজি, তোম হুঁয়া মৎ বইঠিও—তোম হামারা পাশ আও।" শুনিয়া রামা গরম হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছে, "যা বেটা মেড়ুয়াবাদী যা—তোর আপনার কাজ করগে।"

দ্বারবান পোর্টমান্টো নামাইয়া নিল। কালীকান্ত বলিল, "দরওয়ানজি, বাবুকে অমন করিয়া অপমান করিও না। উনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।"

দ্বারবান জামাইবাবুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না। কালীকান্তের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মনে করিল, যেখানে জামাইবাবুই ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে ইনি কোন ছদ্মবেশী বড় লোক হইবেন। দ্বারবান তখন ভক্তিভাবে রামাকে যুক্তকরে আশীর্বাদ করিয়া কহিল, "গোলামকি কসুর মাপ কিজিয়ে!" রামা কহিল, "আচ্ছা, তামুক ভেজ দেও!"

শ্বশুরবাড়ির খানসামা উদ্ধব, অতি প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য। সেই বাঁধা হুঁকায় তামাকু সাজিয়া আনিল। রামা, তাকিয়ায় হেলান দিয়া তামাকু খাইতে লাগিল। কালীকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া কলিকায় তামাকু খাইতে লাগিল। উদ্ধব বিস্মিত হইয়া কহিল, "দাদা ঠাকুর, এ কি এ?" কালীকান্ত কহিল, "ওঁর সাক্ষাতে কি তামাকু খাইতে পারি?"

উদ্ধব গিযা অন্তঃপুরে কর্তাকে সংবাদ দিল, "জামাইবাবু আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন কে ছদ্মবেশী মহাশয় এসেছেন—জামাইবাবু তাঁকে বড মানেন, তাঁর সাক্ষাতে তামাকু পর্যন্ত খান না।"

কর্তা নীলরতনবাবু শীঘ্র বহির্বাটিতে আসিলেন। কালীকান্ত তাঁহাকে দেখিযা দূর হইতে একটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিযা সরিয়া গেল। রামা আসিয়া নীলরতনের পায়ের ধূলা লইয়া কোলাকুলি করিল। নীলরতন ভাবিল, "সঙ্গের লোকটা সভ্যভব্য বটে—তবে জামাই বাবাজিকে কেমন কেমন দেখিতেছি।"

নীলরতনবাবু রামাকে, স্বাগত জিজ্ঞাসা কবিতে বসিলেন, কিন্তু কথাবার্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে অন্তঃপুর হইতে জলযোগের স্থান হইয়াছে বলিয়া পরিচারিকা কালীকান্তকে ডাকিতে আসিল। কালীকান্ত বলিল, "বাপ রে, আমি কি বাবুর আগে জল খেতে পারি! আগে বাবুকে জল খাওয়াও। তার পর আমাব হবে এখন। আমি, মাঠাকরুণ, আপনাদের খাচ্চিই ত।"

"মাঠাকরুণ" শুনিয়া পরিচারিকা মনে করিল, "জামাইবাবু আমাকে একজন শাশুড়ি টাশুড়ি মনে করিয়াছেন—না করবেন কেন; আমাকে ভাল মানুষের মেয়ে বই ত আর ছোট লোকের মেয়ের মত দেখায় না। ওঁরা দশটা দেখেছেন—মানুষ চিন্‌তে পারেন—কেবল এই বাড়ির পোড়া লোকেই মানুষ চেনে না।" অতএব বিন্দী চাকরাণী জামাইবাবুর উপর বড় খুশি হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া বলিল, "জামাইবাবুর বিবেচনা ভাল—সঙ্গের মানুষটি না খেলে কি তিনি খেতে পারেন—তা আগে তাঁকে জল খাওয়াও, তবে জামাই খাবেন।"

বাড়ির গৃহিণী মনে ভাবিলেন, "সে উপরি লোক, তাহাকে বাড়ির ভিতর আনিয়া জল খাওয়ান হইতে পারে না। জামাইকেও বাহিরে খাওয়ান হইতে পারে না। তা, তার জায়গা হউক বাহিরে, আর জামাইয়ের জায়গা হউক ভিতরে।" গৃহিণী সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। রামা বাহিরে জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল, ভাবিল, "এ কি অলৌকিকতা?" এদিকে দাসী কালীকান্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল। ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্তু কালীকান্ত উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকে ঘরের ভিতর কেন? আমাকে এইখানে হাতে দুটো ছোলা গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই।" শুনিয়া শালীরা বলিল, "বোসজা মশাই যে এবার অনেক রকম রসিকতা শিখে এয়েছ দেখতে পাই।"

কালীকান্ত কাতর হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমাকে ঠাট্টা করেন কেন, আমি আপনাদের তামাসার যোগ্য?" একজন প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি বলিল, "আমাদের তামাসার যোগ্য কেন?—যার তামাসার যোগ্য, তার কাছে চল।" এই বলিয়া কালীকান্তের হাত ধরিয়া হড়হড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল।

সেখানে কালীকান্তর ভার্যা কামসুন্দরী দাঁড়াইয়া ছিল। কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়া প্রভুপত্নী মনে করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবিল।

কামসুন্দবী দেখিয়া চন্দ্রবদনে মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "ওকি ও রঙ্গ—এ আবার কোন্ ঠাট শিখিয়া আসিয়াছ?" শুনিয়া কালীকান্ত কাতর হইয়া কহিল, "আজ্ঞে, আমার সঙ্গে অমন সব কথা কেন—আমি আপনার চাকর—আপনি মুনিব!"

বসিকা কামসুন্দরী বলিল, "তুমি চাকর, আমি মুনিব, সে আজ না কাল? যত দিন আমার বয়স আছে, তত দিন এই সম্পর্কই থাকিবে। এখন জল খাও।'

কালীকান্ত মনে করিল, "বাবা, এঁর কথার ভাব যে কেমন কেমন। আমাদের বাবু যে একটা গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন দেখতে পাই। তা, আমার সবাই ভাল।" এই ভাবিয়া কালীকান্ত পুনর্বার ভক্তিভাবে প্রণাম কবিয়া পলাইবাব উদ্যোগ করিতেছিলেন, দেখিয়া কামসুন্দবী আসিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র ধবিল; বলিল, "ওরে আমার সোণার চাঁদ! আমার সাত বাজাব ধন এক মাণিক! আমার কাছ থেকে আর পলাতে হয় না।" এই বলিয়া কামসুন্দরী স্বামীকে আসনের দিকে টানিতে লাগিল।

কালীকান্ত আন্তরিক কাতরতাব সহিত হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "দোহাই বৌঠাকুরাণি, আপনার সাত দোহাই—আমাকে ছাড়িয়া দিন—আপনি আমার স্বভাব জানেন না—আমি সে চরিত্রেব লোক নই।" কামসুন্দরী হাসিয়া বলিল, "তুমি যে চরিত্রের লোক, আমি বেশ জানি—এখন জল খাও।"

কালীকান্ত বলিল, "যদি আপনার কাছে কেহ আমার এমন নিন্দা করিয়া থাকে, তবে সে ঠক—ঠকাম করিয়াছে। আপনাব কাছে হাতযোড় করিতেছি, আপনি আমার গুরুজন, আমায় ছাড়িয়া দিন।"

কামসুন্দরী বসিকতাপ্রিয়; মনে করিল যে, এ একতর নূতন রসিকতা বটে। বলিল, "প্রাণাধিক, তুমি কত রসিকতা শিখিয়া আসিয়াছ, তাহা বুঝা যাইবে।" এই বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আসনে বসাইবার জন্য টানিতে লাগিল।

হস্তধারণ মাত্র কালীকান্ত সর্বনাশ হইল মনে করিয়া "বাবা রে, গেলাম রে, এগো রে, আমায় মেরে ফেল্লে রে" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। চীৎকার শুনিযা গৃহস্থ সকলে ভীত হইয়া দৌড়িয়া আসিল। মা, ভাগিনী, পিসী প্রভৃতিকে দেখিয়া কামসুন্দরী স্বামীর হস্ত ছাড়িয়া দিল। কালীকান্ত অবসর পাইয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

গৃহিণী কামসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লা কামি—জামাই অমন করে উঠলো কেন? তুই কি মেরেছিস?"

বিস্মিতা কামসুন্দরী মর্মপীড়িতা হইয়া কহিল, "মারিব কেন? আমি মারিব কেন—আমাব যেমন পোড়া কপাল।" ক্রমে ক্রমে সুর কাঁদনিতে চড়িতে লাগিল—"আমার যেমন পোড়া কপাল—কোন্ আবাগী আমার সর্বনাশ করেছে—কে ওষুধ করেছে—" বলিতে বলিতে কামসুন্দরী কাঁদিয়া হাঁটা লাগাইল।

সকলেই বলিল, "হাঁ তুই মেরেছিস্; নহিলে অমন কাতরাবে কেন?" এই বলিয়া

সকলে কামকে "পাপিষ্ঠা" "ডাইনি" "রাক্ষসী" ইত্যাদি কথায় ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কামসুন্দরী বিনাপরাধে নিন্দিতা ও ভর্ৎসিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িল।

এদিকে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, বড় একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। নীলরতনবাবু স্বয়ং এবং দ্বারবান্ ও উদ্ধব, সকলে পড়িয়া যে যেখানে পাইতেছে, সে সেইখানে রামকে প্রহার করিতেছে; কিল, লাথি, চড়, চাপড়ের বৃষ্টির মধ্যে রামা চাকর কেবল বলিতেছে, ছেড়ে দে রে, বাবারে, জামাই মারে, এমন কখন শুনি নাই, আমাব কি—তোদেরই মেয়েকে একাদশী করতে হবে।" নিকটে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ চাক্‌রাণী হাসিতেছে, সে সর্বদা কালীকান্ত বাবুর বাড়িতে যাতায়াত করিত, সে রামা চাকরকে চিনিত, সেই বলিয়া দিয়াছে। কালীকান্তবাবু মারপিট দেখিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠানময় বেড়াইতে লাগিল, বলিতে লাগিল, "কি সর্বনাশ হইল! বাবুকে মারিয়া ফেলিল।" ইহা দেখিয়া নীলরতনবাবু আরও কোপাবিষ্ট হইয়া রামাকে বলিতে লাগিলেন, "তুই বেটাই জামাইকে কি খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দিয়াছিস—মার বেটাকে জুতো।"এই কথা বলায়, যেমন শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্টি চাপিয়া আইসে, তেমনি নির্দোষী রামার উপর প্রহারবৃষ্টি চাপিয়া আসিল। মারপিটের চোটে বস্ত্রমধ্য হইতে লুকান স্বর্ণগোলকটি পড়িয়া গেল। দেখিয়া তবঙ্গ চাকবাণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া নীলরতনবাবুর হস্তে দিল। বলিল, "ও মিন্‌সে চোব! দেখুন, ও একটা সোণার তাল চুরি কবিয়া রাখিয়াছে।" "দেখি" বলিয়া নীলবতনবাবু স্বর্ণগোলক হস্তে লইলেন,—অমনি তিনি রামাকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া দাঁড়াইয়া কোঁচাব কাপড় খুলিয়া মাথায় দিলেন; তরঙ্গও মাথার কাপড় খুলিয়া, কোঁচা করিয়া পরিয়া, পাদুকা হস্তে রামাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল।

উদ্ধব তরঙ্গকে বলিল, "তুই মাগি আবাব এর ভিতর এলি কেন?"

তরঙ্গ বলিল, "কাকে মাগি বলিতেছিস্?"

উদ্ধব বলিল, "তোকে।"

"আমাকে ঠাট্টা?" এই বলিয়া তরঙ্গ মহাক্রোধে হস্তের পাদুকার দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার করিল। উদ্ধবও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীলোককে মারিতে না পারিয়া, নীলরতনবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন দেখি কর্তা মহাশয়, মাগির কত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে জুতা মারে!" কর্তা তখন একটুখানি ঘোমটা টানিয়া, একটু রসের হাসি হাসিয়া, মৃদুস্বরে কহিলেন, "তা মেরেছেন মেরেছেন, তুমি রাগ করিও না। মুনিব, মারতে পারেন।"

শুনিয়া উদ্ধব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ও আবার কিসের মুনিব—ওও চাকর, আমিও চাকর! আপনি এমনি আজ্ঞা করেন! আমি আপনারই চাকর, ওর চাকর কেন হব? আমি এমন চাকরি করি না।"

শুনিয়া কর্তা আবার একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মরণ আর কি! বুড়ো বয়সে মিন্সের রস দেখ! আমার চাকর আবার তুমি কিসে হতে গেলে?"

উদ্ধব অবাক্ হইল, মনে করিল, "আজ কি পাগলের পাড়া পড়িয়াছে নাকি? উদ্ধব বিস্মিত হইয়া রামাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

এমত সময়ে বাড়ির গোরক্ষক গোবর্দ্ধন ঘোষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তরঙ্গের স্বামী। সে তরঙ্গের অবস্থা ও কার্য দেখিয়া বিস্মিত হইল—তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহ্যও করিল না। এদিকে কর্তামহাশয় গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন।

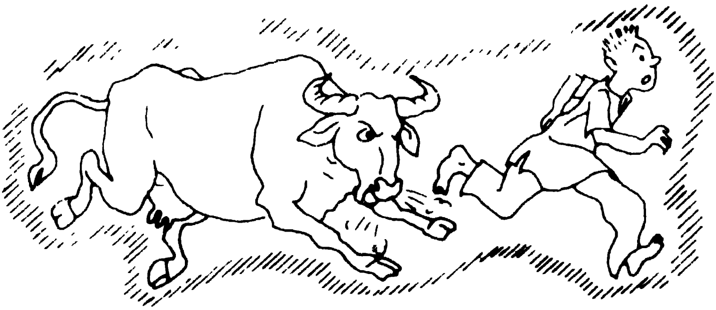
গোবর্দ্ধনকে আড়ে আড়ে দেখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "তুমি উহার ভিতর যাইও না।" গোবর্দ্ধন তরঙ্গের আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল—সে কথা তাহার কাণে গেল না; সে তরঙ্গের চুল ধরিতে গেল। "নচ্ছার মাগি, তোর হায়া নেই" এই বলিয়া গোবর্দ্ধন অগ্রসর হইতেছিল, দেখিয়া তরঙ্গ বলিল, "গোবরা, তুইও কি পাগল হয়েছিস না কি? যা, গোরুর যাব দিগে যা," শুনিয়া গোবর্দ্ধন তরঙ্গের কেশাকর্ষণ করিয়া উত্তম মধ্যম আরম্ভ করিল। দেখিয়া নীলরতনবাবু বলিলেন, "যা! পোড়াকপালে মিন্‌সে কর্তাকে ঠেঙ্গিয়ে খুন কর্‌লে।" এদিকে তরঙ্গও ক্রুদ্ধ হইয়া "আমার গায়ে হাত তুলিস" বলিয়া গোবর্দ্ধনকে মারিতে আরম্ভ কবিল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়া উঠিল। শুনিয়া পাড়ার প্রতিবাসী রাম মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম মুখোপাধ্যায় একটা সুবর্ণ-গোলক পড়িয়া আছে দেখিযা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি মহাশয়, এটা কি?"

কৈলাসে পার্বতী বলিলেন, "প্রভো! আপনার গোলক সম্বরণ করুন—ঐ দেখুন গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া রামের বৃদ্ধা ভার্যাকে পত্নী সম্বোধনে কৌতুক করিতেছে। আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পবিচারিকা তাহার আচরণ দেখিযা সম্মার্জনী প্রহার করিতেছে। এদিকে বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়, আপনাকে যুবা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া, তাঁহার অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার ভার্যাকে টপ্পা শুনাইতেছে। এ গোলক আর মুহূর্তকাল পৃথিবীতে থাকিলে গৃহে গৃহে বিশৃঙ্খলা হইবে। অতএব আপনি ইহা সম্বরণ করুন।"

মহাদেব কহিলেন, "হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে। কবে না দেখিতেছ যে. পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম। এক্ষণে গোলক সম্বৃত করিলাম। আমার ইচ্ছায় সকলেই পুনর্বার স্ব স্ব প্রকৃতিস্থ হইবে, এবং যাহা ঘটিয়া গিয়াছে. তাহা কাহারও স্মরণ থাকিবে না। তবে, লোকহিতার্থে আমার বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পৃথিবীমধ্যে প্রচারিত করিবে।"

একঠেঙো ছকু

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়



॥ ১ ॥

ধন ফেলে ব্যাঙ পালালো।
ছকু ভায়ার ঠ্যাঙটি গেল॥

কিনুবাবু ছোট একটি চালা-ঘর করিয়াছেন। তাহার নাম যোগ-মন্দির। বন্ধুবান্ধব লইয়া সেই ঘরে তিনি গাঁজার ধূম পান করেন। পাল-পার্বণে আমোদটা কিছু অধিক মাত্রায় হয়। আজ মহাষ্টমী, দুই বোতল মদ আসিয়াছে। আমোদ করিবার নিমিত্ত বদন ও নবদ্বীপ কিনুর বাড়িতে গিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্বে ঠক্ ঠক্ করিয়া ছকুও সেই স্থানে চলিয়াছেন।

ছকুকে দেখিয়া পাড়ার ছেলেদের আনন্দ হইল। হাততালি দিয়া দূর হইতে তাহারা বলিতে লাগিল;—

ধন ফেলে ব্যাঙ পালালো।
ছকু ভায়ার ঠ্যাঙটি গেল॥

ছকু ক্ষেপিয়া উঠিলেন। প্রথমে তিনি অনেক গালি দিলেন। তাহার পর ঢিল ছুড়িয়া বালকদিগকে মারিতে লাগিলেন। বালকেরা আরও একটু দূরে গিয়া বলিতে লাগিল—

ধন ফেলে ব্যাঙ পালালো।
ছকু ভায়ার ঠ্যাঙটি গেল॥

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ছকু যোগ-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 'শালারা—গু-খেকোর বেটারা!' এইরূপ গালি দিয়া মনের আগুন তিনি নিবাইতে লাগিলেন।

কিনু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি হইয়াছে ভাই?'

ছকু উত্তর করিলেন,—'ঐ ছোঁড়ারা! শালারা।'

বদন বলিলেন,—'এক গেলাস মাল টানিলে এখনি রাগ ভাল হইয়া যাইবে!'

সন্ধ্যা হইল। তিন ছিলিম গাঁজার ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাহার পর আসল জিনিসটি আরম্ভ হইল। মন একটু সুস্থ হইলে ছকু বলিলেন,—'এই মহাষ্টমীর দিন একটু মদ না খাইলে হিঁদুয়ানী বজায় থাকে না।'

কিনু বলিলেন,—'সুরা অতি পবিত্র সামগ্রী, দ্রবীভূত তারা।'

নবদ্বীপ বলিলেন,—'মা এই তিন দিন মর্ত্যে আসিয়াছেন। বাড়ি বাড়ি ফিরিয়া লোকের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। আমাদের আরাধনাই ঠিক। গাঁজা উৎসর্গ করিয়া শিবকে ও সুরা দিয়া মাকে সন্তুষ্ট করিলাম! আমরা প্রসাদ পাইলাম।'

বদন বলিলেন,—'ভালরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে সাক্ষাৎ হইয়া মা পূজা গ্রহণ করেন। মন্ত্রের গুণ।'

ছকু বলিলেন,—'মন্ত্রের গুণ! ওকথা আর বলিও না ভাই! কেবল দেবীর প্রতিমা নহে, মন্ত্রবলে দেবীর বাহন সিংহ ও মহিষাসুর পর্যন্ত সজীব হইয়াছিল। কলিকাতায় আমার শ্বশুর চক্রধর রায়ের বাটীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই হিড়িকেই আমার পা কাটা গিয়াছে।'

বদন বলিলেন,—'তুমি না যকের টাকা পাইয়াছিলে? সেইজন্য তোমার না পা কাটা গিয়াছে? মহিষাসুর কি করিয়াছিল?'

ছকু উত্তর করিলেন,—'সে ভাই অনেক কথা। বলিলে বিশ্বাস করিবে না!'

নবদ্বীপ বলিলেন,—'মহাষ্টমীর রাত্রি। মা পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। অগণিত ভূত, প্রেত, দানা, দৈত্য তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। অদ্ভুত গল্প শুনিবার সময় এই।'

॥ ২ ॥

মাধবের অপমান

গল্পটি বলিতে কিনুও অনুরোধ করিলেন। কিছুক্ষণ সাধ্য-সাধনার পর ছকু বলিতে আরম্ভ করিলেন। ছকু বলিলেন,— 'চক্রধর রায় মহাশয়ের কন্যাকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। রায় মহাশয় টাকা ধার দিয়া কখনও একপয়সা সুদ না ছাড়িয়া, লোকের বাড়ি বাঁধা রাখিয়া, তাহার পর তাহাদের ভদ্রাসন বেচিয়া ধনবান্ হইয়াছিলেন। রাঘব হালদার নামে একজন বড়মানুষের ছেলে বদখেয়ালীতে সমুদয় বিষয় নষ্ট করিয়া রায় মহাশয়ের নিকট আপনার বাড়ি বাঁধা রাখিয়াছিল। তাহার পর সে জাল-জুয়াচুরী আরম্ভ করিল। কাবুলী চাকর রাখিয়া তাহাদের দ্বারা সে ডাকাইতি করাইত। অবশেষে জাল করার অপরাধে তাহার দ্বীপান্তর হইল। আমার শ্বশুর মহাশয় তাহার বাড়ি অতি অল্প মূল্যে কিনিয়া লইলেন। কলিকাতা শহরের উত্তর ধারে বৃহৎ বাড়ি, অনেক জমি, চারিদিকে বাগান, প্রাচীর দিয়া ঘেরা। আমি সেই শ্বশুরবাড়িতে থাকিতাম।'

কিনু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার পত্নী-বিয়োগ হইলেও?'

ছকু উত্তর করিলেন,—'হাঁ ভাই, পত্নী-বিয়োগ হইলেও কিছুদিন আমি সে স্থানে ছিলাম। কিন্তু আমার পক্ষে সে একপ্রকার নরকভোগ হইয়াছিল। শ্বশুরের রাগে আর শাশুড়ি ঠাকুরানীর গঞ্জনায় প্রাণ আমার অস্থির হইয়াছিল। শাশুড়ি ঠাকুরানী পরম রূপবতী ছিলেন।'

নবদ্বীপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার স্ত্রী, তাঁর কি প্রকার রূপ ছিল?'

ছকু উত্তর করিলেন,—'সেকথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? কেমন গর্ভে জন্ম। রং কিন্তু একটু কালো ছিল। চক্চকে কালো, বার্নিস জুতার মত, সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে মনে হইত যেন কালো বিজলী খেলিয়া গেল।'

বদন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাহার পর?'

ছকু বলিলেন,—'আমার শ্বশুরদের পাড়ায় মাধব নামে একজন ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নানা বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। বিলাতী ধরনে তিনি ভূত নামাইতে পারিতেন, গায়ে হাত বুলাইয়া রোগ ভাল করিতেন। আর সেই বিলাতি ভেলকি—যাহাকে হিপনটিশ্যাম বলে, তাহাও তিনি জানিতেন!'

নবদ্বীপ একটু ইংরাজি জানিতেন। তিনি বলিলেন, 'হিপনটিসম (hypnotism) বলে। তাহার পর?'

ছকু বলিলেন,—'আমার শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে একঘরে করিলেন। কিন্তু কলিকাতায় কে কাহাকে একঘরে করিতে পারে? অনেকে তাঁহার পক্ষ হইল। আমার শ্বশুরের আরও রাগ হইল। কিসে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, সর্বদা সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্বশুরের প্রিয়পাত্র হইবার নিমিত্ত আমি এক উপায় স্থির করিলাম। শ্বশুর প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করেন। অনেককে নিমন্ত্রণ করেন। সকলের কান মলিয়া প্রণামী আদায় করেন। পূজা করিয়া বিলক্ষণ দু-পয়সা তিনি উপার্জন করিতেন। যে যেমন প্রণামী দিত, তাহার সেইরূপ আদব হইত। এক টাকার কম প্রণামী দিলে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে তিনি একটি নারিকেল-নাড়ুও দিতেন না। শ্বশুরের সহিত পরামর্শ করিয়া পূজার সময় মাধবকে আমি নিমন্ত্রণ করিলাম। মাধব দুই টাকা প্রণামী দিলেন। পাড়ার অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সহিত তাঁহাকে ভোজনে বসাইলাম। এমন সময় সেইস্থানে শ্বশুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটু দূরে খপ করিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর মাধবের দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—'ও কে? ও যে বড় ব্রাহ্মণের সহিত বসিয়াছে! ওর জাত গিয়াছে! তুমি এখনি উঠিয়া যাও।'

মাধব বলিলেন,—'তবে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কেন?'

কান খুঁটিতে খুঁটিতে শ্বশুর বলিলেন,—'কি বলিলে?'

মাধব পুনরায় বলিলেন,—'তবে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কেন?'

শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমাকে কে নিমন্ত্রণ করিয়াছে?'

মাধব উত্তর করিলেন,—'আপনার জামাতা।'

শ্বশুর বলিলেন,—'মাথা নাই তার আবার মাথা-ব্যথা। আমার কন্যা কোথায় যে আমার জামাতা! এখনি উঠিয়া যাও, নতুবা গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইব!'

আর কোন কথা না বলিয়া মাধব উঠিয়া গেলেন। দুই-চারিজন ব্যতীত তাঁহার সহিত প্রায় সমুদয় ব্রাহ্মণ উঠিয়া গেল। যাইবার সময় মাধব বলিয়া গেলেন,—'যদি বিদ্যাবল থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই আপনি ইহার প্রতিফল পাইবেন।'

॥ ৩ ॥

সর্বাঙ্গসুন্দরী

মাধবকে অপমান করিয়া শ্বশুর মহাশয়ের ঘোরতর আনন্দ হইল। বাড়ির ভিতর গিয়া বিছানায় বসিয়া তিনি ডুকুরে ডুকুরে হাসিতে লাগিলেন।

নীচের একটি ঘরে আমি বাস করিতাম। আমিও আমার ঘরে গিয়া ক্রমাগত হাসিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পূর্বে একবার হাসিতে হাসিতে আমার ঘাড়টি খুট্‌ করিয়া উঠিল। আর

সেই সঙ্গে আমার মাথা হালকি হইয়া গেল, যেন ঠিক শোলার মত বোধ হইতে লাগিল। হাসিবার নিমিত্ত মুখ যে হাঁ করিয়াছিলাম, সেইরূপ হাঁ রহিয়া গেল। মুখ বুজিতে পারিলাম না। কথা কহিতে পারিলাম না। শুনিয়াছিলাম যে, হাই তুলিতে গিয়া অনেকের চ'লের হাড় নড়িয়া এইরূপ হয়। আমি মনে করিলাম যে, আমারও তাহাই হইল।

'ছকু। ছকু কোথায়? এখনও তুমি ঘরের ভিতর। সখের যাত্রা হইবে, তাহার সব যোগাড় কর।' এই কথা বলিতে বলিতে শ্বশুর মহাশয় আমার ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমার মুখের দিকে একবারমাত্র দৃষ্টি করিয়াই তিনি ঘোরতর ভীত হইলেন। ভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু তিনি সাহসী পুরুষ ছিলেন। পলাইলেন না। পুনর্বার আমার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'সর্বনাশ! এ কি হইয়াছে! তোমার নিজের মুখ কোথায় গেল। সর্বাঙ্গসুন্দরীর মাথা তোমার ঘাড়ের উপর কি করিয়া আসিল?'

সর্বাঙ্গসুন্দরী আমার পরলোকগত স্ত্রীর নাম ছিল। আমার নিজের মুণ্ড আমার নিজের স্কন্ধে নাই। সে স্থানে তাহার মুণ্ড বসিয়াছে। হাসিতে হাসিতে ঘাড় কেন যে খুট্ করিয়াছিল, এখন তাহার কারণ বুঝিলাম। মুখ আমার হাঁ হইয়াছিল। আমি কোন কথা বলিতে পারিলাম না। উত্তর না পাইয়া, শ্বশুর মহাশয় সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাড়ির ভিতর গিয়া তিনি শাশুড়ি ঠাকুরানীকে ডাকিয়া আনিলেন। শাশুড়ি ঠাকুরানীও আমার ঘাড়ের উপর তাঁহার কন্যার মুখ দেখিয়া প্রথমে ভয়ে ব্যাকুলিতা হইলেন ও সে স্থান হইতে পলাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু রায় মহাশয় তাঁহার হাত ধরিয়া রাখিলেন, যাইতে দিলেন না। শাশুড়ি ঠাকুরানী তাহার পর আমার দ্বারের নিকট মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। কন্যার শোক এখন তাঁহার উথলিয়া পড়িল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—'ওগো মাগো! যদি ভূত হইয়া দেখা দিলি, তো সর্বশরীরে দেখা দিলি না কেন? পরের ধড়ের উপর নিজের মুণ্ড বসাইলি কেন! ওগো মা গো! তুই আমার যে বড় সাধের মেয়ে ছিলি। তোর যেমন রূপ তেমনি গুণ ছিল। সেইজন্য আমরা যে তোর সর্বাঙ্গসুন্দরী নাম রাখিয়াছিলাম।'

শাশুড়ি ঠাকুরানী একটু চুপ করিলে, শ্বশুর মহাশয় আমাকে বলিলেন,—'তোমাকে এ অবস্থায় দেখিলে ভয়ে লোক সব পলাইয়া যাইবে। সন্ধ্যার পর অনেকে নিমন্ত্রণে আসিবে। তাহাদের প্রণামী তাহা হইলে আমি পাইব না। যাত্রাও তাহা হইলে হইবে না। অতএব তুমি আজ রাত্রিতে এই ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাক। কাল প্রাতঃকালে রোজা আনাইয়া তোমার ঝাড়ান-কাড়ান করাইব। যাহাতে এ মুখ গিয়া পুনরায় তোমার নিজের মুখ হয়, সে চেষ্টা করিব।'

আমি হাঁ বুজিতে পারিলাম না। কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। শাশুড়ির হাত ধরিয়া শ্বশুর মহাশয় চলিয়া গেলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে, আরসিখানি লইয়া আমি মুখ দেখিলাম। আশ্চর্য কথা। আমার কাঁধের উপর আমার নিজের মস্তক নাই। আমার মৃত স্ত্রীর মস্তক রহিয়াছে। আহা! সেই রং, সেই দাঁত, সেই মধুর হাসি, সেই মুখশ্রী, আমার মুণ্ডর পরিবর্তে তাহার মুণ্ড আমার স্কন্ধে বসিয়াছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধি আমার নিজের ছিল। বলা বাহুল্য যে, আমার ঘোরতর ভাবনা হইল। এই মুণ্ড যদি আমার কাঁধে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে আমার দশা যে কি হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।'

কিনু বলিলেন,—'ঘোর বিপদের কথা বটে। তাহার পর?'

॥ ৪ ॥

দুরন্ত মহিষাসুর

ছকু বলিলেন,—'ছোট ঘরটিতে মনের দুঃখে চুপ করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার পর আরতি হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের প্রণামীর টাকা ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে পড়িতে লাগিল। আরও অধিক রাত্রি হইল। সখের যাত্রা আরম্ভ হইল। বাড়ি লোকে লোকারণ্য হইল। যাত্রাদলের বালকেরা কেহ ছোঁড়া, কেহ ছুঁড়ি সাজিয়া কাতাব দিয়া দাঁড়াইয়া চিল-চেঁচাইতে লাগিল। এমন সময় সহসা দালানে প্রতিমাখানি দুলিতে লাগিল। গান বন্ধ হইয়া গেল। যত লোক শঙ্কিত ও স্তম্ভিত হইয়া একদৃষ্টে প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিল। কার্তিকের ময়ূর ভয়ঙ্কর ক্যাঁ-ক্যাঁ রবে বাড়ি যেন ফাটাইয়া দিল। সহসা দেবীর সিংহ বজ্রনিনাদেব ন্যায় গর্জন করিয়া অসুরকে ছাড়িয়া দুরে গিয়া বসিল। যে বল্লম দ্বারা অসুরকে মা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, এখন তিনি সেই বল্লমটি তুলিয়া লইলেন। অসুর উঠিয়া দাঁড়াইল। আসল মহিষাসুর। হস্তীর ন্যায় প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট ভয়াবহ অরণ্যবাসী অর্ণা।

দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বিপরীত বক্রাকার শৃঙ্গ পাতিয়া মহিষ গা-ঝাড়া দিল। তাহার পর শিং পাতিয়া ভীষণ গর্জন করিতে করিতে লোকদিগকে তাড়া করিল। শিঙে তুলিযা আমার শ্বশুরকে দূরে একটি তাকিয়ার উপব ফেলিয়া দিল। অজ্ঞান হইয়া শ্বশুর মহাশয় সেই তাকিযাব উপর পড়িয়া রহিলেন। তাহাব পর লাফ দিয়া উঠানে যাত্রাদলের মাঝখানে গিয়া পড়িল। সম্মুখের খুর দিয়া সপ-বিছানা দূরে নিক্ষেপ করিল; খুর দিয়া প্রাঙ্গণের মাটি খুঁড়িতে লাগিল, তাহার পর শিং পাতিয়া মাথা নীচে করিয়া দুরন্ত মহিষ একবার এদিকে একবার ওদিকে লোকসকলকে তাড়া করিতে লাগিল। বাপ রে মা রে চীৎকার করিয়া লোক সব পরস্পরের ঘাড়ে গিয়া পড়িতে লাগিল। কাহারও মাথায় ভয়ানক চোট লাগিল। যাত্রাদলের ছেলেদের কান্নায় বাড়ি পরিপূরিত হইল। দোতলার উপর বারাণ্ডায় বসিয়া স্ত্রীলোকেরা যাত্রা শুনিতেছিল। 'মা গো, কি হইল গো' বলিয়া তাহারা কাঁদিয়া উঠিল। কচি ছেলেরা সব চ্যাঁ-ভ্যাঁ করিয়া বাড়ি ফাটাইয়া দিল। দেবীর পাদপদ্মের নিকট সিংহ বসিয়া ভীষণ মেঘ-গর্জনের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল। কার্তিককে পৃষ্ঠে করিয়া মাথা তুলিয়া ময়ূর পুনরায় ক্যাঁ-ক্যাঁ করিতে লাগিল। মহিষ গাঁ-গাঁ শব্দ করিয়া একটা ঢাকের ভিতর শিং প্রবিষ্ট করিয়া দিল। তাহার পব মাথা তুলিয়া ঢাকটি দশ হাত দূরে ফেলিয়া দিল। পুনরায় শিং পাতিয়া মাথা নীচে করিয়া একবাব এদিক একবার ওদিক প্রবলবেগে দৌড়িতে লাগিল। তখন তাহার খুরের দুড়-দুড় শব্দে মেদিনী কাঁপিতে লাগিল। দক্ষযজ্ঞের কথা শুনিয়াছিলাম, আজ আমার শ্বশুরবাড়িতে সেই দক্ষযজ্ঞ হইতে লাগিল। শৃঙ্গে তুলিয়া মহিষ শত শত লোককে দূরে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কাহারও সে প্রাণবধ করিল না। লোক সব রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। বাদ্যকরদিগের ঢাক-ঢোল, যাত্রাওয়ালাদিগের বিলাতি যন্ত্র ভাঙিয়া-চুরিয়া একাকার করিয়া দিল। দোল-মঞ্চে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, সেসব ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল।

বাহিরে ভয়ানক কোলাহল হইতেছে। ঘরেব ভিতর একাকী আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। ব্যাপারখানা কি জানিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিলাম। মহিষের ভয়ে কতক লোক আশেপাশে লুকাইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া 'বাপ রে! আবার রাক্ষস আসিয়াছে!' এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে সকলে পলায়ন করিল। মহিষ আমাকে তাড়া করিল। ভয়ে আমি ঘবে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে বাটী নীরব হইল, আস্তে আস্তে আমি দ্বার খুলিয়া উঁকি মারিলাম। মহিষ নাই, বাটীতে জনপ্রাণী নাই। আরও আগে গিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণের ঝাড়লণ্ঠন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। ভগ্ন ঢাক-ঢোল ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র পড়িয়া আছে। দালানের প্রতিমার নিকট লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। মায়ের প্রতিমা পূর্বে যেরূপ ছিল—এখনও ঠিক সেইরূপ ছিল। শ্বশুর মহাশয় তখনও তাকিযার উপর পড়িয়াছিলেন। আমি তাঁহার মাথাটি তুলিলাম। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর 'বাপ! মহিষাসুর!' এই কথা বলিয়া তিনি বাটীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

আমি নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। তক্তপোষের উপর আমি শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু নিদ্রা হইল না। কি করিয়া পুনরায় নিজের মুণ্ড ফিরিয়া পাইব, কেবল সেই কথা ভাবিতে লাগিলাম। টং টং টং করিয়া রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। ঘরে আমার প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সহসা প্রদীপ নিবিয়া গেল। নিবিড় অন্ধকারে ঘর পরিপূর্ণ হইল। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দুইটি সাদা চক্ষু আর দুই পাটি দাঁত জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

আমি মনে করিলাম, এ আবার কি? কি কুক্ষণেই আজ প্রভাত হইয়াছিল। সপ্তমী পূজার দিন, কোথায় আমোদ-প্রমোদ করিব, তাহা না হইয়া বিপদের উপর বিপদ। ভয়ের উপর ভয়। ঘোর আতঙ্কে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। আবার ভাবিলাম,—ভয় করি—কেন? আমার নিজের মুণ্ড নাই, পরের মুণ্ড আমার ঘাড়ে। এরূপ অবস্থায় কালযাপন করা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল।'

কিনু বলিলেন,—'তা বটে! তোমার কিন্তু খুব সাহস। তাহার পর কি হইল?'

॥ ৫ ॥

যকের ধন

ছকু বলিলেন,—'দাঁতওয়ালা সেই মূর্তি লোহার ন্যায় কঠিন হাত বাহির করিয়া আমার দুই গালে দু'টি চড় মারিল। তখন আমার চ'লের হাড় নড়িয়া গেল। ঠিক আমার নহে, আমার ঘাড়ে যে মুণ্ড ছিল, তাহার মুখ বুজিয়া গেল। সেই মুখ দিয়া এখন কথা কহিতে পারিলাম।

দাঁতওয়ালা বলিল,—'আমি ভূত!'

আমার মনে এখন ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। আমি বলিলাম,—'বটে! মহাশয়, ভূত?'

ভূত বলিল,—'এস, তোমার ঘাড়টি ভাঙিয়া দিই।'

আমি বলিলাম,—'এ আমার মস্তক নহে, অন্য লোকের।'

ভূত পুনরায় বলিল,—'সম্প্রতি আমি ভূত হইয়াছি। ভূতগিরি করিতে এখনও ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে পারি নাই। আজ ভোর হইলে কি যে কি করিব, তাহাই ভাবিতেছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কেন?'

ভূত উত্তর করিল,—'আমরা হাওয়া। রাত্রি হইলে আমরা মানুষের আকার ধারণ করিয়া ভূতগিরি করি। ভোর হইলে আবার পুনরায় হাওয়া হইয়া যাই। কি করিয়া পুনরায় হাওয়া হইতে হয়, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। দিন হইলেও আমাকে এইরূপ মানুষের আকার ধরিয়া থাকিতে হইবে।'

আমি বলিলাম,—'তা কি হয়! তাহা হইলে লোক সব ভয় পাইবে, কাজকর্ম সব বন্ধ হইয়া যাইবে!'

ভূত বলিল,—'তবে এক কর্ম কর। তোমার ঘাড়ে যে মুণ্ডটি রহিয়াছে, ঐটি আমাকে দাও, ও পুরাতন ভূত, কি করিয়া পুনরায় হাওয়া হইতে হয়, ও আমাকে বলিয়া দিবে।'

আমি বলিলাম,—'আমার নিজের মুণ্ড ফিরিয়া না পাইলে এ মুণ্ড কি করিয়া দিব?'

ভূত বলিল,—'কেন কন্ধকাটা হইয়া থাকিবে। সাধু ভাষায় যাহাকে কবন্ধ বলে।'

আমি বলিলাম,—'জীয়ন্ত শরীরে তাহা হয় না।'

ভূত বলিল,—'তোমার মুণ্ড খিড়কির বাগানে চালতে-তলায় পোঁতা আছে। শাবল লইয়া আমার সঙ্গে চল; আমি দেখাইয়া দিব।'

শাবল লইয়া আমি ভূতেব সঙ্গে চলিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমার শ্বশুরবাড়ির চারিদিকে বাগান ছিল, আর সেই বাগান উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পূর্বদিকে প্রাচীরের ধারে একটি চালতেগাছ ছিল। সেই গাছের অনেকগুলি ডাল প্রাচীরের উপর পড়িয়াছিল। চালতেতলার এক স্থান ভূত আমাকে দেখাইয়া দিল। শাবল দিয়া সেই স্থান আমি খুঁড়িতে লাগিলাম। অল্প খুঁড়িতে সরা ঢাকা এক হাঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল। সরা খুলিয়া দেখি যে, তাহার ভিতর আমার মুণ্ড! আমার স্কন্ধ হইতে ভূত তখন সর্বাঙ্গসুন্দরীর মুণ্ড তুলিয়া লইয়া আবার আমার নিজের মুণ্ড সেই স্থানে বসাইয়া দিল। নিজের মুণ্ড যদি না পাইতাম, তাহা হইলে কি করিয়া যে গাঁজা খাইতাম, তাহাই ভাবি; সে হাঁ-কবা দাঁত বাহির করা মুখ দিয়া গাঁজায় দম দিতে পারিতাম না।'

কিনু বলিলেন,—'আশ্চর্য! তাহার পর?'

ছকু বলিলেন,—'ভূত তখন হাওয়া হইয়া গেল। কিন্তু হাওয়া হইবার পূর্বে সে আমাকে আর একটু খুঁড়িতে বলিয়া গেল। আর একটু খুঁড়িয়া প্রায় একঝুড়ি মাটি আমি তুলিয়া ফেলিলাম! তাহার পর দেখি যে, নিম্নে বৃহৎ একটি কাঠের বাক্স রহিয়াছে, আর সেই বাক্সের উপব প্রকাণ্ড এক ব্যাঙ বসিয়া আছেন, ব্যাঙের গা হইতে একপ্রকার লালা নির্গত হইতেছে। আর সেই লালা আগুনের মত জ্বলিতেছে।

লাফ দিয়া ব্যাঙ গর্তের উপর গিয়া বসিল। আমি ভাবিলাম যে, ভূতের কল্যাণে আমি আমার নিজের মুণ্ড ফিরিয়া পাইলাম। ভূত আমাকে বোধ হয় যকের ধন দিয়া গেল। যকের টাকায় শুনিয়াছি সাপ থাকে, ভূত মহাশয় সাপ লইয়া গিয়াছেন। আহারের নিমিত্ত সাপ ব্যাঙটি যোগাড় করিয়াছিলেন।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শাবলের চাড়া দিয়া বাক্সর ডালা আমি খুলিলাম। তখন আমার যে কি আনন্দ হইল, তাহা তোমাদিগকে আর কি বলিব। বাক্সটি টাকায় পরিপূর্ণ ছিল। চক্‌চকে নূতন টাকা। কেবল একধারে একতাড়া কাগজ ছিল।

ব্যাঙের আলোতে আমি দুই চারিটি টাকা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছি, এমন সময় আমার শ্বশুর মহাশয় দোতলায় তাঁহার শয়নঘরের জানালা হইতে বলিয়া উঠিলেন,—'কে ও! চালতেতলায় কে ও!'

আমি তাড়াতাড়ি বাক্সর উপর মাটি চাপা দিতে লাগিলাম। ব্যাঙ দুই-চারি লাফে সে স্থান হইতে পলাইয়া গেল। ব্যাঙ অভাবে চালতেতলা অন্ধকারময় হইয়া গেল।

সেইজন্য ভাই, ছোঁড়ারা আমায় ক্ষেপায়; বলে,—

ধন ফেলে ব্যাঙ পালালো।
ছকু ভায়ার ঠ্যাঙটি গেল॥

কিনু বলিলেন,—'ছোঁড়াদেব বড় অন্যায়। তোমার ঠ্যাঙটি কি করিয়া গেল?'

ছক্কু বলিলেন,—'আমার শাশুড়ি ঠাকুরানীও সেই সময় জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন,— 'কোথায় কে?'

শ্বশুর উত্তর করিলেন,—'চালতেতলায় একটা আলোর মত কি দেখলাম। এখন নিবিয়া গিয়াছে।'

শাশুড়ি বলিলেন,—'হয়তো আলেয়া।'

শ্বশুর বলিলেন,— 'আলেয়া নয়, হয়তো চোর। ভোজালে দাও, দেখিয়া আসি।'

তাড়াতাড়ি গর্তটি পরিপূর্ণ করিয়া আমি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম। নিজের ঘরে আসিয়া শয়ন করিলাম। ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

প্রাতঃকালে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি বাহিরে আসিলাম। শ্বশুর ভাঙা ঝাড়লণ্ঠন ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি দেখিতেছিলেন। আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি বলিলেন,— 'এই যে, তুমি তোমার নিজের মাথা পাইয়াছ।' তাহার পর পুনরায় তিনি বলিলেন,—'এই সকল বাদ্যযন্ত্রের দাম আমাকে দিতে হইবে। মোদো মহিষাসুর সাজিয়া আমার জিনিসপত্র ভাঙিয়াছে, তাহার নামে আমি নালিশ করিব। তাহাকে জেলে পচাইব।'

আমি কোন উত্তর করিলাম না। নিজের ঘরে আসিয়া যকের টাকার কথা ভাবিতে লাগিলাম। সত্য সত্য কি আমার কপাল ফিরিয়াছে?

॥ ৬ ॥

ছক্কুর ঠ্যাঙ

সমস্ত দিন কেবল ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান্ যদি যকের ধন আমাকে দিলেন, তাহা হইলে কি করিয়া ইহা লইয়া এ-স্থান হইতে পলায়ন করি। কত উপায় ভাবিলাম। কিন্তু কোনটি মনের মত হইল না। একবার ভাবিলাম যে, শ্বশুর যদি এই ধনের অর্ধেক ভাগ আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে গিয়া বলি। কিন্তু রায় মহাশয়ের প্রকৃতি আমি ভালরূপ জানিতাম। তিনি নিশ্চয় বলিবেন যে,—'এ আমার টাকা, আমি এই স্থানে পুতিয়া রাখিয়াছিলাম! তোমাকে ইহার ভাগ দিব কেন?'

সমস্ত দিন ভাবিয়া উপায় স্থির করিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার পূর্বে বাজার হইতে একটি আঁধারে লণ্ঠন কিনিয়া আনিলাম। সেদিন মহাষ্টমী, সে রাত্রিতে বাড়িতে কোন নাচ-গাওনা ছিল না। যকের ধন ঠিক আছে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্ত রাত্রি দুইটার সময় লণ্ঠনটি হাতে লইয়া পুনরায় সেই চালতেতলায় উপস্থিত হইলাম। হাত দিয়া মাটি সরাইতে সবেমাত্র আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময়ে দোতলার উপর জানালার ধারে দাঁড়াইয়া শ্বশুর মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, 'সেই চোর বেটা আজ আবার বুঝি আসিয়াছে। ভোজালে দাও।'

আর আমি বিলম্ব করিলাম না। মাটি যেমন ছিল তাড়াতাড়ি সেইরূপ করিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম। নিজের ঘরে আসিয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া এক উপায় স্থির করিলাম। তাহার পর সেইদিন ভোরে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া শ্বশুরের বাড়ি হইতে পলায়ন করিলাম।

নিকটে একখানি খোলার বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির লোকদিগের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় ছিল। সে স্থানে গিয়া আমি রহিলাম। আমার শ্বশুরের বাগানের পূর্বদিকে প্রাচীরের বাহিরে একটি গলি ছিল। এ স্থানে লোকের অধিক বাস ছিল না। রাত্রিকালে এ গলিতে

লোকের বড় যাতায়াত ছিল না। দিনের বেলা দুই-তিন বার সেই গলিতে গিয়া বাহির হইতে বাগানের প্রাচীর ও সেই চালতেগাছ দেখিয়া আসিলাম। চালতা-বৃক্ষের নিম্নদেশে ডাল ছিল। দুই তিনটি শাখা প্রাচীরের উপর পড়িয়াছিল। সেই ডাল ধরিয়া প্রাচীরের উপর হইতে বাগানের ভিতর সহজে নামিতে পারিব। কিন্তু বাহির হইতে প্রাচীরে কি করিয়া উঠিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে একস্থানে দুইটি বাঁশ পড়িয়া আছে দেখিলাম, মনে করিলাম, এই বাঁশের সহায়তায় আমি প্রাচীরের উপর উঠিব।

নবমী পূজার দিন সন্ধ্যার পর ঘোর বাদলা উপস্থিত হইল। আকাশ নিবিড় মেঘে ঢাকিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোকে পৃথিবী আলোকিত হইতে লাগিল। আমি মনে ভাবিলাম যে, ভালই হইয়াছে, এ দুর্যোগে কেহ ঘর হইতে বাহির হইতে পারিবে না। অনায়াসে আমি বাক্সটি আনিতে পারিব।

রাত্রি তিনটার সময় খেলার ঘর হইতে বাহির হইলাম। প্রাচীরের গায়ে বাঁশ দিয়া উপরে উঠিলাম। চালতেগাছের ডাল ধরিয়া নীচে নামিলাম। হাত দিয়া মাটি খুঁড়িয়া বাক্স বাহির করিলাম। বাক্স গর্তের উপর তুলিলাম। কিন্তু সর্বনাশ! বাক্স অতিশয় ভারি। কি কবিয়া ইহা লইয়া গাছে উঠিব, কি করিয়া প্রাচীর পার হইয়া গলিতে গিয়া নামিব! এ বুদ্ধি পূর্বে আমার যোগায় নাই।

যাহা হউক, অতিকষ্টে বাক্স আমি মাথায় তুলিলাম। এক হাতে বাক্স ধরিয়া অপর হাত দিয়া চালতেগাছের উপর উঠিতে লাগিলাম। ভাগ্যক্রমে গাছের ডালগুলি সুবিধামত ছিল। তাই উঠিতে পারিলাম। একটি ডালের উপর উঠিলাম। দুইটি ডালের উপর উঠিলাম। প্রাচীরের মাথা আর অল্প দূরে আছে, আর দুই-তিনটা ডাল পার হইলেই, তাহার উপর গিয়া উঠিতে পাবি, এমন সময় বিদ্যুতের আলোকে দিনের ন্যায় চারিদিক আলোকিত হইল। সেই সময় হড়াৎ করিয়া শ্বশুরবাটীর খিড়কীদ্বার কে খুলিয়া ফেলিল। পুনরায় আর একবার বিদ্যুৎ হইল। ঘোর বিপদ। আমি দেখিলাম যে, দক্ষিণ হাতে ভোজালে, আর বামহাতে লণ্ঠন লইয়া মশ-মশ করিয়া শ্বশুর মহাশয় সেই চালতেতলার দিকে আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে শাশুড়ি ঠাকুরানী আসিতেছেন।

ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমার হাত-পা অবশ হইয়া গেল। গাছ হইতে আমি পড়িয়া যাই আর কি। যাহা হউক, আমি নিজে পড়িলাম না। কিন্তু বাক্সটি ঝনাৎ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল। ডালটি ভাঙিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। চক্চকে টাকা সব চারিদিকে ছত্রাকার হইয়া ছড়াইয়া পড়িল।

শ্বশুর-শাশুড়ি চালতেতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে একটি কাগজের তাড়া দেখিয়া শ্বশুর মহাশয় প্রথম তাহাই কুড়াইয়া লইলেন। লণ্ঠনের আলোতে কাগজগুলি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ও কি কাগজ?'

শ্বশুর উত্তর করিলেন,—'নোট; এক একখানি হাজার টাকার নোট, অনেকগুলি আছে।'

শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ বাক্স, এ নোট, এসব টাকা কোথা হইতে আসিল?'

শ্বশুর উত্তর করিলেন,—'এ বাড়ি পূর্বে একজন বড়মানুষের ছেলের ছিল। নিজের বিষয় উড়াইয়া সে কাবুলী চাকর দ্বারা ডাকাতি করাইত। চোরাই মাল সে বোধ হয়, এই স্থানে পুতিয়া রাখিয়াছিল। আমরা এইবার বড়মানুষ হইব।'

শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বাক্স খুঁড়িয়া তুলিতে চোর আসিয়াছিল?'

শ্বশুর উত্তর করিলেন,—'চোর নয়, জামাই বেটার কাণ্ড। যদি এখন পাই, তাহা হইলে এই ভোজালে দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তাহাকে কাটি, আর এই গর্তের ভিতর পুতিয়া রাখি।'

এই কথা বলিয়া তিনি গাছের দিকে লণ্ঠনটি তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। পাতার ভিতর এতক্ষণ চুপ করিয়া আমি লুক্কায়িত ছিলাম। আর থাকিতে পারিলাম না। ডাল ধরিয়া প্রাচীরের উপর গিয়া উঠিলাম। তাহার পর বাঁশ ধরিয়া তাড়াতাড়ি নামিবার চেষ্টা করিলাম। বাঁশ পড়িয়া গেল। আমি সবলে নীচে গলিতে গিয়া পড়িলাম। আমার দক্ষিণ পায়ের হাড় ভাঙিয়া চর্মভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তথাপি বুকে হাঁটিয়া আমি সে স্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিলাম। বুকে হাঁটিয়া ক্রমে সদর-রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আর আগে যাইতে পারিলাম না। অল্পক্ষণ পরে একজন পাহারাওয়ালা আমাকে দেখিতে পাইল। তাহার পর কি হইল, তাহা আমি জানি না। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

তিন দিন পরে একবার আমার জ্ঞান হইল। দেখিলাম যে, আমি হাসপাতালে পড়িয়া আছি। আর জানিতে পারিলাম যে, করাত দিয়া ডাক্তারে আমার দক্ষিণ পা কাটিয়া ফেলিয়াছে। আমার জ্ঞান অধিকক্ষণ রহিল না, প্রবল জ্বর দ্বারা আমি আক্রান্ত হইলাম। জ্বরের উপর বিকার হইল। জ্ঞান-গোচরশূন্য হইয়া পঁচিশ দিন আমি এখন যাই, তখন যাই হইয়া পড়িয়া রহিলাম। পঁচিশ দিন পরে পুনরায় আমার জ্ঞান হইল। কিন্তু আরও দুই মাস আমাকে হাসপাতালে বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইল।

হাসপাতাল হইতে বাহির হইবার পূর্বে, একজন বাঙ্গালী ডাক্তার আমাকে একখানি খবরের কাগজ দিয়াছিলেন, তাহাতে লেখা ছিল যে, চক্রধর রায়ের সাত বৎসর কারাবাস হইয়াছে।

কিনু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেন?'

ছকু উত্তর করিলেন,—'জাল নোট, মেকি টাকা বাজারে চালাইতেছিলেন।'

বদন বলিলেন,—'তবে সে বাক্সতে কেবল জাল নোট আর মেকি টাকা ছিল?'

ছকু উত্তর করিলেন,—'হুঁ! বাক্সটি মেকি টাকায় পরিপূর্ণ ছিল। নোটগুলিও সব জাল। পূর্বে যাহার ঐ বাড়ি ছিল, সে এই কাজ করিত।'

নবদ্বীপ বলিলেন,—'উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে।'

কিনু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভূত, মহিষাসুর—এসব কি করিয়া হইয়াছিল?'

ছকু উত্তর করিলেন,—'মাধব হিপনটিশ্যাম করিয়াছিল।'

বদন বলিলেন,—'গেলাসে ঢালো।'

কিনু বলিলেন,—'তামাক সাজো।'

ছকু বলিলেন,—'তামাক সাজিতেছি, কিন্তু তোমাদিগকে একটা কথা বলি, আমার পা কাটা গিয়াছে সত্য, কিন্তু আমি সুপুরুষ। তথাপি কেহ আমাকে কন্যা দিতে চায় না। তোমরা প্রাণের বন্ধু! তোমরাও কিছু করিলে না। এখন পাঠকগণ আমার একমাত্র ভরসা। পাঠকগণ! যদি কাহারও অবিবাহিত কন্যা থাকে, যদি আমা হেন সু-পাত্রকে ঘরজামাই রাখিতে সাধ থাকে, তাহা হইলে এই আমি মজুদ আছি।'

মৃত্যুকালের পূর্ববর্তী কালের বিবরণ

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



বৎসরের বার মাস ত্রিশদিনই কিছু আমার জন্মপরিগ্রহ হয় নাই; নির্দিষ্ট মাস, বার তারিখে আমি ভূমিষ্ঠ হই। তৎপূর্বে আমার এই চক্ষুতে সংসার দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ফলত ইতিহাসের প্রথমাবস্থা এইরূপ তিমিরাচ্ছন্নই হইয়া থাকে। যাহা হউক, সেই অবধি নিয়তই আমার বয়োবৃদ্ধি হইতেছে; অধিক কি, সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, কাল-গণনায় গত কল্য আমার যত বয়ঃক্রম হইয়াছিল, অদ্য তাহা অপেক্ষাও বেশী।

কোন কোন দার্শনিকের মতে, কাল-সহকারে বয়সের বৃদ্ধি না হইয়া বরং ক্ষয় হয়। কিন্তু আমি এ মতের অনুমোদন করি না; কারণ, তাহা হইলে ক্রমে স্ত্রী বিধবা হইতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, দেখা যায়, অনেকের স্ত্রী বিধবা হন না। তদ্ভিন্ন বিধবা-বিবাহ যুক্তি এবং শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া মানিলেই স্ত্রীর সধবত্বাৎ বয়ঃক্ষয়ের অপ্রমাণ সিদ্ধান্ত।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধনসঞ্চয়ের মত মহাপাতক আর নাই; উপার্জনশীলের হাতে পাছে টাকা-কড়ি জমিয়া যায়, এই আশঙ্কায় বার মাসে তের পর্ব, পনর তিথিতে সাঁইত্রিশ ব্রত, সাত পুরুষের শ্রাদ্ধ, অপর পক্ষের তর্পণ, গয়ায় পিণ্ড প্রদান, বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন, পুরুষোত্তমে আট্‌কে বন্ধন, এবং অতিথিকে ইচ্ছাভোজন ও ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষাদানের ব্যবস্থাতে শাস্ত্রকারগণ নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া বিবাহ, সীমোন্তন্নয়ন, গর্ভাধান, সাধ-ভক্ষণ, অন্নপ্রাশন, নামকরণ, চূড়া, কর্ণবেধ, উপনয়ন, দীক্ষা প্রভৃতি সাত শত তিরানব্বই হাজার বারের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমারও অন্নপ্রাশনাদি হইয়াছিল, এ কথা লিখিয়া এই জীবনী দীর্ঘাকৃতি করা অস্মদাদির অনুচিত।

যথাক্রমে আমি পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম; শুভক্ষণে আমার হাতে খড়ি পড়িল। গুরু বিদ্যাবীজ ভূমিতে অঙ্কিত করিলেন, আমি মৃত্তিকা খনন এবং হলচালন অভ্যাস করিতে লাগিলাম। গুরুর পর গুরু গেল, ক—এর ত্রিসীমার পর আঁকড়ি পর্যন্ত আমার আদায় হইল। এইরূপে দিন দিন শশিকলার ন্যায় আমার বিদ্যার ষোড়শ বা চতুঃষষ্টি কলা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে আমি বিদ্যার পারে গেলাম। তখন আমার

বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর মাত্র।

একবার মাত্র আমি পরীক্ষা দিয়াছিলাম, আমার বিদ্যাশিক্ষা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় তাহাতেই হইয়াছিল; অতএব সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে।

গ্রামে একটি গবর্ণমেন্ট-পরিচালিত বঙ্গবিদ্যালয় হইয়াছিল, প্রথম প্রথম অনেকগুলি বালক পড়িতে যাইত। পণ্ডিত মহাশয়ের তাহাতে বড়ই প্রতাপ বৃদ্ধি হইল; পড়ো অ-পড়ো, সব ছেলেকেই তিনি লালচক্ষু দেখাইতেন। আমি একাধিপত্যের বিরোধী, সুতরাং পণ্ডিতের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহার প্রতাপ টুটিল, বালকেরা বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ করিল।

ইন্‌স্পেক্টার একদিন সংবাদ পাঠাইলেন যে, পর দিবস তিনি পরিদর্শনে আসিবেন। পণ্ডিত ব্যতিব্যস্ত, আসিয়া আমার খোশামুদ জুড়িলেন। সেই রাত্রিতে আমার যাত্রার দলের গান হইবে; আমি দূতী সাজিবার জন্য গোঁফ কামাইয়া প্রস্তুত; ছেলেরা বালক সাজিবে, গান মুখস্থ করিতেছে। শেষ, পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে রফা হইল, তিনি ছেলেদের কিছু বলিবেন না, আমার যাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, আর ইন্‌স্পেক্টার আসিলে আর কেহ যাউক না যাউক, আমি গিয়া স্কুল এবং স্কুলের ইজ্জত বজায় করিয়া দিয়া আসিব।

পরদিন আমার মনোমত চারি পাঁচটি বালক সঙ্গে, আমি গিয়া উপস্থিত; গোঁফ ছিল না, আমিও বালক, তবে প্রধান বালক। ইন্‌স্পেক্টার আসিলেন।

ইন্‌স্পেক্টার,-- বালকসংখ্যা এত অল্প দেখিতেছি কেন?

পণ্ডিত, --হুজুর, ম্যালেরিয়া।

ইন্‌স্পেক্টার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। বুদ্ধিমান চেহারা দেখিয়া আমাকেই প্রথম ধরিলেন।

ইঃ। তোমার বয়স কত?

আমি। আজ আঁকের দিন নয়, ছিলট্ আনি নাই।

ইঃ। শ্লেট কেন?

আমি। বয়সের হিসাব করিতে।

ইন্‌স্পেক্টার, পণ্ডিত মহাশয়ের উপর সোৎসাহ দৃষ্টিপাত করিলেন; পুনরপি পরীক্ষা আরম্ভ--

ইঃ। তোমরা ভূগোল পড়?

আমি। (মৃদুস্বরে) ভুও গোল করি।

ইঃ। পৃথিবীর আকার কেমন?

আমি। দাঁড়িব (।) মত।

ইঃ। না, ঠিক দাড়িম্বের মত নয়; তাহা অপেক্ষাও গোল।

আমি। সবই গোল।

ইঃ। তবে দাড়িম্বের মত বলিলে কেন?

আমি। কৈ তা ত বলি নি।

ইঃ। তবে বল, পৃথিবী কিসের মত?

আমি। আপনার মাথার মত।

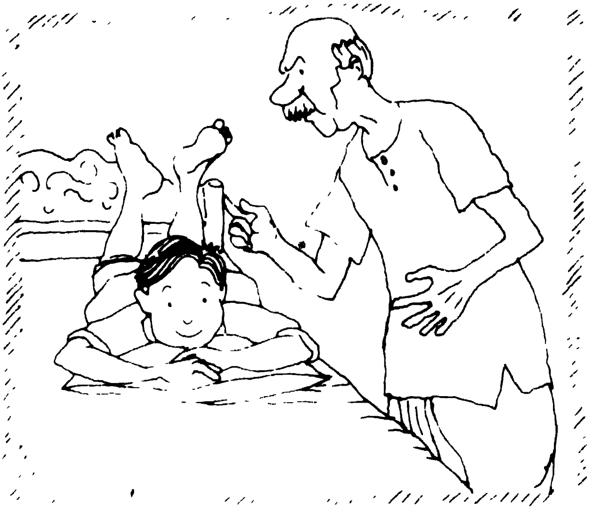
ইন্‌স্পেক্টার চলিয়া গেলেন। সকলে আমার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল। দিন কতক পরে সংবাদ আসিল, বিদ্যালয়ের সাহায্য বন্ধ, পণ্ডিত মহাশয়ের অন্ন বন্ধ।*

---

* রেভারেন্ড লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইচ্ছাপূরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মানুষটি হয় না। সেই জন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াশুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেই জন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল্, চড়্, চাপড়্ সকল সময় ঠিক জায়গায় পড়িত না। কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাৎ যেদিন ধরা পড়িতেন, সেদিন তাঁহার, তার [illegible] থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেছিল না। তাহার অনেকগুলা কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও-পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধুমধাম চলিতেছে। সুশীলের ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে বিছানায় পড়ে আছিস্ যে। আজ স্কুলে যাবিনে?"

সুশীল বলিল, "আমার পেট কাম্‌ড়াচ্ছে, আজ আমি স্কুলে যেতে পারব না।"

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, রোস, একে আজ জব্দ করতে হবে। এই বলিয়া কহিলেন, "পেট কামড়াচ্ছে? তবে আর তোর

কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসেদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জন্যে আজ লজেঞ্জুস কিনে রেখেছিলুম সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক্, আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি।''

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবলচন্দ্র খুব তিতো পাঁচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন। সুশীল মহা মুশকিলে পড়িয়া গেল। লজঞ্জুস্ সে যেমন ভালোবাসিত, পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্বনাশ বোধ হইত। ওদিকে আবার বোসেদের বাড়ি যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছটফট করিতেছে, তাহাও বুঝি বন্ধ হইল।

সুবলবাবু যখন খুব বড়ো এক বাটি পাঁচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন, সুশীল বিছানা হইতে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল, ''আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ স্কুলে যাব।''

বাবা বলিলেন, ''না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ করে শুয়ে থাক্।'' এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল, আহা, যদি কালই আমার বাবার মত বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না।

তাহার বাপ সুবলবাবু বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার ভালো রকম পড়াশুনা কিছু হলো না। আহা, আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই, তাহলে আর কিছুতেই সময় নষ্ট না করে কেবল পড়াশুনো ক'রেনি।

ইচ্ছাঠাক্‌রুন সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, আচ্ছা ভালো, কিছু দিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, ''তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।'' ছেলেকে গিয়া বলিলেন, ''কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।'' শুনিয়া দুইজনে ভারি খুশি হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটায় ঘুমাইতেন। কিন্তু আজ তাঁহার কী হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন খুব ছোটো হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগুলি উঠিয়াছে; মুখের গোঁফ দাড়ি সমস্ত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই। রাত্রে যে ধুতি জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন, সকাল বেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে যে, হাতের দুই আস্তিন প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা বুক পর্যন্ত নাবিয়াছে, ধুতির কোঁচাটা এতই লুটাইতেছে যে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারিদিকে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙে না; যখন তাহার বাপ সুবলচন্দ্রের চেঁচামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল, কাপড়চোপড়গুলো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে ছিঁড়িয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার জো হইয়াছে; শরীরটা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে; কাঁচা পাকা গোঁফ-দাড়িতে অর্ধেকটা মুখ দেখাই যায় না; মাথায় এক মাথা চুল ছিল। হাত দিয়া দেখে, সামনে

চুল নাই—পরিষ্কার টাক্ তক্‌তক্ করিতেছে।

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিল; অনেকবার এপাশ ওপাশ করিল; শেষকালে সুবলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুশকিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া, কাঁচা আম খাইয়া, পাখির বাচ্চা পাড়িয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে; যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহাই ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানা পুকুরটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, ইহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে। চুপচাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিযা বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলা-ধুলাগুলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় না, একবার চেষ্টা কবিয়াই দেখা যাক। এই ভাবিয়া কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করিল। কাল যে গাছটাতে কাঠবিড়ালির মতো তর তর করিয়া চড়িতে পারিত, আজ বুড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না; নিচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গেল এবং বুড়া সুশীল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বুড়াকে ছেলেমানুষের মতো গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সুশীলচন্দ্র লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদুরে আসিয়া বসিল। চাকরকে বলিল, "ওরে বাজার থেকে একটাকার লজঞ্জুস্ কিনে আন্।"

লজঞ্জুসের প্রতি সুশীলচন্দ্রের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজঞ্জুস্ কিনিয়া খাইত; মনে করিত, যখন বাবার মত টাকা হইবে, তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজঞ্জুস্ কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় এক রাশ লজঞ্জুস্ কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া চুষিতে লাগিল; কিন্তু বুড়ার মুখে ছেলেমানুষের লজঞ্জুস্ কিছুতেই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল, এগুলা আমার ছেলেমানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক আবার তখনই মনে হইল, না, কাজ নাই, এত লজঞ্জুস্ খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।

কাল পর্যন্ত যে সকল ছেলে সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে, আজ তাহারা সুশীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়া সুশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল।

সুশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে সমস্তদিন ধরিয়া কেবলই ডুডু ডুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে; কিন্তু আজ রাখাল, গোপাল, অক্ষয়, নিবারণ, হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল; ভাবিল চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনি বুঝি ছোঁড়াগুলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।

আগেই বলিয়াছি, বাবা সুবলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোটো ছিলাম তখন দুষ্টামি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ছেলে বয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্ত দিন শান্ত শিষ্ট হইয়া, ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া, কেবলই বই লইয়া পড়া মুখস্থ করি। এমন কি, সন্ধ্যার পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া

রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলে বয়স ফিরিয়া পাইয়া সুবলচন্দ্র কিছুতেই স্কুলমুখো হইতে চাহেন না। সুশীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, "বাবা, ইস্কুলে যাবে না?" সুবল মাথা চুল্‌কাইয়া মুখ নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, "আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।" সুশীল রাগ করিয়া বলিত, "পারবে না বৈ কি! ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও সব জানি।"

বাস্তবিক সুশীল এত রকম উপায়ে স্কুল পলাইত এবং সে এত অল্পদিনের কথা যে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম নহে। সুশীল জোর করিয়া ক্ষুদ্র বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছুটির পরে সুবল বাড়ি আসিয়া খুব একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিযা বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃদ্ধ সুশীলচন্দ্র চোখে চশমা দিয়া একখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া পড়িত, সুবলের ছুটাছুটি গোলমালে তাহার পড়ায় ব্যাঘাত হইত। তাই সে জোর করিয়া সুবলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা শ্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগুলো এমনি বড়ো বড়ো বাছিয়া দিত যে, তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের এক ঘণ্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলায় বুড়া সুশীলের ঘরে অনেক বুড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় সুবলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাস্টার রাখিয়া দিল, মাস্টার রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড়ো কড়াকড়ি ছিল। কারণ, তাহার বাপ সুবল যখন বৃদ্ধ ছিলেন, তখন তাহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একটু বেশী খাইলেই অম্বল হইত,—সুশীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে, সেজন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্প বয়স হইয়া আজকাল তাঁহার এমনি ক্ষুধা হইয়াছে যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাঁহাকে যতই অল্প খাইতে দিত, পেটের জ্বালায় তিনি ততই অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে; তাই কেবল ঔষধ গিলাইতে লাগিল। বুড়া সুশীলের বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার পূর্বকালের অভ্যাস মতো যাহা করে, তাহাই তাহার সহ্য হয় না। পূর্বে সে, পাড়ায় কোথাও যাত্রা-গানের খবর পাইলেই, বাড়ি হইতে পলাইয়া, হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়ে হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া—সর্দি হইয়া—কাসি হইয়া, গায়ে মাথায় ব্যথা হইয়া—তিন হপ্তা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহা করিতে গিয়া হাতের গাঁট, পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল; তাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। তাহার পর হইতে দুই দিন অন্তর সে গরম জলে স্নান করিত এবং সুবলকেও কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্বেকার অভ্যাস মতো, ভুলিয়া তক্তপোষ হইতে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গুলো টনটন ঝনঝন করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আস্ত পান পুরিয়াই হঠাৎ দেখে, দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধ্য। ভুলিয়া চিরুনি, ব্রুশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক্। এক-একদিন হঠাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়া হইয়াছে এবং পূর্বের অভ্যাস মতো দুষ্টামি করিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত—বুড়া মানুষের এই ছেলেমানুষি দুষ্টামি দেখিয়া, লোকেরা তাহাকে মার্ মার্ করিয়া তাড়াইয়া দিত, সে-ও

লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সুবলচন্দ্র এক-একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল ছেলেমানুষ হইয়াছে। আপনাকে পূর্বের মতো বুড়া মনে করিয়া, যেখানে বুড়া মানুষেরা তাস, পাশা খেলিতেছে, সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বুড়ার মতো কথা বলিত, শুনিয়া সকলেই তাহাকে "যা যা, খেলা কর্‌গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না",—বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, "দাও তো তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।" শুনিয়া মাস্টার তাহাকে বেঞ্চের উপর একপায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, "ওরে ফেজা, ক'দিন আমাকে কামাতে আসিসনি কেন।"

নাপিত ভাবিত, ছেলেটি খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে। সে উত্তর দিত, "আর বছর দশেক বাদে আসব অখন!" আবাব এক একদিন তাহার পূর্বের অভ্যাস মতো তাহার ছেলে সুশীলকে গিয়া মারিত।

সুশীল ভারি রাগ করিয়া বলিত—"পড়াশুনো করে তোমার এই বুদ্ধি হচ্ছে? একরত্তি ছেলে হয়ে বুড়ো মানুষের গায়ে হাত তোলো!"—অমনি চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া, কেহ কিল, কেহ চড়, কেহ গালি দিতে আরম্ভ করে।

তখন সুবল একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, "আহা, যদি আমি আমার ছেলে সুশীলের মতো বুড়া হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।"

সুশীল প্রতিদিন জোড় হাত করিয়া বলে, "হে দেবতা, আমার বাপের মতো আমাকে ছোটো করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা যে রকম দুষ্টামি আরম্ভ করিয়াছেন, উহাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।"

তখন ইচ্ছাঠাক্‌রুন আসিয়া বলিলেন, "কেমন তোমাদের শখ মিটিয়াছে?" তাঁহারা দুজনে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া করিলেন,—"দোহাই ঠাক্‌রুন মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।"

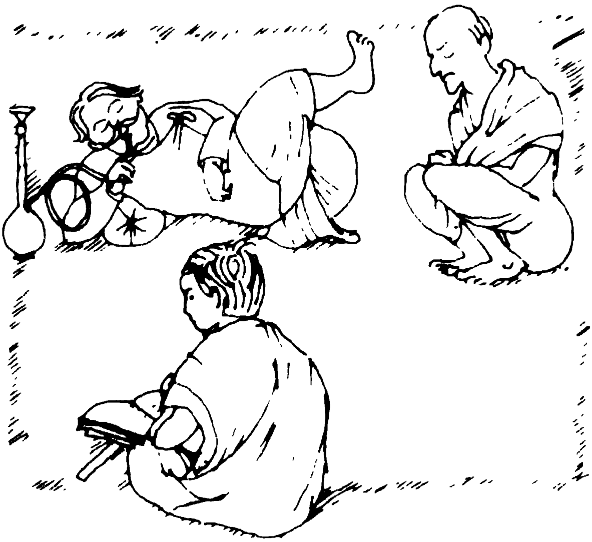
ইচ্ছাঠাক্‌রুন বলিলেন—"আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।"

পরদিন সকালে সুবল পূর্বের মতো বুড়া হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুই জনেরই মনে হইল যে স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি। সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন,—"সুশীল ব্যাকরণ মুখস্থ করবে না?"

সুশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।"

দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



চৌধুরী মশাই ছিলেন গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত স্থূলকায় মাতব্বর,—ছ-আনি জমিদার। বাড়ি, বাগান, পুষ্করিণী, শিবমন্দির, সটকার মাথায় অনির্বাণ বাড়বানল—সব্বই তাঁর ছিল। আর ছিল তাস, পাশা, অহিফেন, আর সান্ধ্য-মজলিস,—এই চতুর্বেদ চর্চা। অহিফেনটা তিনি আহার করতেন,—সাত সের দুধে দু ভরি আফিং সুপক্ক হ'লে, তার সরখানি তিনি ভোগে লাগাতেন, দুগ্ধটা পার্ষদদেব মধ্যে অধিকারী মত বন্টন হ'ত।

ভৃত্য নন্দার প্রধান কাজ ছিল—গো-সেবা, দুগ্ধপ্রস্তুত আর কল্‌কে বদলে দেওয়া। আর যে কাজটি ছিল, সেটি সে দুধ জ্বাল দিতে দিতেই সেরে রাখত। কথাবার্তার জবাব সে চোখ বুজেই দিত।

চৌধুরী মশাই কখনও কখনও আন্দাজে বলতেন, "নন্দা, ঝিমুচ্চিস বুঝি? খবরদার বেটা, দোর-গোড়ায় ব'সে ঝিমুলে গেরস্তোর অকল্যান হয়, জান না পাজি! দূর ক'রে দেব।"

নন্দা চোখ বুজেই বলত, "আপনি দেখলেন কখন হুজুর?"

কথাটা ঠিক। শুনে চৌধুরী মশাই খুশিই হতেন। বড়লোকের, বিশেষ জমিদার লোকের, চোখ চেয়ে থাকাটা একেবারেই ভাল নয়,—লোকসেনে লক্ষণ. প্রজা বেটারা চোখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে— বাঁধি-ব্যবস্থা বিগড়ে দেয়, মতলব হাসিল ক'রে নেয়, দুঃখ-কষ্ট মাখানো মুখ দেখিয়ে অকস্মাৎ দয়া টেনে বার ক'রে বসে। এটা ছিল তাঁর পিতৃবাক্য। চোখ চাওয়ার তরে রয়েছে ভস্মলোচনরা—নায়েব, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা।

চৌধুরী মশাইয়ের পেয়ারের নাতি ইন্দ্রভূষণ আজ বেজায় ব্যস্ত। সে লেখাপড়া ছেড়ে এখন লায়েক হয়েছে। একখানি নাটক লিখে ফেলেছে "লক্ষ্মণের শক্তিশেল।" তার রিহার্সেলও চলেছে—পূজার নবমীতে অভিনয়। ইন্দু নিজেই ম্যানেজার আর লক্ষ্মণ—দুই-ই। হনুমানের পার্ট সে খুব জমাটি ক'রে লিখে ফেলেছে। সে বলে, কি ক'রে যে এমন ফ্লো (তোড়) বেরিয়ে গেছে, সে তা নিজেই জানে না। লেখকদের নাকি ঝোঁকের মাথায় feeling (ভাব) এসে ওরূপ অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়ে দেয়।

বীররসের কথা এলে তার ধমনীগুলো একসঙ্গে ধড়ফড় করতে থাকে, মনের ভাবগুলোকে ঠেলে বার ক'রে দেয়। লেখাটা ভারি লাগমাফিক বেরিয়ে যাওয়ায় ইন্দুর মনে বড় একটা আপসোসও র'য়ে গেছে,—অমন পার্টটা সে নিজে নিতে পারলে না কেবল হনুমান নামটার জন্যে। বাল্মীকি এত বড় কবি হয়ে একটা ভাল নামও খুঁজে পান নি।

নেপা হনুমানের পার্ট খুব উৎসাহে শখ ক'রেই নিয়েছে,—করেও ভাল। তার ওপর সে ইস্কুলের খেলায় সে-বছর Long Jump আর High Jump এ(লাফালাফিতে) পদক পুরস্কার পাওয়ায়—হনুমান সাজবার দাবিও তার এসে গিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা বিঘ্ন উপস্থিত হয়ে ইন্দুকে বড় বিচলিত ক'রে দিয়েছে। নেপার বিধবা পিসী খড়দায় থাকেন, তাঁর সঙ্কট পীড়া শুনে নেপাকে সেথায় চ'লে যেতে হয়েছে। আবার, তাঁর শেষ না দেখে তার ফেরবারও জো নেই,—হাবাতে মাগীর টাকা আছে। অভিনয়ের সবে আর সাতটি দিন বাকি, এর মধ্যে কি মানী মরবে! পাকা হাড়—শ্বাসই টানতে পারে সাত দিন! আপদ দেখ না।

ইন্দু দারুণ দুশ্চিন্তায় প'ড়ে গেছে। পড়বারই কথা। উত্তরপাড়া একটি উন্নত সমাজ-জায়গা,—সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত আভিজাতের বাড়িতে অভিনয়! এখনও প্রহসনের প্লটই সে ঠিক করতে পারে নি,—সেই চিন্তায় মাথা ভ'রে রয়েছে। তার ওপর নেপার পিসীর এই ব্যবহার! তাই সে দলের মাতব্বরদের ডেকে পিসী-সঙ্কট হতে উদ্ধারের একটা উপায় স্থির করবার জন্যে মীটিং কল্ (meeting call) করেছে।

২

চৌধুরী মশাই সপ্তাহকাল কস্ত ক'রে, আজ মরিয়া হয়ে গা তুলে নিকটস্থ জমিদারিতে দর্শন দিতে বেরিয়ে পড়েছেন,—প্রজাদের কাছ থেকে পূজার পার্বণী আদায়ের জন্যে। ফিরতে সন্ধ্যার পূর্বে নয়।

এই সুযোগ পেয়ে—মীটিংটা আজ তাঁর বৈঠকেই বসেছে। প্রধান উদ্দেশ্য—নেপার একজন ডুপ্লিকেট্ (মুশকিল-আসান) ঠিক ক'রে ফেলা, যে নেপার অনুপস্থিতিতে তার পার্ট যোগ্যতার সহিত করতে পারে।

ভুবন পারে,—অন্তরায় কেবল ওই হনুমান নামটি।

নেপা সম্বন্ধে সন্দেহের কথা আলোচনার পর, সকলে একবাক্যে বললে, "ডুপ্লিকেট্ নিশ্চয়ই চাই।"

ইন্দু বললে, "চাই তো বটেই, কিন্তু ও-পার্ট করবার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে কজনের আছে? বইখানির মধ্যে ওই পার্টটিই আমার প্রাণ ঢেলে লেখা, কারণ হনুমানেব মত অমন ভক্ত, অত বড় বীর, আর সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ত্রেতায় কেউ জন্মান নি। সেই মহাপুরুষের কৃপায় লেখাটাও বেরিয়ে গেছে তেমনই। নেপা সাগ্রহে লুফে নিলে, তাই তাকে ক্ষুণ্ণ

করতে পারি নি। অবশ্য সে করেও মন্দ নয়। কিন্তু ও-পার্ট যখন অর্ধেক লেখা হয়েছে, তখন থেকে আমার নজরে ছিল ভুবনের ওপর। আমাদের মধ্যে ও-ই ছাত্রবৃত্তি পাস, আবৃত্তি করেও তেমনই, কারণ তার সঙ্গে অর্থবোধ থাকে কি না—পাখির মত মুখস্থ বলা তো নয়! কিন্তু নেপাকে তখন ক্ষুন্ন করতে পারলুম না। এ কথা সতীশকে Privately (গোপনে) ব'লেও ছিলুম,—মনে নেই সতীশ?"

সতীশ বললে, "মনে খুবই আছে, আমি তখুনি তোমাকে বলেছিলুম, এটা তোমার দুর্বলতা।"

"কি করব ভাই, আমাকে তোমরা ম্যানেজার করেছ,—সব দিক দেখতে হয়। ভুবন কিছু মনে করে তো—সামান্য ইঙ্গিতেই কারণটা সে বুঝতে পারবে। দেখলে না—তাই তাকে অন্য কোনও ছোট পার্ট দিতেই পারলুম না, Prompting-এ (ধর্তায়) রাখতে হ'ল, কারণ প্রম্‌টিংয়ের ওপরই সাফল্য নির্ভর করে। আর ওর মত motion দিয়ে accent ঠিক ক'রে (ঝোঁক দিয়ে সরু-মোটা খেলিয়ে) প্রম্‌ট্ করতে পারতই বা কে?"

নরেশ বললে, "কথা যখন ফাঁস হয়েই গেল, আজ তবে বলি,—এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কম মতভেদ হয় নি। সকলেরই ইচ্ছা ভুবন ও-পার্টটি করে, তা হ'লে একাই মাত ক'রে দেবে, আমাদের অ্যাক্‌টিংয়ের দোষ-টোস সব ঢাকা প'ড়ে যাবে। ইন্দুর লেখাটা ভুবন একাই সার্থক ক'রে দেবে। ইন্দু হাত-জোড় ক'রে বলেওছিল, 'চক্ষুলজ্জায় ভুলটা যখন হয়ে গেছে ভাই—এবারটি মাপ কর। দ্বিতীয় opening থেকে ও-পার্ট ভুবনেরই রইল, এখন change করতে (বদলাতে) গেলেই একটা মনোমালিণ্য ঘটাই সম্ভব।' কথাটাও ঠিক। নেপা যে রকম মেতে রয়েছিল, ও আর এদিকে মাড়াত না। তাই আমরা চেপে গেলুম। যাক্ এখন দেখছ তো বাবা, দশের ইচ্ছা কি বিফল হয়।"

শরৎ বললে, "আর ও-সব দুশ্চিন্তা কেন বাবা,—পিসী তো পথ ক'রে দিয়েছে, এখন তিনি গুটিগুটি দশমিতে চোখ বুজুন, আর নেপা টাকার তোড়া নিয়ে জোড়া পাঁঠা ঝেড়ে আমাদের গার্ডেনপার্টি দিক—এই প্রার্থনা করি। ভুবন, লেগে যাও ভাই, তোমার তো সব পার্টই খাড়া মুখস্থ। আমাদের তো মেমরি (memory) নয়—সব শঁক্তিগড়! বাংলায় বাপের নামটাও মনে রাখতে পারি না—পেছনে prompter (তন্ত্রধারক) চাই। যাক, একেই বলে—যোগ্য পাত্রে কন্যা দান। কি বল সব?"

সকলে সহাস্যে শরতের প্রস্তাব একবাক্যে অনুমোদন করলে। একটা আনন্দ-কলরোল প'ড়ে গেল। তিন পাক হুর্‌রে ঘুরে গেল। সকলের চক্ষু ভুবনের মুখের ওপর চমকাতে লাগল।

ভুবন হাতজোড় ক'রে সবিনয়ে বললে, "আর যা বল সব করতে রাজি আছি ভাই, কেবল ওই কাজটি ছাড়া। কারে প'ড়ে—নাপার্যমানে একজনের বদলি-খাটার বিড়ম্বনা আমার দস্তরমত ভোগা হয়ে গেছে। মাপ কর দাদা. ওতে আমি আর নেই।"

শুনে সকলে সহসা যেন চোট খেয়ে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। ইন্দু ব'সে পড়ল। শেষে ক্ষুব্ধ রোষে বললে, "আমি এখনই 'হনুমান' নামটা কেটে 'মহাবীর' নাম বসিয়ে দিচ্ছি ভাই। যা হয়েছে হয়েছে, এই নাকে কানে খত—রামায়ন যদি আর ছুঁই! এবারটি মান রক্ষা ক'রে দাও দাদা। ও-পার্ট আর কারুর দ্বারাই ঠিক ঠিক হবে না।"

"না ইন্দু, ও-কারণে নয় ভাই। আর নয়ই বা কেন, গ্রামের যে সব ছেলে,—তাদের কাছে তো চিরদিনই ওই নাম বাহাল হয়ে যাবে! পরিবার থাকলে সেও মুখ পুড়িয়ে

সত্যিকার হনুমান বানিয়ে দিত। ছেলে থাকলে তার সঙ্গীরা তাকে মর্কট সাজাবার দাবি রাখত,—এক পুরুষ মিটত না, যাক্, তার জন্য বলছি না। তোমরা তো জান, পাশের গ্রামেই আমার মামার বাড়ি, সেখানেই থাকতুম। সেখানেও শখের যাত্রার ভারি ধুম। দু বছর আগেকার কথা,—তখন আমাদের রিহার্সেল খুব জোর চলছে,—পালাটা 'সীতা-হরণ'। সীতা কি রাম লক্ষ্মণ সাজবার মত চেহারা নয়,—গাইতেও পারি না, সুতরাং সেখানেও আমি ছিলুম প্রম্‌প্‌টার। হরিদত্ত সাজবে হরিণ। অভিনয়ের দুদিন আগে তার হ'ল জ্বর,—কথাটি তো সামান্য নয়—সে যেন রাজপুত্তুরের কলেরা। অবস্থা বুঝতেই পারছ,—সকলেই মহা চিন্তিত।

''ম্যানেজার এসে আমাকে ধ'রে বসলেন, ''তোমাকে স্বর্ণমৃগ সাজতে হবে ভুবন।' কেউ আর তখন হরিণ বলে না,—সবাই শোনায় 'স্বর্ণমৃগ'! অর্থাৎ—খুব সম্মানের পার্ট।

''বললুম, ও-পার্ট তো যে সে একবার ওই সোনালী বসানো খোলটায় ঢুকে ক'রে আসতে পারে, ওতে তো আর কথাবার্তা নেই।

''সবাই চক্ষু কপালে তুলে গাঢ়স্বরে ব'লে উঠল, 'কি বলছ ভুবন! কথাবার্তা নেই, অথচ সে অভাবকে ভাবে ভ'রে দিতে হবে—সে কি যার তার কাজ। না হরি দত্তর কাজ? তোমার ওপর তাই বারবারই আমাদের নজর,—intelligent (বুদ্ধিমান) লোক না হ'লে ও-পার্ট ঠিক ঠিক করা কি তামাসার কথা! পারেন এক মুস্তপি সায়েব, আর পার তুমি,—এ তোমার সামনে বলা নয়।'

''ম্যানেজার বললেন, 'হরি দত্ত দশ টাকা ঝাড়লে, বললে, তার পরিবার দেখতে আসবে, তাকে একটা কিছু সাজা চাই-ই। কি করি, চক্ষুলজ্জায়ও বটে, আর হারমোনিয়ামটা সারবারও দরকার, তাই দিতে হয়েছিল।' ইত্যাদি।—

''শেষ হরি দত্তর খোলস আমার স্কন্ধেই চাপল। বড়লোকের বাড়ি অভিনয়, বনেদী ব্যবস্থা,—বিপুল আয়োজন। আলোয়, ছবিতে, ফুলের মালায় আসর হাসছে। সে পঞ্চবটী দেখলে রাজার ছেলেরও বনে যেতে শখ চাপে। আসরে আতরদান, গোলাপপাশ, রূপোর থাল ভরা পান; ট্রে-ভরা বেদানা, মিছরির টুকরো, আদার কুচি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, বচ প্রভৃতি। আর সুগন্ধ ছড়িয়ে সধূম চায়ের যাতায়াত, চামচের ঠুনঠান শব্দ! এতদ্বারা অভিনেতা আর গাইয়েরা গলা বজায় রাখবেন,—আর বাড়িওলার সম্মান বজায় থাকবে।—

''ব্যবস্থা সবই সুন্দর, সকলে গালে দিচ্ছেনও সুন্দর। অর্থাৎ মুঠো মুঠো, এস্তোক বনবাসী রাম লক্ষ্মণ সীতা,—মায় কন্‌সার্ট পার্টি। অসুন্দর কেবল হরিণের সেদিকে নজর দেওয়াটা! এক টুকরো মিছরি, দুটি বেদানা, এক কুচি আদা, একটা পান কি এক চুমুক চা, তাঁর ছোঁবার জো নেই, কারণ, সে যে হরিণ! আর ইন্টেলিজেন্ট হবার মানেই স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখা, সেটা কেবল হরিণকেই রাখতে হবে! কিছুতেই হাত বাড়ালেই, সবাই 'হাঁ হাঁ' করে ওঠে। তার কাজ কেবল—ছোটা, লাফানো, হাঁপানো, শেষ তেউড়ে পঞ্চত্ব পাওয়া। হল' ও তাই। হরি দত্ত জ্বর হয়ে বাঁচল,—আর নীরোগ জলজ্যান্ত আমি তার খোলে ঢুকে, সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে মলুম। Intelligent পশু সাজায় সেলাম বাবা।''

হাসির হাউই ছুটে গেল। সবাই বললে, '' Bravo ভুবন, এমন বর্ণনা আর কে শোনাতে পারত! ও-পার্ট ভাই তোমাকে করতে হবে, তা না তো প্লে একদম মাটি,—তা লিখে রেখো।''

শেষটা দলের সকলের একান্ত অনুরোধে আর ইন্দুর কাতর অনুনয়ে ভুবনকে রাজি হতে হ'ল। ইন্দুর দুশ্চিন্তা দূর হ'ল। হুররের হল্লায় সভাও ভঙ্গ হল।

৩

চৌধুরী মশাই আজ বেলাবেলি জমিদারি থেকে ফিরছেন,—মেজাজ খুব খুশ। পার্বনী আদায় হয়েছে পূজার খরচের দেড়া। তাই কাপড় না ছেড়েই সর্বাগ্রে—প্রতিষ্ঠিত শৈলেশ্বরের মন্দিরে প্রণাম সেরে, বৈঠকে ঢুকেছেন। নন্দা সটকা ধরিয়ে চটকা ভাঙিয়ে দিয়ে গেল।

ইন্দুভূষণ পাশের কামরায় ব'সে প্রহসনের প্লট ভাবছে। মাথায় বোমা মেরেও কিছু পাচ্ছে না। মাঝে আর পাঁচটি দিন মাত্র। পিসীর পাল্লা পেরিয়ে শেষ প্রহসন যে মাথায় হুতাশন জ্বেলে দিলে! অন্যমনস্ক পেন্‌সিলটে কামড়ে কামড়ে দাঁতনে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। প্লটের কিন্তু পাত্তা লাগছে না।

চৌধুরী মশাব আজ মেজাজ সরিফ। ইন্দু তাঁর পেয়ারের নাতি। চৌধুরী মশায়ের মেজাজ মশগুল থাকলে ইন্দুকে ডেকে কিছুক্ষণ রহস্যানন্দ উপভোগ কবতেন। আজও তার ডাক পড়ল।

ইন্দুকে উঠে আসতে হ'ল—কিন্তু বিরক্তভাবে।

চৌধুরী মশাই একবাব মুখ তুলে চেয়েই, চোখ বুজে সহাস্যে বললেন, "বিকেলবেলা হাতে দাঁতন যে বড়,—রোজা রাখছিস নাকি?"

ইন্দু তাঁর কথাটা আগে বুঝতে পারে নি, পেন্‌সিলটায় নজর পড়তেই বুঝলে। বললে, "আপনি যখন মুক্ত-কচ্ছ হয়েছেন, তখন আমাকে তো ধর্মরক্ষা করতে হবে।"

বলাই বাহুল্য, চৌধুবী মশাই বসলেই মুক্ত-কচ্ছ হয়ে পড়তেন।

চৌধুরী মশাই উপভোগের হাসি হেসে তাড়াতাড়ি ভুলটা সেরে নিয়ে, 'জিত' বলেই বালিশের তলা থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার ক'রে ইন্দুর হাতে দিলেন।

*　*　*　*　*

তখনকার ন্যাশনাল থিয়েটাবে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম অভিনয়-রজনী, আয়োজনের অন্ত নেই। জগৎ সিংহ নাকি ঘোড়ায় চ'ড়ে appear (হাজির) হবে। গ্রামের দ্যালে দ্যালে, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, বাগানের ফটকে ফটকে—

বড় বড় অক্ষবে সোনার জলে ছাপা পোস্টার,—তাতে লেখা—

কে না জানে বঙ্গে রঙ্গে বঙ্কিম লেখনী,
কে না জানে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী
ইত্যাদি।

যাতায়াতের সময়, উঁচু-নীচু গ্রাম্য পথে গাড়ি যতবার টক্কর খেয়েছে, ততবারই চৌধুরী মশাই "খেলে কচু পোড়া" বলেছেন আর চেয়েছেন। সেই সময় ঝক্‌ঝকে হরপের পোস্টারগুলোও এক-একবার নজরে পড়েছে,—এক-একটা কথা প'ড়েও ফেলেছেন, সবটা সাপটাতে পারেন নি। তবে আন্দাজে আর বুদ্ধির জোরে ব্যাপারটা সমঝে নিয়ছেন।

ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করলেন, দুর্গেশনন্দী লোকটা কে হে? দোকানটা কোথায়, বরানগরে বুঝি! বেজায় বেড়ে উঠেছে দেখছি। মেয়ের বিয়েতে সোনার জলে হেঁয়ালি ঝেড়েছে

দেখলুম। তেল বেচে, না? তা না তো এত তেল?"

ইন্দু হেসে বললে, "নন্দী কোথায় দেখলেন,—দুর্গেশনন্দিনী।"

"ঐ হ'লো,—বাংলা বুঝি না রে শা—। না হয় দুগোনন্দীর মেয়ে, এই তো?"

"না না, ও একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাসের নাম। বঙ্কিমবাবুর লেখা। অমন বই পড়েন নি। তার একটু যদি দেখেন, নাওয়া-খাওয়া ঘুরে যাবে,—সবটা না দেখে ছাড়তে পারবেন না, অবাক হয়ে যাবেন।

"থাম্ থাম্, নন্দীর মেয়ে দেখে ওঁর দাদামশাইয়ের নাওয়া-খাওয়া ঘুরে যাবে,— হ্যাংলার মত অবাক হয়ে দেখবে! ইষ্টুপিড! সে বটে 'গোলেবকালী', আলবৎ, কেতাব বটে!" "কি বলছেন দাদামশাই,—বইখানা যুগান্তর এনে ফেলেছে।"

"অ্যাঁঃ, কলি প্রবেশ হয়ে গেছে তা হ'লে?"

"না দাদামশাই, অমন সুন্দর বই বাংলা ভাষায় আর বেরোয় নি। পড়বার তরে কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেছে।"

"বলিস কি! 'মজনু'র চেয়েও ভাল?"

"কিসে আর কিসে! সে না দেখলে আপনি আইডিয়াই করতে পারবেন না। অমন একটা আয়েসা দুনিয়া ঢুঁড়ে বার করতে পারবেন না।"

"এটা কি মাস র্যা?"

"কেন?—আশ্বিন।"

"এ দুটো মাস আর বাতিক বৃদ্ধি ক'রে মাথা খারাপ করিস নি। কটা দিন কোনও রকমে কাটিয়ে দে ভাই। অঘ্রাণের তেরোটা দিন বাদ দিয়ে তোর মুখ বন্ধ করছি, র'স্।"

"আপনি তো শুনবেন না! কি ঘটনা-বিন্যাস, সে না শুনলে—"

"বটে! লেখকের বাড়ি কোথায়,—যাত্রার দল আছে বুঝি?"

"না না, মস্ত বিদ্বান্, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বাড়ি কাঁঠালপাড়ায়।"

"বলিস কি, ডিপুটি! ওঃ বুঝেছি, আইন-আকবরির তর্জমা করেছে! যাঃ, আর জ্যাঠামি করতে হবে না। আগে দেখ, শোন, শোন্—ওই জামতাড়া, নারকেলডাঙা, ডুমুরদ, বেলঘরে, বেলগেছে, কলাগেছে, কাঁটালপাড়া—ওসব জায়গার লোক ফলহরি ঠাকুরের ফলোয়ার (follower)—তারা আবার বই লিখবে। লিখলে, আমলকী কি বয়ড়া বানিয়ে বসবে। আর কি ভারতচন্দ্র আছে,—এক্ কেতাবে খেতাব বেবিয়ে গেল,—'মেদিনী হইল মাটি', খবর রাখিস?"

শেষ বললেন, "আচ্ছা, আজ সন্ধ্যার পর শোনাস্ দিকি,—সে সময় পাঁচজন পাকা সমঝদারও থাকবে, বোঝা যাবে কেমন কেতাব।"

"আপনি তো তখন ঢোলেন।"

"অজ্ঞান তো হই না রে,—একটু চেঁচিয়ে পড়িস্; আমি হুঁ দিলেই তো হ'ল।"

সন্ধ্যার পর চৌধুরি মশাইয়ের সমঝদার পরিষদেরা একে একে সব উপস্থিত হলেন। তাকিয়া ঠেস দিয়ে তামাক চলতে লাগল। ভৃত্য নন্দা দোরের বাইরে আসন নিলে তার কাজও ঢোলা, আর মাঝে মাঝে কলকে বদলে দেওয়া।

ইন্দু বই হাতে ক'রে উপস্থিত হতেই, চৌধুরী মশাই বললেন, "বুঝলে বিশ্বম্ভর, ইন্দু আজ আমাদের একখানা বই শোনাবে ব'লে বায়না ধরেছে। কাঁটালপাড়ার কে ডিপুটি টঙ্কনাথবাবু নাকি লিখেছেন—"

"আজ্ঞে—বঙ্কিমবাবু।"

"ঐ হ'ল,—আসল অক্ষর তো বাদ দিই নি, 'ঙ'য়ায় ক'য়ে তো বজায় রেখেছি রে। আচ্ছা, শুরু কর।"

হরদেব খুড়ো তাস পেড়েছিলেন, অনিচ্ছায় তুলে রাখলেন। শম্ভু বাড়ুজ্জে বেজার মুখে—একটা আকর্ণ-বিস্তৃত হাই তুলে, দেল ঠেসে দিলেন।

ইন্দু আরম্ভ করলে, চৌধুরী মশারও ঢুলুনি এল।

ইন্দু যেই বলেছে—মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ—

চৌধুরী মশাই বেশ মশগুল মেরে আসছিলেন, চোখ বুজেই ব'লে উঠলেন, "বাস্ করো—গল্তি হায় 'মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ কখনও হতেই পারে না। এই সব বই লেখা! মানসিংহ লোকটাই বা কে, কার পুত্র, কাদের দারোয়ান, এ পরিচয় কে দেবে? তিনি তো আর গঙ্গাগোবিন্দ সিং নন যে, সবচিন লোক, আবি কেটে দাও। লেখ—ওলসিংহের পুত্র মানসিংহ, তস্য পুত্র কচুসিংহ, তেকার পুত্র ঘেঁচুসিংহ, তবে না একটা ধারাবাহিক বংশাবলী পাওয়া যাবে। ও-পাড়ার মেনকা ঠান্‌দি মেয়েমানুষ হ'লে কি হবে—সেটা তাঁর অদৃষ্টের দোষ, তাঁরও এসব জ্ঞান আছে। নিজে মেনকা, মেয়ের নাম রেখেছেন দুর্গা, নাতনীর নাম লক্ষ্মী। খুঁট ধরলেই পটাপট তিন পুরুষ আপ্‌সে বেরিয়ে আসে। বই কি লিখলেই হ'ল। কি ব'ল। হরদেব?"

"বলব আর কি,—আর কি দেবীবব আছেন! তিনি থাকলে এসব যথেচ্ছাচার ঘটতে পেত না।" এই ব'লে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

কালীবর রায় বললেন, "ছেড়ে দাও না। ও-কথা আর বাড়িওনা। আমাদের মহাদেব খুড়োর ছেলের নামকবণ হয়েছে 'মেঘনাদ'। সতী সাধ্বী বিন্দু খুড়ীর কলঙ্কটা একবার বোঝ। কার্তিক নয়, গণেশ নয়। 'মেঘনাদ' হয় কি ক'রে? সমাজ কি আর আছে? তিনি লজ্জায় গঙ্গাস্নান ছেড়ে দিয়েছেন। যাক্, ও পাপ-কথা ছেড়ে দাও।"

চৌধুরী মশার তে-ভাঁজ থুতনিটা তখন বুকে বেকে থেবড়ে ছিল। সেটা ঈষৎ চাগিয়ে বললেন, "ছেড়ে দাও কি রকম? আমরা জিতা থাকতে জাতটা চোখের সামনে বর্ণসঙ্কর মেরে যাবে নাকি? কাল মহাদেবকে ডাক দাও। বুঝলে?"

যাক্, ইন্দুকে অনেক ক'রে সে-ধাক্কা সামলে সুরু করতে হ'ল। চৌধুরী মশার থুতনি আবার তাঁর বুকের ওপর থেবড়ে বসল। সট্‌কার নলটা হাত থেকে খ'সে পড়ল। এক-একবার চমক আসে আর বলেন, "হুঁ, তারপর?"

ইন্দু তখন এগিয়েছে,—"বিমলা আর তিলোত্তমা তখন শৈলেশ্বরের মন্দির মধ্যে; বাইরে ভয়ঙ্কর ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত—"

চৌধুরী মশাই চমকে দুবার 'দুর্গা দুর্গা' উচ্চারণ ক'রে ভৃত্যকে ব'লে উঠলেন, "নন্দা, ঢুলছিস বুঝি? দেখছিস না হারামজাদা, মাথার ওপর কী প্রলয়কান্ড! গরুগুলো বাইরে নেই তো,—শিগগির তুলে ফেল্। উঠলি?"

ইন্দু থামে নি,—"রমনীদ্বয় ভয়ে জড়সড়।"

শুনেই চৌধুরী মশাই চেঁচিয়ে উঠলেন, "কোনও ভয় নাই মা, এ ভদ্রলোকের বাড়ি। নন্দা, গিন্নীকে বল্—চট করে ওদের বাড়ির মধ্যে নে' যান। গেলি?"

ইন্দু ছাড়ে নি,—"এমন সময় জগৎসিংহ মন্দিরদ্বারে করাঘাত ক'রে বললেন—"মন্দিরের মধ্যে কে আছ, দ্বার খোল—"

চৌধুরী বেজায় চ'টে ব'লে উঠলেন, "খেলে কলা-পোড়া,—মেয়েদের বলে দ্বার খুলতে! বেটার বাবার মন্দির! নন্দা, আবি গলাধাক্কা দেকে নিকালো, গিয়েছিস?"

ইন্দু শোনাবেই,—"দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় দমকা হাওয়া ঢুকে প্রদীপ নিবে গেল।"

"অ্যাঁ, ও বেটাও ঢুকল নাকি? কি দেখছ হে হরদেব?"

ইন্দু—"শুনুন না,—জগৎসিংহের মন্দির মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চমকাল, অমনিই তিলোত্তমার সঙ্গে তাঁর চারি চক্ষে মিলন।"

"এই মাথা খেলে"—ব'লেই রাগে কাঁপতে কাঁপতে মুক্তকচ্ছ চৌধুরী ওঠবাব উপক্রম করলেন। চীৎকার ক'রে উঠলেন, "শিবের মন্দিরে বেলকামো,—পাহারাওলা—পাহারাওলা—! আচ্ছা হরদেব, মেয়েগুলোই বা কি রকম!—এই দুর্যোগের রাতে,—আমারই শিবমন্দিরে—অ্যাঁঃ! নন্দা, ছাতাটা দে তো। উঃ, কি বিদ্যুৎ! চোখ সামলাও হরদেব, চোখে পড়তে পারে,—পড়্—ল!"

এই ব'লে, বোজা চোখ সজোরে বুজলেন।

উঠে পড়েন আর কি, "ওঃ, কি দমকা!"

ইন্দু অনেক ক'রে বুঝিয়ে বসালে। বললে, "আমি দেখছি দাদামশাই।"

"তুই কি দেখবি? তোর যাওযা হবে না,—ওবা কাঠের পুতুল নয়। দেখলি নি পাজি, বিদ্যুতে শুভদৃষ্টি! কি হে হরদেব, কিছু বলছ না যে?"

"কি বলব বলুন? তাস খেললে আব এসব বিভ্রাট ঘটে না। অমন নিরীহ জিনিসটি আর নেই। বিবিগুলো পর্যন্ত বাড়ির চেয়ে ভাল, মুখে কথাটি নেই।"

"সে তো বুঝলুম, এখন উপায়? মন্দিরের তো দফা—বুঝলে, শিবেরও মাথা খেলে! এখন শুদ্ধির উপায় করু।"

"আজ্ঞে, তারিনী পুরুতকে ডাকতে পাঠান। কাল প্রাতেই পঞ্চগব্য চড়াতে হবে, আর দ্বাদশটি—সে তো জানেনই।"

"এই নন্দা, শুনলি? সারা রাতের বেবার গোবর আর শ্রীচোনা, একরত্তি যেন নষ্ট না হয। শোন্, সাতটা গরুরই—সবটা। ব্যাপারটি সোজা নয়,—বুঝলি?.......দিন যায় তো ক্ষণ যায না হে! হারামজাদাকে বলি, শীতল আরতি হয়ে গেলেই তালা বন্ধ করেত; শুয়ার হরগিজ শুনবে না! দূর ক'রে দেব।"

চৌধুরী ব'লেই চললেন, "হ্যাঁ, কি নাম বললে, তিলের ধামা আর কি? কি বিদকুটে নাম রে বাবা! না ক্ষ্যান্তো, না লক্ষ্মী, না বিধু! ওরা কখ্খনও ভাল মেয়েমানুষ নয়। খবরদার ইন্দু, ওদিকে যেতে পাবি নি, ফের বিদ্যুৎ চমকাতে পারে। তোর এত ছটফটানি কেন বে রাসকেল? ব'স এখানে।"

এই ব'লে ইন্দুর হাত মনে ক'রে, সটকার নলটা ধ'রে জোরে টান মারতেই গড়গড়িটা উলটে প'ড়ে—লঙ্কাকান্ড।

এতক্ষণে চৌধুরী মশার ঘুমের ঘোরটা একেবারে কেটে গেল, চোখওও খুলে গেল।

ইন্দু হাসি চেপে গম্ভীরভাবে বললে, "তারিনীপুরুত বললেন, "আপনাকে নেড়া হয়ে প্রাচিত্তির করতে হবে।"

চৌধুরী মশাই একদম অবাক, "কেন? মুংলী মরেছে বুঝি, গলায় দড়ি ছিল?"

এতক্ষণের ঘটনাটা তাঁর মাথায় ধোঁয়াটে মেরে ঘোলাচ্ছিল, কিছু ঠিক করতে পারছিলেন না। ইন্দুর কথায় যেন কুয়াশা কেটে গেল;--তবে তো সত্যি!

সহসা চ'টে উঠে, "হারামজাদ্, মশা-মাছিতে মেঘ দেখতে পায়, আর তুমি বেটা চোখ বুজে ব'সে আছ!" ব'লেই নন্দার পিঠে পটাপট চটি-প্রহার। সে হাসতে হাসতে ছুটে পালাল।

ইন্দু তাঁকে ধ'রে বসিয়ে বলল, "আজ্ঞে, শুধু তাই নয়,—শিবের মন্দিরে ঐ যে অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক কাণ্ডটা—"

"ওঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ, তারা কি এখনও—"

"না, তাঁরা বোধ হয় বেরিয়ে গি'য় থাকবেন। আমি দেখে আসছি দাদামশাই,—এক মিনিটও লাগবে না, এলুম ব'লে।"

"দাঁড়া বলছি ছুঁচো! তোর এত দেখতে যাবার মাথাব্যথা কেন রে ইস্টুপিড! শুনলে হরদেব, আমার নীতিবোধ-পড়া নাতি কি বললেন, 'তাঁরা বেরিয়ে গিয়ে থাকবেন! তাঁরা!! ওরে গাধা, তোর দাদামশাই জানে, তারা ঘরে থাকবার নয়। নন্দা, দেখ্ দিকি, অমনই গোবরজল ছড়া দিয়ে আসবি;—আর আমার জন্যেও একটু গঙ্গাজল আনিস, কান দুটো ধুয়ে ফেলি।"

* * * * *

ইন্দু তখন সদরবাড়ির বাগানে আনন্দাতিশয্যে ছুটোছুটি করছে, আর আপনা-আপনি হো-হো ক'রে হাসছে, আর হাঁপাচ্ছে।

রিহার্সেল-ঘরে না পেয়ে শরৎ তাকে খুঁজতে এসে তার অবস্থা দেখে অবাক!

"কি হে, ব্যাপার কি? একা একাই সিদ্ধি চড়িয়েছ নাকি?"

ইন্দু—"'সখি রে কি কহিব আনন্দ ওর!' চড়াই নি, লাভ করেছি।"

"কি রকম?"

"ভাই, সারা বিকেলটা প্রহসনের প্লটের জন্যে মাথায় পেরেক ঠুকেও একটা প বার করতে পারি নি,—পাগল হয়ে যাচ্ছিলুম। পিসী-পর্ব পার হয়ে শেষ প্লটে ঠেকে গেলুম। এই অবস্থায়—

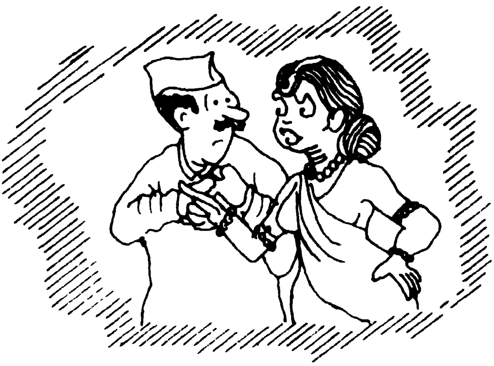
স্বপ্নে কহি দিলা দেবী—"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?"

"না হে,—ভূতাবিষ্ট দাদামহাশয় প্রমুখাৎ,—একদম খাঁটি স্বপ্নাদ্য।"

ঘোষালের হেঁয়ালি

প্রমথ চৌধুরী



॥ এক ॥

সেদিন সন্ধ্যায় একা বাড়ি বসেছিলুম। শরীরটে ছিল মাদা, তার উপর সেদিন পড়েছিল একটু বেশী শীত। তাই বাড়ি থেকে না বেরনোই শ্রেয় মনে করলুম।

এ সময় বেকার বাড়ি বসে থাকাটা আমার পক্ষে ঈষৎ বিরক্তিকর। এ দেশে কোন evening paper নেই, যার মারফৎ দুনিয়ার টাটকা খবর পাওয়া যায়; যে খবরের জন্য আমরা কেউ ব্যস্ত নই, তবুও যা আমরা পড়ি। তাই বসে বসে একখানি futurist নভেলের পাতা ওলটাচ্ছিলুম। দু-চার পাতা উলটেই মনে হল, বাংলার তরুণ সাহিত্যের কোনও future নেই।

এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে—"এক্‌ঠো বাবু আপকো সাথ মুলাকাত কর্‌নে আয়া।" আমি বল্লুম—"বাবুকো আনে বোলো।" যদিচ এ অসময়ে কে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল বুঝতে পারলুম না। সে যাই হোক্, বাবুর আগমন সংবাদ শুনে খুশীই হলুম। কেননা বুঝলুম যে আগন্তুকটি যিনিই হোন, তাঁর সঙ্গে হয় কাজের নয় বাজে কথা কয়ে এই ফাঁকা সময়টা ভরিয়ে দিতে পারব।

ভদ্রলোকটি ঘরে ঢোকবামাত্র বুঝলুম, তিনি বিল সাধতে আসেননি। কারণ তাঁর পরনে সাদা কাগজের মত ধব্‌ধবে খদ্দরের জামা ও ধুতি। গায়ে ধূপছায়ারঙের মুর্শিদাবাদী বালাপোষ, আর মাথায় খদ্দরের গান্ধী টুপি। দেখে মনে হল তিনি হয়ত স্বরাজের জন্য চাঁদা সাধতে এসেছেন। যদি তাই হয় ত ভাবী স্বরাজের অনেক খবর পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক টুপিটি খুলতেই দেখি তিনি স্বয়ং ঘোষাল। কারণ তার হচ্ছে সেই জগতের স্বপ্রকাশ চেহারা, যা একবার দেখলে জীবনে আর ভোলা যায় না।

আমি তাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করেই জিজ্ঞাসা করলুম— কি খবর?

ঘোষাল উত্তর করলে—unemployed।

—রায় মহাশয়ের সঙ্গে তোমার কি ফারকৎ হয়ে গিয়েছে?

—না। যা হয়েছে, তাকে একরকম judicial separation বলা যেতে পারে।

—Divorce নয়?

—না। তবে যে কোন মুহূর্তে আমি তাঁকে তালাক দিতে পারি। ব্যাপার কি ঘটেছে, তা পরে বলব। আগে কাজের কথাটা সেরে নেওয়া যাক্। আমি স্বরাজ-দলে ভর্তি হতে চাই।

আমি ঘোষালের মুখে এ প্রস্তাব শুনে বুঝলুম কথাটা নেহাত বাজে। সে বলতে চায় গল্প। আর এ প্রস্তাব তার গল্পের ভূমিকা মাত্র। ও সে ভূমিকা G. B. S.-এর নাটকের ভূমিকার মত, যার আত্মীয়ীর সঙ্গে অন্তরার কোন সম্বন্ধ নেই। তাহলেও ঐ বিষয়েই আলাপ সুরু করলুম। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"সেই জন্যই বুঝি খদ্দরমণ্ডিত হয়েছ?"

—অবশ্য। মুখপাত্র ত দুরস্ত চাই। তা ছাড়া দেশ-ই ত বেশ গড়ে। নব রাশিয়া গড়েছে লাল কুর্তা, আর নব ইতালি কালো কুর্তা।

—তথাস্তু। এখন দেশের কাজে এত লোভ কেন?

—ও কাজটা sinecure বলে।

—তুমি বলতে চাও কিছু না করারই অর্থ দেশের কাজ করা?

—আমার মত অকর্মণ্য লোকের পক্ষে তাই। স্বরাজের কেষ্টবিষ্টুদের অবশ্য অগাধ খাটুনি। তাঁরা আলেয়ার মত নিয়ত ভ্রাম্যমাণ। আজ জ্বলে উঠছেন পুরুষপুরে, কাল কামাখ্যায়। আর আমরা Hail! holy light বলে সেই উদ্‌ভ্রান্ত আলোর পিছনে ছুটছি। এখন আপনার কাছে কিঞ্চিৎ সাহায্য চাই,—পয়সার নয়, মুখের কথার।

—এ দলের বড় কর্তাদের কাছে না হোক, উপকর্তাদের কাছে গিয়ে তোমার প্রস্তাব জানাতে হবে।

—আপনার মুখের কথা রসিকতা বলে উপেক্ষিত হবে। রসিকতা কর্মক্ষেত্রে অগ্রাহ্য।

—তবে কি certificate লিখে দেব?

—মাপ করবেন। আপনি ত লিখবেন যে ঘোষাল একজন জাতগুণী, চমৎকার টপ্পা গাইয়ে, আর নিত্য নতুন স্বরচিত গল্প বলতে পারে। আপনি কি জানেন না, গান ও গল্প স্বরাজ্যে থাকবে না?

—তবে থাকবে কি?

—বক্তৃতা আর তার স্বরলিপি, অর্থাৎ খবরের কাগজ।

—তবে আমাকে কি তোমার application লিখে দিতে হবে?

—দরখাস্ত আমি নিজেই লিখব। স্বরাজের ভাষা আমি জানি। সে ভাষা ত দেশী মনের তাঁতে বোনা বস্তাপচা বিলেতি শব্দ।

—তবে কি চাও?

—As regards my qualifications সম্বন্ধে কি লিখব, সেই বিষয় আপনার পরামর্শ চাই। যে মার্কার qualification-এর কিঞ্চিৎ বাজার দর আছে, সে qualification-এর কথা লিখতে ভয় হয়।

—কেন বল ত?

—সেই qualification-এর কথা একবার মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছিল, তার ফলেই

ত আমার এই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা।

—হেঁয়ালি ছেড়ে ব্যাপার কি হয়েছিল স্পষ্ট করে বললে বুঝতে পারি। সত্য কথা বলতে হলে তোমার ভবিষ্যৎ কস্মিনকালেও ছিল না, এখনও নেই; কেন না তুমি সামাজিক ও সাংসারিক জীব নও। সমাজে তোমরা হচ্ছ সব উদ্বৃত্তের দল। সুতরাং তুমি কোন্ দলে ভর্তি হও আর না হও, তাতে কিছু আসে যায় না,—তোমারও নয়, সমাজেরও নয়।

তোমার গত চাকরি কি করে ছুটিতে পরিণত হল, তাই জানবার কৌতূহল আমার হচ্ছে।

মুখবন্ধ

—আচ্ছা সেই নিকট অতীত কাহিনী বলছি।

এই কথা বলে ঘোষাল চেয়ারের উপর জোড়াসন হয়ে বসে ইংরাজীতে বল্লেন :—

—Beastly cold. May I have a drop of—

—What will you have—whisky or brandy?

—Cognac, s'll vous plais.

আমি বেহারাকে একটি brandy-peg আনতে হুকুম দিলে ঘোষাল বল্লে —Merci, monsieur.

আমি প্রশ্ন করলুম :— Vous parlez francaise monsieur?

—Pardon, monsieur, ও অপরাধ আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়। এই Cognac-ই ঐ ফরাসী বুলি টেনে এনেছে। Cognacএর সঙ্গে 'if you please' কি খাপ খেত? আর 'thank you'-এর মত মিছে কথা কি কোন ভাষায় আছে?

এ কৈফিয়তে আমি হেসে উঠলুম, সঙ্গে সঙ্গে সেও। বেহারা brandy-pegটির সঙ্গে soda সংযোগ করতে উদ্যত হলে ঘোষাল বল্লে—"ও ব্র্যান্ডিটুকুকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিন। আমি হিন্দুধর্ম রক্ষা করে পানাহার করি। জাত যায় সোডায়, ব্র্যান্ডিতে নয়।"

—Unfiltered water?

—সে ত গঙ্গামৃত্তিকা। আমি চাই ইন্‌ভাগাস্ত বিলাতি ওষধ দিয়ে শোধনকরা গঙ্গার জল—যার নাম কলের জল।

তারপর সজল ব্র্যান্ডি এক চুমুকমাত্র গলাধঃকরণ করে ঘোষাল তার কাহিনী বলতে শুরু করবার পূর্বে দু-কথায় তার মুখবন্ধ করলেন। তিনি বল্লেন—এ উপন্যাস নয়, ইতিহাস। এর রস অতি ফিকে,—গঙ্গাজলী ব্র্যান্ডির মত। সুতরাং একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। আশা করি রায় মহাশয়ের সভার নবরত্নদের সব মনে আছে, যথা পণ্ডিত মহাশয়, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি।

—হ্যাঁ, আছে।

—তাহলে শুনুন।

কথামুখ

একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর ঘরে বসে বিশ্রাম করছি, অর্থাৎ আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় গীতা পড়ছি—

—তুমি কি আবার গীতাপাঠ করো নাকি?

—করি। অবসরবিনোদনের জন্য নয়, পণ্ডিত মহাশয়েব আদেশ, আমার প্রজ্ঞা

প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। ভয়ানক ঘুম পাচ্ছিল, তারপর এই শ্লোকটি পড়বামাত্র জেগে উঠলুম :—

"যা নিশা সর্বভূতানাং তসাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি, সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

—ও শ্লোকের অর্থ কি বুঝলে?

—এর অর্থ ঘুমের ঘোরে বোঝা যায়, কিন্তু জেগে অপরকে বোঝানো যায় না। ও শ্লোকটা "We are such stuff as dreams are made of"-এর সগোত্র।

—তুমি Shakespeare পড়েছ নাকি?

—Tempest ও Hamlet-এর সুভাষিতাবলী ত মুখে মুখেই চলে। ও সব কি আর বই পড়ে শিখতে হয়?

—তারপর?

—এমন সময় দুয়োর ঠেলে কে ঘরে প্রবেশ করলে। বই থেকে মুখ তুলে 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা' সখীরানী সুমুখে দাঁড়িয়ে। তার চোখেমুখে লেগে রয়েছে অর্ধস্ফুট হাসি। ও মূর্তি দেখেই স্বতঃই মুখ থেকে বেরিয়ে যায়—অরালা কেশেষু প্রকৃতি সরলা মন্দহাসিতে—

—এ দেবীটি কে?

—এ রমণী দেবী নয়, বোষ্টমের মেয়ে। তার পিতৃদত্ত নাম শ্যামাদাসী। সখীরানী নাম আমি দিয়েছি, রানীমার প্রিয় সখী বলে। রানীমা তাকে বাপের বাড়ি থেকে সঙ্গে এনেছেন, তার বাল্যবন্ধু বলে। প্রায় তার সমবয়সী, বছর দুতিনের বড় হবে। এ বাড়িতে তার কাজ হচ্ছে রানীমার কাছে গল্প করা, কীর্তন গাওয়া ও চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি বৈষ্ণব গ্রন্থ সব তাঁকে পড়ে শোনানো। আর রানীমার নেপথ্য বিধান করা। কিন্তু রাজবাড়ি এসেও তার চাল বিগড়ে যায়নি। সে পরন-পরিচ্ছদে আহার-বিহারে বোষ্টমী কায়দা পুরো বজায় রেখেছে। তার পরনে একখানি চাঁপাফুলের রঙের তসরের সাড়ি, গায়ে নামাবলী, গলায় তুলসী কাঠের মালা, নাকে রসকলি, একরাশ ঢেউখেলানো চুল কপালের ডান ধারে চুড়ো করে বাঁধা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটি জীবন্ত ছবি। রাধিকা একবার অভিমান করে কৃষ্ণকে বলেছিলেন যে, "আপনি হইয়ে শ্রীনন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা।" শ্রীনন্দের নন্দন যদি হঠাৎ মেয়ে হয়ে যেতেন, তাহলে তার রূপ হত ঠিক সখীরানীর মত।

সখীরানীর দৌত্য

তাকে দেখে আমি একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম :—

এ অবেলায় তোমার হঠাৎ আগমনের কারণ কি?

—আমি নিজের গরজে আসিনি, এসেছি মীনারানীর দূত হয়ে।

—মীনাক্ষী দেবীর, থুড়ি রানীমার কি হুকুম?

—আজ সন্ধ্যেয় তোমাকে গানগল্প করতে হবে তাঁর সভায়।

—সে সভা কি রকম সভা?

—মেয়ে-মজলিস্।

—সে মজলিসে বোধহয় নিষ্পুরুষ নাটকের অভিনয় হয়?

—ধরে নাও যে তাই হয়।

—শুনেছি পুরাকালে কোন বীরপুরুষ "একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনং।"

আমাকেও দেখছি তার পদানুসরণ করতে হবে।

—কি বলছ, ভাষায় বল।

এ কথা শুনে আমি বল্লুম :—

—তুমি দেখছি এখন কথায় কথায় সংস্কৃতের ফোড়ন দাও।—এ অভ্যাস হয়েছে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গদোষে। নইলে আমার ফরাসী বিদ্যা যদ্রূপ, সংস্কৃত বিদ্যাও তদ্রূপ। এক বর্ণ গাইতে না পারলেও যে লোক খাঁ সাহেবদের সহবত করেছে, সে কি শ্রুতি কপ্‌চায় না?

সে যাই হোক্, কথাটা বাঙ্গালায় বুঝিয়ে দেবার পর সখীরানী বল্লেন :—

তুমি যে বীরপুরুষ নও, তা আমি জানি। দু-বেলা ঐ মুগুর ভেঁজে তোমার বুক চওড়া হয়েছে, কিন্তু বুকের পাটা হয় নি। তবে ভয় নেই; তোমাকে ঘোড়ায়ও চড়তে হবে না, একাও যেতে হবে না। পণ্ডিত মহাশয় থাকবেন তোমার প্রহরী। আর রায় মহাশয়ের অন্দরমহল গহন বন নয়, ফুলের বাগান।

—তাহলে সেখানে গিয়ে দেখব :—

"কোন ফুল জপত হরিনাম,
কোন ফুল ফুকারে অলি অলি।"

—ও দুই কাজ করা ছাড়া মেয়েদের আর উপায় কি? প্রথমে অলি অলি, শেষে হরি হরি। সে যাই হোক্, তোমাকে আজ একটি সাদাসিদে গল্প বলতে হবে, যা মেয়েরা বুঝতে পারে। রায় মহাশয়ের আড্ডায় যে-সব গল্প বল, তা শুনলেই আমার বলতে ইচ্ছে যায় —এহ বাহ্য, আগে কহো আর।

—কেন?

—তার দু-আনা গল্প, আর পড়েপাওয়া চোদ্দ আনা তর্ক; —অর্থাৎ বাক্যি।

—আচ্ছা, গল্পটা যথাসাধ্য সাদা করব, তবে সিধে হবে কি না বলতে পারিনে।

—যাক্, তাতে কিছু আসে যায় না। গুটি দুচ্চার ভাল ভাল গানও শোনাতে হবে।

—আচ্ছা, তাহলে কীর্তন গাইব, যা মেয়েরা বুঝতে পারে। যথা "প্রাণবঁধুর সনে কথা কইতে, পেলেম না।"

—না, কীর্তন নয়।

—কেন?

—কীর্তন তুমি আমার মত গাইতে পারবে না। ধর ঐ গানটার ভিতর যত মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে হবে, আখর দিয়ে নয়, সুরের টান টেনে। নইলে কীর্তন হয়ে পড়ে নেড়া গান।

—তুমি বলতে চাও নেড়ানেড়ির গান। যথা, আমি চাপান দিলুম—"যদি গৌর চাস, কাঁথা নে ধনী;" আর তুমি উতোর গাইলে, "এ পুজোতে ঝুমকো দিবি, তবে ঘরে রব।"

—এ কীর্তনে অবশ্য আবদার আছে, আক্ষেপ নেই। আর তা ছাড়া ও সব ভাবের কীর্তন নয়, অভাবের সং-কীর্তন। ও সৎপনা এ দরবারে চলবে না।

—তাহলে আমাকে কি গাইতে হবে?

—হিন্দী।

—তোমাকে যে কটি গান শিখিয়েছি, তারই মধ্যে দুয়েকটি।

—হ্যাঁ। "গোরে গোরে মুখপর"ও চলবে, "চামেলি ফুলি চম্পা"ও চলবে।

—তুমি বলতে চাও সে মজলিসে গোরে গোরে মুখও থাকবে, চমেলি ফুলি চম্পাও থাকবে।—তবে কথা হচ্ছে, আমার সঙ্গে সঙ্গত করবে কে?

—খেয়ালেব ভারি ত তাল। আমি খঞ্জনীতে ঠেকা দেব এখন। তোমার তাল আমি সামলে নেব।

—তাহলে আমি নির্ভয়ে গাইতে পারব।

—আচ্ছা, তবে আসি। মেয়েদের সন্ধ্যে আহ্নিক হয়ে যাবার পর রাধানাথ শিকদের এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।

—আচ্ছা, হুকুম ঠিক তামিল করব। ইতিমধ্যে দুর্গানাম জপ করি।

—মধ্যে মধ্যে মার নাম স্মরণ করা ভাল, বিশেষত চিরকুমারের পক্ষে।

সখীরানীর গুণাগুণ

আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি যে, সখীবানী আমার পূর্ব পরিচিত। এ বাড়িতে তার গতিবিধি ছিল অবাধ। তাব তুল্য স্বাধীন জেনানা আমি আব একটিও দেখিনি। সে বোষ্টমের মেয়ে, তাই মনুব বিধিনিষেধেব সে তোযাক্কা রাখত না। সংসারে তার কোনরকম বন্ধন ছিল না; কাবণ সে কুমাবীও নয়, সধবাও নয়, বিধবাও নয়। উপরন্তু সে সুন্দরী ও গুণী। তার যে রূপ আছে, সে তা জানত; কারণ না জানবার তার উপায় ছিল না। আর সে কীর্তন গাইত চমৎকার। তারপর সে ছিল আমার শিষ্যা। রানীমার ইচ্ছায় আর রায় মহাশয়ের আদেশে আমি তাকে হিন্দী গান শেখাতুম,—টপ্পাঠুংরি নয়, সাদাসিধে মামুলী গান; অর্থাৎ সেই সব গান যা আজও বাতিল হয় নি, যদিচ লোকে সেগুলো নবাবী আমল থেকে গেয়ে আসছে। আমি তাকে তান শেখাইনি, পাছে তার গলার অপূর্ব টান নষ্ট হয়। সুবের প্রাণ তার কাঁপুনির উপর নির্ভর করে না; করীকর্ণের মত অবিরত চঞ্চল হওয়া প্রাণের একমাত্র লক্ষণ নয়।

আমি পূর্বেই বলেছি রানীমার নাম হচ্ছে মীনাক্ষী দেবী। শ্যামাদাসী তাঁকে আজন্ম মীনা বলেই ডেকে এসেছে; এ বাড়িতে এসে শুধু তাব পিছনে রানী জুড়ে দিয়েছে। কারণ গবর্নমেন্টে রায় মহাশয়কে রাজা খেতাব না দিলেও, এদেশের লোকে তাঁকে রাজাবাবুই বলত। সে যাই হোক, আমি সখীরানীর প্রস্তাব শুনে একটু অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম। কেন না, আমি জানতুম যে, এই মজলিসে একজন উপস্থিত থাকবেন, যাঁর সুমুখে কি ব্যবহারে, কি কথাবার্তায়, পান থেকে চুন খসলেই সভাবন্ধ হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তিনি কে?

ঘোষাল বল্লেন—তিনি এই রাজপুরীর পুরদেবতা।

—মানবী না পাষাণী?

—ক্রমশ প্রকাশ্য।

সখী সমিতি

সন্ধ্যের পর রাত যখন ৮টা বাজে, পণ্ডিত মশায় আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে রায় মহাশয়ের প্রিয় খানসামা রাধানাথ শিকদার। রাধানাথ আমাদের ঠাকুর-বাড়িতে নিয়ে চললো। বারবাড়ি এবং অন্দরমহলের মধ্যস্থ মহলটি হচ্ছে পূজার মহল। পশ্চিমে প্রকাণ্ড পূজার দালান, তার সুমুখে নাটমন্দির আর তিন পাশে প্রশস্ত ভোগের দালান; সব

আগাগোড়া সাদা মার্বেলে মোড়া,—পবিত্রতার নিদর্শন।

আমাদের পথপ্রদর্শক আমাদের দুজনকে নিয়ে গিয়ে নাটমন্দিরে একখানি গালিচার উপর বসালে। তাকিয়ে দেখি ঠাকুরদালান স্ত্রীজাতি নামক উপদেবতায় গুলজার। শুনলুম এঁরা সবাই ব্রাহ্মণকন্যা,—রায় মহাশয়ের কুটুম্বিনী। আর দাসী-চাকরানীরা বসেছে সব নাটমন্দিরের ডাইনে বাঁয়ে ভোগের দালানের বারান্দায়। প্রথমেই চোখে পড়ে এ দুই দলের বর্ণের পার্থক্য। যাক্, সে স্ত্রীরাজ্য আর বর্ণনা করব না, তাহলে পুঁথি বেড়ে যাবে। ছায়া পিছনে ফেলে আলোর দিকে ফিরে দেখি যে, ঠাকুরদালানের সামনে প্রথমেই বসে আছেন রানীমা, তাঁর বাঁয়ে তাঁর তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী সখীরানী। রানীমাকে এই প্রথম দেখলুম। দিব্যি সুশ্রী, যেন একটি ননীর পুতুল—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।

মূর্তিমতী আনন্দলহরী! এর চেয়ে তাঁর বিষয় বেশী কিছু বলবার নেই।

তাঁর ডাইনে বসে আছেন একটি বিধবা—the woman in white. ইনিই হচ্ছেন এ পুরীর পুরদেবতা। তাঁর রূপ বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কারণ এ তরল ভাষার কোন সংহত গাঢ়বন্ধরূপ নেই। সংস্কৃত কবি হয়ত বলতেন :—

"তড়িল্লেখা তন্বীং তপনশশি বৈশ্বানরময়ী।"

ঠাকুরানী

এই সংস্কৃত আউড়েই ঘোষাল বল্লেন—আর চার ড্রাম, liqueur glass-এ। এখন আমি সুর বদলে নেব, নইলে এ ইতিহাস কাব্য হয়ে উঠবে,—অর্থাৎ প্রলাপ। চার ড্রাম একটা বুড়ো আঙুলের মত গেলাসে এল; এক চুমুকে গেলাসটি খালি করেই ঘোষাল আবার তার গল্প আরম্ভ করলে :—

যে মহিলাটির রূপবর্ণনা করতে পারিনি, এখন তার গুণ বর্ণনা করি। তাঁর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী, এ বাড়িতে তিনি ঠাকুরানী নামেই পরিচিত। তার কারণ তিনি রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালক হরিসত্য শর্মা ঠাকুরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বিবাহের পর থেকে তিনি এই বাড়িতেই বাস করছেন, বিদেহ আত্মার মত; কেননা তাঁর দেখাসাক্ষাৎ সকলে পায় না। অথচ তিনি হয়ে উঠেছেন এ পরিবারের হর্তা কর্তা বিধাতা। এরই নাম নীরব প্রভুত্ব। এক কথায়, সকলেই ছিল তাঁর বশীভূত; হয়ত তাঁর রূপের জ্যোতিই ছিল তাঁর বশীকরণ-মন্ত্র, নয় ত তাঁর অন্তরেব কোনও X-ray!

উপরন্তু তিনি ছিলেন বিদুষী। বিয়ের বছরখানেক পরে তাঁর স্বামীবিয়োগ হয়, তারপর থেকেই তিনি বিদ্যাচর্চা সুরু করলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন সুপণ্ডিতা। পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন তাঁর শিক্ষক। তিনি বিধবার আচার 'ক' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। যদিচ শাস্ত্রে তাঁর কোনরূপ ভক্তি ছিল না। পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে শুনেছি, কিছুদিন বেদান্তচর্চা করে তিনি তাঁকে বলেন যে, ও আধ্যাত্মিক ধূমপানে আমার অরুচি হয়ে গিয়েছে। পণ্ডিত মহাশয় তখন বলেন যে, তবে কাব্যামৃত রসস্বাদ করুন। তারপর থেকেই সুরু হল রামায়ণ, কালিদাস ও ভবভূতির চর্চা। এ সব কাব্য ইতিহাস চর্চা করেও তিনি তৃপ্তিলাভ করেন নি। তিনি নাকি বলতেন যে, যা হওয়া উচিত তার কথা একরঙা, আর সে রঙও জ্বলা। যা হয়, তাই বিচিত্র। এর পর থেকে তিনি

ইংরাজী শিখেছেন, আমিও পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরোধে এ শিক্ষার কিছু সাহায্য করেছি। এই মেয়ে-মজলিসে তিনিই ছিলেন আমার গল্পের একমাত্র বিচারক। তিনি হাসলে সকলে হাসতেন, তিনি গম্ভীর হলে সকলে গম্ভীর হতেন;—শুধু সখীরানী ছাড়া। কেন না ত্রিপুরাসুন্দরীর কাছে ছিল শ্যামাদাসীর সাত খুন মাপ। শুধু তাঁরা উভয়ে সমবয়সী বলে নয়, কতকটা সহকর্মী বলেও বটে।

প্রফেসর

তারপর মুখ ফিরিয়ে দেখি পাশে একটি মহা বেরসিক বসে রয়েছেন। তাঁকে দেখে একটু অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—ভদ্রলোকটি কে?

—রায় মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষের শ্যালক—নাম ভৃঙ্গেশ্বর ভট্টাচার্য, professor বলেই এখানে গণ্য ও মান্য। তিনি একজন ডবল M A.—প্রথম পক্ষে pure Mathematics-এর, দ্বিতীয় পক্ষে Mixed philosophy-র। Mixed philosophy এই জন্য বলছি যে, তিনি হিন্দুদর্শন ও বিলেতিদর্শন তেলের সঙ্গে জলের মতন বেমালুম মিলিয়ে দিয়েছিলেন। সে মিশ্র দর্শন উজ্জ্বল নীলমণি ছাড়া আর কেউ গলাধঃকরণ করতে পারত না। এই অতিবিদ্যের ফলে তিনি সত্য কথা ছাড়া আর কিছু বলতেন না। সত্য কথা যে অপ্রিয় হতে পারে, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, অপ্রিয় কথামাত্রই সত্য হতে বাধ্য, আর সে কথা যত অপ্রিয় হবে, তত বেশী সত্য হবে। ফলে তিনি একটি মহা ক্রিটিক হয়ে উঠেছিলেন,—প্রায় আপনারই জুড়ি। আমি একদিন রায় মহাশয়ের আড্ডায় গল্পচ্ছলে বল্লুম যে, কৃষ্ণ কদমতলায় একা দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছিলেন, আর সেই বংশীধ্বনি শুনে একদিক থেকে রাধিকা আর একদিক থেকে চন্দ্রাবলী উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলেন, তারপর পাঁচজনে মিলে মহা গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে। প্রফেসর অমনি নাক সিঁটকে মন্তব্য করলেন যে, দুই আর একে তিন হয়, পাঁচ হয় না। এ বিষয়ে দেখি রায় মহাশয় থেকে দেওয়ানজি পর্যন্ত সকলেই একমত। তখন আমি বল্লুম—শ্রীকৃষ্ণ যে একে তিন আর তিনে এক। আমার জবাব শুনে রায় মহাশয় বল্লেন, "বহুত আচ্ছা!" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি একেবারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নন্?—তাই তাঁর লীলাখেলা হচ্ছে একদিকে সৃষ্টি আর একদিকে প্রলয়। প্রফেসর বল্লেন যে, একে তিন ধর্মে হতে পারে, অঙ্কে হয় না। আমি বল্লুম—গণিতেও হয়, কেননা কৃষ্ণ হচ্ছেন বীজগণিতের X, তাঁকে বিন্দুও করা যায়, তেত্রিশকোটিও করা যায়।—এর থেকে বুঝতে পারছেন তিনি কত বড় ক্রিটিক।

কথারম্ভ

সে যাই হোক, বানীমার মুখপাত্র হয়ে সখীরানী আদেশ করলেন যে, আজ একটি আজগুবি গল্প বল। প্রফেসর অমনি বলে উঠলেন যে,—ঘোষাল মহাশয় যা বলবেন, তাই আজগুবি হবে। আমি সখীরানীকে সম্বোধন করে বল্লুম—শুনলে ত, আমি যা বলব তাই আজগুবি হবে, সেই ভরসায় আমি গল্প সুরু করছি। প্রফেসর একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন যে,—ঘোষাল যা বললে তা শুধু গল্পেই হবে—অর্থাৎ গল্প হবে না। তার ভিতর দর্শন বিজ্ঞান কিছুই থাকবে না,—ওরকম গল্প একালে চলে না! এ যুগে কাব্য হচ্ছে শাস্ত্রের বেনামদার।

আমি বল্লুম—তা যদি হয় ত পণ্ডিত মহাশয় গল্প বলুন, তার পরে আমি শাস্ত্রচর্চা করব।

এ কথা শুনে সখীরানী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও, —মায় ঠাকুরানী। ফলে তাঁদের দন্তরুচি কৌমুদীতে আকাশবাতাসও হেসে উঠল।

তারপর সখীরানী আবার আদেশ করলেন—এখন গল্প বল, কাল বৈঠকখানায় বসে তর্ক কর।

আমি মনে করেছিলুম গল্প বলব "অচেতন প্রেমের।" কিন্তু বেগতিক দেখে শেষটা নেহাত বেপরোয়া গল্প সুরু করে দিলুম। তার পত্তন করলুম চীনদেশে। কল্পনাকে দিলুম সে দেশের ঘুড়ির মত উড়িয়ে, আর সেই চীনে মাটির দেশের ফুল ফল ও নরনারীর বাঁকা চেহারার বর্ণনা করলুম। সে সবই এড়ো, সবই তেরচা চীনেদের চোখের মত। বলা বাহুল্য, প্রফেসর কথায় কথায় আমার ভুল ধরতে লাগলেন, Geography এবং Botany ইত্যাদিব। অতঃপর আমি যখন বল্লুম যে, আমি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে এখানে উপস্থিত হইনি, আমি এসেছি রূপকথা বলতে। রূপকথার রাজ্য ম্যাপে কোথায় আছে? আমায় কথার রূপ আছে কিনা, তার বিচারক মা-লক্ষ্মীরা ও স্বয়ং সরস্বতী।

কথার অপমৃত্যু

তারপর, আমি আমার চীনে নায়ককে উপস্থিত করলুম। নায়কের যেরকম রূপগুণ অলঙ্কার শাস্ত্রমতে থাকা উচিত, তার অবশ্য সে সব ছিল। তার চোখ ছিল, যে চোখ দিয়ে সে দেখতে পারত; কান ছিল, যে কান দিয়ে সে শুনতে পারত; আর যদিও চীনে, তবু তার নাক ছিল। নায়কের রূপবর্ণনা করবার পর আমার অপরাধের মধ্যে বলেছিলুম যে, সে চীনদেশের পাসকরা মুখস্থবাগীশ mandarin-দের মত স্থূলদেহ ও স্থূলবুদ্ধির লোক নয়, একটি মানুষের মত মানুষ। এতেই হল যত গোল! প্রফেসর চটে উঠে বল্লেন যে,— "নিজে কখনও স্কুলকলেজে পড়নি বলে তুমি ফাঁক পেলেই বিদ্বান লোকদের বিদ্রূপ কর।" আমি একটু বেসামাল হয়ে বল্লুম, আমিও স্কুলে পড়েছি।

—কলেজে?

—আজ্ঞে তাও।

—পাস ত কখনও করনি?

—আজ্ঞে তাও করেছি।

—কি পাস করেছ?

—M.A.

—কোন্ বিষয়ে?

—প্রথমে Mixed Mathematics, পরে pure Philosophy.

—কোন্ বৎসর?

—Calender-এ আমার নাম পাবেন না। ঘোষাল আমার ছদ্মনাম।

—চুরি করে জেলে গিয়েছিলে বুঝি? বেরিয়ে এসে, পুনর্জন্ম লাভ করে ঘোষাল রূপ ধারণ করেছ?

—হয় ত তাই। আমি জাতিস্মর নই, পূর্বজন্মের পাতা ওলটাতে পারব না।

এর পরে তিনি লাফিয়ে উঠে বল্লেন যে—"আমি মিথ্যাবাদী ও চোরের সঙ্গে এক আসনে বসিনে।"

আমি বল্লুম—যদভিরোচতে।

এর পরেই তিনি সরোষে চলে গেলেন। ঠাকুরানী আদেশ দিলেন যে, আজকের মত সভা বন্ধ। পণ্ডিত মহাশয় আর আমি ধীরে ধীরে বাসায় ফিরে এলুম। তিনি হয়ে গিয়েছিলেন অবাক, আর আমি নির্বাক।

তারপর রাত যখন সাড়ে দশটা, সখীরানী আমার ঘরে উপস্থিত হয়ে বল্লেন যে "ঠাকুরানী আপনাকে ডাকছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এত রাত্তিরে কিসের জন্য?

—সে গেলেই বুঝতে পারবেন।

—তবু?

—শ্যালাবাবু রেগে রায় মহাশয়ের কাছে গিয়ে নালিশ করছে যে, তুমি ভদ্রমহিলাদের সামনে তাঁকে গায়ে পড়ে অপমান করেছ। রায় মহাশয় তাই শুনে মহা চটে,—তোমার উপর নয়, শ্যালাবাবুর উপর,—রানীমার কাছে গিয়ে তাঁর ভ্রাতার উপর ঝাল ঝাড়ছিলেন। মীনারানীও তোমার দিক নিলেন দেখে ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট রায় উলটা রেগে বল্লেন যে—'ঘোষালটাকে আজই বাড়ি থেকে বার করে দেব।" মীনারানী বল্লে,—"তার আগে, একবার ঠাকুরানীর মত জেনে নাও।" অমনি তিনি ঠাকুরানীর মন্দিরে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। ফলাফল ঠাকুরানীর কাছেই শুনতে পাবে।

—আচ্ছা যাচ্ছি। তোমার রায় কি?

—ও রসিকতাটা না করলেই ভাল হত। প্রফেসরের যে অজীর্ণ বিদ্যায় মাথা ঘুরে গেছে তা আমরা সকলেই জানি,—এমন কি মীনারানীও। তার মত—তোমার কথা সত্যও হতে পারে, রসিকতাও হতে পারে। কিন্তু তুমি ওকথা বলে ভালই করেছ। মানুষের ধৈর্যেরও ত একটা সীমা আছে। এখন ঠাকুরানীর মত কি, তা তুমি তার কাছে গেলেই শুনতে পাবে। আমি জানিনে!

আমি "আচ্ছা" বলে আবার ঠাকুরবাড়িতে ফিরে গেলুম, কারণ শুনলুম তিনি সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ঠাকুরানী আমাকে আসন গ্রহণ করতে অনুমতি দিয়ে ধীরে শান্তভাবে বল্লেন :—

"আমার বিশ্বাস তুমি সত্য কথা বলেছ, কেননা তুমি যে কৃতবিদ্য, তা প্রত্যক্ষ। ছদ্মবেশ গায়ে যত সহজে পরা যায়, মনে তত সহজে নয়। মন জিনিসটে হাজার ঢাকতে চাইলেও যখন তখন বেরিয়ে পড়ে।

"তুমি বোধহয় জানো যে, মীনা আমার আত্মীয়। যখন দেখলুম যে বিপত্নীক রায় মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষ করতে আর ত্বর সয় না, আর বাল্যবিবাহেও তাঁর আপত্তি নেই, বিধবা বিবাহেও নয়—তখন বাল্যবিধবাবিবাহরূপ যুগপৎ অধর্ম থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য মীনাকে তাঁর হস্তে সমর্পণ করলুম। এ কাজ ভাল করেছি কি না জানিনে। সনাতন ধর্মের বিধি নিষেধ সকলের পক্ষে ভাল হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের পক্ষে নয়। কোন কোন রমণীর স্বধর্ম হচ্ছে ফুটে ওঠা, আর শাস্ত্রির ধর্ম হচ্ছে তাকে ফুটতে না দেওয়া। তাতেই এজাতীয় স্ত্রীলোকের জীবন হয় প্রাণহীন শরীরধারণ মাত্র। একথা অবশ্য ভৃঙ্গেশ্বর বোঝে না। কারণ সে জীবনের মূলও জানে না, ফুলও জানে না। তার বিদ্যে হচ্ছে জীবনের ভাষা ভুলে তার বানান শেখা। সে যাই হোক, তোমায় আজ শেষ রাত্তিরেই এখান থেকে চলে যেতে হবে। কাল সকালে যেন কেউ তোমার দেখা না পায়। এতে

তোমারও মর্যাদা রক্ষা হবে, ভৃঙ্গেশ্বরেরও শিক্ষা হবে।

"রায় মহাশয় তোমার ছ মাসের ছুটি মঞ্জুর করেছেন; পুরো মাইনের। তুমি যেখানে যাও, যেখানে থাকো, শ্যামা-দাসীকে চিঠি দিয়ে জানিয়ো, আর আমাদেরও যদি কিছু বলবার থাকে ত শ্যামাদাসী তোমাকে জানাবে।

"দেখো, আমার বিশ্বাস কলেজ ছেড়ে, সংসারে ঢুকেই তোমার জীবনে কোন একটা ট্র্যাজেডি ঘটেছিল, আর সেই থেকে তোমার জীবনযাত্রার মোড় ফিরে গেছে। তুমি যে জীবনটাকে প্রহসনরূপে দেখতে ও দেখাতে চাও, সে হচ্ছে ঐ ট্র্যাজেডির বাহ্য আবরণ মাত্র।

"আজ তবে এসো। শ্যামাদাসী পরে তোমার সঙ্গে দেখা করবে।"

আমি বাসায় ফিরে আসবার কিছুক্ষণ পরে শ্যামাদাসী এসে যথেষ্ট টাকা দিয়ে বললে—"বিদেশে কখনও যদি কোন বিপদে পড়ো আমাকে জানিয়ো, ঠাকুরানী তোমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে। তুমি চলে গেলে এ পুরী নিরানন্দ পুরী হবে।"

তারপর থেকেই তীর্থভ্রমণ করছি, অর্থাৎ নানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পরশু শ্যামাদাসীর একখানি চিঠি পেয়ে কাল কলকাতায় এসেছি। এদিকে শ্যামাদাসীও আজ উপস্থিত হয়েছেন। আজ রাত্তিরের ট্রেনেই নাকি মকদমপুর রওনা হতে হবে। আমার সেখানে পদবৃদ্ধি হয়েছে, সে বাড়িতে আমি এখন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছি। ঠাকুরানীকে শেখাতে হবে ইংরেজী, সখীরানীকে সঙ্গীত ও মীনারানীকে অঙ্ক। ঠাকুরানী এখন আয়ব্যয়ের হিসাব তাঁর কাছে বুঝিয়ে দিতে চান সেই জন্যই তাঁর তেরিজ খারিজ শেখা দরকার। দেখেছেন একবার qualification-এর কথা বলে কি মুশকিলেই পড়েছি। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলুম যে, দেশের কাজ করতে গেলে কি qualification-এর প্রয়োজন?

—তোমার বিপদটা কি ঘটল, তা ত বুঝতে পারছি নে।

—একটি বাল্যবিধবা আর একটি বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা, আর একটি স্বাধীনভর্তৃকা, এই তিনজনের ত্রি-সীমানায় ঘেঁষলে কি বিপদের সম্ভাবনা নেই? সখীরানী ত আগেই বলেছে যে, আমার বুকের পাটা নেই। আমি ত আর Shelley নই যে, এ অবস্থায় Epipsychidion লিখে পরে ত্রি-রানী সঙ্গমে ডুবে মরব।

—একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে হয়ত দেখবে যে, এ তিনই এক।

—অর্থাৎ তড়িল্লেখা, তপন ও শশী তিনই এক,—অর্থাৎ আলো। কিন্তু ঐ তিনের মধ্যে এক যদি উপরন্তু বৈশ্বানরময়ী হন?

—সখীরানী ত আগেই বলেছে ঠাকুরানী তোমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তারপর ঘোষাল বললে—তবে আসি, সখীরানী অনেকক্ষণ আমার জন্য একা অপেক্ষা করছে।

—কোথায়?

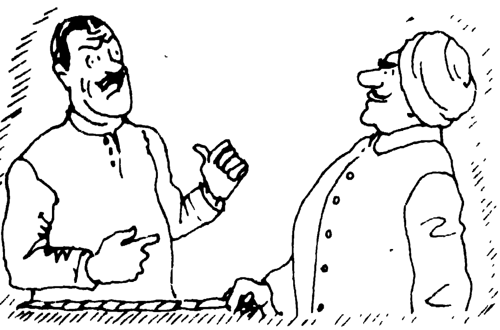
—রাস্তায় Taxi-তে।

তার পর ঘোষাল au revoir বলে অন্তর্ধান হল।

শেষ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারলুম না যে, ঘোষালের গল্পটি সত্য কিম্বা সর্বৈব রসিকতা—অথবা অসম্বদ্ধ প্রলাপ। আপনাদের কি মনে হয়?

বলবান জামাতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়



নলিনীবাবু আলিপুরে পোস্টমাস্টার। বেলা অবসান প্রায়; আপিসে নলিনীবাবু ছটফট করিতেছিলেন। আশ্বিন মাস—সম্মুখে পূজা—নলিনীবাবু ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও হেড আপিস হইতে কোনও হুকুম আসিল না। যদি আজ পাঁচটার মধ্যেও হুকুম আসে, তবে আজই মেলে এলাহাবাদ রওনা হইবেন। এলাহাবাদে তাঁহার শ্বশুরালয়। নলিনীবাবু এই প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাইবেন। জিনিসপত্র কিনিয়া, বাক্স তোরঙ্গ সাজাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু এখনও ছুটির হুকুম আসিল না। বেলা চারিটা বাজিল। হঠাৎ টং টং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বড় আশা করিয়া নলিনীবাবু টেলিফোনের নল মুখে দিয়া বলিলেন—"Yes"।

কিন্তু হায়, ছুটির হুকুম আসিল না। একটা মনিঅর্ডার সম্বন্ধে কী গোলমাল ঘটিয়াছিল, তাহারই সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন।

নলিনী হতাশ হইয়া আবার চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন। দুই একটা টুকিটাকি কার্যের পর পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি তাঁহার স্ত্রীর লেখা। ইতিপূর্বেই সেখানি বহুবার পাঠ করা হইয়াছিল; আবার পড়িলেন—

(একটি পাখির ছবি)
নিম্নে সোনার জলে মুদ্রিত
"যাও পাখি যেথা মম আছে প্রাণপতি"

প্রিয়তম,

তোমার সুধামাখা পত্রখানি পাইয়া মনপ্রাণ শীতল হইল। নাথ, এতদিনের পর কি দীর্ঘ বিরহের অবসান হইবে? তোমার চাঁদমুখখানি দেখিবার জন্যে আমার চিত্তচকোর উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। আজ দুই বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে, এখনও একদিনের তরে পতিসেবা করিতে পাইলাম না। ছুটি হইলে শীঘ্র চলিয়া আসিও। দুঃখিনী আশাপথ

চাহিয়া রহিল। দিনাজপুর হইতে মেজদি আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কতদিনে তোমার ছুটি হইবে? পঞ্চমীব দিন যাত্রা করিতে পারিবে কি? আজ তবে আসি। মনে রেখ, ভুল না।

তোমারই
সরোজিনী

নলিনীবাবু পত্রখানি উলটিয়া পালটিয়া পাঠ করিলেন। শেষে পুনর্বার তাহা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

পাঁচটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আজও ছুটির কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। নলিনীবাবু একটি মৃদু রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার কার্যে মন দিতে চেষ্টা করিলেন; যাহা হউক, আজ চতুর্থী মাত্র। যদি আগামী কল্যও ছুটি আসে, তবুও পঞ্চমীর দিন যাত্রা করিতে সমর্থ হইবেন।

পাঁচটা বাজিতে আর যখন দুই এক মিনিট বাকি আছে, তখন আবার টেলিফোন কলঝঙ্কার করিয়া উঠিল। আবার নলিনীবাবু নলে মুখ দিয়া বলিলেন—"Yes"।

॥ ২ ॥

ছুটি!—ছুটি!—ছুটি!—নলিনীবাবু দুই সপ্তাহের বিদায় পাইযাছেন। ডেপুটি পোস্টমাস্টারকে চার্জ বুঝাইয়া দিয়া আজই রাত্রে নলিনীবাবু রওনা হইতে পারিবেন।

সরোজিনীব পত্রে প্রকাশ, 'দিনাজপুরের মেজদি' আসিয়াছেন; ইহার আসিবার কথা পূর্বেই নলিনীবাবু অবগত ছিলেন, এবং সেইজন্যই বিশেষত এবার এলাহাবাদ যাইবার জন্য তাঁহার এত অধিক আগ্রহ। 'দিনাজপুরের মেজদি'র উপর তাঁহার বিলক্ষণ রাগ আছে—তাই তাঁহার সহিত এখন একবার সাক্ষাতের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত। কিন্তু সে ব্যাপারটি কি, বুঝাইতে হইলে, মেজদির একটু পরিচয় এবং নলিনীর বিবাহ-বাসরের একটু ইতিহাস বিবৃত করা আবশ্যক।

মেজদির স্বামী মহা সাহেব-লোক—তিনি দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মেজদির নামটি উল্লেখ করলেই সকলেই তাঁহাকে অনায়াসে চিনিতে পারিবেন। শ্রীমতী কুঞ্জবালা দেবীর স্বাক্ষরিত ওজস্বিনী স্বদেশী কবিতাগুলি বর্তমান সময়ের মাসিক পত্রাদিতে কে না পাঠ করিয়াছেন? সৌভাগ্যবশত ফুলার সাহেব বাঙ্গালা জানেন না, জানিলে এতদিন কুঞ্জবালার স্বামীর চাকুরিটি লইয়া টানাটানি হইত।

কুঞ্জবালা বিদুষী, সুতরাং বলাই বাহুল্য তাঁহার রসনাটি ক্ষুরধার। তিনি ইংরাজীতে শিক্ষিতা, সুতরাং তাঁহার 'আইডিয়াল' সর্ববিষয়ে সাধারণ বঙ্গললনা হইতে বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একবার তাঁহার এক দেবর এক শিশি সুগন্ধি কিনিয়া আনিয়াছিল। দেখিয়া কুঞ্জবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কার জন্যে এনেছিস?"

"নিজে মাখব।"

"দূর—ও জিনিস ত কেবল স্ত্রীলোকে আর বাবুতে মাখে,—পুরুষমানুষ কখনও সুগন্ধি ব্যবহার করে?"

বালক দেবরটি, বউদিদির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বুঝিতে না পারিয়া ভালমানুষের মত বলিয়াছিল, "কেন? বাবুরা কি পুরুষ নয়?"

নলিনীবাবুর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার মূর্তিটি দিব্য গোলগাল নন্দদুলালি ধরনের

ছিল। গাল দুইটি টেবো-টেবো, হাত দু'খানি নবনীতোপম, প্রকোষ্ঠদেশের কোমল অস্থিগুলি কোমলতর মাংসে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন। শীলতার অনুমোদিত না হইলেও, বিবাহ-বাসরে কুঞ্জবালা নলিনীর দেহখানির প্রতি বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর কাব্য কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :

নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম,
কোমল কোমল কোমল অতি
যেমন কোমল নাম।
যেমন কোমল, তেমনি বিকল,
তেমনি আলস্য ধাম,—
নলিনীর মত চেহারা তাহার
নলিনী যাহার নাম।

একটি শ্লেষবাক্য মনুষ্যকে যেমন সচেতন করে, দশটি উপদেশবচনেও সেরূপ হয় না। সেই শ্লেষবাক্য যদি সুন্দরীমুখনিঃসৃত হয় এবং সেই সুন্দরী যদি সম্পর্কে শ্যালিকা হন, তাহা হইলে একটি শ্লেষবাক্যের ফল শতগুণ সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

বিবাহের পর নলিনীবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ও সপরিবারে কর্মস্থান এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিদুষী শ্যালিকার ব্যঙ্গ নলিনী কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

একদা সন্ধ্যায় পোস্ট অফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া, ইজিচেয়ারে পড়িয়া, নলিনীবাবু ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে একটি মতলবের উদয় হইল— কেন, তিনি ত চেষ্টা করিলেই এ কলঙ্ক মোচন করিতে পারেন— শরীর পুরুষোচিত দৃঢ় করিতে পারেন। পরদিন বাজার হইতে তিনি স্যান্ডোর ডাম্বেলাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া, বাড়িতে রীতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে যত্নবান হইলেন। নিজ দৈনিক খাদ্যতালিকা হইতে মিষ্ট, দুগ্ধ, ঘৃত ও তণ্ডুল যথাসম্ভব কাটিয়া দিয়া, তৎস্থানে রুটি, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি যোজনা করিলেন। প্রথম প্রথম পাঁচ সাত মিনিটের অধিক ব্যায়াম করিতে পারিতেন না —ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। অভ্যাসের গুণে ক্রমে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অর্ধঘণ্টা কাল ধরিয়া নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর এইরূপ করিয়া তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বিলক্ষণ দৃঢ় হইল। তখন স্বীয় মূর্তি আরও অধিক মাত্রায় পুরুষ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি দাড়ি কামানো বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই একটি শিকারী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামে গিয়া হংস, বন্যশূকরাদি, শিকার করিতেও অভ্যাস করিলেন।

এইরূপ করিয়া দুই বৎসর কাটিয়াছে। এখন আর সে নলিনী নাই। এখন তাঁহার কপোলদেশ রসাশূন্য, চিবুকাগ্রভাগ, সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত, হস্তপদাদি অস্থিবহুল হইয়াছে; ফলত তিনি নামের এখন সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় একবার কুঞ্জবালার সহিত সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষিত। হায় নামটাও যদি পরিবর্তন করিবার উপায় থাকিত! নলিনীবাবু মনে করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র জন্মিলে তাহার নাম রাখিবেন—খুব একটা ভীষণ রকমের—কী নাম রাখিবেন এখনও স্থির করিতে পারেন নাই।

॥ ৩ ॥

পরদিন বেলা দুইটার সময়, নলিনীবাবু এলাহাবাদ স্টেশনে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পায়জামা ও লম্বা পাঞ্জাবি কোট, মস্তকে পাগড়ি। হস্তে একটি বৃহদাকার যষ্টি দেখা যাইতেছিল। জিনিসপত্রের সঙ্গে একটি বন্দুকের বাক্স। ইচ্ছা ছিল ছুটিতে কিঞ্চিৎ শিকারও করিয়া যাইবেন।

স্টেশনে নামিয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন—কই, কেহ ত তাঁহাকে লইতে আসে নাই। গত কল্য যাত্রা করিবার পূর্বে তিনি যে শ্বশুবমহাশয়েব নামে চারি আনার টেলিগ্রাম একটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা পৌঁছে নাই কি?

কুলি ডাকিয়া, জিনিসপত্র লইয়া, নলিনীবাবু স্টেশনের বাহিরে গেলেন। একজন গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্রবাবু উকিলকা বাসা জান্‌তা?"

গাড়োয়ান উত্তর করিল, "হাঁ বাবু—আইয়ে।"

"চলো"—বলিয়া নলিনী গাড়িতে আরোহণ করিলেন।

এলাহাবাদে নলিনীবাবু পূর্বে কখনও আসেন নাই; এমন কি এই তিনি প্রথম বঙ্গদেশের বাহিবে পদার্পণ করিয়াছেন। পশ্চিমের শহরে নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি চলিলেন।

অর্ধ ঘণ্টা পরে গাড়ি একটি বৃহৎ কম্পাউন্ডযুক্ত বাড়িতে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই বহির্বাটী, বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের বালিকা খেলা করিতেছিল। বারান্দার নিম্নে, বামে, একটা কূপ; সেখানে বসিয়া একজন পশ্চিমা ভৃত্য সজোরে একটা কটাহ মাজিতেছিল।

গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া, সেই ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া নলিনীবাবু বলিলেন—"এই মহেন্দ্রবাবু উকিলের বাড়ি?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"বাবু আছেন?"

"না। তিনি কিদাববাবু উকিলের বাড়ি পাশা খেলতে গিয়েছেন।"

"আচ্ছা—ভিতরে খবর দাও—বল জামাইবাবু এসেছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র, যে মেয়েটি বারান্দায় খেলা করিতেছিল, সে ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে গিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া বলিল, "ওগো, তোমাদের জামাইবাবু এসেছেন।"

ভৃত্যটির নাম রামশরণ। সে এই কথা শুনিয়া, দন্ত বিকশিত করিয়া বলিল, "আরে! জামাইবাবু?" বলিয়া সে চটপট হাত ধুইয়া ফেলিয়া, নলিনীকে এক দীর্ঘ সেলাম করিল।

তাহার পর রামশবণ জিনিসপত্র গাড়ি হইতে নামাইয়া ফেলিল। এদিকে বাড়ির ভিতর হইতে নানা আকারের বালকবালিকাগণ আসিয়া উঁকি মারিয়া জামাই দেখিতে লাগিল।

রামশরণ নলিনীবাবুকে বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল, "বাবু চান করা হোবে কি?"

নলিনী বলিল, "হ্যাঁ—স্নান করব। তুমি গোসলখানায় জল দাও।"

এই সময় একজন বাঙ্গালী ঝি আসিয়া নলিনীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "ভাল ছিলেন ত?"

"হ্যাঁ, ভাল ছিলাম। তোমরা কেমন ছিলে?"

হাসিয়া ঝি বলিল, "যেমন রেখেছেন। আজ ছ' মাস আমি এ বাড়িতে চাকরি করছি, দিদিমণিকে রোজ জিজ্ঞাসা করি, 'জামাইবাবু কবে আসবেন গো?'—'জামাইবাবু কবে আসবেন গো?'—দিদিমণি বলেন, এই ছুটি হলেই আসবেন। তা এতদিনে মনে পড়ল সেও ভাল। আপনি চান করে ফেলুন। মা ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি জলটল খাবেন, না ভাত চড়িয়ে দেওয়া হবে?"

নলিনী মোগলসরাই স্টেশনে, কেলনারের কল্যাণে, প্রাতরাশ সমাধা করিয়া আসিয়াছিলেন; বলিলেন, "এখন ভাত চড়াতে হবে না;—জলটল খাব এখন।"

ঝি বলিল, "আচ্ছা তবে স্নান করে ফেলুন। পরে আপনাকে একটি নতুন জিনিস দেখাব। আমার বখশিসের জন্যে কি গহনা-টহনা এনেছেন বের করে রাখুন।" বলিয়া ঝি নলিনীর প্রতি রমণীজন-সুলভ কটাক্ষপাত করিয়া, মৃদু হাস্য করিল।

রামশরণ বলিল, "তুই বখশিস্ লিবি, হামি বুঝি বখশিস্ লেব না?"

নলিনী ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল গম্ভীরভাবে ঘাড়টি নাড়িতে লাগিল।

স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া নলিনী দেখিল, কতকগুলি বালকবালিকা তাহার বন্দুকের বাক্স খুলিয়া বন্দুকটি বাহির করিয়াছে। সকলে মিলিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি জোড়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহাদের হাত হইতে বন্দুকটি লইয়া নলিনী সাবধানে স্থানান্তরে রাখিয়া দিল। এমন সময় পূর্ব কথিত ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কোলে একটি অল্পবয়স্ক শিশু। তাহার মুখখানি সদ্য পরিষ্কৃত, চক্ষুযুগল এইমাত্র কজ্জলিত, মাথার চুলগুলি সাবধানে আঁচড়াইয়া দেওয়া।

ঝি শিশুটিকে হাতে করিয়া তুলিয়া নাচাইয়া বলিল, "দেখ জামাইবাবু দেখ, কেমন সোনার চাঁদ হয়েছে। যেন রাজপুত্তুরটি। নাও—একবার কোলে কর।"

নলিনী কখনই ছোট শিশু পছন্দ করিত না। তথাপি ভদ্রতার খাতিরে বলিল, "বাঃ—বেশ ছেলেটি ত।" বলিয়া কোলে লইল।

ঝি বলিল, "বেশ ছেলেটি বললেই হয় না, এখন কি দিয়ে মুখ দেখবে দেখ।"

নলিনী পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া শিশুর বদ্ধমুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

কলিকাতার ঝি তদ্দর্শনে গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা ওমা ওকি? নোকে বলবে কি গো! রুপো দিয়ে সোনার চাঁদের মুখ দেখা!"

সমবেত বালকবালিকাগণ খিলখিল করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া, আর কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া নলিনী বলিল, "সোনা ত আনিনি।" মনে মনে স্বীয় পত্নীর উপরও রাগ হইল। তাহার কি উচিত ছিল না পত্রে নলিনীকে লেখা যে, অমুকের সন্তান হইয়াছে, তাহার মুখ দেখিবার জন্য একটা গিনি আনিও?

ঝি বলিল, "সে কথা শোনে কে? তা হলে আজই সেকরা ডেকে সোনার গহনার ফরমাশ দাও। ছেলের বাপ হলেই হয় না!"

নলিনীর বুদ্ধিসুদ্ধি ইতিপূর্বেই যথেষ্ট গোলমাল হইয়া গিয়াছিল; শেষের এই কথা শুনিয়া সে একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িল। 'ছেলের বাপ হলেই হয় না' ইহার অর্থ কী? তবে নলিনীই কি ছেলের বাপ নাকি?

শিশুকে ঝির কোলে ফিরাইয়া দিয়া সভয়ে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটি কবে হল?"

ঝি পুনর্বার গালে হাত দিয়া বলিল, "অবাক কল্লে যে! তোমার ছেলে কবে হল তুমি জান না, পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করছ?"

যে দুইটি বালকবালিকা উহারই মধ্যে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত ছিল, তাহারা ঝির এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্ষুদ্রতর বালকবালিকাগণ তাহাদের দেখাদেখি, উচ্চতর হাস্য করিয়া মেঝেতে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

সদ্যস্নাত নলিনীর ললাট তখন ঘর্মসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে, মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া রাখিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

এই সময়ে একটি বালিকা আসিয়া, নলিনীর হাতে একটি গেলাস দিয়া বলিল, "জামাইবাবু! একটু সরবত খাও।"

নলিনী গেলাসে মুখ দিয়া দেখিল, জলটা লবণাক্ত। গেলাস নামাইয়া রাখিল। তখন হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহার প্রতি এই পিতৃত্ব আরোপটাও, জামাই ঠাট্টারই একটা অংশ হইবে। এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া, নলিনীর মন একটু শান্ত হইল। তাহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল আবার সমতা প্রাপ্ত হইল।

সেই বৈঠকখানার একটা কোণে, একটা কবাট খুলিবার শব্দ হইল। কবাটের সম্মুখস্থিত পর্দা অপসৃত করিয়া বামশরণ ভৃত্য বলিল, "বাবু আসুন—জলখাওয়া দেওয়া হয়েছে।"

নলিনী চাহিয়া দেখিল, অন্দর মহলের একটি কক্ষ দৃশ্যমান। উঠিয়া এই কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষের মধ্যস্থলে সুন্দর কার্পেটের আসন পাতা রহিয়াছে। তাহাব সম্মুখে রূপার রেকাবি বাটি গেলাসে ভরা নানাবিধ খাদ্য ও পানীয়। নলিনী ধীরে ধীরে আসনখানির উপর উপবেশন করিয়া জলযোগে মন দিল।

এমন সময় কক্ষান্তর হইতে মলের ঝুমঝুম শব্দ উত্থিত হইল। একটি ক্ষুদ্র বালিকা দ্বারপথে মুখ দিয়া বলিল, "মেজদি আসছেন।"

নলিনী বুঝিল, কুঞ্জবালা আসিতেছেন। নিজ দক্ষিণ হস্তের আস্তিন সে ভাল করিয়া গুটাইয়া লইল। কুঞ্জবালা আসিয়া দেখুন, তাহার হাতের কব্জি এখন আর সুগোল নহে, মাংসল নহে, পরন্তু তাহা সুপুষ্ট অস্থি ও শিরায় সমাকীর্ণ।

মলের শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। "কি ভাই এত দিনে মনে পড়ল?"—বলিতে বলিতে যুবতী আসিয়া কক্ষমধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।

কিন্তু তাহা একমুহূর্তের জন্য মাত্র। চারি চক্ষে মিলিত হইতেই, সেই মহিলা একহাত ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

নলিনী দেখিল, তিনি কুঞ্জবালা নহেন!

পার্শ্বের কক্ষ হইতে দুই-তিনটি রমণীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর নলিনীর কর্ণে আসিল :

"কি লো, পালিয়ে এলি যে?"

"ওমা, ও যে অন্য লোক।"

"অন্য লোক কি লো? আমাদের শরৎ নয়?"

"না, শরৎ হবে কেন?'

"কে তবে?"

"আমি জানি?"

"এ কি কাণ্ড? জুয়াচোর নাকি?"

"যে রকম চোয়াড়ে চেহারা, আশ্চর্য নয়।"

"ওমা এ কি কাণ্ড! জামাই সেজে কে এল?"

একজন বালকের কণ্ঠস্বরে শুনা গেল, "একটা বন্দুক নিয়ে এসেছে।"

"অ্যাঁ—ওমা কি সর্বনাশ হল গো! ওরে রামশরণা—রামশরণা—কোথা গেলি! যা, শীগগির বাবুকে খবর দে।"—রমণীগণের দ্রুত পদধ্বনি শ্রুত হইল। তাহার পর নলিনী আর কিছু শুনিতে পাইল না।

এই সময়ের মধ্যে, অদূরস্থিত একটি পুস্তকের আলমারির প্রতি নলিনীর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সারি সারি বাঁধান ল-রিপোর্ট: প্রত্যেকখানির নিম্নে সোনার জলে নাম লেখা —এম. এন. ঘোষ।

তখন সমস্ত ব্যাপার নলিনী দিনের আলোকের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। তাহার শ্বশুরের নাম মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। তবে ভ্রমক্রমে সে অন্য লোকেব শ্বশুরবাড়িতে চড়াও করিয়াছে।

নলিনী তখন মনে মনে হাস্য করিতে করিতে নিশ্চিন্তমনে একে একে জলখাবারের পাত্রগুলি খালি করিয়া ফেলিল।

॥ ৪ ॥

এদিকে রামশরণ ভৃত্য ঊর্ধ্বশ্বাসে বাবুকে খবর দিতে ছুটিল। কেদারবাবু উকিলের বাসায়, ছুটির সময়, প্রায়ই পাশা খেলার আড্ডা জমিয়ে থাকে। অদ্য এখানে বড় মহেন্দ্রবাবু, ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর আসল শ্বশুর) এবং অন্যান্য অনেকগুলি উকিল সমবেত হইয়াছেন।

পাশা খেলা চলিতেছিল, এমন সময় ঝড়ের মত আসিয়া রামশরণ সেখানে প্রবেশ কবিল। নিজ প্রভুকে দেখিয়া বলিল, "বাবু—বাবু—জল্‌দি বাড়ি আসুন—"

তাহার মুখ চক্ষু দেখিয়া ভীত হইয়া মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন, "কেন রে—কারু অসুখ বিসুখ?"

"বাড়িমে একঠো ডাকু এসেছে।"

সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্র ঘোষ বলিলেন, "ডাকু? দিনের বেলায় ডাকু?"

রামশরণ বসিল, "ডাকু হোবে কি জুয়াচোর হোবে কি পাগল আদমি হোবে কিছু ঠিকানা নাই। সে বলে কি হামি বাবুর দামাদ আছি।"

ইহা শুনিয়া অন্য সকলে হাস্য করিলেন। কিন্তু মহেন্দ্র ঘোষ উত্তেজিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন এল? কি করছে?"

"এই তিন বাজে এসেছে। একঠো লাঠি এনেছে, একঠো বন্দুক এনেছে—অন্দরমে গিয়ে জল উল খেয়েছে। মাইজি লোগকো বড়া ডর হয়েছে।"

"বন্দুক এনেছে? লাঠি এনেছে?—হতভাগা পাজি শূয়ার—তুই বাড়ি ছেড়ে এলি কার জিম্মায়?" বলিয়া ক্ষিপ্তের মত মহেন্দ্রবাবু বাহির হইলেন। গাড়ি প্রস্তুত ছিল। লম্ফ দিয়া গাড়িতে উঠিয়া হাঁকিলেন, "জোরসে হাঁকাও।"

কয়েকজন উকিল সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়াছিলেন। কেহ বলিলেন—"বোধ হয়

পাগল হবে।" কেহ বলিলেন—"না, পাগল হলে বন্দুক আনবে কেন? কোনও বদমায়েস গুণ্ডা হবে।" ছোট মহেন্দ্রবাবু (নলিনীর শ্বশুর) বলিয়া দিলেন, "পাগলই হোক, গুণ্ডাই হোক, ধরে পুলিসে হ্যান্ডোভার করে দিও।"

গাড়ি নক্ষত্রবেগে ছুটিল—বাড়িতে পৌঁছিলে, গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কই? কোথায়?"

এমন সময় নলিনী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনিই মহেন্দ্রবাবু? আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমাপ্রার্থনা করবার আছে।"

নলিনীর ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তায় মহেন্দ্রবাবু একটু থতমত খাইয়া গেলেন। বাড়ি পৌঁছিয়াই যেরূপ প্রহারের বন্দোবস্ত করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি?"

"আমার নাম নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। আমি মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। মহেন্দ্রবাবু উকিলের বাড়ি গাড়োয়ানকে বলেছিলাম, সে আমাকে এখানে এনে ফেলেছে। আমি আমার ভুল এই অল্পক্ষণ মাত্র জানতে পেরেছি। এতক্ষণ চলে যেতাম। আপনাকে আনতে লোক গিয়েছে—আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তবে যাব, এইজন্যে অপেক্ষা করছি।"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ঘোষের রাগ জল হইয়া গেল। তিনি নলিনীর হাত দু'খানি নিজ হস্তে ধারণ করিয়া হো-হো শব্দে অনেকক্ষণ হাস্য করিলেন।

শেষে বলিলেন, 'মহিনের জামাই তুমি? বেশ বেশ। দেখ, এখানে দুজন মহেন্দ্রবাবু উকিল থাকাতে, মক্কেল নিয়ে মাঝে মাঝে গোলমাল হয় বটে। হয়ত মফস্বল থেকে কোনও উকিল, আমার কাছে এক মোকর্দমা পাঠিয়ে দিলে মক্কেল কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল তোমার শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু জামাই নিয়ে গোলমাল এই প্রথম!"—বলিয়া মহেন্দ্র ঘোষ অপরিমিত হাস্য করিতে লাগিলেন।

তাহার পর নলিনীকে লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। কিঞ্চিৎ গল্প-গুজবের পর, নলিনীর জন্যে একটি ভাড়াটিয়া গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনী তখন বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ শ্বশুরালয় অভিমুখে যাত্রা করিল।

॥ ৫ ॥

এদিকে কেদারবাবু উকিলের বাড়িতে, সে অপরাহ্নে পাশা খেলা আর ভাল জমিল না। মহেন্দ্র ঘোষ প্রস্থান করিলে, সে সভায় অনেকে অনেক আশ্চর্য জুয়াচুরির গল্প করিলেন। অনেক পাগলের গল্পও হইল। ক্রমে সভাভঙ্গ হইল। উকিলগণ একে একে নিজ আলয়ে ফিরিয়া গেলেন।

মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি শাগঞ্জ মহল্লায়। তিনি বাড়ি ফিরিয়া, চা ও তাওয়াদার তামাক হুকুম করিলেন। আপিস কক্ষে ইজিচেয়ারে বসিয়া, চা-পান করিতে লাগিলেন। ভৃত্য একটি বৃহদাকার ছিলিম আলবোলায় চড়াইয়া, গুলের আগুনে মৃদু মৃদু পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

চা-পান শেষ হইলে, মহেন্দ্রবাবু আলবোলার নলটি মুখে করিয়া আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে পর, একটি ভাড়াটিয়া গাড়ি কম্পাউন্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। উকিলের বাড়ি, কত লোকে আসে যায়, মহেন্দ্রবাবু কিছুই ব্যস্ত হইলেন না, কিন্তু চক্ষু উন্মীলন করিয়া বহিলেন।

বাহির হইতে শব্দ শুনিলেন, একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলিতেছে, "এই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি?"

"হাঁ বাবু!"

"খবর দাও, বল বাবুর জামাই এসেছেন।"

এই 'জামাই' শুনিযাই মহেন্দ্রবাবু কেদাবা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। জানালার পর্দা তুলিয়া দেখিলেন—বৃহৎ যষ্টিহস্তে ষণ্ডামার্কা আকারের একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ান গাড়ির ভিতব হইতে একটা বন্দুকের বাক্স বাহির করিতেছে।

দেখিযাই মহেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন, "কোই হ্যায় রে?"—বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন।

তাঁহার মূর্তি দেখিয়া বেচারা নলিনী একটু থতমত খাইযা গেল। মহেন্দ্রবাবু দাঁতমুখ খিঁচাইয়া সপ্তমে বলিলেন, "পাজি বেটা জুয়াচোর—ভাগো হিঁয়াসে। আভি ভাগো। ঘুরে ফিরে শেষে আমার বাড়িতে এসেছ? শ্বশুর পাতাবার আব লোক পেলে না? বেটা বদ্‌মায়েস গুণ্ডা!"

ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভৃত্য দারোয়ান আসিয়া পড়িয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু হুকুম দিলেন, "মারকে নিকাল দেও। গর্দান পাকড়কে নিকাল দেও।"

ভৃত্যগণ নলিনীকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল। তাহা দেখিয়া নলিনী তাহার বৃহৎ যষ্টি মস্তকোপরি ঘূর্ণিত করিয়া বলিল, "খবরদার! হাম্ চলা যাতা হ্যায়। লেকেন্ যো হাম্‌কো ছুঁয়েগা, উস্‌কা হাড্ডি হাম্ চুরচুর কর্ ডালেঙ্গে।"

নলিনীব মূর্তি ও লাঠি দেখিয়া ভৃত্যগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল।

নলিনী মহেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনি ভুল করছেন। আমি আপনার জামাই নলিনী।"

এ কথা শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন, "বেটা জুয়াচোর! তুমি শ্বশুর চেন আব আমি জামাই চিনিনে? আমার জামাইয়ের এ রকম গুণ্ডার মত চেহারা?—ভাগো হিঁয়াসে—নিকালো হিঁয়াসে—নয়ত আভি পুলিশমে ভেজেঙ্গে—"

নলিনী আর দ্বিরুক্তি করিল না। গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "চলো স্টেশন।"

॥ ৬ ॥

গোলমাল থামিলে, তাওয়াদার তামাকটা শেষ করিয়া মহেন্দ্রবাবু বাড়ির মধ্যে গেলেন।

তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "মদ খেয়েছ নাকি? জামাইকে তাড়ালে?"

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "জামাই কাকে বল? সে একটা জুয়াচোর!"

"জুয়াচোর কিসে জানলে?"

তখন মহেন্দ্রবাবু, পাশা খেলিবার কালে কেদারবাবুর বাসায় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সবই বলিলেন।

শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন, "বেশ ত, কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল যে সে জুয়াচোর? দুজনেরই এক নাম—বাড়ি ভুল করে সেখানে গিয়ে ওঠাই কি আশ্চর্য নয়?"

স্ত্রীর মুখে এ যুক্তি শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু একটু দমিয়া গেলেন। লাঠি ও বন্দুক দেখিয়াই হঠাৎ তিনি বুদ্ধিহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন—এ সকল কথায় ভাল রূপ বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

একটু ভাবিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "সে যদি হত—তাহলে খবর দিয়ে আসত—আমরা স্টেশনে তাকে আনতে যেতাম। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কখনো জামাই প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি এসে উপস্থিত হয়? সে জুয়াচোর—জুয়াচোব!"

"কেন আসবার কথা থাকবে না? আসবার কথা ত রয়েছে। পুজোর আগেই আসবে আমরা ত জানি—তবে ঠিক কবে আসবে তা খবর ছিল না বটে।"

পিতার এই বিপদ দেখিয়া, কুঞ্জবালা বলিলেন, "ওগো সে নলিনী নয়—আমি তাকে দেখেছি।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তুই দেখেছিস নাকি? বল্ ত!—বল্ ত! কোথা থেকে দেখলি?"

"যখন ওই গোলমালটা হল, আমি দোতলায় উঠে জানালা দিয়ে দেখলাম। নলিনী আমাদেব ননীব পুতুল। এ ত দেখলাম একটা কাটখোট্টা জোয়ান।"

মহেন্দ্রবাবু অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছিস। আমি ত সে কথা তার মুখের উপবেই বলে দিয়েছি। আমি আমার জামাই চিনিনে? তার কি অমন মিরজাপুরী গুণ্ডার মত চেহারা? তার দিব্যি নধর বাবু-বাবু চেহারাটি। বিয়ের সময় একদিন মাত্র দেখেছি বটে—তা ব'লে এমনিই কি ভুল হয়?"

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "বাবু, টেলিগেরাপ এসেছে।"

টেলিগ্রাম পড়িয়া মহেন্দ্রবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইহা সেই নলিনীর প্রেরিত গতকল্যকার চারি আনা মূল্যের টেলিগ্রাম।

গৃহিণী বলিলেন, "খবর কী?"

নিতান্ত অপরাধীর মত, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এই ত টেলিগ্রাম এসেছে। সে তবে দেখছি জামাই-ই বটে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তবে এখন ফেরাবার কী উপায় হয়?"

"যাই, নিজে গিয়ে দেখি। যাবার সময় গাড়োয়ানকে বলেছিল, 'স্টেশনে চল'। এখন ত কলকাতা যাবার কোনও গাড়ি নেই। বোধ হয় স্টেশনে গিয়ে বসে আছে। যাই, গিয়ে বাপু বাছা বলে ফিরিয়ে আনি।"

বাড়ির লোকে মনে করিয়াছিল, নলিনী এই ব্যাপার লইয়া শালীশালাজকে ঠাট্টা করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইবে। কিন্তু নলিনী ফিরিয়া আসিয়া একদিনের জন্যও সে কথা উত্থাপন করে নাই। যে ভুল হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য তাহার শ্বশুরবাড়ির সকলেই লজ্জিত, অনুতপ্ত—তাহাই নলিনীর পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। একদিন কেবল অন্য প্রসঙ্গে মহেন্দ্র ঘোষ উকিলের কথা উঠিলে সে বলিয়াছিল—"যা হোক, পরের শ্বশুরবাড়িতে উঠে যে আদর যত্ন পেয়েছিলাম—অনেকে সে রকম নিজের শ্বশুরবাড়িতে পায় না।"

লালু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



ছেলেবেলায় আমার এক বন্ধু ছিল তাব নাম লালু। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে—অর্থাৎ, সে এতকাল পূর্বে যে, তোমরা ঠিকমত ধারণা করতে পারবে না—আমরা একটি ছোট বাঙলা ইস্কুলের এক ক্লাসে পড়তাম। আমাদের বয়স তখন দশ-এগারো। মানুষকে ভয় দেখাবার, জব্দ করবার কত কৌশলই যে তার মাথায় ছিল তার ঠিকানা নেই। ওব মাকে রবারেব সাপ দেখিয়ে একবার এমন বিপদে ফেলেছিল যে, তিনি পা মচ্‌কে প্রায় সাত-আটদিন খুঁড়িয়ে চলতেন। তিনি রাগ করে বললেন—ওর একজন মাস্টার ঠিক করে দিতে। সন্ধ্যেবেলায় এসে পড়াতে বসবেন, ও আর উপদ্রব করবার সময় পাবে না।

শুনে লালুর বাবা বললেন, না। তাঁর নিজেব কখনও মাস্টার ছিল না, নিজের চেষ্টায় অনেক দুঃখ সয়ে লেখাপড়া করে এখন তিনি একজন বড় উকিল। ইচ্ছে ছিল, ছেলেও যেন তেমনি করেই বিদ্যা লাভ করে। কিন্তু শর্ত হল এই যে, যে-বার লালু ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম না হতে পারবে তখন থেকে থাকবে ওঁর বাড়িতে পড়ানোর টিউটার। সে যাত্রা লালু পরিত্রাণ পেলে, কিন্তু মনে মনে রইল ও মা'র 'পরে চটে। কারণ, উনি তার ঘাড়ে মাস্টার চাপানোর চেষ্টায় ছিলেন। সে জানত বাড়িতে মাস্টার ডেকে আনা আর পুলিশ ডেকে আনা সমান।

লালুর বাপ ধনী গৃহস্থ। বছর কয়েক হল পুরানো বাড়ি ভেঙে তেতলা বাড়ি করেছেন; সেই অবধি লালুর মায়ের আশা গুরুদেবকে এ-বাড়িতে এনে তাঁর পায়ের ধুলো নেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, ফরিদপুর থেকে এতদূর আসতে রাজী হন না, কিন্তু এইবার সেই সুযোগ ঘটেছে। স্মৃতিরত্ন সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশী এসেছেন, সেখান থেকে লিখে পাঠিয়েছেন—ফেরবার পথে নন্দরানীকে আশীর্বাদ করে যাবেন। লালুর মা'র আনন্দ ধরে না—উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত—এতদিনে মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, গুরুদেবের পায়ের ধুলো পড়বে।

বাড়িটা পবিত্র হয়ে যাবে।

নীচের বড় ঘরটা থেকে আসবাবপত্র সরানো হল, নতুন ফিতের খাট, নতুন শয্যা তৈরী হয়ে এল,—গুরুদেব শোবেন। এই ঘরেরই এক কোণে তাঁর পুজো-আহ্নিকের জায়গা হল, কারণ তেতলার ঠাকুরঘরে উঠতে নামতে তাঁর কষ্ট হবে।

দিন-কয়েক পরে গুরুদেব এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কি দুর্যোগ! আকাশ ছেয়ে কালো মেঘের ঘটা, যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি—তার আর বিরাম নেই।

এদিকে মিষ্টান্নাদি তৈরি করতে, ফল-ফুল সাজাতে লালুর মা নিঃশ্বাস নেবার সময় পান না। তারই মধ্যে স্বহস্তে ঝেড়েঝুড়ে মশারি গুঁজে দিয়ে বিছানা করে গেলেন। নানা কথাবার্তায় রাত হয়ে গেল, পথশ্রমে ক্লান্ত গুরুদেব আহারাদি সেরে শয্যা গ্রহণ করলেন। চাকর-বাকর ছুটি পেলে। সুকোমল শয্যার পারিপাট্যে প্রসন্ন গুরুদেব মনে মনে নন্দরানীকে আশীর্বাদ করলেন।

কিন্তু গভীর রাতে অকস্মাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ছাদ চুঁইয়ে মশারি ফুঁড়ে তাঁর সুপরিপুষ্ট পেটের উপর জল পড়চে।—উঃ, কি ঠাণ্ডা সে জল! শশব্যস্তে বিছানার বাইরে এসে পেটটা মুছে ফেললেন, বললেন, নতুন বাড়ি করলে নন্দরানী, কিন্তু পশ্চিমের কড়া রোদে ছাতটা এব মধ্যেই ফেটেচে দেখচি। ফিতের খাট, ভারী নয়, মশারি-সুদ্ধ সেটা ঘরের আর একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আধ মিনিটের বেশী নয়, চোখ দুটি সবে বুজেছেন, অমনি দু-চার ফোঁটা তেমনি ঠাণ্ডা জল টপটপ টপটপ করে পেটের ঠিক সেই স্থানটিব উপরেই ঝরে পড়ল। স্মৃতিরত্ন আবার উঠলেন, আবার খাট টেনে অন্যধারে নিয়ে গেলেন, বললেন, ইঃ— ছাতটা দেখচি এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত ফেটে গেছে। আবাব শুলেন, আবার পেটের উপর জল ঝরে পড়ল। আবার উঠে পেটের জল মুছে খাটটা টেনে নিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু শোবামাত্রই তেমনি জলের ফোঁটা। আবার টেনে নিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু সেখানেও তেমনি। এবার দেখলেন বিছানাটাও ভিজেছে, শোবার জো নেই। স্মৃতিরত্ন বিপদে পড়লেন। বুড়ো-মানুষ; অজানা জায়গায় দোর খুলে বাইরে যেতেও ভয় করে, আবার থাকাও বিপজ্জনক। কি জানি ফাটা ছাত ভেঙে হঠাৎ মাথায় যদি পড়ে! ভয়ে ভয়ে দোর খুলে বারান্দায় এলেন, সেখানে লণ্ঠন একটা জ্বলচে বটে, কিন্তু কেউ কোথাও নেই—ঘোর অন্ধকার।

যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড়ো হাওয়া! দাঁড়াবার জো কি!.কোথায় চাকর-বাকর, কোন্ ঘরে শোয় তারা—কিছুই জানেন না তিনি। চেঁচিয়ে ডাকলেন, কিন্তু কারও সাড়া মিলল না। একধাবে একটা বেঞ্চি ছিল, লালুর বাবার গরিব মক্কেল যারা, তারাই এসে বসে। গুরুদেব অগত্যা তাতেই বসলেন। আত্মমর্যাদার যথেষ্ট লাঘব হল; অন্তরে অনুভব করলেন, কিন্তু উপায় কি! উত্তুরে বাতাসে বৃষ্টির ছাঁটের আমেজ রয়েছে—শীতে গা শিরশির করে—কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, পা দুটি যথাসম্ভব উপরে তুলে, যথাসম্ভব আরাম পাবার আয়োজন করে নিলেন। নানাবিধ শ্রান্তি ও দুর্বিপাকে দেহ অবশ, মন তিক্ত, ঘুমে চোখের পাতা ভারাতুব, অনভ্যস্ত গুরু-ভোজন ও রাত্রি-জাগরণে দু-একটা অম্ল উদ্গারের আভাস দিলে—উদ্বেগের অবধি রইল না! হঠাৎ এমনি সময় অভাবনীয় নতুন উপদ্রব। পশ্চিমের বড় বড় মশা দুই কানের পাশে এসে গান জুড়ে দিলে। চোখের পাতা প্রথমে সাড়া দিতে চায় না, কিন্তু মন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল—কি জানি এরা সংখ্যায় কত। মাত্র মিনিট-দুই—অনিশ্চিত নিশ্চিত হল; গুরুদেব বুঝলেন সংখ্যায় এরা

অগণিত। সে বাহিনীকে উপেক্ষা করে বিশ্বে এমন বীরপুরুষ কেউ নেই। যেমন তার জ্বলুনি তেমনি তার চুলকুনি। স্মৃতিরত্ন দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন, কিন্তু তারা সঙ্গ নিলে। ঘরের মধ্যে জলের জন্য যেমন, ঘরের বাইরে মশার জন্য তেমন। হাত-পায়ের নিরন্তর আক্ষেপে, গামছার সঘন সঞ্চালনে কিছুতেই তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায় না। স্মৃতিরত্ন এ-পাশ থেকে ও-পাশে ছুটে বেড়াতে লাগলেন, শীতের মধ্যেও তাঁর গায়ে ঘাম দেখা দিলে। ইচ্ছে হল ডাক ছেড়ে চেঁচান, কিন্তু নিতান্ত বালকোচিত হবে ভেবে বিরত রইলেন। কল্পনায় দেখলেন নন্দরানী সুকোমল শয্যায় মশারির মধ্যে আরামে নিদ্রিত, বাড়ির যে যেখানে আছে পরম নিশ্চিন্তে সুপ্ত—শুধু তাঁর ছুটোছুটিরই বিরাম নেই। কোথাকার ঘড়িতে চারটে বাজলো, বললেন, কামড়া ব্যাটারা যত পারিস, কামড়া,—আমি আর পারিনে।—বলেই বারান্দার একটা কোণে পিঠের দিকটা যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, সকাল পর্যন্ত যদি প্রাণটা থাকে ত এ দুর্ভাগা দেশে আর না। যে গাড়ি প্রথমে পাব সেই গাড়িতে দেশে পালাব। কেন যে এখানে আসতে মন চাইত না তার হেতু বোঝা গেল। দেখতে দেখতে সর্বসন্তাপহর নিদ্রায় তাঁর সারারাত্রির সকল দুঃখ মুছে দিলে,—স্মৃতিরত্ন অচেতনপ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে নন্দরানী ভোর না হতেই উঠেছেন,—গুরুদেবের পরিচর্যায় লাগতে হবে। রাত্রে গুরুদেব জলযোগ মাত্র করেছেন—যদিচ তা গুরুতর—তবু মনের মধ্যে ক্ষোভ ছিল, খাওয়া তেমন ভাল হয় নাই। আজ দিনের বেলা নানা উপচারে তা ভরিয়ে তুলতে হবে।

নীচে নেমে এলেন, দেখেন দোর খোলা। গুরুদেব তাঁর আগে উঠেছেন ভেবে একটু লজ্জা বোধ হল। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখেন তিনি নেই, কিন্তু এ কি ব্যাপার! দক্ষিণ দিকের খাট উত্তর দিকে, তাঁর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা জানালা ছেড়ে মাঝখানে নেমেচে, কোষাকুষি আসন প্রভৃতি পূজাআহ্নিকের জিনিসপত্রগুলো সব এলোমেলো স্থানভ্রষ্ট,—কারণ কিছুই বুঝলেন না। বাইরে এসে চাকরদের ডাকলেন, তারা কেউ তখনও ওঠেনি। তবে একলা গুরুদেব গেলেন কোথায়? হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল—ওটা কি? এক কোণে আলো-অন্ধকারে মানুষের মত কি একটা বসে না! সাহসে ভর করে একটু কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখেন তাঁর গুরুদেব। অব্যক্ত আশঙ্কায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ঠাকুরমশাই! ঠাকুরমশাই!

ঘুম ভেঙে স্মৃতিরত্ন চোখ মেলে চাইলেন, তার পরে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন। নন্দরানী ভয়ে, ভাবনায়, লজ্জায় কেঁদে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরমশাই, আপনি এখানে কেন?

স্মৃতিরত্ন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সারা রাত দুঃখের আর পার ছিল না যে মা!

কেন বাবা?

নতুন বাড়ি করেচ বটে মা, কিন্তু ছাত কোথাও আর আস্ত নেই। সারা রাতের বৃষ্টিবাদল বাইরে ত পড়েনি, পড়েচে আমার গায়ের উপর। খাট টেনে যেখানে নিয়ে যাই সেখানেই পড়ে জল। পাছে ছাত ভেঙে মাথায় পড়ে, পালিয়ে এলাম বাইরে, কিন্তু তাতেই কি রক্ষে আছে মা, পঙ্গপালের মত ডাঁশ-মশা ঝাঁকে ঝাঁকে সমস্ত রাত্রি যেন ছুবলে খেয়েছে,—এধার থেকে ছুটে ওধার যাই, আবার ওধার থেকে ছুটে এধারে আসি। গায়ের অর্ধেক রক্ত বোধ করি আর নেই মা।

বহু প্রয়াস, বহু সাধ্য-সাধনায় ঘরে আনা বৃদ্ধ গুরুদেবের অবস্থা দেখে নন্দরানীর দু'চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠল, বললেন, কিন্তু বাবা, বাড়িটা যে তেতলা, আপনার ঘরের উপর আরও যে দুটো ঘর আছে, বৃষ্টির জল তিন-তিনটে ছাদ ফুঁড়ে নামবে কি করে? কিন্তু বলতে বলতেই তাঁর সহসা মনে হল এ হয়ত ঐ শয়তান লালুর কোনরকম শয়তানি বুদ্ধি। ছুটে গিয়ে বিছানা হাতড়ে দেখেন মাঝখানে চাদর অনেকখানি ভিজে এবং মশারি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে দেখতে পেলেন ন্যাকড়ায় বাঁধা এক চাঙড় বরফ, সবটা গলেনি, তখনও এক টুকরো বাকি আছে। পাগলের মত ছুটে বাহিরে গিয়ে চাকরদের যাকে সুমুখে পেলেন চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন,—হারামজাদা লেলো কোথায়? কাজকর্ম চুলোয় যাক গে, বজ্জাতটাকে যেখানে পাবি মারতে মারতে ধরে আন্।

লালুর বাবা সেইমাত্র নীচে নামছিলেন, স্ত্রীর কাণ্ড দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন,—কি কাণ্ড করচ? হল কি?

নন্দরানী কেঁদে ফেলে বললেন, হয় তোমার ঐ লেলোকে বাড়ি থেকে তাড়াও, না হয় আজই আমি গঙ্গায় ডুবে এ-মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করব।

কি করলে সে?

বিনা দোষে গুরুদেবের দশা কি করেছে চোখে দেখোসে। তখন সবাই গেলেন ঘরে। নন্দরানী সব বললেন, সব দেখালেন। স্বামীকে বললেন, এ দস্যি ছেলেকে নিয়ে ঘর করব কি করে তুমি বল?

গুরুদেব ব্যাপারটা সমস্ত বুঝলেন। নিজের নির্বুদ্ধিতায় বৃদ্ধ হাঃ হাঃ করে হেসে ফেললেন।

লালুর বাবা আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চাকররা এসে বললে, লালুবাবু কোঠি মে নহি হ্যায়। আর একজন এসে জানালে সে মাসীমার বাড়িতে বসে খাবার খাচ্ছে। মাসীমা তাকে আসতে দিলেন না।

মাসীমা মানে নন্দর ছোট বোন। তার স্বামীও উকিল, সে অন্য পাড়ায় থাকে।

এর পরে লালু দিন-পনেরো আর এ বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দিলে না।

চিকিৎসা-সঙ্কট

পরশুরাম



সন্ধ্যা হব হব। নন্দবাবু হগ সাহেবের বাজার হইতে ট্রামে বাড়ি ফিরিতেছেন। বীডন স্ট্রীট পার হইয়া গাড়ি আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। সম্মুখে গরুর গাড়ি। আর একটু গেলেই নন্দবাবুর বাড়ির মোড়। এমন সময় দেখিলেন পাশের একটি গলি হইতে তাঁর বন্ধু বঙ্কু বাহির হইতেছেন। নন্দবাবু উৎফুল্ল হইয়া ডাকিলেন—'দাঁড়াও হে বঙ্কু, আমি নাবছি।' নন্দর দু-বগলে দুই বাণ্ডিল, ব্যস্ত হইয়া চলন্ত গাড়ি হইতে যেমন নামিবেন অমনি কোঁচায় পা বাধিয়া নীচে পড়িয়া গেলেন।

গাড়িতে একটা শোরগোল উঠিল এবং ঘ্যাচাং করিয়া গাড়ি থামিল। জনকতক যাত্রী নামিয়া নন্দকে ধরিয়া তুলিলেন। যাঁরা গাড়ির মধ্যে ছিলেন তাঁরা গলা বাড়াইয়া নানাপ্রকারের সমবেদনা জানাইতে লাগিলেন।—'আহা হা বড্ড লেগেছে—থোড়া গরম দুধ পিলা দোও—দুটো পা-ই কি কাটা গেছে?' একজন সিদ্ধান্ত করিল মৃগি। আর একজন বলিল ভির্মি। কেউ বলিল মাতাল, কেউ বলিল বাঙাল, কেউ বলিল পাড়াগেঁয়ে ভূত।

বাস্তবিক নন্দবাবুর মোটেই আঘাত লাগে নাই। কিন্তু কে তা শোনে। 'লাগে নি কি মশায়, খুব লেগেছে—দু-মাসের ধাক্কা—বাড়ি গিয়ে টের পাবেন।' নন্দ বার বার করজোড়ে নিবেদন করিলেন যে প্রকৃতই কিছুমাত্র চোট লাগে নাই। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন—'আরে মোলো, ভাল করলে মন্দ হয়। পষ্ট দেখলুম লেগেছে তবু বলে লাগে নি।'

এমন সময় বঙ্কুবাবু আসিয়া পড়ায় নন্দবাবু পরিত্রাণ পাইলেন, মনঃক্ষুণ্ণ যাত্রিগণসহ ট্রাম গাড়িও ছাড়িয়া গেল।

বঙ্কু বলিলেন—'মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল আর কি। যা হোক. বাড়ির পথটুকু আর হেঁটে গিয়ে কাজ নেই। এই রিক্‌শ—'

রিক্‌শ নন্দবাবুকে আস্তে আস্তে লইয়া গেল, বঙ্কু পিছনে হাঁটিয়া চলিলেন।

নন্দবাবুর বয়স চল্লিশ, শ্যামবর্ণ, বেঁটে গোলগাল চেহারা। তাঁহার পিতা পশ্চিমে কমিসারিয়টে চাকরি করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে একমাত্র

সন্তান নন্দর জন্য কলিকাতায় একটি বড় বাড়ি, বিস্তর আসবাব এবং মস্ত একগোছা কোম্পানির কাগজ রাখিয়া যান। নন্দর বিবাহ অল্পবয়সেই হইয়াছিল, কিন্তু এক বৎসর পরেই তিনি বিপত্নীক হন এবং তারপর আর বিবাহ করেন নাই। মাতা বহুদিন মৃতা, বাড়িতে একমাত্র স্ত্রীলোক এক বৃদ্ধা পিসী। তিনি ঠাকুরসেবা লইয়া বিব্রত, সংসারের কাজ ঝি চাকররাই দেখে। নন্দবাবুর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা হইয়া ওঠে নাই। প্রধান কারণ— আলস্য। থিয়েটার, সিনেমা, ফুটবল ম্যাচ, রেস এবং বন্ধুবর্গের সংসর্গ—ইহাতে নির্বিবাদে দিন কাটিয়া যায়, বিবাহের ফুরসত কোথা? তার পর ক্রমেই বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, আর এখন না করাই ভাল। মোটের উপর নন্দ নিরীহ গোবেচারা অল্পভাষী উদ্যমহীন আরামপ্রিয় লোক।

নন্দবাবুর বাড়ির নীচে সুবৃহৎ ঘরে সান্ধ্য আড্ডা বসিয়াছে। নন্দ আজ কিছু ক্লান্ত বোধ করিতেছেন, সেজন্য বালাপোশ গায়ে দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন। বন্ধুগণের চা ও পাঁপরভাজা শেষ হইয়াছে, এখন পান সিগারেট ও গল্প চলিতেছে।

গুপীবাবু বলিতেছিলেন—'উঁহু। শরীরের ওপর এত অযত্ন করো না নন্দ। এই শীতকালে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া ভাল লক্ষণ নয়।'

নন্দ। মাথা ঠিক ঘোরে নি, কেবল কোঁচার কাপড় বেধে—

গুপী। আরে, না না। ঘুরেছিল বই কি। শরীরটা কাহিল হয়েছে। এই তো কাছাকাছি ডাক্তার তফাদার রয়েছেন। অত বড় ফিজিশিয়ান আর শহরে পাবে কোথা? যাও না কাল সকালে একবার তাঁর কাছে।

বঙ্কু বলিলেন—'আমার মতে একবার নেপালবাবুকে দেখালেই ভাল হয়। অমন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথ আর দুটি নেই। মেজাজটা একটু তিরিক্ষি বটে, কিন্তু বুড়োর বিদ্যে অসাধারণ।'

ষষ্ঠীবাবু মুড়িশুড়ি দিয়া এক কোণে বসিয়াছিলেন। তাঁর মাথায় বালাক্লাভা টুপি, গলায় দাড়ি এবং তার উপর কম্ফর্টার। বলিলেন—'বাপ, এত শীতে অবেলায় কখনও ট্রামে চড়ে? শরীর অসাড় হলে আছাড় খেতেই হবে। নন্দর শরীর একটু গরম রাখা দরকার।'

নিধু বলিল—'নন্-দা, মোটা চাল ছাড়। সেই এক বিরিঞ্চির আমলের ফরাস তাকিয়া, লক্কড় পালকি গাড়ি আর পক্ষিরাজ ঘোড়া, এতে গায়ে গত্তি লাগবে কিসে? তোমার পয়হার অভাব কি বাওআ? একটু ফুর্তি করতে শেখ।'

সাব্যস্ত হইল কাল সকালে নন্দবাবু ডাক্তার তফাদারের বাড়ি যাইবেন।

ডাক্তার তফাদার M.D., M.R.A.S. গ্রে স্ট্রীটে থাকেন। প্রকাণ্ড বাড়ি, দু-খানা মোটর, একটা ল্যান্ড। খুব পসার, রোগীরা ডাকিয়া সহজে পায় না। দেড় ঘণ্টা পাশের কামরায় অপেক্ষা করার পর নন্দবাবুর ডাক পড়িল। ডাক্তারসাহেবের ঘরে গিয়া দেখিলেন এখনও একটি রোগীর পরীক্ষা চলিতেছে। একজন স্থূলকায় মারোয়াড়ী নগ্নগাত্রে দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার ফিতা দিয়া তাহার ভুঁড়ির পরিধি মাপিয়া বলিলেন—'বস্, সওয়া ইঞ্চি বঢ় গিয়া।' রোগী খুশী হইয়া বলিল—'নবজ্, তো দেখিয়ে।' ডাক্তার রোগীর মণিবন্ধে নাড়ীর উপর একটি মোটর-কারের স্পার্কিং প্লাগ ঠেকাইয়া বলিলেন—'বহুত মজেসে চল্ রহা।' রোগী বলিল—'জবান তো দেখিয়ে।' রোগী হাঁ করিল, ডাক্তার ঘরের অপর দিকে দাঁড়াইয়া অপেরা গ্লাস দ্বারা তাহার জিব দেখিয়া বলিলেন,— 'থোড়েসি কসর হ্যায়। কল্ ফিন আনা।'

রোগী চলিয়া গেলে তফাদার নন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'ওয়েল?'

নন্দ বলিলেন—'আজ্ঞে বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। কাল হঠাৎ ট্রাম থেকে—'

তফাদার। কম্পাউন্ড ফ্রাক্‌চার? হাড় ভেঙেছে?

নন্দবাবু আনুপূর্বিক তাঁর অবস্থার বর্ণনা করিলেন। বেদনা নাই, জ্বর হয় না, পেটের অসুখ, সর্দি, হাঁপানি নাই. ক্ষুধা কাল হইতে একটু কমিয়াছে। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। মনে বড় আতঙ্ক।

ডাক্তার তাঁহার বুক পেট মাথা হাত পা নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'জিব দেখি।' নন্দবাবু জিভ বাহির করিলেন।

ডাক্তার ক্ষণকাল মুখ বাঁকাইয়া কলম ধরিলেন। প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ হইলে নন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'আপনি এখন জিব টেনে নিতে পারেন। এই ওষুধ রোজ তিনবার খাবেন।'

নন্দ। কি রকম বুঝলেন?

তফাদার। ভেরি ব্যাড।

নন্দ সভয়ে বলিলেন—'কি হয়েছে?'

তফাদার। আরও দিন কতক ওয়াচ না করলে ঠিক বলা যায় না। তবে সন্দেহ করছি cerebral tumour with strangulated ganglia। ট্রিফাইন করে মাথার খুলি ফুটো করে অস্ত্র কবতে হবে, আর ঘাড় চিরে নার্ভের জট ছাড়াতে হবে। শর্ট-সার্কিট হয়ে গেছে।

নন্দ। বাঁচব তো?

তফাদার। দমে যাবেন না, তা হলে সারাতে পারব না। সাত দিন পরে ফের আসবেন। মাই ফ্রেন্ড মেজর গোঁসাই-এর সঙ্গে একটা কন্‌সলটেশনের ব্যবস্থা করা যাবে। ভাত-ডাল বড় একটা খাবেন না। এগ-ফ্লিপ, বোনম্যারো সুপ, চিকেন-স্টু, এইসব। বিকেলে একটু বার্গন্ডি খেতে পারেন। বরফ-জল খুব খাবেন। হ্যাঁ, বত্রিশ টাকা। থ্যাঙ্ক ইউ।

নন্দবাবু কম্পিত পদে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা বঙ্কুবাবু বলিলেন—'আরে তখনি আমি বারণ করেছিলুম ওর কাছে যেয়ো না। ব্যাটা মেড়োর পেটে হাত বুলিয়ে খায়। এঃ, খুলির ওপর তুরপুন চালাবেন!'

ষষ্ঠীবাবু। আমাদের পাড়ার তারিণী কবিরাজকে দেখালে হয় না?

গুপীবাবু। না না, যদি বাস্তবিক নন্দর মাথার ভেতর ওলট-পালট হয়ে গিয়ে থাকে তবে হাতুড়ি বদ্দির কম্ম নয়। হোমিওপ্যাথিই ভাল।

নিধু। আমার কথা তো শুনবে না বাওআ। ডাক্তারি তোমার ধাতে না সয় তো একটু কোবরেজি করতে শেখ। দরওয়ানজী দিব্বি একলোটা বানিয়েছে। বল তো একটু চেয়ে আনি।

হোমিওপ্যাথিই স্থির হইল।

পরদিন খুব ভোরে নন্দবাবু নেপাল ডাক্তারের বাড়ি আসিলেন। রোগীর ভিড় এখনও আরম্ভ হয় নাই, অল্পক্ষণ পরেই তাঁর ডাক পড়িল। একটি প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেতে ফরাশ পাতা। চারিদিকে স্তূপাকারে বহি সাজানো। বহির দেওয়ালের মধ্যে গল্পবর্ণিত শেয়ালের মত বৃদ্ধ নেপালবাবু বসিয়া আছেন। মুখে গড়গড়ার নল, ঘরটি ধোঁয়ায় ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নেপাল ডাক্তার কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—'বসবার জায়গা আছে।' নন্দ বসিলেন।

নেপাল। শ্বাস উঠেছে?

নন্দ। আজ্ঞে?

নেপাল। রুগীর শেষ অবস্থা না হলে তো আমায় ডাকা হয় না, তাই জিজ্ঞেস করছি।

নন্দ সবিনয়ে জানাইলেন তিনিই রোগী।

নেপাল। অ্যালোপ্যাথ ডাকাত ব্যাটারা ছেড়ে দিলে যে বড়? তোমার হয়েছে কি?

নন্দবাবু তাঁহার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলেন।

নেপাল। তফাদার কি বলেছে?

নন্দ। বললেন আমার মাথায় টিউমার আছে।

নেপাল। তফাদারের মাথায় কি আছে জান? গোবর। আর টুপির ভেতর শিং জুতোর ভেতর খুর, পাত্‌লুনের ভেতর ল্যাজ। খিদে হয়?

নন্দ। দু-দিন থেকে একেবারে হয় না।

নেপাল। ঘুম হয়?

নন্দ। না।

নেপাল। মাথা ধরে?

নন্দ। কাল সন্ধ্যেবেলা ধরেছিল।

নেপাল। বাঁ দিক?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

নেপাল। না ডান দিক?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

নেপাল ধমক দিয়া বলিলেন—'ঠিক করে বল।'

নন্দ। আজ্ঞে ঠিক মধ্যিখানে।

নেপাল। পেট কামড়ায়?

নন্দ। সেদিন কামড়েছিল। নিধে কাবলী মটরভাজা এনেছিল তাই খেয়ে—

নেপাল। পেট কামড়ায় না মোচড় দেয় তাই বল।

নন্দ বিব্রত হইয়া বলিলেন—'হাঁচোড়-পাঁচোড় করে।'

ডাক্তার কয়েকটি মোটা-মোটা বহি দেখিলেন, তার পর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'হুঁ। একটা ওষুধ দিচ্ছি নিয়ে যাও। আগে শরীর থেকে আলোপ্যাথিক বিষ তাড়াতে হবে। পাঁচ বছর বয়সে আমায় খুনে ব্যাটারা দু-গ্রেন কুইনীন দিয়েছিল, এখনও বিকেলে মাথা টিপ টিপ করে। সাতদিন পরে ফের এসো। তখন আসল চিকিৎসা শুরু হবে।'

নন্দ। ব্যারামটা কি আন্দাজ করছেন?

ডাক্তার ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—'তা জেনে তোমার চারটে হাত বেরবে নাকি? যদি বলি তোমার পেটে ডিফারেনশ্যাল ক্যাল্‌কুলস হয়েছে, কিছু বুঝবে? ভাত খাবে না, দু-বেলা রুটি, মাছ-মাংস বারণ, শুধু মুগের ডালের জুষ, স্নান বন্ধ, গরম জল একটু খেতে পার, তামাক খাবে না, ধোঁয়া লাগলে ওষুধের গুণ নষ্ট হবে। ভাবছ আমার আলমারির ওষুধ নষ্ট হয়ে গেছে? সে ভয় নেই, আমার তামাকে সালফার-থার্টি মেশানো থাকে। ফী

কত তাও বলে দিতে হবে নাকি? দেখছ না দেওয়ালে লটকানো রয়েছে বত্রিশ টাকা? আর ওষুধের দাম চার টাকা।'

নন্দবাবু টাকা দিয়া বিদায় লইলেন।

নিধু বলিল—'কেন বাওআ কাঁচা পয়হা নষ্ট করছ? থাকলে পাঁচ রাত বক্সে বসে ঠিয়াটার দেখা চলত। ও নেপালবুড়ো মস্ত ঘুঘু, নন্‌-দাকে ভালমানুষ পেয়ে জেরা করে থ করে দিয়েছে। পড়ত আমার পাল্লায় বাছাধন, কত বড় হোমিওফাঁক দেকে নিতুম। এক চুমুকে তার আলমারি-সুদ্ধ ওষুধ সাব্‌ড়ে না দিতে পারি তো আমার নাক কেটে দিও।'

গুপী। আজ আপিসে শুনেছিলুম কে একজন বড় হাকিম ফরাক্কাবাদ থেকে এখানে এসেছে। খুব নামডাক, রাজা-মহারাজারা সব চিকিৎসা করাচ্ছে। একবার দেখালে হয় না?

ষষ্ঠী। এই শীতে হাকিমী ওষুধ? বাপ, শরবত খাইয়েই মারবে। তার চেয়ে তারিণী কোবরেজ ভাল।

অতঃপর কবিরাজী চিকিৎসাই সাব্যস্ত হইল।

পরদিন সকালে নন্দবাবু তারিণী কবিরাজের বাড়ি উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয়ের বয়স ষাট, ক্ষীণ শরীর, দাড়ি-গোঁফ কামানো। তেল মাখিয়া আটহাতী ধুতি পরিয়া একটি চেয়ারের উপর উবু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। এই অবস্থাতেই ইনি প্রত্যহ রোগী দেখেন। ঘরে একটি তক্তাপোশ, তাহার উপর তেলচিটে পাটি এবং কয়েকটি মলিন তাকিয়া। দেওয়ালের কোলে দুটি ঔষধের আলমারি।

নন্দবাবু নমস্কার করিয়া তক্তাপোশে বসিলে কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবুর কন্‌থে আসা হচ্চে?' নন্দবাবু নিজের নাম ও ঠিকানা বলিলেন।

তারিণী। রুগীর ব্যামোডা কি?

নন্দবাবু জানাইলেন তিনি রোগী এবং সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিলেন।

তারিণী। মাথার খুলি ছেঁদা করে দিয়েছে নাকি?

নন্দ। আজ্ঞে না, নেপালবাবু বললেন পাথুরি, তাই আর মাথায় অস্তর করাই নি।

তারিণী। নেপাল! সে আবার কেডা?

নন্দ। জানেন না? চোরবাগানের নেপালচন্দ্র রায় M.B.F.T.S.—মস্ত হোমিওপ্যাথ।

তারিণী। অঃ, ন্যাপলা, তাই কও। সেডা আবার ডাগদর হল কবে? বলি, পাড়ায় এমন বিচক্ষণ কোবরেজ থাকতি ছেলেছোকরার কাছে যাও কেন?

নন্দ। আজ্ঞে, বন্ধু-বান্ধবরা বললে ডাক্তারের মতটা আগে নেওয়া দরকার, যদিই অস্ত্র-চিকিৎসা করতে হয়।

তারিণী। যত্তিবাবু-রি চেন? খুলনের উকিল যত্তিবাবু?

নন্দ ঘাড় নাড়িলেন।

তারিণী। তাঁর মামার হয় উরুস্তম্ভ। সিভিল সার্জন পা কাটলে। তিন দিন অচৈতন্যি। জ্ঞান হলি পর কইলেন, আমার ঠ্যাং কই? ডাক তারিণী স্যানরে। দেলাম ঠুকে এক দলা চ্যবনপ্রাশ। তারপর কি হল কও দিকি?

নন্দ। আবার পা গজিয়েছে বুঝি?

'ওরে অ ক্যাব্লা, দেখ্ দেখ্ বিড়েলে সব্‌ডা ছাগলাদ্য ঘেত খেয়ে গেল'—বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় পাশের ঘরে ছুটিলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিয়া বলিলেন—'দ্যাও নাড়ীডা একবার দেখি। হঃ, যা ভাবছিলাম তাই। ভারী ব্যামো হয়েছিল কখনও?'

নন্দ। অনেক দিন আগে টাইফয়েড হয়েছিল।

তারিণী। ঠিক ঠাউরেছি। পাঁচ বছর আগে?

নন্দ। প্রায় সাড়ে সাত বছর হল।

তারিণী। একই কথা, পাচ দেরা সাবে সাত। প্রাতিক্কালে বোমি হয়?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। হয়, টেনতি পার না। নিদ্রা হয়?

নন্দ। ভাল হয় না।

তারিণী। হবেই না তো। উর্ধ্ব হয়েছে কি না। দাত কনকন করে?

নন্দ। আজ্ঞে না।

তারিণী। করে, টেনতি পাব না। যা হোক, তুমি চিন্তা কোরো নি বাবা। আবাম হয়ে যাবানে। আমি ওষুধ দিচ্চি।

কবিরাজ মহাশয় আলমারি হইতে একটি শিশি বাহির করিলেন, এবং তাহার মধ্যস্থিত বড়ির উদ্দেশ্যে বলিলেন— 'লাফাস নে, থাম্ থাম্। আমাব সব জীয়ন্ত ওষুধ, ডাক্‌লি ডাক শোনে। এই বড়ি সকাল-সন্ধ্যা একটা করি খাবা। আবার তিনদিন পরে আস্‌বা। বুজেচ?'—

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

তারিণী। ছাই বুজেচ। অনুপান দিতি হবে না? ট্যাবা লেবুর রস আর মধুর সাথি মাড়ি খাবা। ভাত খাবা না। ওলসিদ্ধ, কচুসিদ্ধ, এইসব খাবা। নুন ছোবা না। মাগুর মাছের ঝোল একটু চ্যানি দিয়ে রাঁধি খাতি পার। গরম জল ঠাণ্ডা করি খাবা।

নন্দ। ব্যারামটা কি?

তারিণী। যারে কয় উদুরি। উর্ধ্ব শ্লেষ্মাও কইতি পাব।

নন্দবাবু কবিরাজের দর্শনী ও ঔষধের মূল্য দিয়া বিমর্ষচিত্তে বিদায় লইলেন।

নিধু বলিল—'কি দাদা, বোক্‌রেজির সাধ মিট্‌ল?'

গুপী। নাঃ এ-সব বাজে চিকিৎসার কাজ নয়। কোথাও চেঞ্জে চল।

বঙ্কু। আমি বলি কি, নন্দ বে-থা করে ঘরে পরিবার আনুক। এ-রকম দামড়া হয়ে থাকা কিছু নয়।

নন্দ চিঁ চিঁ স্বরে বলিলেন—'আর পরিবার! কোন্ দিন আছি, কোন্ দিন নেই। এই বয়সে একটা কচি বউ এনে মিথ্যে জঞ্জাল জোটানো।'

নিধু বলিল—'নন্-দা, একটা মোটর কেন মাইরি। দু-দিন হাওয়া খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সেভেন সিটার হড্‌সন; ষেটের কোলে আমরা তো পাঁচজন আছি।'

ষষ্ঠী। তা যদি বললে, তবে আমার মতে মোটর-কারও যা, পরিবারও তা। ঘরে আনা সোজা; কিন্তু মেরামতী খরচ যোগাতে প্রাণান্ত। আজ টায়ার ফাট্‌ল কাল গিন্নীর অম্বল শূল, পরশু ব্যাটারি খারাপ, তরশু ছেলেটার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর। অমন কাজ কোরো না

নন্দ! জেরবার হবে। এই শীতকালে কোথা দু-দণ্ড লেপের মধ্যে ঘুমুব মশায়, তা নয়, সারারাত প্যান প্যান ট্যাঁ ট্যাঁ।

নিধু। ষষ্ঠী খুড়ো যে রকম হিসেবী লোক, একটি মোটা-সোটা রোঁ-ওলা ভাল্লুকের মেয়ে বে করলে ভাল করতেন। লেপ-কম্বলের খরচা বাঁচত!

গুপী। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। কাল সকালে নন্দ একবার হাকিম সাহেবের কাছে যাও। তার পর যা হয় করা যাবে।

নন্দবাবু অগত্যা রাজী হইলেন।

হাজিক-উল-মুল্‌ক্ বিন লোকমান নুরুল্লা গজন ফরুল্লা অল হকিম য়ুনানী লোয়ার চিৎপুর রোডে বাসা লইয়াছেন। নন্দবাবু তেতলায় উঠিলে একজন লুঙ্গিপরা ফেজ-ধারী লোক তাঁহাকে বলিল—'আসেন বাবুমশায়। আমি হাকিম সাহেবের মীরমুন্সী। কি বেমারি বোলেন, আমি লিখে হুজুরকে ইতালা ভেজিয়ে দিব।'

নন্দ। বেমারি কি সেটা জানতেই তো আসা বাপু।

মুন্সী। তব্ ভি কুছু তো বোলেন। না-তাক্‌তি, বুখার, পিল্লি, চেচক, ঘেঘ, বাওআসির, বাত-অন্ধি—

নন্দ। ও-সব কিছু বুঝলুম না বাপু। আমার প্রাণটা ধড়ফড় করছে।

মুন্সী। সো হি বোলেন। দিল তড়্‌পনা। মোহর এনেছেন?

নন্দ। মোহর?

মুন্সী। হাকিম সাহেব চাঁদি ছোন না। নজরানা দো মোহর। না থাকে আমি দিচ্ছি। পয়তালিশ টাকা, আব বাট্টা দো টাকা, আর রেশমী রুমাল দো টাকা। দরবারে যেয়ে আগে হুজুরকে বন্দগি জনাব বোলবেন, তার পর রুমালের ওপর মোহর রেখে সামনে ধরবেন।

মুন্সী নন্দবাবুকে তালিম দিয়া দরবারে লইয়া গেল। একটি বৃহৎ ঘরে গালিচা পাতা, একপার্শ্বে মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া হাকিম সাহেব ফরসিতে ধূমপান করিতেছেন। বয়স পঞ্চান্ন, বাবরী চুল, গোঁফ খুব ছোট করিয়া ছাঁটা। আবক্ষলম্বিত দাড়ির গোড়ার দিক সাদা, মধ্যে লাল, ডগায় নীল। পরিধানে সাটিনের চুড়িদার ইজার, কিংখাপের জোব্বা, জরির তাজ। সম্মুখে ধূপদানে মুসব্বর এবং রুমী মস্তগি জ্বলিতেছে, পাশে পিকদান, পানদান, আতরদান ইত্যাদি। চার-পাঁচজন পারিষদ হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া আছে এবং হাকিমের প্রতি কথায় 'কেরামত' বলিতেছে। ঘরের কোণে একজন ঝাঁকড়া-চুলো চাপ-দেড়ে লোক সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং এবং বিকট অঙ্গভঙ্গি করিতেছে।

নন্দবাবু অভিবাদন করিয়া মোহর নজর দিলেন। হাকিম ঈষৎ হাসিয়া আতরদান হইতে কিঞ্চিৎ তুলা লইয়া নন্দর কানে গুঁজিয়া দিলেন। মুন্সী বলিল—'আপনি বাংলায় বাতচিত বোলেন। হামি হুজুরকে সম্‌ঝিয়ে দিব।'

নন্দবাবুর ইতিবৃত্ত শেষ হইলে হাকিম ঋষভকণ্ঠে বলিলেন—'সর্ লাও!'

নন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। মুন্সী আশ্বাস দিয়া বলিল— 'ডরবেন না মশয়। জনাবকে আপনার শির দেখ্‌লান!'

নন্দর মাথা টিপিয়া হাকিম বলিলেন—'হড্ডি পিল্‌পিলায় গয়া।'

মুন্সী। শুনেছেন? মাথার হাড় বিলকুল নরম হয়ে গেছে।

হাকিম তিনরঙা দাড়িতে আঙুল চালাইয়া বলিলেন— 'সুর্মা সুর্খ্'।

একজন একটা লাল গুড়া নন্দর চোখের পল্লবে লাগাইয়া দিল। মুন্সী বুঝাইল—'আঁখ ঠাণ্ডা থাকবে, নিদ হোবে।' হাকিম আবার বলিলেন—'রোগন বব্বর।' মুন্সী হাঁকিল—'এ জী বাল্‌বর, অস্তুয়া লাও।'

নন্দবাবু—'হাঁ-হাঁ আরে তুম করো কি'—বলিতে বলিতে নাপিত চট্‌ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মতালুর উপর দু-ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ কামাইয়া দিল, আর একজন তাহার উপর একটা দুর্গন্ধ প্রলেপ লাগাইল। মুন্সী বলিল—'ঘবড়ান কেন মশয়, এ হচ্চে বব্বরী সিংগির মাথার ঘি। বহুত কিম্মত। মাথার হাড্ডি সকত হোবে।'

নন্দবাবু কিয়ংক্ষণ হতভম্ব অবস্থায় রহিলেন। তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া বেগে ঘর হইতে পলায়ন করিলেন। মুন্সী পিছনে ছুটিতে ছুটিতে বলিল—'হামারা দস্তুরি? নন্দ একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া তিন লাফে নীচে নামিয়া গাড়িতে উঠিয়া কোচমানকে বলিলেন—'হাঁকাও!'

সন্ধ্যাকালে বন্ধুগণ আসিয়া দেখিলেন বৈঠকখানার দরজা বন্ধ। চাকর বলিল, বাবুর বড় অসুখ, দেখা হইবে না। সকলে বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

সমস্ত রাত বিছানায় ছটফট করিয়া ভোর চারটার সময় নন্দবাবু ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর বন্ধুগণের পরামর্শ শুনিবেন না, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিবেন।

বেলা আটটার সময় নন্দ বাড়ি হইতে বাহির হইলেন এবং বড় রাস্তায় ট্যাক্সি ধরিয়া বলিলেন—'সিধা চলো।' সঙ্কল্প করিয়াছেন, মিটারে এক টাকা উঠিলেই ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িবেন, এবং কাছাকাছি যে চিকিৎসক পান তাহারই মতে চলিবেন—তা সে অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ, হাতুড়ে, অবধূত, মাদ্রাজী বা চাঁদসীর ডাক্তার যেই হউক।

বউবাজারে নামিয়া একটি গলিতে ঢুকিতেই সাইনবোর্ড নজরে পড়িল—'ডাক্তার মিস বি. মল্লিক।' নন্দবাবু 'মিস' শব্দটি লক্ষ্য করেন নাই, নতুবা হয়তো ইতস্তত করিতেন। একেবারে সোজা পরদা ঠেলিয়া একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

মিস বিপুলা মল্লিক তখন বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কাঁধের উপর সেফটি-পিন আঁটিতেছিলেন। নন্দকে দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—'কি চাই আপনার?'

নন্দবাবু প্রথমটা অপ্রস্তুত হইলেন, তার পর মরিয়া হইয়া ভাবিলেন—দূর হ'ক, না-হয় লেডি ডাক্তারের পরামর্শই নেব। বলিলেন—'বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।'

মিস মল্লিক। পেন আরম্ভ হয়েছে?

নন্দ। পেন তো কিছু টের পাচ্ছি না।

মিস। ফার্স্ট কনফাইনমেন্ট?

নন্দ। আজ্ঞে?

মিস। প্রথম পোয়াতী?

নন্দ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—'আমি নিজের চিকিৎসার জন্যই এসেছি।

মিস মল্লিক আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—'নিজের জন্যে? ব্যাপার কি?'

সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা শেষ হইলে মিস মল্লিক নন্দবাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু-চারটি প্রশ্ন করিয়া কহিলেন—'আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

নন্দ। শ্রীনন্দদুলাল মিত্র।

মিস। বাড়িতে কে আছেন?

নন্দ জানাইলেন তিনি বহুদিন বিপত্নীক, বাড়িতে এক বৃদ্ধা পিসী ছাড়া কেউ নাই।

মিস। কাজকর্ম কি করা হয়?

নন্দ। তা কিছু করি না। পৈতৃক সম্পত্তি আছে।

মিস। মোটর-কার আছে?

নন্দ। নেই তবে কেনবার ইচ্ছে আছে।

মিস মল্লিক আরও নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া কিছুক্ষণ ঠোঁটে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বামে দক্ষিণে ঘাড় নাড়িলেন।

নন্দ ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—'দোহাই আপনার, সত্যি করে বলুন আমার কি হয়েছে। টিউমার, না পাথুরি, না উদরী, না কালাজ্বর, না হাইড্রোফোবিয়া?'

মিস মল্লিক হাসিয়া বলিলেন,—'কেন আপনি ভাবছেন? ও-সব কিছুই হয় নি। আপনার শুধু একজন অভিভাবক দরকার।'

নন্দ অধিকতর কাতরকণ্ঠে বলিলেন—'তবে কি আমি পাগল হয়েছি?'

মিস মল্লিক মুখে রুমাল দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিলেন—'ও ডিয়ার ডিয়ার নো। পাগল হবেন কেন? আমি বলছিলুম, আপনার যত্ন নেবার জন্যে বাড়িতে উপযুক্ত লোক থাকা দরকার।'

নন্দ। কেন, পিসীমা তো আছেন।

মিস মল্লিক পুনরায় হাসিয়া বলিলেন— 'দি আইডিয়া! মাসীপিসীর কাজ নয়। যাক, আপাতত একটা ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে দেখবেন। বেশ মিষ্টি, এলাচের গন্ধ। এক হপ্তা পরে আবার আসবেন।

... .

নন্দবাবু সাত দিন পরে পুনরায় মিস বিপুলা মল্লিকের কাছে গেলেন। তার পর দু-দিন পরে আবার গেলেন। তার পর প্রত্যহ।

তার পর একদিন নন্দবাবু পিসীমাতাকে ৺কাশীধামে রওনা করাইয়া দিয়া মস্ত বাজার করিলেন। এক ঝুড়ি গল্‌দা চিংড়ি, এক ঝুড়ি মটন, তদনুযায়ী ঘি, ময়দা, দই, সন্দেশ ইত্যাদি। বন্ধুবর্গ খুব খাইলেন। নন্দবাবু জরিপাড় সূক্ষ্ম ধুতির উপর সিল্কের পাঞ্জাবি পরিয়া সলজ্জ সস্মিতমুখে সকলকে আপ্যায়িত করিলেন।

মিসেস বিপুলা মিত্র এখন আর স্বামী ভিন্ন অপর রোগীর চিকিৎসা করেন না। তবে নন্দবাবু ভালই আছেন। মোটর-কার কেনা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সান্ধ্য আড্ডাটি ভাঙিয়া গিয়াছে।

বিজয়োৎসবে দৈন্য-বিজয়ী সৈন্য

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

এক রাজার প্রাসাদের অতি নিকটে রামদয়াল মণ্ডল নামক দরিদ্রের উলুখড়ের বসত বাড়ি। রামদয়াল দিন মজুরের কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। বৃদ্ধা মাতা, পত্নী, একটি পুত্র ও এক মাতৃপিতৃহীন ভাগিনেয় এ চারিটি মহাপ্রাণীর উদরান্ন ও লজ্জা নিবারণের বস্ত্র বামদয়ালের খাটুনিব মজুরীর উপর নির্ভর করে। রামদয়াল যার মজুর খাটিতে যায় সেই মুক্তকণ্ঠে তার প্রশংসা না কবিয়া পারে না। খলামি কাহাকে বলে সে তা জানে না। লোকে তার কাজে এত সন্তুষ্ট যে তাকে পেলে অন্য মজুর চায় না। অনেকে বলে যে সে একা দুই জন লোকের কাজ সাবাড় করিতে পারে।

যে দিন যার কাজে যায় অতি প্রত্যুষে সূর্য উঠিবার পূর্বেই ঘরে যা থাকে তাই মুখে দিয়ে গান করিতে করিতে কর্মস্থলে উপস্থিত হয়। মুখে গান গায় কিন্তু হাত কখনও কামাই হয় না। আনন্দের সঙ্গে কাজ করিয়া যায়। হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়াও সে আনন্দে দিন কাটায়। তার সঙ্গে যারা খাটে তারাও তার গান শুনে খুব আনন্দ উপভোগ করে। প্রত্যুষে রামদয়াল যখন বাঁ-হাতে রৌদ্র-বৃষ্টি-নিবারক মাথালী এবং ডান হাতে কাস্তে বা হাঁসুয়া লইয়া রাস্তায় বহির্গত হয় তখন মনে হয়—যেন দীন বীরপুরুষ ভগবদ্দত্ত দৈন্য বিজয়ার্থ এক হাতে ঢাল এবং অন্য হাতে তরবারি লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেছে।

যত বড় পদস্থ বা শিক্ষিত লোকই হউন না কেন যাঁহাকে মজুরি লইয়া পেটের ভাত করিতে হয়, রামদয়াল তাঁহাকেই নিজের পর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করে। সে বলে—যে ভাত হাতে সয় না, তাই মুখে সইয়ে গিলে, জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে যাকে ছুটতে হয় সে যত টাকাই রোজগার করুক না কেন, সেও রামদয়ালের চেয়ে একটুও আরামে থাকে না। যাকে পরের টাকার হিসাবনিকাশ দিতে হয়, রামদয়াল তার থেকে ঢের সুখী।

রামদয়াল লেখাপড়া জানে না তবুও মুখে মুখে গান তৈরি করে সেই গান গেয়ে লোককে আনন্দ পরিবেশন করে নিজেও আনন্দ উপভোগ করে। তার প্রাতঃকালে কর্মে বহির্গত হইবার সময় প্রভাতী সুরের গান শুনুন।

প্রভাত হইল, ভুবন গাহিল
          টাকা টাকা বুলি।
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
থাকে থাকে থাকে
          ধায় কেরানি-কুলি।
প্রভাত হইল...
টাকা তুমি সবার শ্রেষ্ঠ,
তোমারে পাইতে সবে সচেষ্ট
ধনীরা খুলেছে আয়রন-চেস্ট
          ভিখারি খুলেছে ঝুলি।
ক্ষুধা রাক্ষসী ভীষণ ভয়াল,

হাতে নিয়ে তাই ঢাল তরোয়াল,
যুদ্ধে জিনিয়া রামদয়াল
আনিবে টাকা আধুলি।

সন্ধ্যার পর যখন মজুরির পয়সা ট্যাকস্থ করিয়া এক আঁটি উলুখড় মাথায় লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিত তখন গাইত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই গানটি

মন পয়সার জন্য ভাবো কেনে?
পয়সা দিতেও হরি, পয়সা নিতেও হরি,
(পয়সা) আসতে যেতেও নিজে জানে।
পয়সার জন্য ভাবো কেনে।
জান না কি মন পয়সার এক নাম অর্থ,
যেখানে সে থাকে, সেখানে অনর্থ,
তার সাক্ষী মন রাজা দুর্যোধন
সবংশে নিধন ঐ পয়সা ধনে।
পয়সার জন্য ভাবো কেনে।
পয়সা দিলে যদি ভগবানকে মিলে,
নীলকণ্ঠ কি কাঁদিত সদাই হরি বোলে,
পয়সার নয় সে ধন, শ্রীনন্দের নন্দন
সচন্দন তুলসী বিনে।
পয়সার জন্য ভাবো কেনে।

রামদয়ালের গানের আওয়াজ তার স্ত্রী-এর কানে যাওয়া মাত্র সে এক ঘটি জল, শীতকাল হলে গরম জল নিয়ে স্বামীর পা দু-খানি বেশ করে ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছে, এক কলকী তামাক সেজে ফুঁ দিয়ে ধরিয়ে হুঁকোটি স্বামীর হাতে দেয়। রামদয়াল ধূমপান করিতে করিতে পত্নীকে প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করে—ধার শোধ করেছ? ধার দিয়েছ? জলে ফেলে দিয়েছ? স্ত্রী প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেয় 'হাঁ'! তখন বেশ বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে রামদয়াল স্ত্রীকে আদেশ করে—

"জ্বালাও সহস্র বাতি
ভোজনে বসুক নরপতি।"

এই সব অহঙ্কারপূর্ণ প্রশ্ন ও আদেশ রাজপ্রাসাদের তোষাখানা হইতে বেশ শোনা যায়। অন্য দিন রাজা এতে বড় একটা গুরুত্ব দেন না। আজ বিজয়ার দিনে তাঁর জন্মদিন। তোষাখানায় বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি উপস্থিত। তাঁহাদের অনেকেই রাজাকে প্রশ্ন করিলেন এ কোন্ নরপতি? রাজা নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করে তখনি দ্বারোয়ানকে হুকুম দিলেন দয়াল বেটাকে এখনি ধরে আনো।

একে হনুমান তাতে রাম আজ্ঞা। ভোজপুরী বীরপুঙ্গব রামদয়ালকে তখনই বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত রাজ-সন্নিধানে হাজির করিল। রামদয়াল করজোড়ে প্রণাম করিবামাত্র রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—রোজ কত টাকা উপার্জন করা হয়?

দয়াল—কোন দিন বারো আনা যেদিন খুব বেশী হয় এক টাকা।

রাজা—এর মধ্যে ধার শোধ করিস্ কি? ধার দিস্ কি? জলে ফেলেও দিস্ কত?

দয়াল—হুজুর—বুড়ো মা আছেন, স্ত্রীকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করি মাকে খেতে দিয়েছ?

যার বুকের রক্ত খেয়ে এই দেহখান তার ধার শোধ হবার নয় তবুও রোজ রোজ দুটি খেতে দিয়ে কিঞ্চিৎ শোধ করা। একটি ছেলে আছে হুজুর তাকে যা দিই, সে যখন উপার্জন করতে পারবে হয় তো আমার দেওয়াকে ধার মনে করে আমরা বুড়ো হলে দু-মুঠো দিবে এই আশা। কাজেই সেটা ধার দেওয়া। আর হুজুর একটা মা-বাপ-মরা ভাগনে আছে তাকে যা দিই, জলে ফেলা ভিন্ন আর কি মহারাজ? সে যখন বড় হবে—জন, জামাই, ভাগনা তিন হয় না আপনা। আমাদের তো খেতে দিবেই না বরং বলবে—বাবা মরবার সময় হাজার টাকা রেখে গিয়েছিল মামার কাছে। মামা সে টাকা মেরে দিয়েছে।

রাজা—সহস্র বাতি জ্বালিয়ে ভোজনে বস। হাজার বাতির ঝাড় পেলে কোথা? আমার পৈতৃক ৪০০ বাতির একটা ঝাড় আছে আর তোর সহস্র বাতির ঝাড়?

দয়াল—হুজুর, রাত্রে বাড়ি ফিরে রোজ খাই। আঁধারে খেতে হয় বলে, রোজ এক আঁটি উলুখড় কেটে আনি, তাই শুকিয়ে আমার স্ত্রী এক মুঠো করে জ্বালায়, আমি সেই আলোতে ভাত কয়টি খেয়ে নিই।

রাজা ও তাঁহার বন্ধুবর্গ রাজার জন্মদিন উপলক্ষে এই স্বাধীন দৈন্যবিজয়ী জন্ম-দীনকে দেখিয়া হতবাক হইয়া রহিলেন। কবির কথা—

সন্তোষামৃত-তৃপ্তানাং
　　যৎ সুখং শান্ত চেতসাম্
কুতস্তদ্ধন লুব্ধানাং
　　ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্।

রাজবাড়ি হইতে ছাড়ান পাইয়া রামদয়াল সহস্র বাতি জ্বালিয়া ভাত খাইয়া হুঁকা টানিতে টানিতে গান ধরিল—

পাপ না হলে,
　　পুণ্যের কি মান্য হতো।
সবাই যদি রাজা হতো
　　রাজস্ব বা কে দিতো।
তোমাদের বিচার কি সূক্ষ্ম,
দেখে হয় মনে দুঃখ,
দেশের যারা অন্নদাতা
তারাই সব মূর্খ—
এ সব মূর্খ নইলে পণ্ডিতেরা
　　পঞ্জিকা চুষে খেতো।
পাপ না হলে পুণ্যের কি মান্য হতো।

উট-রোগ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



১

প্রায় হাজার বৎসর আগেকার কথা। তখন প্রতিহার-বংশের পতনের ফলে বিস্তৃত সাম্রাজ্য কয়েকটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। সেই খণ্ডরাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজা সূর্যপাল খুব পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠে সাম্রাজ্য গঠন এবং প্রতিহার-বংশের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনবার দিকে মন দিয়েছেন, এমন সময়ে সূর্যপালের শরীরে কঠিন ব্যাধি দেখা দিল।

ব্যাধি যে ঠিক কি, তা কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। দক্ষিণ পায়ের একটা শিরা টন্ টন্ ঝন্ ঝন্ করে, বুক ধড়ফড় করে, আর বাম চক্ষুটা থেকে থেকে জবাফুলের মতো লাল হ'য়ে ওঠে। রাজবৈদ্যগণের মধ্যে কেউ বললেন—বাতব্যাধি, কেউ বললেন—হৃদরোগ, কেউ বা বললেন—মস্তিষ্কের পীড়া। উপসর্গ তেমন কিছু সাংঘাতিক নয়, কিন্তু মহারাজা দিন দিন বলহীন এবং কৃশ হ'য়ে পড়তে লাগলেন। মুখ বিস্বাদ, মেজাজ খিট্‌খিটে, আহারে রুচি নেই, আমোদ-প্রমোদে মন সাড়া দেয়না।

রাজবৈদ্যগণ, একটা পরামর্শ-সভা ক'রে স্থির করলেন যে, এ ব্যাধি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র-বিদিত কোন ব্যাধি নয়; এ নিশ্চয় এমন একটা চোরা ব্যাধি যার উৎপত্তিস্থল শরীরের বিশেষ কোন গুপ্ত প্রদেশে নিহিত। নিদানশাস্ত্র মথিত ক'রে যখন তার কোন হদিস পাওয়া গেল না, তখন তাঁরা রোগের উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হ'ল না। মূলে কুঠারাঘাত না ক'রে শুধু শাখাচ্ছেদন করলে কি মহীরুহের

বিনাশ সাধন করা যায়? রোগ বেড়েই চলল, মহারাজা সূর্যপাল ক্রমশ নির্জীব হ'য়ে পড়তে লাগলেন।

স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তায় মহারাণী চন্দ্রশীলা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করেছিলেন। মহারাজার আরোগ্য কামনায় তিনি কত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, কত যাগ-যজ্ঞ, কত গ্রহপুজা করালেন; মাদুলি এবং কবচে, নীলায় এবং পলায় মহারাজার কণ্ঠ ও বাহু ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল; তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক কিছুই বাদ গেল না; কিন্তু রোগ বিন্দুমাত্র উপশমের দিকে না গিয়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। মনে হ'ল, দেবতাও বুঝি সূর্যপালের প্রতি বিরূপ।

রাজবৈদ্যগণের সকল চেষ্টা বিফল হ'লে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের অপরাপর খ্যাতনামা চিকিৎসকগণকে আহ্বান করা হ'ল। কিন্তু কেউই রাজাকে বিন্দুমাত্র সুস্থ করতে সমর্থ হলেন না; শুধু অর্থব্যয় এবং কালক্ষেপই সার হ'ল। সকলেই রাজার জীবনের বিষয়ে হতাশ হলেন; রাজা নিজেও বুঝলেন, তাঁর প্রাণপ্রদীপ নির্বাপিত হ'তে আর বেশি বিলম্ব নেই।

দুর্বল শরীরে সূর্যপাল চিকিৎসার তাড়নায় অস্থির হয়েছিলেন। অরিষ্ট, রসায়ন, তৈল, পাঁচন, বটিকা আর চূর্ণের উৎপীড়ন মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়ে কষ্টকর হ'য়ে উঠেছিল। রাজা মনে মনে একটা সঙ্কল্প ক'রে তাঁর প্রধানমন্ত্রী বল্লভাচার্যকে ডেকে পাঠালেন।

বল্লভাচার্য উপস্থিত হ'লে রাজা বললেন, "মন্ত্রীমশায়, আজ থেকে আমি সকল চিকিৎসা বন্ধ করে দিলাম। বৈদ্যরা একেবারে অকর্মণ্য বাজে লোক, বিদ্যে বুদ্ধি করাও কিছু নেই। সহজ রোগ হ'লে তারা হয়ত সময়ে সময়ে সারাতে পারে। কিন্তু কঠিন রোগের তারা কেউ নয়। শুধু আমার রাজ্যে নয়, আপনি রাজ্যে রাজ্যে ঘোষণা করে দিন, যে-বৈদ্য আমাকে রোগমুক্ত করতে পারবে তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব, কিন্তু চিকিৎসারম্ভের তিন মাসের মধ্যে রোগ সারাতে না পারলে তার প্রাণদণ্ড হবে। এ শর্তে যদি কেউ আসে, তা হ'লে বুঝতে হবে সে যথার্থ শক্তিশালী চিকিৎসক। ঘোষণাপত্রে সবিস্তারে আমার রোগ-লক্ষণ বর্ণনা করবেন, যাতে যারা আসবে প্রস্তুত হ'য়েই যেন আসতে পারে।"

রাজার কথা শুনে বল্লভাচার্য অতিশয় চিন্তিত হ'য়ে বললেন, "মহারাজ, এ কিন্তু বস্তুত চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দেওয়াই হ'ল। কারণ অতিবড় ক্ষমতাশালী চিকিৎসকও প্রাণদণ্ডের ভয়ে আপনার চিকিৎসা করতে সাহস করবে না।"

রাজা তখন মরিয়া হয়েছেন; বললেন, "তা না করুক। এ রোগে আমার মৃত্যু অনিবার্য তা ত বুঝতেই পারছি,—দলন-মলন আর অরিষ্ট-রসায়নের হাত থেকে মুক্তিলাভ ক'রে কয়েক দিন একটু শান্তি ভোগ ক'রে মরতে চাই।"

এ সঙ্কল্প থেকে রাজাকে নিরস্ত করবার জন্যে বল্লভাচার্য, মহারাণী চন্দ্রশীলা, অমাত্যবর্গ, এমন কি রাজগুরু পর্যন্ত অনেক অনুরোধ-উপরোধ সাধ্য-সাধনা করলেন; কিন্তু কোন ফল হ'ল না। রাজা একেবারে বদ্ধপরিকর।

অগত্যা বল্লভাচার্য চতুর্দিকে ঘোষণাপত্র জারি করলেন। উত্তরে গান্ধার, কাশ্মীর; পশ্চিমে সিন্ধু দেশ; দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, মহাকোশল, চালুক্য রাজ্য; পূর্বে অঙ্গ, বঙ্গ, চম্পা রাজ্য—কোন দেশই বাদ পড়ল না। কিন্তু কোন ফলও হ'ল না। এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা যথেষ্ট লোভনীয় পুরস্কার বটে, কিন্তু জীবনও তার চেয়ে কম লোভনীয় বস্তু নয়। বড় বড় চিকিৎসক পরাভূত হয়েছেন শুনে কোনো চিকিৎসকই সূর্যপালের চিকিৎসা করতে অগ্রসর

হল না। এইরূপে বিনা চিকিৎসায় প্রায় ছ মাস কাল অতিবাহিত হ'ল। রাজার জীবনীশক্তি আরও ক্ষীণ হ'য়ে এল।

২

সেই সময়ে মহারাজা সূর্যপালের রাজধানী সিংহগড় থেকে পঁচিশ ক্রোশ দূরে চেতসা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে অতিশয় দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি বাস করত। অভাবে নিদারুণ তাড়নায় তাদের জীবন দুর্বহ হ'য়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণের বিদ্যার দৌড় খুব বেশি ছিল না, কিন্তু কূটবুদ্ধিতে তার সমকক্ষ ব্যক্তি পাওয়া সত্যই কঠিন ছিল। সূর্যপালের চিকিৎসার পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ সেই ব্রাহ্মণ-দম্পতিরও শ্রুতিগোচর হ'ল।

ব্রাহ্মণের দেবরাজ উপাধ্যায়। কয়েকদিন নিরবসর চিন্তার পর হঠাৎ একদিন দেবরাজ তার স্ত্রীকে বললে, "ব্রাহ্মণী, তুমি কিছুদিন ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা কোনরকমে সংসার চালাও, আমি সিংহগড়ে চললাম মহারাজা সূর্যপালের ঘোষিত এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করতে।"

দেবরাজের কথা শুনে তার স্ত্রী বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "ও মা, সে কি কথা গো! কত বড় বড় বৈদ্য কবিরাজ হার মেনে গেল মহারাজের রোগ সারাতে, আর তুমি চিকিৎসাশাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গ জান না, তুমি চললে মহারাজকে সারিয়ে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করতে?"

দেবরাজ বললে, "বড় বড় বৈদ্য কবিরাজ যখন হার মেনে গেছে, তখন বুঝতেই পারছ—এ রোগ শাস্ত্রীয় চিকিৎসায় সারবার নয়! অর্থের এই নিদারুণ অভাব আর সহ্য হয় না ব্রাহ্মণী, ভাগ্য পরীক্ষা করতে চললাম। অর্থ পাই ত হাসতে হাসতে ঘরে ফিরব, নইলে এ ঘৃণিত জীবন শেষ হওয়াই ভাল।"

ব্রাহ্মণী অনেক বোঝালে, অনেক কান্নাকাটি করলে; বললে, "ওগো, এ ত তুমি আত্মহত্যাই করতে চলেছ!" কিন্তু দেবরাজ কোন কথাই শুনল না, একটি কঙ্কালসার মৃতকল্প টাট্টু ঘোড়া সংগ্রহ ক'রে তার পিঠে চ'ড়ে সিংহগড় অভিমুখে যাত্রা করলে।

৩

পথে নানাপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ঝড়-ঝাপটার মধ্যে দিয়ে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতে করতে চতুর্থ দিন দিবা তৃতীয় প্রহরকালে দেবরাজ সিংহগড়ের পশ্চিম তোরণ অতিক্রম ক'রে রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করলে। সেই মাজা-ভাঙা ঘিয়ে-ভাজা বিচিত্র অশ্ব এবং তদুপরি রুক্ষকেশ ধূলিধূসর বিচিত্রতর অশ্বারোহীর অপূর্ব সমাবেশ দেখে পথচারী নাগরিকগণের কৌতুক এবং কৌতূহলের অন্ত রইল না। দেখতে দেখতে দেবরাজের পিছনে জনতা জ'মে গেল। সকলেই প্রশ্ন করে—কোথা থেকে আসছ, কোথায় যাবে, কার বাড়িতে অতিথি হবে? বিস্ময়াহত জনমণ্ডলীর কৌতূহল নিবারণের কোন প্রকার চেষ্টা না ক'রে দেবরাজ গম্ভীর বদনে সোজা রাজপ্রাসাদের অভিমুখে অশ্ব-চালনা ক'রে চলল। এর পূর্বে সে দু-তিনবার সিংহগড়ে এসেছে।—রাজপ্রাসাদের পথ তার অজানা নয়।

প্রাসাদের সিংহদ্বারে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। প্রবেশোদ্যত দেবরাজের পথরোধ ক'রে আরক্ত নেত্রে কর্কশ কণ্ঠে সে বললে, 'কোথায় যাও?"

অকুতোভয়ে দেবরাজ বলে, "রাজপুরীতে।"

"কার কাছে?"

"মহারাজার কাছে।"

সরোষে প্রহরী তর্জন ক'রে উঠল, "স্পর্ধা ত তোমার কম নয় দেখছি! একটা কানাকড়ির ভিখিরি, তুমি মহারাজার কাছে যাবে?—পালাও এখান থেকে, নইলে এখনি তোমাকে বন্দী করব।"

অশ্বের উপর উপবিষ্ট দেবরাজের কোটরপ্রবিষ্ট দুই চক্ষু প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, "বন্দী করবে, না, শেষ পর্যন্ত এই কানাকড়ির ভিখিরীকে বন্দনা করবে, তা ঠিক বলা যায় না। আমি মহাচণ্ড শ্মশাননিবাসী হ্রীং-ক্রৈট আখ্যাত তান্ত্রিক দেবরাজ উপাধ্যায়। ভৈরবীচক্র থেকে উঠে সোজা এসেছিলাম মহারাজকে রোগমুক্ত করতে। ঔষধ-প্রয়োগের আজ প্রশস্ত দিন ছিল, কিন্তু তুমি প্রতিবন্ধক হ'য়ে আমার গতিরোধ করলে। তুমি রাজদ্রোহী, রাজমৃত্যুকামী। তোমার বিরুদ্ধে রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত ক'রে তোমার কর্মচ্যুতির পর তোমার স্থলে উত্তম সিংকে প্রতিষ্ঠিত করাব। আপাতত ফিরে চললাম।" ব'লে দেবরাজ লাগাম টেনে অশ্বের মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল।

'কানাকড়ির ভিখিরী'র অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার অকস্মাৎ একটা উৎকট জটিলতায় পরিণত হওয়ায় প্রহরী একেবারে হকচকিয়ে গেল। মহারাজার চিকিৎসার প্রতিবন্ধক হওযার গুরু অপরাধের বিরুদ্ধে দেবরাজ কর্তৃক রাজসমীপে অভিযোগ আনা এবং পরিণামে তার কর্মচ্যুতি ও অজানা অচেনা উত্তম সিংয়ের নিয়োগ—সমস্ত ব্যাপারটাকে ষোল আনা সন্দেহ অথবা উপেক্ষা করবার মত তার মনের জোর রইল না। ওদিকে এক-পা এক-পা ক'রে দেবরাজ ফিরে চলেছে; দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলে তাকে সন্ধান ক'রে বার করা কঠিন হবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে প্রহরী ছুটে গিয়ে দেবরাজের ঘোড়ার লাগাম ধ'রে টেনে নিয়ে এসে, কি বলবে সহসা ভেবে না পেয়ে, বললে, "শোন। উত্তম সিং কে?"

অবলীলার সহিত দেবরাজ বললে, "মধ্যম সিংয়ের বড় ভাই।"

বিস্মিত হ'য়ে প্রহরী জিজ্ঞাসা করলে, "মধ্যম সিং আবার কে?"

দেবরাজ বললে, "উত্তম সিংয়ের ছোট ভাই।"

সমস্যা কিছুমাত্র মন্দীভূত হ'ল না। এক মুহূর্ত চিন্তার পর প্রহরীর বুঝতে একটুও বাকি রইল না যে, মান-মর্যাদা লজ্জা-সঙ্কোচের অনুরোধ অন্ন-বস্ত্রের পাকা ব্যবস্থাকে সংশয়াপন্ন করার মত নির্বুদ্ধিতা আর নেই। তা ছাড়া, তান্ত্রিকদের প্রতি মনে মনে তার উৎকট ভীতি ছিল; সুতরাং দেবরাজের প্ররোচনায় রাজাদেশে তার কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কাও যে মনের মধ্যে উদিত হয় নি তা নয়। মস্তক হতে শিরস্ত্রাণ উন্মোচিত ক'রে দেবরাজের সম্মুখে রেখে যুক্তকরে সে বললে, "উত্তম সিং-মধ্যমসিংদের আমি জানি নে। কিন্তু আপনি আমাকে অধমসিং ব'লে জানবেন। আমি আপনাকে বুঝতে পারিনি প্রভু। আমার অপরাধ মার্জনা করুন।'

দেবরাজ ধূর্ত ব্যক্তি; কোথায় কোন্ জিনিস শেষ এবং কোন জিনিস আরম্ভ করা উচিত তা সে বিলক্ষণ বোঝে; বললে, "তবে আমাকে মহারাজার কাছে?

প্রহরী বললে, "মহারাজার কাছে আপনাকে পাঠাবার অধিকার আমার নেই।

প্রধানমন্ত্রী মশায় এখন রাজপ্রাসাদে মন্ত্রণাগারে আছেন, আমি আপনাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি সব ব্যবস্থা করবেন।"

দেবরাজ বললে, "বেশ, তাই হোক।"

অদূরে একজন টহলদার টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাকে ডেকে প্রহরী সব কথা বুঝিয়ে ব'লে তার সঙ্গে দেবরাজকে প্রধানমন্ত্রী বল্লভাচার্যের নিকট পাঠিয়ে দিলে।

৪

একজন তান্ত্রিক চিকিৎসক রাজার চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হয়েছে—টহলদারের মুখে অবগত হ'যে সকৌতূহলে বল্লভাচার্য তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। অশ্বের উপর উপবিষ্ট দেবরাজের আকৃতি দেখে কিন্তু মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।

দেবরাজকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বল্লভাচার্য বললেন, "আপনি মহারাজার রোগ সারাবেন?"

দেবরাজ অসঙ্কোচে বললে, "হ্যাঁ, সারাব বইকি।"

বল্লভাচার্য বললে, "কিন্তু না সারাতে পারলে কি তার ফল তা জানেন ত?"

দেববাজ বললেন, "সব জানি মন্ত্রীমশায়, এই দীর্ঘপথ এত কষ্ট ক'রে নিজের জীবন দিতে আসি নি, পরে জীবন দিতেই এসেছি। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, এখান থেকে আমি অর্থোপার্জন ক'রেই যাব, প্রাণ দিয়ে যাব না।"

বল্লভাচার্য বললেন, "ভগবানেব অনুগ্রহে আপনি যেন এখান থেকে অর্থোপার্জন ক'রেই যান।"

দেবরাজ বললে, "কারুর অনুগ্রহের দরকার নেই মন্ত্রীমশায়, সে কার্য আমি নিজের বিদ্যাবুদ্ধিব জোরেই ক'রে যাব।"

আরও কিছুক্ষণ দেবরাজের সহিত আলাপ-আলোচনা ক'রে বল্লভাচার্য রাজসমীপে উপস্থিত হলেন।

এতদিন পরে একজন চিকিৎসক চিকিৎসা করবার জন্য উদ্যত হয়েছে শুনে রাজা উৎফুল্ল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "শর্তের কথা জানে ত?"

বল্লভাচার্য বললেন, "সম্পূর্ণ জানে। মহারাজকে সারাতে পারবে, সে বিষয়ে সে এ'কেবারে নিঃসন্দেহ।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি জাতি?"

বল্লাভাচার্য বললেন, "ব্রাহ্মণ। তান্ত্রিক।"

বল্লভাচার্যের কথায় উৎফুল্ল হয়ে রাজা বললেন, "তান্ত্রিক? তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ওষুধ দেবে না-কি?"

বল্লভাচার্য বললেন, "সেই রকমই ত বলে।"

রাজা বললেন, "সে কথা ভাল। ভেষজ-শক্তির সঙ্গে মন্ত্র-শক্তির যোগ হ'লে উপকার হবার সম্ভাবনা খুব বেশি।"

বল্লভাচার্য বললেন, "উপকার হ'লে ত আমরা বেঁচে যাই মহারাজ, কিন্তু তার চেহারা দেখলে একটুও শ্রদ্ধা হয় না।"

রাজা বললেন, "তা হোক। তান্ত্রিকদের চেহারা দেখতে ভাল হয় না। ডাকান তাকে এখনই আমার কাছে।"

তথাপি দেবরাজ এলে তার মূর্তি দেখে রাজার উৎসাহ অনেকটা ক'মে গেল; বললেন, "আমাকে তুমি সারাতে পারবে?"

দেবরাজ বললে, "নিশ্চয় পারব।"

রাজা বললেন, "তিন মাসের মধ্যে?"

রাজার প্রতি তর্জনী আস্ফালিত ক'রে দেবরাজ বললে, "তিন মাস বলছেন কি মহারাজ! তিন দিনে আপনাকে সারিয়ে দেব।"

রাজা বললেন, "তুমি পাগল।"

দেবরাজ বললে, "মহারাজ, এ পর্যন্ত যাঁরা আপনার চিকিৎসা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ পাগল ছিলেন?"

রাজা বললেন, "না, তাঁদের মধ্যে কেউ পাগল ছিলেন না।"

করজোড়ে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, অপরাধ মার্জনা করবেন,—সুস্থমস্তিষ্কের লোকেরা যখন কোন সুবিধেই করতে পারেনি, তখন পাগলকেই একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন না। আর, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন যে ব্যক্তির মহাচণ্ড শ্মশানে কুম্ভক যোগের দ্বারা শিববিন্দুর চতুর্দিকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে কাটে, সে পাগল নয় ত কি? আমি আপনার কাছে প্রাণ দিতে আসি নি মহারাজ। মহাচণ্ড শ্মশানে উৎকট ভৈরবের যে মন্দিরগুহা নির্মাণ করব, আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে তার অর্থ সংগ্রহ করতে। আমি আপনাকে নিঃসন্দেহে বলে রাখছি, আজ থেকে চার দিনের দিন এই পাগলের হাতে গুণে গুণে এক লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা আপনাকে দিতে হবে।"

উৎসাহিত হ'য়ে রাজা বললেন, "তা যদি হয় ত একলক্ষ নয়, দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে দোব; কিন্তু তা যদি না হয়, তা'হলে—"

সূর্যপালকে কথা শেষ করবার অবসর না দিয়ে দেবরাজ বললে, "এ বিষয়ে আর 'কিন্তু' নেই মহারাজ, একেবারে নিশ্চয়। আজ সন্ধ্যাবেলা আমি ওষুধ নিয়ে আসব আর সেইসময়ে ঔষধ সেবনের নিয়ম আপনাকে ব'লে দোব। আপাতত, আপনার রাশি কি আমাকে বলুন।"

সূর্যপাল বললেন, "সিংহ রাশি।"

দেবরাজ বললে, "আর মহারাণীর?"

সূর্যপাল বললেন, "বৃষ রাশি।"

নিজের বাম চক্ষু বন্ধ ক'রে দক্ষিণ চক্ষু দিয়ে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, আপনি দক্ষিণ চক্ষু বন্ধ ক'রে বাম চক্ষু দিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে একটু তাকিয়ে থাকুন।"

সূর্যপাল তাই-ই করলেন। কি করেন, তান্ত্রিক চিকিৎসকের হয়ত কোন মন্ত্র-প্রক্রিয়াই বা হবে!

এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে দেবরাজ বললে, "এবার ঠিক উল্টো—আপনি দক্ষিণ, আমি বাম।"

সূর্যপাল বাম চক্ষু বন্ধ ক'রে দক্ষিণ চক্ষু দিয়ে দৃষ্টিপাত করলেন।

দেবরাজ বললে, "হয়েছে, এবার দুই চোখ খুলুন। কোন ভয় নেই মহারাজ, তিন দিনেই আপনাকে সুস্থ ক'রে দোব। তবে রোগ-শান্তির পর 'দুষ্ঠস্য দানং রবিনন্দনস্য' করতে হবে।"

সকৌতূহলে রাজা বললেন, "সে কি?"

দেবরাজ বললেন, "সে অতি সামান্য ব্যাপার, যথাকালে জানতে পারবেন। এখন আমি চললাম, সময়ে আসব।"

রাজা বললেন, "ঔষধ সেবনের নিয়ম পালনের কথা বলছিলে, নিয়ম খুব কঠিন না-কি?"

দেবরাজ বললে, "আজ্ঞে না মহারাজ, অতি সহজ নিয়ম, শুনলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু কঠিনই হোক আর সহজই হোক, নিয়ম পালন না করলে ওষুধে উপকার হবে কেন বলুন?"

রাজা বললেন, "সে ত সত্যি কথা। তোমার কোন চিন্তা নেই, নিয়ম পালন আমার দ্বারা বর্ণে বর্ণে হবে।"

প্রসন্নমুখে দেবরাজ বললে, "তা হ'লেই হ'ল। বিশেষত এই চিকিৎসায় যখন আমারও জীবন-মরণের কথা জড়িত।"

রাজা বললেন, "সত্যিই ত।" তারপর বল্লভাচার্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "ব্রাহ্মণকে নিয়ে গিয়ে আহার এবং বাসস্থানের উত্তম ব্যবস্থা ক'রে দিন।"

"যে আজ্ঞে" ব'লে দেবরাজকে নিয়ে বল্লভাচার্য প্রস্থান করলেন।

৫

সন্ধ্যার পর রাজ-অন্তঃপুরে রাজা ও রাণী দেবরাজেরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা এসে সংবাদ দিলে দেবরাজ এসেছে।

রাজা বললেন, "নিয়ে এস এখানে।"

একটু পরেই পরিচারিকার সঙ্গে দেবরাজ প্রবেশ করলে। হাতে তার সুবর্ণ পাত্রে ঈষৎ লালচে রঙের খানিকটা তরল পদার্থ। বলা বাহুল্য, সুবর্ণ পাত্রটি রাজভাণ্ডার হ'তে সংগৃহীত, এবং পাত্রের ঔষধ সাধারণ লালরঙ-মিশ্রিত খাঁটি জল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

দেবরাজকে দেখে রাজা ও রাণী আসন পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। মহারাণী চন্দ্রশীলা ভক্তিভরে দেবরাজকে প্রণাম করলেন।

দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত ক'রে দেবরাজ বললে, "জয় হোক মহারাণী মহারাজার!" তার পর সুবর্ণ পাত্রটি চন্দ্রশীলার হাতে দিয়ে বললে, "মহারাজ, আপনার ওষুধ এনেছি।"

রাজা বললেন, "ওষুধ খাবার নিয়ম কি বলুন?"

দেবরাজ বললে, "আজ থেকে ঔষধ সেবনের তিন রাত্রি আপনি মহারাণীকে আপনার দক্ষিণ পাশে নিয়ে এক পালঙ্কে পূর্ব শিয়রে শয়ন করবেন। এই পাত্রটি সমস্ত রাত পালঙ্কের ঈশান কোণে রাখা থাকবে। প্রত্যুষে উঠে মহারাণী বাসি কাপড়ে আপনার হাতে ওষুধ দেবেন। আপনিও বাসি কাপড়ে পূর্বমুখে ব'সে সমস্ত ওষুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলবেন। দিনের মধ্যে একবার মাত্র ওষুধ খাওয়া। আবার কাল সন্ধ্যায় যে ওষুধ দিয়ে যাব, পরশু প্রত্যুষে তা খাবেন।"

রাজা বললেন, "মাত্র এই? আর কোন নিয়ম নেই?"

দেবরাজ বললে, "আর একটি মাত্র নিয়ম আছে। নিদিধ্যাসনে দেখা গেল, আপনার এ ব্যাধির মধ্যে উষ্ট্রিকা দোষ আছে,—ওষুধ খাবার সময় আপনি কদাচ উট মনে করবেন না। উট মনে করলে উপকার ত হবেই না, উল্‌টে অপকার হবে। উট মনে পড়লে সেদিন

আর ওষুধ খাবেন না।"

সকৌতূহলে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "উট কি?"

দেবরাজ বললে, "এই—জন্তু উট। হাতী, ঘোড়া, উট বলে না? সেই উট। লম্বা গলা পিঠে কুঁজ।"

রাজা বললেন, "অত ক'রে বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। আমার নিজের উটশালাতেই ৩ হাজারো উট আছে।" তার পর এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে বললেন, "না না, উট মনে কবব কেন? উট মনে করবার কি কারণ আছে?"

দেবরাজ বললে, "তা হ'লেই হবে। তা হ'লে তিন দিনে আরাম। তা যদি না হয় তা হ'লে আমি নিজে গিয়ে শূলে চ'ড়ে বসব মহারাজ।"

দেবরাজের কথা শুনে রাজা ও রাণী উভয়েই খুব সন্তুষ্ট হলেন। আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে তাঁদের মনের মধ্যে প্রবল আশা দেখা দিলে।

৬.

পরদিন প্রত্যূষে ঈশান কোণ থেকে ঔষধের পাত্রটি নিয়ে মহারাণী চন্দ্রশীলা সযত্নে স্বামীর হাতে দিলেন। পূর্ব দিকে মুখ ক'রে সূর্যপাল প্রস্তুত হ'য়েই ব'সে ছিলেন, ইষ্টদেবতা স্মরণ করে ঔযধ পান কবতে গিয়ে পাত্রটা মুখে ঠেকিয়েই ভূমির উপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন।

উৎকণ্ঠিত স্বরে চন্দ্রশীলা বললেন, "কি হ'ল? খেলেন না কেন মহারাজ?"

অপ্রতিভ মুখ সূর্যপাল বললেন, "উট মনে প'ড়ে গেল।"

শুনে রাণী শিউরে উঠলেন; বললেন, "আগে থেকেই মনে পড়ছিল, না, খেতে গিয়ে মনে পড়ল?"

রাজা বললেন, "খেতে গিয়ে মনে পড়ল।"

নিঃশব্দে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে রাণী বললেন, "কি আর করবেন বলুন, একদিন পেছিয়ে গেল। কাল আর মনে করবেন না।"

মনে মনে কি ভাবতে ভাবতে রাজা বললেন, "না, তা আর করব না।"

সন্ধ্যাবেলা ওষুধ দিতে এসে সব কথা শুনে দেবরাজ মুখ গম্ভীর করলে। বললে, "মহারাজ, এত ক'রে যে কথাটা নিষেধ করে দিলাম, শেষ পর্যন্ত তাই করে বসলেন?"

অপ্রতিভ হয়ে সূর্যপাল বললেন, "কি করি বল? ইচ্ছে ক'রে করেছি কি? হঠাৎ মনে পড়ে গেল।"

দেবরাজ বললে, "তার আগেই টপ্ ক'রে খেয়ে ফেললে ত হ'ত!"

অন্যমনস্কভাবে রাজা বললেন, "কাল না হয় তাই করব।" তারপর মনে মনে ক্ষণকাল কি চিন্তা ক'রে বললেন, "দেখ দেবরাজ, এ নিয়মটা তুমি যদি আমাকে না জানাতে তা হ'লে এমনি-এমনিই পালন হ'য়ে যেত। জানিয়েই অসুবিধেয় ফেলেছ।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেবরাজ বললে, "বলেন কি মহারাজ! এর উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে, না জানিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারি কি? হঠাৎ যদি আপনি উটের কথা মনে ক'রে ফেলেন, তা হ'লে?"

রাজা মৃদুভাবে আপত্তি করলেন; বললেন, "না, না, হঠাৎ উটের কথাই বা মনে করতে যাব কেন?"

দেবরাজ বললেন, "এই যে আপনি বললেন, আপনার উটশালায় হাজারো উট আছে।"

রাজা বললেন, "কি গেরো! শুধু কি আমার উটশালাই আছে! হাতীশালা নেই? ঘোড়াশালা নেই?"

দেবরাজ বললে, "কিন্তু মহারাজ, উটশালাও ত আছে।"

রাজা আর তর্ক করলেন না— পরদিন নিয়ম পালন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেবরাজকে বিদায় দিলেন।

পরদিনও কিন্তু একই ব্যাপার ঘটল, মুখে ঠেকিয়েই ঔষধের পাত্র নামিয়ে রাখতে হ'ল, উট মনে পড়ায় ঔষধ খাওয়া গেল না। তৎপরদিন থেকে ঔষধের পাত্র স্পর্শ করাও চলল না, আগে থেকেই উটের কথা মনে পড়তে থাকে।

মহারাণী চন্দ্রশীলা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। ওষুধ খাবার সময় যাতে উটের কথা রাজার মনে না পড়ে, সেজন্য তিনি রাজাকে নানা প্রকাবে অন্যমনস্ক করতে চেষ্টা করেন। মিথ্যা করে বলেন, "মহারাজ, আপনার হাতীশালায় আজ লছমনদাসের ভারি অসুখ, এক কুটো ডাল-পালা মুখে দেয়নি, আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানি শুঁড় নাড়ছে।

লছমনদাস রাজার সর্বাপেক্ষা প্রিয় হস্তী। কিন্তু শাক দিয়ে কখনও মাছ ঢাকা চলে? লছমনদাসের দীর্ঘ-আন্দোলিত শুঁড় রাজার মনে ঢুনডিনাথের লম্বা গলা রূপে উঁচু হয়ে দেখা দেয়। রাজা ধীরে ধীরে অ-সেবিত ঔষধের পাত্র ভূমিতলে নামিয়ে রাখেন। ঢুনডিনাথ রাজার সবচেয়ে আদরের উট—খাস আরব দেশ থেকে বহু যত্নে এবং বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করা।

মহারাণী চন্দ্রশীলার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। মনে মনে বলেন, "তোমার অপরাধ কি মহারাজ! আমার নিজেরই মন ক্রমশ এক উটশালায় পরিণত হয়েছে।"

এমনি ভাবে মাসাধিক কাল গত হ'ল। সূর্যপালের পেটে এক বিন্দু ঔষধ প্রবেশ করল না। ওদিকে রাজার-হালে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহারে দেবরাজের শরীর দিন দিন কান্তিমান হ'য়ে উঠছে। ঔষধ দিতে এসে দেবরাজ গজগজ করে; বলে, "মহারাজ, মনে করেছিলাম দিন চারেকে কার্য শেষ ক'রে বাড়ি ফিরব, কিন্তু আপনি এমনি ছেলেমানুষি আরম্ভ করেছেন যে, দেখতে দেখতে এক মাস হ'য়ে গেল। ওদিকে বাড়িতে কত প্রয়োজনীয় কাজ পণ্ড হচ্ছে।"

রাজা কিছু বললেন না, বেকায়দায় প'ড়ে গেছেন, মনের আক্রোশ মনের মধ্যে চেপে চুপ ক'রে থাকেন।

৭

আর দিন পনের পরে কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে। বল্লভাচার্যকে আর দেবরাজকে রাজা ডাকিয়ে পাঠালেন।

উভয়ে উপস্থিত হ'লে দেবরাজের প্রতি সক্রোধ নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে রাজা বললেন, "দেবরাজ, তুমি একটি বিষম ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড, জোচ্চোর।"

কাঁচুমাচু মুখে করজোড়ে দেবরাজ বললে, "কেন মহারাজ?"

কঠোর কণ্ঠে রাজা বললেন, "আবার চালাকি করছ? কেন মহারাজ!...কেন, তা জান না?"

দেবরাজ কোনও কথা বললে না, করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, "আমার আগেকার রোগ সেরে গেছে, তার বিন্দু বিসর্গও আর নেই। কিন্তু তার জায়গায় নতুন যে-রোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্যে পাগল হ'য়ে যাবার মত হয়েছি। আগেকার রোগ এর চেয়ে ভাল ছিল। তার শেষ ছিল মৃত্যুতে, কিন্তু এ রোগে বেঁচে থেকে দিবারাত্র মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছি।"

রাজার কাতরোক্তি শুনে দেবরাজের হাসি পেয়েছিল। অতি কষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর মুখে সে বললে, "কি রোগ মহারাজ?"

রাজা সজোরে চিৎকার ক'রে উঠলেন, "হারামজাদা, আবার ন্যাকামি করছ। উট-রোগ তা তুমি জান না?"

শুনে মন্ত্রী বল্লভাচার্য চমকে উঠলেন; বললেন, "বলেন কি মহারাজ! উট-রোগ।

রাজা বললেন, "হ্যাঁ উট-রোগ। ওই নচ্ছারটা একটা আস্ত উট, আমার মনের মধ্যে ঢুকিয়েছে। ঘুমিয়ে পর্যন্ত নিস্তার নেই, স্বপ্ন দেখি উটের। ঘুম ভাঙলে মনে হয় উট। উট ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। জেগে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ মনের মধ্যে উট খট্ খট্ ক'রে বেড়িয়ে বেড়ায়।" তারপর দেবরাজের দিকে আরক্ত নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "বার কর এ উট আমার মনের ভেতর থেকে, নইলে তোকে শূলে চড়িয়ে, আগুনে পুড়িয়ে মারব।"

মনের অপরিসীম উল্লাস অতি কষ্টে মনের মধ্যে দমন ক'রে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, প্রথম দিনেই ত বলেছিলাম যে, নিদিধ্যাসনে দেখা গিয়েছিল আপনার রোগে উষ্ট্রিকা দোষ—"

দেবরাজকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রাজা চিৎকার ক'রে উঠলেন, "চোপ রও পাষণ্ড! ফের যদি উষ্ট্রিকা দোষের কথা উচ্চারণ করেছ, এক্ষুনি দু খণ্ড করব তোমাকে।" ব'লে কোষ থেকে অসি নিষ্কাষিত করলেন।

দেবরাজ দেখলে, আর, বেশি বাড়াবাড়ি ক'রে কাজ নেই। করজোড়ে বললে, "দোহাই মহারাজ! দয়া ক'রে ও-কার্যটি করবেন না। প্রাণটা দেহে বর্তমান থাকলে উটের যা-হয় একটা ব্যবস্থা করতে পারব, কিন্তু না থাকলে উটকে কোনমতেই বার করতে পারব না। এর অতি সহজ প্রতিকার আছে, অভয় দেন ত নিবেদন করি।"

রাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কী?"

দেবরাজ বললে, "আপনার পায়ের শির ত আর টন্ টন্ করে না?"

রাজা বললেন, "না।"

"বুক ধড়ফড় করে না?"

"না।"

"চোখ লাল হয় না?"

"না।"

দেবরাজ বললে, "মহারাজ, তা হ'লে ত আপনার আসল রোগ একেবারে সেরে গিয়েছে। আপনার প্রতিশ্রুত দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আমাকে বিদায় করুন, তা হ'লে আপনার মন থেকে বেরিয়ে এসে উটও আমার পিছনে পিছনে খট্ খট্ করতে করতে চ'লে যাবে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে রাজা বললেন, "আমারও তাই মনে হয়। মন্ত্রীমশায়, এই

শয়তানটাকে দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে লাথি মেরে বিদায় করুন।"

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, এর এক ফোঁটা ওষুধ আপনার পেটে গেল না, আর দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা একে দিতে বলছেন?"

রাজা বললেন, "এই সর্বনেশে লোককে আর একদিনও আমাদের রাজ্যে রাখবেন না। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ না পেলে শেষ পর্যন্ত ও আপনার মনে হাতি ঢুকিয়ে ছাড়বে। তখন চার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ওকে বিদায় করতে হবে।"

এই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক কথা শোনবার পর মন্ত্রী আর দ্বিরুক্তি করলেন না, দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দেবরাজকে বিদায় দিলেন।

সেই বিপুল বহুমূল্য অর্থ ষোল খানা মজবুত বোরায় পুরে আটটা ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে দশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী রক্ষীর দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে প্রফুল্ল মুখে দেবরাজ নিজের সেই মাজা-ভাঙা ঘোড়ার উপর সমাসীন হ'য়ে টেতসা অভিমুখে যাত্রা করলে। বলা বাহুল্য, রাজবাড়ির পুষ্টিকর দানা-পানির গুনে দেবরাজের সেই ঘিয়ে ভাজা ঘোড়াও অনেকটা বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল।

৮

রাত্রে মহারাণী চন্দ্রশীলা পূর্বের মতো রাজার বাম পার্শ্বে শয়ন করলেন। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর সূর্যপালকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, কাল রাত্রে আপনার সুনিদ্রা হয়েছিল ত?"

প্রসন্নমুখে রাজা বললেন, "হ্যাঁ, সমস্ত রাত।"

"স্বপ্ন দেখেছিলেন?"

"দেখেছিলাম।"

সভয়ে মহারাণী জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের স্বপ্ন?"

সহাস্যমুখে রাজা বললেন, "উটের স্বপ্ন একেবারেই নয়; শুধু তোমার স্বপ্ন।"

সূর্যপালের কথা শুনে লজ্জায় এবং আনন্দে মহারাণীর মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। মনে মনে ভাবলেন, উটটা তা হ'লে সত্য সত্যই দেবরাজের সঙ্গে প্রস্থান করেছে।

হাসির গান গাওয়ার পুরস্কার

নলিনীকান্ত সরকার



হাসির গান গেয়ে সুনাম কতটা পেয়েছি ভগবানই জানেন, কিন্তু দুর্নাম কুড়োতে আদৌ বেগ পেতে হয়নি। নিতান্ত ছারকপালে না হলে এমনটা হয় না।

সেকালে গোয়াবাগানে আমার একজন বন্ধু ছিলেন, নাম রবি বাঁড়ুজ্জে। মাঝে মাঝে রবির বাড়িতে যেতাম আড্ডা দিতে। সন্ধ্যার সময় সেখানে গেলে আর রক্ষা থাকত না। ছেলেমেয়েরা ধরে বসত—গাইতেই হবে। গুটিকতক শ্রোতা নিয়ে দস্তুরমতো গানের আসর বসে যেত। বলা বাহুল্য, হাসির গানের প্রতিই তাদের ঝোঁক ছিল বেশি। আমি যে-সব হাসির গান সেখানে গাইতাম, সেগুলির মধ্যে একটি বিশেষ গান তাদের খুব প্রিয় ছিল। সেটি হচ্ছে, ডি. এল. রায়ের 'পাঁচটি এয়ার'। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের আসর ছাড়া এ-গানটি আমি অন্য কোথাও বড়-একটা গাইতাম না। কারণ, গানটি গাইতাম অভিনয়ের ঢঙে। মাথার চুল উস্কখুস্ক করে, বগলে বোতল নিয়ে, টলতে টলতে জড়িতে কণ্ঠে গাইতাম—

'আমরা পাঁচটি এয়ার, দাদা,
আমরা পাঁচটি এয়ার।'

এই বাড়ির পাশেই থাকতেন প্রসিদ্ধ অ্যাটর্নি কুঞ্জবিহারী ঘোষ। সে-সময় তাঁর সঙ্গে আমার কোনরূপ আলাপ-পরিচয় ছিল না। পনেরো-ষোলো বছর পরে তাঁর ডাফ্ স্ট্রীটের বাড়িতে যখন শ্রীঅরবিন্দ পাঠচক্র ও ধ্যানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেই প্রতিষ্ঠা-দিবসে খবর পেয়ে আমিও তাঁর বাড়িতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি অনেকগুলি শ্রীঅরবিন্দ-

ভক্তের সমাবেশ হয়েছে। কুঞ্জবাবু সকলের সঙ্গেই আলাপ-আপ্যায়ন করছেন, কিন্তু আমার উপর তাঁর আদৌ আগ্রহ নেই। বরং তাঁদের আলাপ-আলোচনায় গায়ে পড়ে দুটো-একটা কথা কইলে আমার প্রতি উপেক্ষার ভাবই তিনি প্রদর্শন করছেন। আমি যেন তাঁর অবাঞ্ছিত অতিথি।

কিন্তু এ-ভাব আর বেশি দিন রইল না। প্রতি রবিবার তাঁর বাড়িতে পাঠচক্রে যেতে যেতে এমন ঘনিষ্ঠতা হল যে, প্রত্যহ অন্তত একটিবার তাঁর সঙ্গে দেখা না হলে চলত না। এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব-স্থাপনের পর একদিন কথায় কথায় কুঞ্জবাবু বললেন, 'আরে মশায়, গোয়াবাগানে আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতে আপনি যেতেন, আহা তখন যদি আপনার সঙ্গে আলাপ হত!'

আমি বললাম, 'আলাপ করলেই পারতেন।'

কুঞ্জবাবু ঈষৎ হেসে বললেন, 'আলাপ কেন করিনি জানেন? আপনাকে আমি জানতাম একটি পাঁড় মাতাল বলে। পাশের বাড়িতে মদের বোতল নিয়ে আপনাকে মাতলামি করতে দেখেছিলামও। পরে অবশ্য শুনেছিলাম যে, আপনি মাতালের ক্যারিকেচর করছিলেন। কিন্তু তাতেও আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা পালটায়নি। এখানে যেদিন পাঠচক্র প্রতিষ্ঠিত হল, সেদিন আপনাকে দেখে আমার কেবলই মনে হয়েছিল, এ মাতালটা এখানে কেন এল?'

আমি বললাম, 'এখন কি মত পালটেছে?'

কুঞ্জবাবু হেসেই বললেন, 'কতকটা।'

* * *

দুর্নাম তো দূরের কথা,—হরেক রকম কারণে গালাগালিও খেয়েছি হরেক রকম। গানের ভিতর দিয়ে রসিকতা করতে গিয়ে গালাগালি খাওয়ার কথা আগেই বলেছি, কিন্তু গান গেয়ে রসিকতা না করেও গালাগালি খেয়েছি।

কলকাতা থেকে কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে এমন একজন গুণী ব্যক্তি আছেন, যিনি ভৌতিক চিকিৎসা করে অনেক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি নিরাময় করে থাকেন। এই খবরটি পেয়ে কবি-বন্ধু নজরুল ইস্‌লাম তাঁর স্ত্রীর পক্ষাঘাত রোগের চিকিৎসার জন্যে সেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবার সঙ্কল্প করলেন। চিকিৎসককে খবর দিয়ে দিনক্ষণ স্থির করে একদিন সন্ধ্যায় নজরুল রওনা হলেন তাঁর নিজের মোটরে। সঙ্গে গেলাম আমি আর বন্ধুবর হেমচন্দ্র সোম। যথাস্থানে পৌঁছলাম সন্ধ্যা আটটা সাড়ে-আটটায়।

ভৌতিক চিকিৎসার কথাটা একটু সংক্ষেপে বলে নিই। সেটা সেখানে গিয়ে ভালো করে আমরা জানতে পারলাম। ভৌতিক চিকিৎসা মানে, স্বয়ং ভূত অশরীরে উপস্থিত হয়ে রোগের বিবরণ শ্রবণ করেন; অশরীরী কণ্ঠে নাকী সুরে কথা কয়ে নিজের অভিমত জ্ঞাপন করেন এবং নিজের হাতে গাছের শিকড় তুলে এনে ওষুধ দিয়ে থাকেন। ওষুধের প্রয়োগ-বিধি, পথ্যাপথ্য সবই সর্বজনসমক্ষে খোনা-খোনা ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেন। যে গুণী ব্যক্তিটির কথা বলেছি, তিনি হচ্ছেন ভূতের প্রতিনিধি মাত্র। ভূতটিকে আহ্বান করে নিয়ে আসেন আর রোগীর প্রতি প্রসন্ন হবার জন্যে ভূতের কৃপা প্রার্থনা করেন। ভূতের সে এক অদ্ভুত কাণ্ড! আমরা স্বচক্ষে দেখে নয়ন-মন সার্থক করেছি।

আমরা পৌঁছে দেখি, আরও কয়েকজন নারী-পুরুষ সেখানে সমবেত হয়েছেন। আমাদের পৌঁছনো খবর পেয়ে অন্তঃপুর থেকে সেই গুণী ব্যক্তির একজন চেলা আমাদের

অভ্যর্থনা করে বাড়ির বাইরে বারান্দায় একখানি মাদুর পেতে বসালেন। এবং সেই গুণী ব্যক্তির গুণ বর্ণনা আরম্ভ করলেন, —তিনি একজন মহাসাধক, মহাপুরুষ ইত্যাদি। সব শেষে আমাদের জানালেন, 'বাবা নিশিরাত্রে এসে থাকেন। আপনাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।'

বাবা মানে ইহলোকের বাবা নন,—পরলোকের বাবা। অর্থাৎ সেই ভূত। আর নিশিরাত্রি হচ্ছে নিশীথ রাত্রি। চেলার কথা শুনে বুঝতে পারলাম, গুণীটি চক্রে বসে ধ্যানযোগে সেই অশরীরী আত্মার আবাহন করছেন। তাঁর আবির্ভাব হবে রাত বারোটায়। সুতরাং আমাদের তিন-চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতেই হবে।

বাড়ির বাইরে দু-দিকে দুটি বাবান্দা, মাঝে অন্তঃপুরে যাবার প্রবেশ-পথ। এক পাশের বারান্দায় আমরা তিন বন্ধুতে বসে রইলাম। অপরদিকেব বারান্দায় কতকগুলি নারী —অন্ধকারে ভালো দেখাও যায় না—গলার স্বর শুনে মনে হয় সকলেই বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া। দুটি-একটি পুরুষ কণ্ঠস্বরও তাঁদেব দিক থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

তিন-চার ঘণ্টা কি করে কাটবে, এইটেই একটা সমস্যা হয়ে পড়ল। একটু তন্দ্রালু হবাবও উপায় নেই। প্রহরারত মশককুল ঘন-ঘন কর্ণকুহরে ওয়ার্নিং দিয়ে সজাগ করে দিয়ে যায়। সময়-কাটানোর জন্যে আমরা গান গাইতে আবম্ভ করলাম। এ আর হাসির গান নয়। চেলাটির কাছে শুনলাম, সেই গুণী ব্যক্তিটি উঁচু দরের তান্ত্রিক সাধক। তাই আমবা এই সাধন-পীঠে সাধন-সঙ্গীতই গেযে চলেছি একেব পব আব। নজরুল গাইছেন তাঁর স্বরচিত অপূর্ব শ্যামাসঙ্গীতগুলি,—যার প্রভাবে অতি সহজেই ভক্তের মন ভগবদুন্মুখী হয়ে ওঠে। বিপন্ন নজরুল তাঁর স্ত্রীর রোগ-নিরাময়ের জন্য ভগবৎ-করুণার প্রত্যাশী হয়ে এসেছেন, সুতরাং তাঁর কণ্ঠে শরণাগতির ভাবটা গানের কথায় কথায় ফুটে উঠছে। নজরুর ভক্তিগদগদকণ্ঠে দরদ দিয়ে গাইছেন :

'আমি মা বলে যত ডেকেছি, সে-ডাক
নূপুর হয়েছে ও রাঙা পায়।
আমার শত জনমের কত নিবেদন
ঐ চরণ জড়ায়ে কহিয়া যায়॥'

এমন সময় বারান্দার অপর দিক থেকে বাজখাঁই আওয়াজে একটি বামাকণ্ঠে যেন কাংস্যধ্বনি উত্থিত হল, 'হ্যাঁ গা, তোমাদের ঘরে কি মা-বোন নাই! গান-বাজনা শোনানোর নোক কি নিজের ঘরে পেলে না? তোমরা কিরকম ভদ্দরনোক গা, যে রেতের বেলায় মেয়েদের দেখে গান ধরে দিয়েছ বাছা?'

আমরা তো হকচকিয়ে গেলাম। নজরুলের ভাবও ভেঙে গেল। অতঃপর আমরা নীরবে মশক-দংশনই বাঞ্ছনীয় মনে করলাম।

* * *

সেকালে অর্থাৎ কলকাতা বেতার-প্রতিষ্ঠানের আদিযুগে অনেকগুলি সাময়িক পত্রে বেতারের আসরের সাপ্তাহিক সমালোচনা বের হত। 'আজকাল' বলে একখানি সাপ্তাহিক ছিল। তার বেতার-সমালোচক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তো আমাকে গালাগালি না-দিয়ে জলগ্রহণ করতেন না! কিন্তু 'দীপালী'র সমালোচক কেন যে একবার গালাগালি দিয়ে আমার গানের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করেছিলেন, তার কারণ আজ পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারিনি!

ব্যাপারটা উপভোগ করবার মতো। রেডিয়োতে একদিন আমার হাসির গান। 'বেতার

জগতে' আমার গানের তারিখ ও সময় ছাপা হয়েছে। আমার গানের নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টাখানেক পূর্বে রেডিয়ো অফিসে আমি পৌঁছেছি। সেখানে বসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করছি, এমন সময় আমার কাছে একটি টেলিফোন 'কল' এলো। টেলিফোনে খবর এলো, কবি নজরুলের পুত্র বুলবুলের মৃত্যু হয়েছে, অবিলম্বে আমার সেখানে পৌঁছনো প্রয়োজন। খবরটি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটলাম নজরুলের বাড়ি। সেদিন রেডিয়োতে আমার আর গান গাওয়া হল না।

অথচ তারপরের সপ্তাহের 'দীপালী'তে আমার সেদিনের গানের সমালোচনা বেরিয়ে গেল! যে-দুটি গান আমার গাইবার কথা ছিল, দুটি গানেরই গোড়াকার লাইন ছাপা হয়েছিল 'বেতার জগতে'। সেই দুটি লাইন অবলম্বন করে সমালোচক মহাশয় তীব্র ভাষায় আমাকে আক্রমণ করেছেন।—আমি গান দুটিতে আদৌ রসসৃষ্টি করতে পারিনি, গান গাওযাও হয়েছিল অশ্রাব্য—ইত্যাদি কটূক্তি করে সমালোচক আমাকে ব্যাঙ-খোঁচানি খুঁচিয়েছেন।

আমি ভাবলাম, গান আদৌ গাইলাম না, তাইতেই এত; গাইলে না-জানি আমার কি দশা হত!

* * *

ভবানীপুরে, বেলতলা রোডে একটি আসরে গাইতে গিয়ে একজন শ্রোতার কাছ থেকে এমন তারিফ পেলাম যে, সেটা সাধুবাদ কি নিন্দাবাদ বুঝে উঠতে পারলাম না।

বেশ জমজমাট আসর। অনেকগুলি ভদ্রলোক ও মহিলা সমবেত হয়েছেন। সকলের পুরোভাগে বসেছেন একজন বিশেষ ধরনের ব্যক্তি—সকলের থেকে স্বতন্ত্র। বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা সকলেই তাঁকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করছেন। আমার সম্মুখেই বসেছেন তিনি। ভদ্রলোকের বয়সটা ঠিক ধরা যায় না। মস্তকটি কেশবিরল। মস্তকের ইন্দ্রলুপ্তের অপবাদ অবলুপ্ত করেছে বদনমণ্ডলের আরণ্য-সুষমা। প্রশস্ত কবাটবক্ষ আবৃত করেছে ঘন প্রলম্ব শ্মশ্রুরাজি।

আমার প্রতি গানে ইনি বাহবা দিয়ে চলেছেন নানা রকম উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনির দ্বারা। শেষ গানটি গেয়ে শেষ করলাম যখন, তখন ভদ্রলোকটি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 'বাবা, তোমাকে একটি কথা বলব। মনে রেখো। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।'

আসর শেষ হল বলে শ্রোতৃবৃন্দ চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এই ভবিষ্যতে কাজে লাগার কথাটা শোনবার জন্যে সকলেই দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদেরও তো ভবিষ্যৎ আছে।

আমি ভদ্রলোকটিকে বললাম, 'কি বলবেন, বলুন।'

ভদ্রলোক উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, 'তোমাকে একটিমাত্র কথাই বলব। কথাটা আর কিছুই নয়—চরিত্রটি যাতে পবিত্র থাকে তার চেষ্টা কোরো।'

সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ আমার দিকে এমনভাবে চাইলেন যে, আমার চরিত্রের একটা গোপন কথা ঐ ভদ্রলোকটি যেন ফাঁস করে দিয়েছেন। আমি ছাড়া আর সকলেরই মুখে-চোখে ঔৎসুক্য জেগেছে ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমার আরও কিছু গোপন তথ্য জানবার জন্যে। আমার দিকে চেয়ে ভদ্রলোকটি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'তোমাকে ঐ কথাটি বললাম বাবা, তোমারি ভালোর জন্যে। চরিত্রে সংযম না থাকলে কণ্ঠস্বর ঠিক থাকে না। ভগবান তোমাকে অমন জোরালো কণ্ঠস্বর দিয়েছেন, সেটির তেজ রক্ষা কোরো। বিশেষ করে একটি বয়স আছে,—কণ্ঠস্বরের পক্ষে মারাত্মক কাল। চল্লিশ বছর বয়সে

অসংযমী লোকদের কণ্ঠস্বর স্বভাবতই বিকৃত হয়ে যায়। ঐ বয়সটাতে একটু বিশেষ সাবধানে থেকো বাবা!'

আমি তাঁর প্রতি বিনয়াবনত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করলাম, 'আপনার বয়স কত?'

'আমার বয়স?—সাতচল্লিশ।'

আমি মৃদু হেসে ভদ্রলোককে বললাম, 'ন'বছর আগে আমি চল্লিশ পেরিয়ে এসেছি; আর আপনার চেয়েও বোধ হয় বছর দুয়েকের বড়োই হব।'

অপত্য-সম্বোধন ছেড়ে ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'বলেন কি!'

* * *

অনেকেই অর্থ উপার্জন করে, কেউ কেউ উপহার-বকশিশও পায়। পণ্ডিত জওহরলালের কাছ থেকে আমেরিকার লোকেরা হাতীও উপহার পেয়েছে। সেটা অবশ্য বড়ঘরের বড় কথা। কিন্তু কোনও গাইয়ের গান শুনে কোনও গুণগ্রাহী শ্রোতা বাঘ বকশিশ দেবার প্রস্তাব করেছে কি? বাঘ, বাঘ,— খেলনার বাঘ নয়—জঙ্গলের জ্যান্ত বাঘ।

কলকাতায় যে-সব সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার নিকট-আত্মীয়ের মতো ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী অন্যতম। কবি এবং কবিজায়া দুজনেরই ছিল স্নেহ-সমৃদ্ধ হৃদয়—পরকে আপন-করা প্রাণ। যতীন-দার বাড়িতে গেলে আমি যেন তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁদেরই একজন হয়ে যেতাম। নদীয়া জেলার জমশেরপুরের বিখ্যাত বাগচী-পরিবারের সন্তান ছিলেন যতীন-দা,—জমশেরপুরের জমিদার। যতীন-দা একবার পুজোর সময় কলকাতা থেকে সপরিবারে জমশেরপুর যাচ্ছেন। আমাকেও ধরলেন তাঁদের সঙ্গে যেতে। 'প্রতিশ্রুতি দিলাম, 'যাব'; কিন্তু তাঁদের সঙ্গে নয়, আমি যাব আমার পল্লীবাসভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতা থেকে রওনা হয়ে। যতীন-দা পুজোর দিন-পনেরো পূর্বে সপরিবারে জমশেরপুর রওনা হলেন, আমি রওনা হলাম আমার পল্লীবাসে।

যতীন-দা আমাকে পথের নির্দেশ দিয়ে বলে দিয়েছিলেন, পদ্মার ওপরে একটি স্টিমার স্টেশনে নেমে জমশেরপুর যেতে হয়, সাত-আট মাইল পথ। আমি আগে খবর দিলে তিনি স্টেশনে তাঁদের হাতী পাঠিয়ে দেবেন। আরও একটি পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, সেটা আরও দূর পথ।

ক্রমশ পুজোর দিন এগিয়ে এল। দেশে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হৈ-হৈ করে কাটানোতে যতীন-দাকে আর চিঠি লেখা হয়ে উঠল না। এদিকে আকাশ-ফুঁড়ে নামল ঝড় আর বৃষ্টি। সেই দারুণ দুর্যোগের মধ্যে 'পরান-সখা বন্ধু হে আমার' বলে ঝড়ের রাতে আমার অভিসার জমশেরপুর অভিমুখে। আগে থেকে খবর দিতে পারিনি বলে হাতীর আশা ছেড়ে দিতেই হল। সেই দূর পথের স্টেশন অভিমুখেই রওনা হলাম। এটিও স্টিমারের পথ। দামুকদিয়া ঘাট স্টেশনে স্টিমার থেকে নেমে ট্রেনে চড়ে কয়েকটি স্টেশন পরে নামলাম ভেড়ামারা স্টেশনে। সেখান থেকে গো-যানে জমশেরপুর-যাত্রা। বারো-চৌদ্দ মাইল পথ। রাস্তা বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত। গাড়ির চাকা বসে যাচ্ছে সেই কাদার মধ্যে। গরু দুটির আদৌ ইচ্ছে নেই এ-পথে চলতে, কিন্তু গাড়োয়ান তাদের চালাবেই ঠেঙিয়ে-ঠেঙিয়ে। এ আরামের যাত্রা ত্যাগ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। পদব্রজেই যাত্রা করলাম। সামান্য যা বাক্স-বিছানা ছিল, তাই নিয়ে গরুর গাড়ি আসতে লাগল আমার পিছনে পিছনে।

তিন-চার ঘণ্টা অবিশ্রান্ত হেঁটে জমশেরপুর পৌঁছলাম। যতীন-দার বাড়ি বাংলাদেশের প্রাচীনকালের জমিদারদেব রুচিসম্মত বিরাট প্রাসাদ। পুজোর সময়, স্বভাবতই বাড়িটা সরগরম হয়েই ছিল, আমি যাওয়াতে যতীন-দা এবং বাড়ির ছেলেমেয়েরা আরও মেতে উঠলেন। যতীন-দা জমিদার হলেও জীবনে অনেক বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু তিনি বোধহয় কখনও প্রচারকের কাজ করেননি। তিনি যে কত বড় সুদক্ষ প্রচারক ছিলেন, সেটা বুঝতে পারলাম জমশেবপুর গিয়ে। আমাকে নিয়ে তিনি জমশেরপুরের বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে লাগলেন। যেন আমার গলায় দড়ি বেঁধে ডুগডুগি বাজিয়ে যতীন-দা সারা গ্রামটিতে আমাব প্রচারকার্য চালিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

সমগ্র জমশেরপুর গ্রামটিকেই বাগচী-পরিবারের গ্রাম বললে অত্যুক্তি হয় না। একটি মহা মহীরুহের দিগন্তবিতত শাখাপ্রশাখা যেন সমগ্র গ্রামটিকে ছেয়ে রেখেছে। বাংলাদেশে একরূপ বৃহৎ পরিবাব-অধ্যুষিত গ্রাম আব আছে কিনা জানিনে। গ্রামে শত শত সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন, কৃতবিদ্য ব্যক্তিব বাস। তাঁদের মধ্যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীও বহু। সন্ধ্যাব পবে যতীন-দার বাড়িতে বসল গানের আসর। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনেকেই এসেছেন আমার গান শুনতে। আসরে এইরূপ শ্রোতার সমাবেশ যে হবে, এটা আমি আগেই যতীন-দাব কাছ থেকে জেনে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনী সেন, নজরুল ইস্‌লাম প্রভৃতির কতকগুলি জনপ্রিয় গান গাইব বলে মনে মনে ঠিক কবে রেখেছিলাম। কিন্তু যতীন-দাব উদ্দেশ্য অন্যরূপ। এইসব শ্রোতাদের কাছে আমাকে অসাধারণরূপে জাহির করবার জন্যে যতীন-দা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। তিনি শ্রোতাদের কাছে দেখাতে চান যে, আমি বাংলা গানেব কত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক। যতীন-দা আসরের মধ্যে বলে বসলেন, 'গাও তো ভায়া, প্রাচীন বাংলা-গান। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি থেকে শুরু করে শেষ করো রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত-নীলকণ্ঠে।'

শ্রোতাদের মধ্যে দু-চারজন কলকাতায় আমাব গান শুনেছিলেন। তাঁদেব মধ্যে একজন বললেন, 'আমবা ওঁর হাসিব গান শুনব।'

যতীন-দা জবাব দিলেন, 'হাসির গানও গাইবে বইকি। সেকালে কি হাসির গান ছিল না? তুমি আবম্ভ করো ভায়া, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি থেকে।'

যতীন-দার সঙ্গে তাঁর কলকাতার বাড়িতে একবার প্রাচীন বাংলা-গান সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়েছিল। আলোচনার দিক দিয়ে এ-বস্তু সাহিত্যিকের কাছে উপভোগ্য হতে পারে, কিন্তু আধুনিক কালের সাধাবণ শ্রোতাদের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রাচীন বাংলা-গান সইবে কেন? যাই হোক, যতীন-দার কথামতো আমি গাইলাম : বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে দাশরথি, মধু কান, নিধুবাবু, প্যারিমোহন কবিরত্ন, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দেওয়ানমশায়, নীলকণ্ঠ প্রভৃতির গান। কবি, ঝুমুর, যাত্রার গানও বাদ গেল না। একমাত্র যতীন-দাই বোধহয় গানগুলি শুনে মুগ্ধ হলেন। অবশ্য যতীন-দা প্রত্যেকটি গানের পর বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, যাতে তাঁরাও মুগ্ধ হন কিন্তু আমার গানের সময় তাঁদের মুখমণ্ডলের ভাব-ব্যঞ্জনায় মুগ্ধ হবার কোনও লক্ষণ আমি দেখতে পাইনি। ঘণ্টা দুই গানের পর আসর ভাঙলো। দু-চারজন প্রবীণ ব্যক্তি আমার পিঠ চাপড়ে তারিফ করলেন বটে, কিন্তু বাদবাকি শ্রোতাদের দেখে মনে হল তাঁবা যদি পিঠ চাপড়াতেন তাহলে সে-স্পর্শ আদৌ প্রশংসাব্যঞ্জক বলে অনুভূত হত না।

নৈশ ভোজনান্তে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর শয্যাগ্রহণ করে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে

আছি। হঠাৎ একটি প্রবল ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, যতীন-দা। যতীন-দা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, 'ওঠো, ওঠো,—যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল।'

তখনও প্রভাত হতে বোধ হয় ঘণ্টা দুই বাকি আছে। যাত্রার দলের ঐকতান-বাদন কানে এল। ঢোলের মেঘগর্জন আমার যে-নিদ্রা ভঙ্গ করতে পারেনি, সেই সুখনিদ্রাটি ভঙ্গ হওয়াতে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। যতীন-দা টেনে নিয়ে চললেন যাত্রা শোনবার জন্যে। ঘণ্টা দুই যাত্রাভিনয় সম্ভোগ করে এসে প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতরাশ ইত্যাদি সমাপনের পর আবার যাত্রার উদ্দেশে যাত্রা।

যাত্রার পালা সাঙ্গ হল আন্দাজ বেলা দশটায়। সেকালে যাত্রাভিনয়ে মুখ্য পালাটি শেষ হবার পর, কোনও কোনও আসরে একখানি ছোট প্রহসনের অভিনয় হত। যাত্রাওয়ালারা এই প্রহসনের জন্যে হয়তো প্রস্তুত হবার আয়োজন করছিলেন, এমন সময় যতীন-দা তাঁদের ম্যানেজারকে ডেকে এনে আমার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললেন, 'আপনাদের আর 'ফার্স' করতে হবে না, সেটা ইনিই করবেন। চলুন, আমি আসরে গিয়ে শ্রোতাদের বলে আসছি।'

যতীন-দা আমাকে কোনও কথা বলবার অবকাশ দিলেন না, হনহন করে চলে যাত্রার আসরের মধ্যে ঢুকে, আমার আসরে অবতীর্ণ হয়ে রঙ্গরস করার কথা শ্রোতাদের কাছে ঘোষণা করে দিলেন।

যতীন-দা ফিরে এলে আমি বললাম, 'এ আপনি কী করলেন? এ আসরে কী করব আমি?'

যতীন-দা আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'লাগিয়ে দাও তোমার 'কাঞ্চনতলার কাপ'। খুব জমে যাবে।

যতীন-দা নাছোড়বান্দা। রাজী হতেই হল 'কাঞ্চনতলার কাপ' গাইতে। এটি একটি ফুটবল-কাপ প্রতিযোগিতার বর্ণনামূলক গান—মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাঞ্চলের গ্রাম্যভাষায় রচিত। আমারই লেখা। যতীন-দা খুব পছন্দ করতেন গানটি। কি আর করি, নেমে পড়লাম যাত্রার আসরে সাজপোশাক পরে—খালি গা, পরনে লুঙি, হাতে লাঠি, মাথায় টুপি। আসরে নেমে যখন ভাবের অভিব্যক্তির সঙ্গে গান ধরলাম—

মামু হে, তু রোহলি ঘরে পোড়্যা,
দেখতে পালিন্যা,
হামি দেখ্নু, লয়ন ভোর্যা;

তখন দর্শকেরা আমাকে দেখবে কি যতীন-দাকে দেখবে, তা ঠিক করতে পারছে না। যতীন-দার সে কী উল্লাস! অভিনয় শেষ করে যখন আমি আসর থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন যতীন-দা সাজঘরে ঢুকে আমাকে একেবারে বুকে জাপটে ধরলেন। ভুজবন্ধন থেকে মুক্ত করে উচ্ছ্বাসভরে বললেন, 'তোমাকে একটা বাঘ পুরস্কার দেব, ঠিক করেছি।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'বাঘ!'

'হাঁ, বাঘ। আমি আয়োজন করছি। কালকেই আমরা বেরোবো শিকারে।'

আমি তো চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বাঘ কিরে বাবা! যতীন-দার মুখ থেকে এ রকম উক্তি আমি আশাই করিনি।

পরদিন সত্যিই আয়োজন চলতে লাগল শিকারে যাওয়ার। যতীন-দার আত্মীয়, নাম-করা শিকারী ভোলানাথ বাগচী হলেন দলপতি। মধ্যাহ্নভোজন সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের

তিন-চার ঘণ্টা অবিশ্রান্ত হেঁটে জমশেরপুর পৌঁছলাম। যতীন-দার বাড়ি বাংলাদেশের প্রাচীনকালের জমিদারদের রুচিসম্মত বিরাট প্রাসাদ। পুজোর সময়, স্বভাবতই বাড়িটা সরগরম হয়েই ছিল, আমি যাওয়াতে যতীন-দা এবং বাড়ির ছেলেমেয়েরা আরও মেতে উঠলেন। যতীন-দা জমিদার হলেও জীবনে অনেক বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু তিনি বোধহয় কখনও প্রচারকের কাজ করেননি। তিনি যে কত বড় সুদক্ষ প্রচারক ছিলেন, সেটা বুঝতে পারলাম জমশেরপুর গিয়ে। আমাকে নিয়ে তিনি জমশেরপুরের বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে লাগলেন। যেন আমার গলায় দড়ি বেঁধে ডুগডুগি বাজিয়ে যতীন-দা সারা গ্রামটিতে আমার প্রচারকার্য চালিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

সমগ্র জমশেরপুর গ্রামটিকেই বাগচী-পরিবারের গ্রাম বললে অত্যুক্তি হয় না। একটি মহা মহীরুহের দিগন্তবিস্তৃত শাখাপ্রশাখা যেন সমগ্র গ্রামটিকে ছেয়ে রেখেছে। বাংলাদেশে এরূপ বৃহৎ পরিবার-অধ্যুষিত গ্রাম আর আছে কিনা জানিনে। গ্রামে শত শত সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন, কৃতবিদ্য ব্যক্তির বাস। তাঁদের মধ্যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীও বহু। সন্ধ্যার পরে যতীন-দার বাড়িতে বসল গানের আসর। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনেকেই এসেছেন আমার গান শুনতে। আসরে এইরূপ শ্রোতার সমাবেশ যে হবে, এটা আমি আগেই যতীন-দার কাছ থেকে জেনে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনী সেন, নজরুল ইসলাম প্রভৃতির কতকগুলি জনপ্রিয় গান গাইব বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু যতীন-দার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। এইসব শ্রোতাদের কাছে আমাকে অসাধারণরূপে জাহির করবার জন্যে যতীন-দা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। তিনি শ্রোতাদের কাছে দেখাতে চান যে, আমি বাংলা গানের কত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক। যতীন-দা আসরের মধ্যে বলে বসলেন, 'গাও তো ভায়া, প্রাচীন বাংলা-গান। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি থেকে শুরু করে শেষ করো রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত-নীলকণ্ঠে।'

শ্রোতাদের মধ্যে দু-চারজন কলকাতায় আমার গান শুনেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমরা ওঁর হাসির গান শুনব।'

যতীন-দা জবাব দিলেন, 'হাসির গানও গাইবে বইকি। সেকালে কি হাসির গান ছিল না? তুমি আরম্ভ করো ভায়া, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি থেকে।'

যতীন-দার সঙ্গে তাঁর কলকাতার বাড়িতে একবার প্রাচীন বাংলা-গান সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়েছিল। আলোচনার দিক দিয়ে এ-বস্তু সাহিত্যিকের কাছে উপভোগ্য হতে পারে, কিন্তু আধুনিক কালের সাধারণ শ্রোতাদের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রাচীন বাংলা-গান সইবে কেন? যাই হোক, যতীন-দার কথামতো আমি গাইলাম : বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে দাশরথি, মধু কান, নিধুবাবু, প্যারিমোহন কবিরত্ন, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দেওয়ানমশায়, নীলকণ্ঠ প্রভৃতির গান। কবি, ঝুমুর, যাত্রার গানও বাদ গেল না। একমাত্র যতীন-দাই বোধহয় গানগুলি শুনে মুগ্ধ হলেন। অবশ্য যতীন-দা প্রত্যেকটি গানের পর বক্তৃতা দিয়ে শ্রোতাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, যাতে তাঁরাও মুগ্ধ হন; কিন্তু আমার গানের সময় তাঁদের মুখমণ্ডলের ভাব-ব্যঞ্জনায় মুগ্ধ হবার কোনও লক্ষণ আমি দেখতে পাইনি। ঘণ্টা দুই গানের পর আসর ভাঙলো। দু-চারজন প্রবীণ ব্যক্তি আমার পিঠ চাপড়ে তারিফ করলেন বটে, কিন্তু বাদবাকি শ্রোতাদের দেখে মনে হল তাঁরা যদি পিঠ চাপড়াতেন তাহলে সে-স্পর্শ আদৌ প্রশংসাব্যঞ্জক বলে অনুভূত হত না।

নৈশ ভোজনান্তে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর শয্যাগ্রহণ করে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে

আছি। হঠাৎ একটি প্রবল ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, যতীন-দা। যতীন-দা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, 'ওঠো, ওঠো,—যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল।'

তখনও প্রভাত হতে বোধ হয় ঘণ্টা দুই বাকি আছে। যাত্রার দলের ঐকতান-বাদন কানে এল। ঢোলের মেঘগর্জন আমার যে-নিদ্রা ভঙ্গ করতে পারেনি, সেই সুখনিদ্রাটি ভঙ্গ হওয়াতে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। যতীন-দা টেনে নিয়ে চললেন যাত্রা শোনবার জন্যে। ঘণ্টা দুই যাত্রাভিনয় সম্ভোগ করে এসে প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতরাশ ইত্যাদি সমাপনের পর আবার যাত্রার উদ্দেশে যাত্রা।

যাত্রাব পালা সাঙ্গ হল আন্দাজ বেলা দশটায়। সেকালে যাত্রাভিনয়ে মুখ্য পালাটি শেষ হবার পর, কোনও কোনও আসরে একখানি ছোট প্রহসনের অভিনয় হত। যাত্রাওয়ালারা এই প্রহসনের জন্যে হয়তো প্রস্তুত হবার আয়োজন করছিলেন, এমন সময় যতীন-দা তাঁদের ম্যানেজারকে ডেকে এনে আমাব দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললেন, 'আপনাদের আর 'ফার্স' করতে হবে না, সেটা ইনিই করবেন। চলুন, আমি আসরে গিয়ে শ্রোতাদের বলে আসছি।'

যতীন-দা আমাকে কোনও কথা বলবার অবকাশ দিলেন না, হনহন করে চলে যাত্রার আসরের মধ্যে ঢুকে, আমার আসরে অবতীর্ণ হয়ে বঙ্গরস করার কথা শ্রোতাদের কাছে ঘোষণা করে দিলেন।

যতীন-দা ফিবে এলে আমি বললাম, 'এ আপনি কী করলেন? এ আসরে কী করব আমি?'

যতীন-দা আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'লাগিয়ে দাও তোমার 'কাঞ্চনতলার কাপ'। খুব জমে যাবে।

যতীন-দা নাছোড়বান্দা। রাজী হতেই হল 'কাঞ্চনতলার কাপ' গাইতে। এটি একটি ফুটবল-কাপ প্রতিযোগিতার বর্ণনামূলক গান—মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাঞ্চলের গ্রাম্যভাষায় রচিত। আমারই লেখা। যতীন-দা খুব পছন্দ করতেন গানটি। কি আর করি, নেমে পড়লাম যাত্রার আসরে সাজপোশাক পরে—খালি গা, পরনে লুঙি, হাতে লাঠি, মাথায় টুপি। আসরে নেমে যখন ভাবের অভিব্যক্তির সঙ্গে গান ধরলাম—

মামু হে, তু রোহলি ঘরে পোড়্যা,
দেখতে পালিন্যা,
হামি দেখ্নু, লয়ন ভোর‍্যা;

তখন দর্শকেরা আমাকে দেখবে কি যতীন-দাকে দেখবে, তা ঠিক করতে পারছে না। যতীন-দার সে কী উল্লাস! অভিনয় শেষ করে যখন আমি আসর থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন যতীন-দা সাজঘরে ঢুকে আমাকে একেবারে বুকে জাপটে ধরলেন। ভুজবন্ধন থেকে মুক্ত করে উচ্ছ্বাসভরে বললেন, 'তোমাকে একটা বাঘ পুরস্কার দেব, ঠিক করেছি।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'বাঘ!'

'হাঁ, বাঘ। আমি আয়োজন করছি। কালকেই আমরা বেরোবো শিকারে।'

আমি তো চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বাঘ কিরে বাবা! যতীন-দার মুখ থেকে এ রকম উক্তি আমি আশাই করিনি।

পরদিন সত্যিই আয়োজন চলতে লাগল শিকারে যাওয়ার। যতীন-দার আত্মীয়, নাম-করা শিকারী ভোলানাথ বাগচী হলেন দলপতি। মধ্যাহ্নভোজন সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের

পর আমরা হাতীর ওপর চড়ে বেরোলাম বাঘ-শিকারে। এ যেন একটা প্রমোদ-ভ্রমণ বলেই মনে হল। কিন্তু এই প্রমোদ প্রমাদে পরিণত হতে বড় বেশী দেরি হল না। এ অঞ্চলে যে বাঘ-লুকোনো জঙ্গল থাকতে পারে, সেটা আমার ধারণার অতীত ছিল। প্রায় মাইল পাঁচ-ছয় যাওয়ার পর সত্যিই একটা ভীষণ জঙ্গল মিলল। তাই তো! সত্যিই বাঘ আছে নাকি?

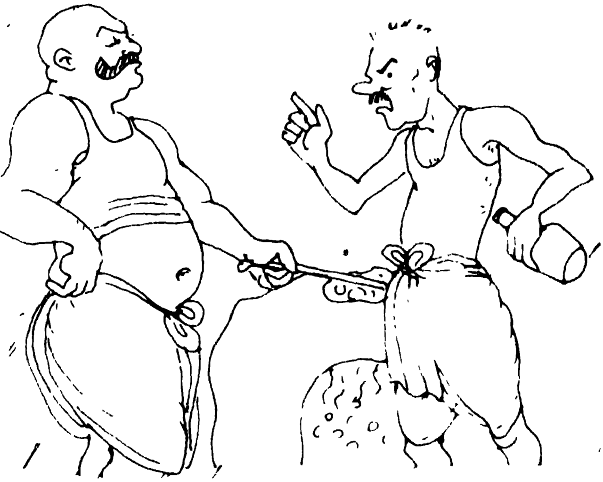
যতীন-দা বললেন, 'জ্যান্ত বাঘ দেখনি ভায়া, আজ দেখবে; আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আর সার্কাসের দলে যেসব বাঘ দেখেছ, তারা সব বেড়ালের বোনপো বনে গেছে, —জ্যান্তে মরা বাঘ। বনের স্বাধীন বাঘ,—দেখবে এক অদ্ভুত ব্যাপার। এ বাঘ যখন চায়, তখন চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ে। এর হাঁ-এর মধ্যে দেখবে হিংস্র ক্ষুধার রূপ। এ বাঘ যখন বনের মধ্যে ছুটে চলে তখন চারদিকে বিদ্যুৎ খেলে যায়।'

বলা বাহুল্য, কবিবরের এ স্বাধীন-ব্যাঘ্র-বর্ণনা আমার কাছে আদৌ শ্রুতি-সুখকর বোধ হল না। হাতী জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে শুঁড় দিয়ে জাপটে ধরে, পা দিয়ে পিষে ফেলে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতে করতে বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে। বাঘকে সে খুঁজে বের করবেই, এই রকম বোখ চেপেছে তার মাথায়। ব্যাপারটা আর সকলের পক্ষে উৎসাহজনক হলেও আমার পক্ষে ক্রমেই উদ্বেগপূর্ণ হয়ে উঠছে। কিছুদূর গিয়ে দেখি, জঙ্গলের মধ্যে একটি মরা ঘোড়া ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে;—চতুর্দিকের মৃত্তিকা তার রক্তে রঞ্জিত। বাঘের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না। প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল, কোন্খান দিয়ে হঠাৎ বাঘ বেরিয়ে পড়ে বা। হাতী চলেছে। কিছুদূর গিয়ে দেখি, একটা বড় গাছের গুঁড়িতে বাঘের থাবার চিহ্ন। প্রত্যেকটি নখচিহ্নের ভিতর সেই গাছের সদা-বের-হওয়া আঠা। মনে হল দশ-পনেরো মিনিট আগে বাঘটি নখ দিয়ে ঐ গাছটি আঁচড়িয়েছে। শিকারী ভোলানাথবাবুর উৎসাহের অন্ত নেই। বন্দুক বাগিয়েই আছেন। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, এ গেছো-বাঘ গাছের থেকেও হাতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। হাওদাবিহীন হাতীর পৃষ্ঠদেশ আদৌ নিরাপদ স্থান নয়। ভগবানের নাম জপ করা ছাড়া আর পরিত্রাণের উপায় খুঁজে পেলাম না। ভগবান ভক্তের কাতর প্রার্থনা শুনলেন। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বেই জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। শিকারী ভোলানাথবাবু বললেন, 'না, আজ শিকার মিললো না। সন্ধ্যা হয়ে এল। চলুন, ফেরা যাক।'

যতীন-দা ভগ্নোৎসাহ হলেন, আমার ধড়ে প্রাণ এল। কাজ নেই আমার পুরস্কারে।

মাতাল

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী



মাতালের ঠিক সংজ্ঞা এখনও নির্ণীত হয়নি। যে মদ্যপান করে তাকেই কি মাতাল বলা চলে? তা বোধ হয় নয়, কারণ 'মাতাল' শব্দটি অপরাধাত্মক তো বটেই এবং প্রয়োগও হয়ে থাকে প্রায় আক্রমণ হিসাবেই। বেদ থেকে আরম্ভ করে আজকের নাটক-নভেল পর্যন্ত মাতালের কেলেঙ্কারী পড়ে, নিজের বা জানাশোনা কোনও মদ্যপায়ী পূর্বাচার্যদের ইতিবৃত্ত শুনে এবং নিজে দেখে বিচার করে লোকে মদ্যপায়ীকে 'মাতাল' বলে গালাগালি দিয়ে থাকে।

অথচ এই মদ অনেকেই খায়। দেশ-বিদেশে ঘুরে নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে যাঁদের আসতে হয়েছে সারা জীবন ধরে, তাঁরাই জানেন যে পরিচিতদের মধ্যে শতকরা অন্তত পঁচিশ জন লোক মদ্যপান করে থাকে। যাঁরা মদ্যপান করেন না তাঁদের মধ্যে শতকরা একটা মোটা অংশ মদ্যপান করেন না—খেতে খারাপ লাগে, বাড়ির ভয়, স্ত্রীর ভয় ইত্যাদি নানা ভয়ে—মদের প্রতি ভয় বা ঘৃণাবশত নয়।

'মাতাল অসহনীয়'—এই বাক্যের মধ্যে কিছু সত্য আছে নিশ্চয় কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। সহনীয় মাতালও আছে। সংখ্যায় কম হলেও এমন লোকও দেখতে পাওয়া যায় যে মদ্যপান করলেও অভদ্র নয় এবং মত্ত অবস্থাতেও যে ভদ্রতা-চ্যুত হয় না। এ কথা ভুললে চলবে না যে, শুধু মধ্যপানের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই 'ভালো'র সংখ্যা অল্পই হয়ে থাকে।

'অধিকারী ভেদ' বাক্যটি যে নিশ্চিত সত্য তা আমরা জীবনের নানা ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। যারা মদ্যপানের অধিকার নিয়েই সংসারে আসে তাদের ছাড়া মদ্যপানের অধিকার

আর কারুর নেই। কিন্তু মুশকিল এই, কে যে সত্যিকারের অধিকারী আগে থেকে তা জানবার উপায় নেই। সকলেই নিজেকে 'অধিকারী' মনে করে সুরু করে দেয় এবং অনধিকারিত্ব প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও ছাড়তে পারে না, তাইতেই মদ্যপায়ীর এত দুর্নাম। যে যুক্তিতে ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দেবতা করা হয়েচে, সেই যুক্তি অনুসারেই মদ্যপায়ীকে 'মাতাল' বলা হয়েছে। ছেলেবেলায় অনেক মাতালই চোখে পড়েছে, তারই কয়েকটা নমুনা এখানে দিচ্ছি।

বাল্যকালে, বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে, 'মাতাল' দেখবার আগেই ভাগ্যগুণে এক মদ্যপায়ীর সংস্পর্শে এসেছিলুম। যাঁর কথা বলছি, তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ ছিল পঁযষট্টি বৎসরের। কিন্তু বয়সের এই বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয়েছিল তার প্রধান কারণ ছিল ভদ্রলোকের অপার ঔদার্য। আমি, আমার ছোট ভাই ও তিনি—এই তিন জনে মিলে আমরা এমন আড্ডা জমিয়েছিলুম যে লোকের চোখে তা বিসদৃশ ঠেকত। এ কথা একদিন শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন—ওরা নিজেরা বুড়ো হয়েছে কি না তাই সবাইকে বুড়ো দেখে। ওদের কথা কানে তুলো না ব্রাদার।

তাঁর অন্তরটি ছিল কাব্যময়। কাছে গিয়ে বসলেই, দু-চারটে এ-কথা-সে-কথার পর প্রায়ই কাব্যের কথা পাড়তেন— অবিশ্যি ইংরিজী কাব্য। কাব্যের অলঙ্কার নয়, কাব্যের ভাবরূপের কথা। বয়সের হিসাবে আমাদের বুদ্ধি একমাত্র 'লেখাপড়া' ছাড়া আর প্রায় সব বিষয়েই একটু 'ইয়ে' থাকলেও কাব্যসাগরে ডুবে মরবার মতন দম তখনও তৈরি হয়নি। কিন্তু কাব্যের অতি সূক্ষ্ম ও জটিল ভাব-স্বপ্নকে যে অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবে তিনি আমাদের অনুভূতিতে পৌঁছে দিতেন তা স্মরণ করে আজও বিস্মিত হই। বালক-মনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে এমন সহমর্মিতা তাঁর ছিল যা কদাচিৎ মেলে।

এই ভদ্রলোক মদ্যপান করতেন। এমনিতেই তাঁর স্বভাবটি ছিল মিষ্টি, কিন্তু যখন মদ্যপান করতেন তখন তাঁর কথাবার্তা, ব্যবহার মধুরতর হয়ে উঠত। সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের 'লেখা-পড়া' নাটকের অভিনয় সুরু হত আর, এই সন্ধ্যে-বেলাটাই ছিল তাঁর মৌতাতের সময়। শনি, রবিবার ও অন্য ছুটির সময় বাড়ির অগোচরে ফুক্‌ফাক্ পালিয়ে মাঝে-মাঝে আমরা দু-ভাই তাঁর আসরে গিয়ে হাজির হতুম। এই দিনগুলির কথা স্মৃতিসাগরের তলায় মহামূল্য রত্নের মতন থিতিয়ে পড়ে থাকলেও তাদের ঔজ্জ্বল্য মাধুর্য আমার সারা-জীবনকে ব্যেপে রয়েছে।

প্রধানত এই কারণেই, হয়ত এর সঙ্গে পূর্বজন্মের কিছু সংস্কার থাকলেও থাকতে পারে—মদ্যপায়ীর প্রতি একটা কৌতূহল ছিল ছেলেবেলায়। বয়সের সঙ্গে চোখ-কান খুলতে লাগল আর মদ্যপায়ীর বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ প্রকট হতে লাগল চোখের ওপর।

সে যুগে অর্থাৎ আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতার রাস্তায় বেরুলে প্রায়ই মাতাল দেখতে পাওয়া যেত। তখনকার দিনের তুলনায় এখন মাতালের সংখ্যা অসম্ভব রকমের বেড়ে গেলেও পথে-ঘাটে মাতালের কেলেঙ্কারি আর দেখতেই পাওয়া যায় না, বলা চলে। তার একটা প্রধান কারণ এই যে, ডেকো-হেঁকো মাতালের চাইতে চোরা-মাতালের সংখ্যা বেড়েছে বেশি।

আমাদের পাড়ায় ছিল হারানের দোকান। তার বাড়ি ছিল আহিরীটোলা অঞ্চলে, আর দোকান ছিল এদিকে। আমাদের জ্ঞান হওয়া এস্তক হারানকে সেই দোকানে দেখেছি। হারান ঘুড়ি তৈরি করত। তার মতন ভাল ঘুড়ি তৈরি করতে কলকাতায় আর কেউ

পারত না। কলকাতা মানে, এখনকার মধ্য ও উত্তর কলকাতা। বালিগঞ্জ বা ভবানীপুরকে কলকাতার মধ্যে ধরা হত না। ভবানীপুরের বাসিন্দারা এদিকে আসতে হলে বলতেন, কলকাতায় যাচ্ছি। ঘুড়ি ছাড়া হারান লম্বা তারের পেছনে কাঠের গোল চাক্‌তি লাগানো 'ফাইল'ও তৈরি করত। সকাল সাতটা-আটটা থেকে বেলা বারোটা, ওদিকে আবার বেলা দু-টো-তিনটে থেকে রাত্রি দশটা অবধি; তার দোকানে গেলেই দেখতে পাওয়া যেত সে কিছু-না-কিছু করছেই—সে ছিল একলা অর্থাৎ কাজের জন্য অন্য কোনও লোক সে রাখত না।

হারান ছিল একেবারে আর্টিস্ট। বড় বড় মোটা বাঁশ এনে পিপীলিকার মতন অধ্যবসায়ে সেই বাঁশ চিরে-চিরে ছোট-ছোট কাঠি করে, সেগুলোকে চেঁচে-ছুলে ঘুড়ির ঝাঁপ তৈরি করত। ছুটির দিন পাড়ার ছেলেরা ঝাঁক বেঁধে হারানের সামনে গোল হয়ে বসে তার কাজ দেখত।

পঞ্চাশের ওপর বয়েস হলেও বুড়ো লোককে সে একেবারেই কাছে ঘেঁষতে দিত না। পাড়া-বেপাড়া যত ছেলের সঙ্গে ছিল তার ভাব আর তারাই ছিল তার বন্ধু।

ছেলেদের কারুর আসল নাম ধরে সে ডাকত না! প্রত্যেকেরই একটা করে সে নাম দিয়েছিল আর সেই নামেই তাকে ডাকত। নামকরণ করার মধ্যেও বিশেষত্ব ছিল—প্রত্যেকের নামই ছিল কোন আনাজের বা সবজির, যেমন— আলু, পটল, ঝিঙে, করলা ইত্যাদি। মানবকের আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে শাক-সবজির আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আবিষ্কার করবার প্রতিভা ছিল তার আশ্চর্য রকমের।

একবার পাড়ায় একজনেরা এল। তাদের বাড়ির একটি ছেলে ম্যালেরিয়ায় ভুগে-ভুগে খুবই কাহিল হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটির সঙ্গে দু-দিনেই আমাদের খুব ভাব জমে গেল। নতুন বন্ধুটিরও ছিল ঘুড়ি ওড়াবার সখ। একদিন বিকেলে তাকে নিয়ে হারানের দোকানে গিয়েছি ঘুড়ি কিনতে—ছেলেটির গায়ে ছিল সবুজ জমির ওপর লম্বালম্বি সাদা ডোরাকাটা সার্ট। হারান তখন ঘাড় নীচু করে ঘুড়ির কাঁপ চাঁচছিল। আমার সাড়া পেয়ে মুখ তুলে চেয়েই বললে—হ্যাঁ ভাই রাঙা-আলু, এই চিচিঙ্গেকে কোথা থেকে জোগাড় করলে ভাই?

বলা বাহুল্য, হারান আমাকে রাঙা-আলু বলে ডাকত। আমাদের সেই নতুন বন্ধুর নাম ছিল মনমোহন, ডাক নাম মোনা। জমিদারের একমাত্র ছেলে, বাড়িতে ও দেশে দোর্দণ্ড প্রতাপ তার। শিশু অবস্থা থেকে আজ্ঞে, হুজুর, বাবু শোনাই তার অভ্যেস। নেহাত ম্যালেরিয়ার ঠেলায় কলকাতায় চলে এসেছে—তাকে কি না চিচিঙ্গে। মনমোহন তো রেগে একেবারে টং হয়ে গেল। সেও ঘুড়ি কিনতে এসেছিল কিন্তু ঘুড়ি না কিনেই চলে এল। আমাকে বললে—ঐ ছোটলোকটার সঙ্গে এত ভাব কেন রে তোর? তোকে রাঙা আলু বলে আর তুই কিছু বলতে পারিস নে?

সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে চিচিঙ্গের সঙ্গে হারানের এমন ভাব জমে গেল যে তার বাড়ির লোকেরা পর্যন্ত বলতে লাগল—দিন রাত্রি একটা বুড়োর সঙ্গে তোর এত কথা কিসের রে?

হারানের হাল-চালই ছিল এক রকমের! চমৎকার রং-বেরংয়ের ঘুড়ি সে তৈরি করত কিন্তু আমাদের মনের মতন রং বেছে ঘুড়ি কেনবার উপায় ছিল না। প্রতিদিন তার দোকানের দরজায় একখানা শ্লেট ঝুলত আর তাতে লেখা থাকত—আজ এক-ঘয়লা,

আজ সতরঞ্জি, আজ পাল্কিওয়ালা ইত্যাদি। এক দিনে নানা রংয়ের ঘুড়ি বিক্রি না করার পক্ষে তার যুক্তি ছিল এই যে, রং-বেরংয়ের ঘুড়ি উড়লে আকাশ মানায় না। আমাদের যুক্তি ছিল ঠিক তার উলটো, কিন্তু আমাদের কোন কথাই সে মানত না। সে বলত—তবে অন্য জায়গা থেকে কিনে আনো—আজ শেলেটে যখন লেখা হয়ে গেছে এক ঘয়লা তখন অন্য ঘুড়ি আর এখানে বিক্রি হবে না।

আর বলতুম—ওঃ, একেবারে হাইকোর্টের বিচার!

হারান হেসে-হেসে বলত—আমার বিচার হাইকোর্টের বিচারের বাড়া! বুঝলে ভাই রাঙা-আলু, হাইকোর্টের রায় আপিলে টলে যেতে পারে কিন্তু হারানের বিচার কোনও আপিলেই টলে না।

এমনি অদ্ভুত ছিল তার হাল-চাল।

একদিন বিকেলে হারানের দোকানে ঘুড়ি কিনতে গিয়ে দেখি, পাড়ার ছয়-সাতটি ঘুড়ি-উড়িয়ে ছেলে হারানের সামনে উবু হয়ে বসে রয়েছে। বিমর্ষ তাদের মুখ—সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে গালে হাত দিয়ে মাটির দিকে চেয়ে বসে আছে হারান। সেই পরিস্থিতির গাম্ভীর্য রক্ষা করে ইশারাতে একজনকে জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপার কি?

বন্ধু কোনও কথা না বলে ইশারাতেই হারানকে দেখিয়ে দিলে।

কিছুই হদিশ না পেয়ে হারানকে বললুম—একখানা দেড়-তে ঘুড়ি দাও তো?

হারান এতক্ষণ মুখ নীচু করেই ছিল। আমার আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে অতি কাতরভাবে বললে—আজকে আর ঘুড়ি বিক্রি হবে না ভাই রাঙা-আলু।

তার মুখের চেহারা দেখে ও কথা শুনে মনে হল, বাড়িতে কেউ মারা-টারা গেছে। সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে হারান।

হারান স্বভাবতই বক্-বক্ করতে ভালবাসত। দু-হাতের সঙ্গে তার মুখও সমানে চলতে থাকত। এক-এক দিন ঘুড়ি কিনতে গিয়ে তার বক্বকানি শুনতে-শুনতে এত দেরি হয়ে যেত যে পালিয়ে আসতে হত। অনেকক্ষণ বাক্-সংযম করে এবার তার ধৈর্যচ্যুতি হল। হারান সুরু করলে—আরে ভাই রাঙা-আলু কি বলব! আজ কদিন থেকে ওপরের কষের একটি দাঁত ঢক্-ঢক্ করে নড়ছে। কাল রাত থেকে জিভটা লেগে গেছে সেই দাঁতটার পেছনে, দাঁতটাকে ওখান থেকে সে তাড়াবেই তাড়াবে—খেতে, শুতে, কাজ করতে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। জিভটাতে বেশ করে মনের লাগাম চড়িয়ে টেনে নিয়ে এসে কাজ করতে শুরু করি আর সেই সুযোগে জিভটা আবার দাঁতের পেছনে লেগে যায়। আরে ভাই, কাজ করব হাতে মন থাকবে হাতধরা, তবেই তো হাতের কাজ হবে! তা সেই মনই যদি হাত থেকে ছুটে গিয়ে জিভের সঙ্গে যোগ দেয় তো হাতের কাজ কি করে হয়!

কাজ করতে না পারার এমন কিন্টারগার্টেনীয় ব্যাখ্যা শুনে হাসি পেলেও চেপে যেতে হল। বললুম—ও দাঁতটা তুলিয়ে ফেল।

হারান একটু বক্র-হেসে বললে—রাঙা-আলু ভাই, তুমি আমায় ছেলেমানুষ পেয়েছ! এই ঝিঙে-ভাইও বলছিল দাঁতটা তুলে ফেলতে। কিন্তু আমি ঠিক করেছি, শুধু ওটা নয়, বত্রিশ-পাটি দাঁতই তুলে ফেল্‌ব।

হারান ছিল ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, হঠাৎ তার ঐ সর্বনাশা স্পৃহা দেখে আমরা ভড়কেই গেলুম। ঝিঙে জিজ্ঞাসা করলে—কেন! সবগুলো তুলবে কিসের জন্য?

হারান বললে—ঝিঙে-ভাই, ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই। একটা দাঁতে যদি এক হপ্তার

কাজ বন্ধ করে, তা হলে বত্রিশটাতে ক'হপ্তা হয় বল দিকিন? এত দিন যদি কাজ না করতে পারি তা হলে আমার যন্ত্রণা ভোগ ও ক্ষেতির কথা ছেড়েই দাও, কত লোকের কত রকমের অসুবিধা হবে বল দিকিন? কাজ কি ভাই অত হাঙ্গামার! শাস্ত্রে বলেছে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই, ব্যস্।

এই রকম সব পাকা-পোক্ত হিসাব ও যুক্তির বাঁধনে হারান রাজ্যের ছেলের মন বেঁধেছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর এক জন বললে — আমাদের হারানের বুদ্ধি আছে, যে যাই বলুক।

কথাটা শুনে হারান বেশ খুশী হয়ে বললে—ট্যাঙ্স্ ভাই, তোমাদের এই ঘুড়িওয়ালা হারান অনেক হারানবাবুর চেয়ে বুদ্ধি ধরে বেশী। যদি বল, তবে তুমি এ কাজ করছ কেন, হাইকোর্টের জজ হলেই তো পারতে। তার উত্তরে আমি বলব, বুদ্ধি কম থাকার দরুণ যে হাইকোর্টের জজ হতে পারিনি তা নয়—এ কাজ করাচ্ছে আমার নেয়ৎ।

এই বলে হারান একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে।

তাকের ওপরে তাড়া করা ঘুড়ি রয়েছে দেখে বললুম—ঐ তো অত ঘুড়ি রয়েছে, দাও না।

হারান বললে—তা কি হয়। আজ আর ঘুড়ি বিক্রি হবে না ভাই, সব বাড়ি যাও।

বিকেল বেলাটা হল মাটি। ঘুড়ির বদলে—হারান কাল দাঁত তোলাবে এই সংবাদটি সংগ্রহ করে সেদিন যে-যার বাড়ি ফেরা গেল।

পরের দিন বিকেলে হারানের দোকানে গিয়ে দেখলুম বেশ নিবিষ্ট চিত্তে সে কাজ করছে। একখানা ঘুড়ি কিনে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হারান, দাঁত তুলিয়েছ না কি?

হারান বললে— দেখ ভাই বাঙা-আলু, কাল সারা-রাত্রি ঘুমইনি, খালি ভেবেছি। ভেবে দেখলুম যে, দাঁতের উপর খুবই অবিচার করা হচ্ছে। আচ্ছা, দাঁতের ব্যথা না হয়ে যদি পায়ে যন্ত্রণা হত তা হলে পা-টা কেটে তো আর ফেলে দিতে পারতুম না। আরে, নড়া-দাঁতের ধর্মই হল কটকট ঝনঝন করা। মন যদি ওদিকে যায় তো মনের দোষ—মনের দোষে দাঁতকে কেন সাজা দেব। ঠিক বলছি কি না, বল তুমি?

ঠিক বলছ, বলে তখনকার মতন পালিয়ে বাঁচলুম।

তখনকার দিনে বৌবাজার থেকে আরম্ভ করে সেই গ্রে স্ট্রীট অবধি বড়-রাস্তার ওপরেই অনেকগুলো মদের দোকান ছিল। পথচারীরা এক পোয়া রাস্তা দূর থেকেই নাকে কাপড় দিত আর দোকানের কাছাকাছি এসে দিত কান চাপা। দোকানের ভেতরে সেই সকাল থেকে রাত সাড়ে নটা অবধি অসংখ্য মাতাল তারস্বরে গান, তর্ক, চ্যাঁচামেচি ঝগড়া করতে থাকত। সরকারী হুকুমে এই সব দোকান এখন বড়-রাস্তার ধারে সরু-সরু গলির মধ্যে উঠে গেছে। এতে তিন পক্ষই হয়েছে খুশী। বড়-রাস্তা থেকে একটা বীভৎস দৃশ্য সরে গেছে। মাতালেরাও বেঁচেছে—ঢুকতে বেরুতে চেনা-লোকের চোখে পড়া, রাস্তায় বেরিয়ে দু-কদম যেতে না যেতেই পুলিশ কনস্টেবল, যারা মালদার মাতাল শিকার করবার জন্যই ওৎ পেতে বসে থাকত, তাদের খপ্পরে পড়া ইত্যাদি হাজার হাঙ্গামা থেকে রক্ষা পেয়েছে। দোকানদারেরাও খুশী, কারণ তাদের খদ্দের বেড়েছে।

আগেই বলেছি, সেকালে প্রায় সব সময়েই রাস্তায় ভদ্রলোক, ছোটলোক সব শ্রেণীরই মাতাল দেখতে পাওয়া যেত। 'সুরাপানে সাম্য ভাব প্রবল হয়' কথাটা খুবই সত্যি। কারণ

সম্প্রদায়গত প্রভেদ থাকলেও ব্যবহারগত প্রভেদ তাদের মধ্যে বিশেষ দেখতে পাওয়া যেত না। কেউ নাচছে, কেউ গাইছে, কেউ বা কাল্পনিক শত্রুর উদ্দেশে হাত-পা ছুঁড়ছে, আধ-আধ ভাষায় এড়িয়ে গালাগালি দিচ্ছে। হয়ত দুই প্রাণের বন্ধু একসঙ্গে বসে মদ্যপান করে ফিরছে, পথে কি তর্ক হতে হতে লেগে গেল তুমুল কাণ্ড—বাড়াবাড়ি করলে পুলিশে রুলের গুঁতো লাগাতে-লাগাতে টেনে নিয়ে যেত থানায়। কেউ বা পথের ওপরেই হাত-পা চিতিয়ে লম্বা—বসন অসংবৃত, সংজ্ঞা নেই। সামনে বাড়ির লোকেরা বালতি-বালতি জল এনে মাথায় ঢালছে—দেখে-দেখে শিউরে উঠতুম আর ভাবতুম, এমন আত্মবিস্মরণকারী অসংযম লোকে মূল্য দিয়ে কেনে কেন?

হারান বলত—ব্যাটারা যা হজম করতে পারবি-নে তা গিলিস্ কেন!

এমন যে বুদ্ধিমান, দার্শনিক হারানচন্দ্র, নেহাত বরাতে নেই বলে যে হাইকোর্টের জজ্ না হয়ে চিঠির ফাইল ও ঘুড়ি ম্যানুফ্যাক্চার করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে, সেও মদ্যপান করত—তবে বছরে একবার মাত্র।

একদিন ইস্কুলে যাবার জন্য পথে বেরিয়েই দেখি, হারান তার পাশের পরোটাওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে সেই দোকানদারকে গাল পাড়ছে। হারানের এতদবস্থা এর আগে কখনও চোখে পড়েনি! চোখাচোখা বোলচাল ছাড়লেও ঝগড়া-ফ্যাসাদকে সে অত্যন্ত অপছন্দ করত এবং তা থেকে দূরে থাকবার জন্য আমাদেরও উপদেশ দিত!

আস্তে-আস্তে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে হারান?

'চোপরাও'—বলে সে এমন চেঁচিয়ে ধমক ছাড়লে যে দশ হাত দূরে ছিটকে গেলুম। বাপ রে! ব্যাপার কি!

ইতিমধ্যে আরও গুটিকয়েক পাড়ার ছেলে বই বগলে সেখানে এসে জমা হল। হারান আমাদের উদ্দেশে চীৎকার করে বলতে লাগল—ছেলেমানুষ আছ ছেলেমানুষের মতন থাকবে—ইস্কুলে যাচ্ছ সিধে ইস্কুলে চলে যাও সব।

কথাগুলো বলেই হারান আবার পরোটাওয়ালাকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করলে।

পরোটাওয়ালা হিন্দুস্থানী হলেও বাংলা ভাষা বেশ ভালই বুঝতে পারত ও বলতে পারত। কিন্তু পাছে সেই ভালো-ভালো অভিধান-বহির্ভূত বাক্যগুলি পরোটাওয়ালার বুঝতে কষ্ট হয় সেজন্য হারান সেগুলিকে হিন্দীতে তর্জমা করে বলতে লাগল, আর তাই শুনে রাস্তার লোকেরা হো-হো করে হাসতে আরম্ভ করে দিলে। একাধারে নতুন ধরনের গালাগালি আর সেই অদ্ভুত হিন্দী ভাষা শোনবার জন্য ক্রমেই ভীড় বাড়তে লাগল।

একটা জিনিস বরাবর দেখেছি যে বাঙালীর পেটে মদ পড়লেই, প্রায় ক্ষেত্রেই সে ইংরিজী, হিন্দী, উর্দু, ফরাসী ভাষায় বুলি কাটতে শুরু করে—ইংরেজ কিংবা ফরাসী মাতালকে স্প্যানিশ কিংবা তুর্কী ভাষায় কথা বলতে শুনিনি। যা হোক্, হারান সেই অদ্ভুত হিন্দী ভাষায়—যা একমাত্র হারান ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না অথচ সকলেই বুঝতে পারে—পরোটাওয়ালাকে গালাগালি দিয়ে চলল।

পরোটাওয়ালা লোকটা ছিল আকাট ষণ্ডা। আশ-পাশের যত হিন্দুস্থানী দোকানদারদের মুরব্বী ও ভরসাস্থল ছিল সে। হারানের মতন দশটাকে সে খালি হাতেই পাট করে দিতে পারত। কিন্তু দেখলুম যে, হারানের সম্বন্ধে নির্বিকার হয়ে সে নিজের কাজ করে চলেছে।

কৌতূহল সম্বরণ করা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। পরোটাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে

ফেলা গেল—কি হয়েছে, হারান তোমাকে এত গালাগালি দিচ্ছে কেন?

পরোটাওয়ালা তার নির্বিকারত্ব বজায় রেখেই বললে— কি আবার হবে! ব্যাটা সরাব টেনেছে।

কথাটা শুনে মনের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগল—দুঃখের নয়—চমকের। মনে হল—অ্যাঁ, হারানও সরাব খায়! ইস্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে অমন মজা ছেড়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হল।

ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি, সে এক বিরাট ব্যাপার! পরোটার দোকানের সামনে খুব ভিড়, তার মধ্যে বই-হাতে ইস্কুল-ফেরৎ ছেলেই বেশি। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে দেখি হারান ও পরোটাওয়ালা দু-জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—হারানের হাতে ঘুড়ির সরু একটা কাঁপ আর পরোটাওয়ালার হাতে সরু মাথা-বাঁকানো লম্বা একটা লোহার শিক, যা দিয়ে তাদের সেই বিপুলগর্ভ উনুনে খোঁচা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু পরোটাওয়ালার হাতের অস্ত্র হারানের হাতের অস্ত্রের চেয়ে ঢের বেশি ভয়াবহ হলেও হারানের মুখনিঃসৃত মিনিটে পঞ্চাশটা বোমার আঘাতে সে ব্যক্তি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে—একেবারে সম্মোহিত অবস্থা।

রাস্তার লোক সেই মজা দেখতে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। এক ভদ্রলোক হারানকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে হ্যাঁ?

হারান হুঙ্কার ছেড়ে বললে—কি হয়েছে! কি হয়েছে এই মেড়োকে জিজ্ঞাসা কর।

পরোটাওয়ালা বলতে লাগল—বাবু, লোকটা সরাব খেয়ে আজ সকাল থেকে আমার দোকানের সামনে এই হাঙ্গামা লাগিয়েছে। সারাদিন এই ভিড়, খদ্দের আসতে পারছে না, সকাল থেকে বিক্রি-বাটা আমার বন্ধ হয়ে গেছে।

হারান তার হাতের অস্ত্র আপ্‌সাতে-আপ্‌সাতে বললে— তোর দোকানে কেউ পা দেবে না, শালা চোর!

পরোটাওয়ালা একবার চোখ পাকিয়ে হারানের দিকে চেয়ে আবার সেই ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বললে—দেখছেন!

ভদ্রলোকটি উদাসভাবে বললেন—পুলিশে খবর দাও।

সেদিন এক চোর-ডাকাত ছাড়া পুলিশকে ভয় করে না এমন বাপ লাখে একটা মিলত কি না সন্দেহ। পুলিশের নাম হওয়া-মাত্র ভিড় পাতলা হয়ে গেল। পরোটাওয়ালা গুটি-গুটি তার দোকানে উঠে উনুনের সামনে গিয়ে বসল। হারান কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে—এমন সময় একটি ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—ঐ লাল পাগড়ি—

আর যায় কোথা! হারান দৌড়ে, গড়িয়ে, হামাগুড়ি দিতে-দিতে নিজের দোকানে ঢুকে পড়ল।

শোনা গেল, বছর কয়েক আগে হারান একদিন একখানা পরোটা কিনেছিল, তাতে দোকানদার নাকি তরকারি দিয়েছিল কম। সেদিন থেকে হারান যতবার মদ্য পান করে ততবারই নাকি সেই একদিন কম তরকারি দেওয়ার জন্য—যে তরকারি পরোটার সঙ্গে স্রেফ দয়া করে দেওয়া হয়ে থাকে—হাঙ্গামা করে।

বাড়িতে এসে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসতে না বসতেই হারানের হুঙ্কার শোনা যেতে লাগল। বাড়িতে একজন গুরুস্থানীয়া মহিলা বললেন—আজ তোমাদের হারান মদ খেয়ে সকাল থেকে রাস্তায় এমন হাঙ্গামা লাগিয়েছে যে কান পাতা যাচ্ছে না।

আর একজন বললেন—অমন লোকের কাছ থেকে কারুর কোনও জিনিস কেনা উচিত নয়।

ঘুড়ির মাধ্যমে হারানের কিছু-কিছু গুণ আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে, হচ্ছে বা হবার সম্ভাবনা আছে—এই রকম কিছু মন্তব্য আশা করছিলুম সে তরফ থেকে, কিন্তু সে রকম কিছু না হওয়ায় তাড়াতাড়ি খেয়ে আবার ছুটলুম হারানের খেল্ দেখতে।

গিয়ে দেখি যে, হারান আবার আসরে নেমেছে। চারিদিকে আগের চাইতে ভিড় বড় বেশি। অবস্থা তার খুবই খারাপ, পা টলমল করছে, কথাবার্তা যা বলছে তা শুনে মনে হচ্ছে যে কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সে অসুবিধার জন্য কথা কিছু কম বলছে না।

শোনা গেল, পুলিশের নামে ভয় পেয়ে দোকানে ঢুকে সে উপরি-উপরি কয়েক পাত্র টেনে এমন দুঃসাহস সঞ্চয় করে এসেছে যে রনাঙ্গণে ভূপাতিত হবার আগে নড়বে বলে মনে হয় না।

হারান মদ-দর্পে টলে-টলে পরোটাওয়ালাকে ইংরিজী ও হিন্দীতে মিলিয়ে উচ্চরবে উপদেশ দিচ্ছে, এমন সময় ভিড়ের সামনেই কোথা থেকে একটা ভাড়াটে গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ির ভেতর থেকে জন চারেক ভদ্রবেশধারী যুবক টপ্ টপ্ করে ভিড় ঠেলে একেবারে হারানের সামনে এসে দাঁড়াল। একজন জিজ্ঞাসা করলে—এ কি কেলেঙ্কারি হচ্ছে?

হঠাৎ তাদের আবির্ভাবে হারান একেবারে হ-য-ব-র-ল। সে কি একটা বললে বটে, কিন্তু তা বুঝতে পারা গেল না।

একজন ধমকের সুরে বললে—চল, বাড়ি চল।

এবার হারান অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে একবার যা যা— বলে সে অবস্থায় যতখানি তাড়াতাড়ি সম্ভব দোকানের দিকে দৌড় দিলে। আগন্তুকেরা আর বাক্যব্যয় না করে হারানকে ধরে একেবারে কোলপাঁজা করে তুলে ফেল্‌লে। হারান হাত-পা ছুঁড়ে কি সব বলতে লাগল কিন্তু ততক্ষণে তারা তাকে গাড়ির মধ্যে পুরে ফেলে গাড়োয়ানকে ইঙ্গিত করতেই গাড়িখানা ছুটে বেরিয়ে গেল।

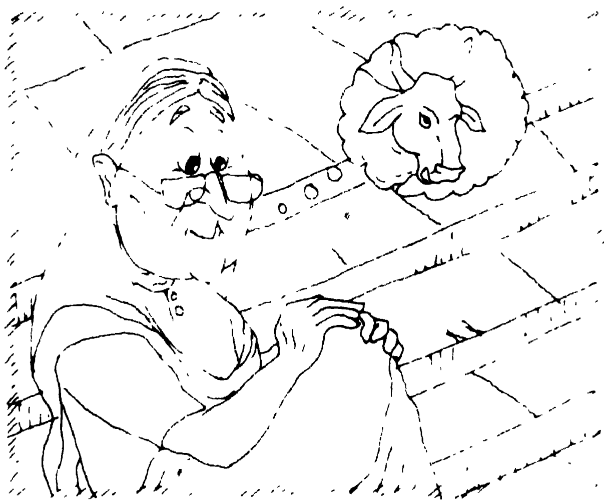
এক মিনিটের মধ্যেই ভিড় একেবারে সাফ্। শুনলুম, ওরা হারানের ছেলে। মদ খেয়ে বাড়াবাড়ি করলে কি করে যে ওরা টের পায় তা কেউ জানে না। প্রতিবারেই হঠাৎ এসে পড়ে আর কথা বলতে না দিয়ে তারা বাপকে ঐ রকম চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে যায়।

পরদিন ইস্কুল থেকে ফেরবার মুখে দেখলুম, হারান লক্ষ্মী ছেলের মতন ঘাড় হেঁট করে ফাইল তৈরি করছে।



দ্রবময়ীর কাশীবাস

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



দু'দিন থেকে জিনিসপত্র গুছনো চললো। পাড়ার মধ্যে আছে মাত্র তিনঘর প্রতিবেশী—কারও সঙ্গে কারও কথাবার্তা নেই। পাড়ার চারিধারে বনজঙ্গল, পিটুলি গাছ, তেঁতুল গাছ, বাঁশঝাড়, বহু পুরনো আমকাঁঠালের বাগান। দ্রব ঠাকরুনের বাড়ির চারিধারে বনে বনে নিবিড়, সূর্যের আলো কস্মিন্‌কালে ঢোকে না, তার ওপর বাড়ির সামনে একটা ডোবা, বর্ষার জলে টইটম্বুর, দিনরাত 'ঘাঁওকো' 'ঘাঁওকো' ব্যাঙের একঘেয়ে ডাক, দিনেরাতে মশার বিন্‌বিনুনি।

দ্রব ঠাকরুনের নাতি বল্লে—ঠাক্‌মা, সাবু আছে ঘরে, না বাজার থেকে আনবো?

দ্রব ঠাকরুনের কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ শোনাল, কারণ আজ দু'মাস কাল তিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন—পালাজ্বর, ঘড়ির কাঁটার নিয়মে তা আসবে একদিন অন্তর অন্তর ঠিক বিকেল বেলাটিতে। দ্রব ঠাকরুন পুরনো কাঁথা-লেপ চাপা দিয়ে পড়বেন, উঃ আঃ করবেন—জ্বরের ধমকে ভুল বকবেন।

ও বাড়ির ন'ঠাকরুন এসে জিজ্ঞেস করবেন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে—বলি ও দিদি, অমন করচ কেন? জ্বর এল নাকি?

—আর ন'বৌ। মলেই বাঁচি। নিত্যি জ্বর, নিত্যি জ্বর— ওরে মা রে, হাত-পা কি কামড়ানটা কামড়াচ্চে!...একটু উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবে না—এ কি কাণ্ড, হ্যাঁ গা?

পরে মিনতির সুরে বললেন—ও ন'বৌ, নক্ষ্মী দিদি, শীত তো আজ ভাঙলো না, কাঁথা গায়ে দিইচি, নেপ গায়ে দিইচি—তুমি ওই বাঁশের আল্‌নায় পুরনো তোশকটা

পেড়ে আমার গায়ে যদি দিয়ে দ্যাও—

—চেপে ধরবো, হ্যাঁ দিদি?

—ধ-বো—ন-বৌ— চেপে ধ-বো—আমার হ-য়ে গেল!

—ভয় কি, অমন কোরো না ছিঃ। টেবু আসবে চিঠি পেলেই, কানু আসবে, বিন্দে আসবে—তোমার নাতিরা বেঁচে থাক্, অমন সোনার চাঁদ নাতি সব, ভাবনা কি তোমার দিদি?

—কে-উ—আ-মা-কে—দে-খে-না—ন'-বৌ—

—কেন দেখবে না দিদি—সবাই দেখবে। তুমি বেশি বোকো না, চুপটি করে শুয়ে থাকো—

—আমার গো-রু, গো-রু উ-ত্ত-র মা-ঠে—

—কোথায় গোরু দিয়ে এসেছিলে?

—জ-টে গ-য়-লা-র অ-ড-ল ক্ষে-তে-র পাশে—

—আচ্ছা আমি এনে দেবো এখন গোরু! আমারও গোরু রয়েচে জটে গোয়ালার জমির কাছেই। তুমি শুয়ে থাকো।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে বৃদ্ধা ন'ঠাকরুন আবার এসে জানালায় দাঁড়িয়ে বল্লেন—কম্প থেমেচে দিদি?

ক্ষীণস্বরে লেপ-কাঁথার ছেঁড়া স্তূপের মধ্যে থেকে জবাব এল—গোরু! আমার গোরু তো—

—কোনও ভয় নেই। সে আমি এনেচি। কম্প থেমেচে?

—হুঁ।

সারা বর্ষা দ্রবময়ী এমনি ম্যালেরিয়ায় ভোগেন। তাঁর বড় নাতি শ্রীশচন্দ্র ওরফে টেবু কাজ করে ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায়, মেজ নাতি পাক্‌শীতে ই. বি. আর.-এ—ছোট নাতিও ওদিকে যেন কোথায় থাকে। বড় নাতি ছাড়া অন্য দুটি অবিবাহিত, বড় নাতির আবার একটি ছেলেও হয়েছে। আজ বছর পাঁচ-ছয় আগে বড় নাতি ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ি এসে দিন সাতেক ছিল। নাতবৌ মনোরমা হুগলী জেলার মেয়ে, সে এখানে এসে নাক সিঁটকে থাকে, 'বাড়ি তো ভারি, মোটে একখানা চালাঘর, ছেঁচার বেড়া, এমনিধারা জঙ্গল যে, দিনমানেই বুনো শূওর লুকিয়ে থাকে—মশার তো ঝাঁক। মাগো, কি কাদা ঘাটের পথে! এখানে কি মানুষ থাকে নাকি?' মনোরমার খাঁড়ার মত নাক আরও উঁচু ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সাতদিন পরে দ্রবময়ীকে নাতির ছেলে খোকনমণির মায়া কাটাতে হয়। তাঁর চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

ন'ঠাকরুনকে বলেন—সুদের সুদ, ও যে কি মিষ্টি তা তোমাকে কি বোঝাব ন'বৌ—

দ্রবময়ীর আকুল ক্রন্দনের মধ্যে যে কত কালের পিপাসিত প্রতীক্ষা সুদূর ভবিষ্যতের দিকে নিষ্পলকে চেয়ে আছে, স্বামীহীনা বন্ধ্যা বিধবা ন'ঠাকরুন তা বুঝতে না পেরে কেমন অবাক হয়ে যান, হয়তো বা ভাবেন—দিদির সবই বাড়াবাড়ি!

ন'ঠাকরুন আপনার জন কেউ নয়—পাড়ার পাশের বাড়ির প্রতিবেশিনী মাত্র। বছরের মধ্যে গড়ে তিন-চার মাস দুই বৃদ্ধার মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়, মুখ দেখাদেখি থাকে না—তবুও ঝগড়া কেটে গেলে পাড়ার মধ্যে একমাত্র ন'ঠাকরুনই দ্রবময়ীকে দেখাশুনো করেন সব চেয়ে বেশি, জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে তাঁর গোরুটাও নিজের

গোরু দুটোর সঙ্গে মাঠে বেঁধে দিয়ে আসেন, একটু সাবু হয়তো করে নিয়ে আসেন, অন্তত জানালায় উঁকি মেরে দু'একটা কথাও বলেন।

কিন্তু এবার দ্রবময়ী যেন ভুগচেন একটু বেশি।

আষাঢ় মাসের প্রথম থেকে জ্বর শুরু হয়েচে, মাঝে মাঝে প্রায়ই ভোগেন।

শরীর দুর্বল হয়ে পড়েচে—ঘোর অরুচি তার ওপর। পালাজ্বরে ধরেচে আজ মাস-খানেক।

সন্ধ্যার দিকে দ্রবময়ী লেপ তোষক ফেলে ঝেড়ে উঠলেন। পালাজ্বরেব কম্প থেমে গিয়েচে। জ্বর যদিও এখনও যায় নি—মুখ তেতো, মাথা ভার, শরীর ঝিম্‌ঝিম্ কবচে।

ডাক দিলেন—ন'বৌ, গোরু এনেচ দিদি?

দু'তিনবার ডাকের পর ন'ঠাকরুন উত্তর দিলেন—কে ডাকে? দিদি? ঠেলে উঠেচ?

—বলি আমার গোরুডো কি এনেচ মাঠ থেকে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। গোরু গোরু করেই মলে শেষকালডা? জ্বর ছেড়েচে?

—ছেড়েচে-ছেড়েচে। বলি গোরু কোথায় বেঁধে বাখলে?

—গোয়ালে গো গোয়ালে—ক্ষেপলে যে গোরু গোরু করে—

কেরোসিন তেল একটা টেমিতে একটুখানি ছিল, দ্রব ঠাকরুন টেমিটা জ্বালালেন। আমড়া গাছে একটা তেড়ো পাখি আর একটা তেড়ো পাখিব সঙ্গে কথাবার্তা কইচে। দ্রব ঠাকরুনের জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কে মনে হল পাখি দুটো বলচে —

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—
দ্বিতীয়। ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ—
প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—
দ্বিতীয়। ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ—
প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

দ্রব ঠাকরুন বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কি একঘেয়ে আওয়াজ রে বাপু। চালাচ্চে তো চালাচ্চেই, আধঘণ্টা হয়ে গেল—একে মাথা ধরে আছে, ভালো লাগে? থাম্ না বাপু। মানুষে জানোয়ারে সবাই মিলে পেছনে লাগলে কি করে বাঁচি—

গোহালে গিয়ে দ্রব ঠাকরুন মুংলি গোরুকে দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করলেন। মুংলি না খেলে তাঁর খাওয়া হয় না, এই বনজঙ্গলে ঘেরা নির্জন স্বামীর ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছেন, সবাই ছেড়ে গিয়েচে তাঁকে, কতক স্বর্গে কতক বা বিদেশে। তাঁর দুই ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি, নাতনী—একঘর বড় গেরস্ত, যদি সবাই থাকতো আজ বজায়!

কেউ নেই আজ। মুংলিকে নিয়ে তিনি একা পড়ে আছেন গোপীনাথপুরের ভিটেতে। তাই গোরুটাকে অত ভালোবাসেন, মাঠে বেঁধে দিয়ে বার বার করে দেখে আসেন, নদীতে জল খাওয়াতে নিয়ে যান।

সকালে উঠে দ্রব ঠাকরুনের মনে হল খিদের চোটে তিনি দাঁড়াতে পারচেন না। বাড়ির পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ডুমুর গাছ থেকে ডুমুব পেড়ে আনলেন, দুটো সজনে শাক পাড়লেন উঠোনের গাছ থেকে। ঘাটেব পথে মুখুজ্যে গিন্নীর সঙ্গে দেখা। মুখুজ্যে গিন্নীর ছেলে ক'টি লেখাপড়া শেখে নি, গাঁজা খেয়ে বেড়ায়—দ্রব ঠাকরুনের ক'টি নাতি চাকুরে, এজন্যে দ্রব ঠাকরুনের প্রতি তাঁর অন্তরে অন্তরে হিংসে বেশ।

জিজ্ঞেস্ করলেন—জ্বর হয়েছিল নাকি শুনলাম খুড়ীমার?

—হ্যাঁ মা, আজ দুটো ভাত রাঁধবো। তাই সকাল সকাল ঘাটে যাচ্চি—

—আর মা, তোমার থাকতেও নেই—অমন সব নাতি নাতনী থাকতেও তোমার এই দুর্দশা—সবই কপাল।

অর্থাৎ, দুই চাকুরে নাতি আছে বলে তোমার গুমর করবার কিছু নেই। তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

নদীর ঘাটে যাবার পথে দুধারে শুধু বন আর বাগান। কোন বাগানে বেড়া দেওয়া নেই, ঘন আশশেওড়া ও বনচালতে গাছের ডালপালা স্নানার্থীদের গায়ে লাগে বলে দু'একজন শুচিবাইগ্রস্তা বিধবা পথের নিতান্ত পাশের ডালগুলো হাত দিয়ে ভেঙে ভেঙে রেখেচেন। দ্রব ঠাকরুন বনের মধ্যে ঢুকে উঁকি মেরে কি দেখচেন, এমন সময় মুখুজোদের সেজ বৌ পেছন থেকে বললে—কি দেখছেন, ও খুড়ীমা?

—এই খয়েরখাগী কাঁঠালগাছটাতে কাঁঠাল আছে কি-না এক আধটা মা—একটা গাছ কাঁঠাল, সব্বনেশেদের জন্যে যদি মা তার কিছু ঘরে উঠলো —নিজে থাকি অসুখে পড়ে—

—কে কাঁঠাল নিলে খুড়ীমা?

—কে নিয়েচে আমি কি চৌকি দিতে গিয়েচি বসে বসে? এই পাড়ার মধ্যে চোরের ঝাড়—দ্যাখ তোর, না দ্যাখ মোর। সব্বনেশে কলিকালে কি ধম্মো জ্ঞান আছে মা?

—চলুন খুড়ীমা ঘাটে যাই—

দ্রব ঠাকরুন বকতে বকতে ঘাটের দিকে চলেন। স্নান সেরে এসে দুটো আলোচাল ফুটিয়ে ডুমুরের চচ্চড়ি করে ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসেচেন এমন সময় দেখলেন বাড়ির পেছনে কাগজী লেবু গাছটার তলায় কি খস্ খস্ শব্দ হচ্চে।

দ্রব ঠাকরুন হাঁক দিলেন —কে রে নেবুতলায়?

ক্ষীণ বালিকাকণ্ঠে উত্তর এল—এই আমি কনক, ঠাকুমা—

—কেন, ওখানে কি শুনি? কি হচ্চে ওখানে? বের হয়ে আয় ইদিকে, সামনে আয়।

একটি ম্যালেরিয়াশীর্ণ এগারো বছরের কালিকামূর্তি অকুণ্ঠপদবিক্ষেপে লেবু ঝোপের আড়াল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উঠোনে এসে দ্রব ঠাকরুনের ক্রুদ্ধ-দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াল।

এই আমার মার মুখে অরুচি—কিছু খেতে পারে না, তাই গিয়ে বল্লে—যা তোর ঠাকুরমার নেবুগাছ থেকে একটা নেবু—

দ্রব ঠাকরুন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বল্লেন—হ্যাঁ যা— তোর বাবা নেবু গাছ পুঁতে রেখে গিয়েচে, যা তুলে নিয়ে আয় গিয়ে! যত সব চোর ছ্যাঁচড় নিয়ে হয়েচে —তোর মার অরুচি, তা হাটে নেবু কিনতে পারিস নে? এখানে কি? তোর বাবার গাছ আছে এখানে?

বালিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দ্রব ঠাকরুন আপনমনে বকে যেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে বালিকা ভয়ে ভয়ে বল্লে—ও ঠাকুরমা—

—কি রে? কি?

—আমি চলে যাব?

—কেন, তোকে কি বেঁধে রেখেচি নাকি? যা—

—নেবু দেবেন না?

দ্রব ঠাকরুন চুপ করে আপনমনে বড় বড় কয়েকটি ভাতের গ্রাস মুখে পুরে দিলেন, বাঁ হাতে ঘটি নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে অপেক্ষাকৃত নরমসুরে জিজ্ঞেস

বললেন—তোর পরনের কাপড় কাচা? ঐ কলসীটা থেকে আমায় একটু খাবার জল গড়িয়ে দে দেখি—

মেয়েটি তাই করল। দ্রব ঠাকরুন বল্লেন—অরুচি কেন? তোর মার কি ছেলেপিলে হবে নাকি?

—তা তো জানিনে ঠাক্‌মা।

—যা, নিয়ে যা—তবে একটার বেশি নিবি নে—বুঝলি?

দ্রব ঠাকরুন খেয়ে উঠে মাদুর পেতে একটু শুয়েচেন, এমন সময় মুখুজ্যে বাড়ির বড় ছেলে অতুল এসে বল্লে—ও ঠাক্‌মা, শুয়েচেন নাকি?

—হ্যাঁ, কে? অতুল? কি ভাই?

—আপনার পিটুলি গাছ আছে? কলকাতা থেকে দেশলাইয়ের কারখানার লোক এসেচে গাঁয়ের পিটুলি আর শিমুল গাছ কিনতে। আপনার যদি থাকে—বেশ দর দিচ্চে—

—না বাপু, আমার নেই।

—কেন, আপনার বাড়িব পেছনে হরি বায়েব দরুণ জঙ্গলে তো বেশ বড় বড় পিটুলি গাছ আছে—

—না, আমি বেচবো না।

আসলে দ্রব ঠাকরুনের গাছপালার ওপব বড় মায়া, স্বামীব আমলের যা কিছু যৎসামান্য জমিজমা, তা প্রায়ই জঙ্গলাবৃত এবং বড় বড় বাজে গাছে ভর্তি। জ্বালানি কাঠ হিসেবে বিক্রি করলেও এ কয়লার দুর্মূল্যতার দিনে দু' পয়সা পাওয়া যায়, কিন্তু গাছের একটা ডাল কাটতেও তাঁব মায়া। না খেয়ে কষ্ট পাবেন, তবুও গাছ বিক্রির কথা তুলতেও দেবেন না। একজনের শুঁয়োপোকা লাগাতে সে ডুমুরপাতা পাড়তে এসেছিল, কারণ ডুমুর পাতা দিয়ে শুঁয়ো-লাগা জায়গাটা ঘষলে শুঁয়ো ঝরে যায়, কিন্তু দ্রব ঠাকরুন তাকে ডুমুর পাতা পাড়তে দেন নি। হয়তো এটা অতিরঞ্জিত গল্প মাত্র, তবে এর দ্বারা তাঁর মনের অবস্থা অনেকটা বোঝা যাবে।

বৈকালের দিকে দ্রব ঠাকরুন বেশ ভালোই বোধ করলেন। পাড়ার এক প্রান্তে জঙ্গলে ঘেরা বাড়ি, বড় কেউ এদিকে বেড়াতে আসে না, এক ন'ঠাকরুন ছাড়া কেউ উঁকি মেরে বড় একটা দেখে না, দ্রব ঠাকরুন কিন্তু লোকজন, আড্ডা, মজলিস প্রভৃতি ভালোই বাসেন। কেউ এসে গল্প করে, এটা তাঁর খুবই ইচ্ছে—কিন্তু ও বেলার সেই বালিকাটি ছাড়া বিকেলে আর কেউ এল না। সেও এসেচে নিজের স্বার্থে।

—ঠাকুরমা, একটা নেবু দেবেন?

—কেন রে? কেন? ওবেলা তো—

—ওবেলার নেবু ওবেলা ফুরিয়েচে, এবেলা একটা দরকার—মা বল্লে—

—আচ্ছা, আয় উঠে বোস একটু—

বালিকাটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসে বসে। নয়তো লেবু পাওয়া যাবে না। বুড়ির কাছে বসতে তার ইচ্ছে হয় না, তার সমবয়সী বালিকারা রায়পাড়ার পুকুরধারে এতক্ষণ ফুল তোলাতুলি খেলা আরম্ভ করে দিয়েচে...তার প্রাণ রয়েচে সেখানে পড়ে। কিন্তু দ্রব ঠাকরুনের নিঃসঙ্গ মন যাকে আঁকড়ে ধরতে চায় এই নির্জন বৈকাল বেলাটিতে...তবুও দুটো কথা বলবার লোক তো বটে।

দ্রব ঠাকরুন আপন মনেই বকে চলেচেন, নাতবৌয়ের মন্দ ব্যবহারের কথা, নাতির

ছেলে খোকনের অলৌকিক গুণাবলী, ছোট নাতি পরেশ তাঁকে কি রকম ভালোবাসে...এই ধরনের নানা কথা শুনতে শুনতে ক্ষুদ্র শ্রোতাটির হাই ওঠে, সে করুণ স্বরে বলে—ঠাকুমা, মা সাবু চড়িয়ে আমায় বল্লে, নেবু নিয়ে আয়, বেলা গেল—

—হ্যাঁ হচ্চে হচ্চে—তারপর শোন্ না...

—মা বক্‌বে—নেবু নইলে সাবু খেতে পারবে না—

—আচ্ছা শোন্—তারপর খোক্‌নমণি সেই পেয়ারা তো খাবেই, কিছুতেই ছাড়ে না—ওর মাও দেবে না—বড্ড হেজলদাগড়া মেয়ে ওর মা, আমি বলি, বৌ—চাচ্চে খেতে, এক টুকরো ওকে দ্যাও—তা আমায় বললে—আপনি চুপ করে থাকুন, আপনি কি বোঝেন ছেলেমেয়ে মানুষ করার—একালের মাও অন্য রকম, আপনাদের সেকাল গিয়েচে।...আমি জানিনে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে—তবে তুই তোর বর পেলি কোথা থেকে রে আবাগের বেটি?

—আমি এবার যাই ঠাক্‌মা—নেবু একটা—

—আচ্ছা তা যা নিয়ে একটা নেবু—শুনলি তো সব কাণ্ডখানা? দিদিশাশুড়ি বড় মন্দ—

এমন সময়ে বাড়ির বাইরে একখানা গোরুর গাড়ির শব্দ শোনা গেল। খুকি কৌতূহলে চোখ বড় বড় করে বল্লে—ও ঠাক্‌মা, কে যেন এল গাড়ি করে—তোমার ওই তুঁত-তলায় গাড়ি দাঁড়ালো—

বলতে বলতে দ্রব ঠাকরুনের মেজ নাতি নীরদচন্দ্র দুটি ভারী মোট দুহাতে ঝুলিয়ে বাড়ি ঢুকে ডাক দিলে—ও ঠাক্‌মা—

দ্রব ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বল্লেন— কানু? আয়, আয় ভাই—ভালো আছিস?

কানু এসে মোট নামিয়ে পিতামহীকে প্রণাম করলে, বালিকাটির দিকে চেয়ে বল্লে—এ হরিকাকার মেয়ে কনক না? ওঃ কত বড় হয়ে গিয়েচে—ভালো আছিস কনকী? নে দাঁড়া—একখানা গজা নিয়ে যা—

পুঁটলি খুলে মেয়েটির হাতে একখানা বড় গজা দিতে সে নিঃশব্দ হাসিমুখে হাত পেতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বড় মোটটার মধ্যে আরও কি কি জিনিস আছে দেখবার আগ্রহে। তাদের বাড়িতে এমন কেউ নেই যে বিদেশে চাকুরি করে—নিতান্তই অল্পবিত্ত গৃহস্থের সংসার—চাকুরে বাবুরা বাড়ি আসবার সময় কি কি অপূর্ব জিনিস না-জানি নিয়ে আসে?

দ্রব ঠাকরুন জিজ্ঞেস করলেন—তারপর, কি মনে করে? হঠাৎ যে বুড়িকে মনে পড়েচে তা হলে? বাবাঃ সারা আষাঢ় মাস অসুখে ভুগে ভুগে—তাই এখনও কি সেরেচি! এমন একটা লোক নেই যে, এক ঘটি জল এগিয়ে দ্যায়—ওই ন'বৌ ছিল তাই—এত চিঠি দিলাম, না এল টেবু, না এল বিন্দে, না এলে তুমি—

সন্ধ্যার পরে ন'ঠাকরুন খবর পেয়ে ছুটে এলেন। গ্রামের ছেলে, জন্মাতে দেখেচেন. অনেক দিন পরে দেখে খুব খুশি। কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করার পর বল্লেন—হ্যাঁ কানু, তা তোমরা সোনার চাঁদ সব নাতি থাকতে বুড়ি এখানে বেঘোরে মারা যাবে? পালাজ্বরে ধরেচে—এই আজ ভালো আছে, কাল এমন সময় লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়বে। কে দ্যাখে, কে শোনে—তার ওপর আবার গোরু—একটা বিহিত করে দাও যা হয়—নইলে—

কানু বল্লে—সে সব জন্যেই তো আসা। চিঠি পেয়েচি অনেক দিন, সায়েব ছুটি দিতে চায় না—পরের চাকরি—তাই দেরি হোল।

দ্রব ঠাকরুন বল্লেন—ভালো কথা, ও ন'বৌ, দুখানা গজা নিয়ে যাও, জল খেয়ো—কানু এনেচে আমার জন্যে—তা ও যেমন পাগল, আমার কি দাঁত আছে যে গজা খাবো? নিয়ে যাও ন'বৌ।

—তা দ্যাও দুখানা, নিয়ে যাই। ভালোটা মন্দটা এ পাড়াগাঁয়ে তো চক্ষেই দেখতে পাইনে দিদি—বেঁচে থাক্ তোমার সোনার চাঁদ নাতিরা, তোমার ভাবনাটা কিসের? বিশেষ করে কানুর মত ছেলে নেই এ গাঁয়ে—আমি যা বলবো তা মুখের ওপরেই বলবো বাপু—

ফলে ন'বৌ দু'খানার জায়গায় চারখানা গজা হাতে খুশি মনে বাড়ির দিকে চল্লেন আর কিছুক্ষণ পরে।

নাতি-ঠাকুরমার পরামর্শ হল রাত্রে। কানু এক মতলব ফেঁদে এসেচে। ঠাকুরমাকে সে কাশী নিয়ে গিয়ে রেখে আসবে। তার একজন কে বন্ধুর মা কাশীতে থাকেন, সেই একই বাড়িতে ঠাকুরমাকে রাখবে। পরদিন সকালে ন'বৌ শুনে খুব খুশি, অমন সব নাতি থাকতে ভাবনা কি? তীর্থধর্ম করার সময়ই তো এই। তাঁর যদি আজ ছেলেটাও বেঁচে থাকতো।

আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে সাত মাস বয়সে ন'ঠাকরুনের সে ছেলে মারা গিয়েচে—সেই প্রথম, সেই শেষ। তাঁর আর ছেলেপুলে হয় নি।

যাবার দিন দ্রব ঠাকরুন প্রিয় মুংলি গোরুটার ভার দিয়ে গেলেন ন'বৌকে। বার বার মাথার দিব্য দিলেন, মুংলিকে যেন যত্ন করা হয়। বল্লেন—ও গোরু তোমারই হয়ে গেল ন'বৌ, আমায় আশীর্বাদ করো যেন কাশীতে হাড় ক'খানা রাখতে পারি—নাতিদের ঘাড়ের বোঝা যেন নেমে যায়—আমার বড় নাতির ভাবনা কি, তার সচ্ছল অবস্থা, লুচি পরটা জলখাবার, তেল ঘিয়ে কলকলে করে পাঁচ ব্যান্নুন রান্না—আমি বুড়ি হয়েচি, ওদের সংসারে সেকেলে মতের লোকের জায়গা আর হয় না এখন—

ঘরের আড়ায় শুকনো নারকোল পাতার আঁটি, পাকাটির বোঝা যোগাড় করা ছিল, বর্ষায় উনুন ধরানোর কষ্ট বলে সুগৃহিণী দ্রব ঠাকরুন যে-সময়ের-যা সঞ্চয় করে রাখতেন। কাশীবাস করতে যাচ্ছেন, পেছনটান থাকলে তীর্থবাস হয় না—সে সব দান করে গেলেন কতক ন'ঠাকরুনকে, কতক একে ওকে।

কনক একটা পাকা শসা হাতে এসে বল্লে—শসা খাবে ঠাক্‌মা?

—তুই এক বোঝা পাকাটি নিয়ে যা কনকী—ঠাক্‌মাকে মনে রাখবি তো? হ্যাঁ-রে? কনক অনেকখানি ঘাড় নেড়ে বল্লে—হুঁ-উঁউ—

ন'ঠাকরুন চোখের জল ফেললেন যাবার সময়।

দ্রব ঠাকরুন ট্রেনে কোনও রকমে শুচিতা বজায় রেখে কাশী এসে পৌঁছলেন। একটা গলির মধ্যে দোতলা একটা বাড়ির নীচের তলার ঘরে কানুর সেই বন্ধুর মা কাশীবাস করচেন। পাশেই আর একখানা ছোট ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে দ্রব ঠাকরুনের জন্যে। অপর বৃদ্ধাটির কাছে চাবি ছিল ঘরের, তিনি চাবি খুলে দিলেন। দ্রব ঠাকরুন নিজের জিনিসপত্র নিয়ে সেই ঘরে অধিষ্ঠান হলেন।

দ্রব ঠাকরুন ঘণ্টাখানেকেব মধ্যেই সভয়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁর প্রতিবেশিনী নদে জেলার লোক। কথাবার্তার ধরন ও সুর শহুরে ও সম্পূর্ণ মার্জিত। যশোর জেলার মানুষ দ্রব ঠাকরুনের ভয় পাবারই কথা বটে। তিনি এসে দ্রব ঠাকরুনের ঘরে ঢুকে বল্লেন—আপনার রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কাল থেকে করলেই হবে—আজ আমার ঘরে দুধ আব মিষ্টি আছে, আপনার জন্যে রাখলুম কিনা।

দ্রব ঠাকরুন ভয়ে ভয়ে বল্লেন—ও!

প্রতিবেশিনী নিজের ঘব থেকে খাবাব এনে বল্লেন—আপনার লোমবস্ত্র বার করুন—

দ্রব ঠাকরুন ভালো বুঝতে না পেবে বল্লেন—কি বল্লেন?

দ্রব ঠাকরুন 'বল্লেন' এই কথায 'ব'-এর উচ্চারণ যশোর জেলার উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী প্রসারিত উচ্চাবণ, প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার উচ্চারণে এই সব স্থানের উচ্চারণ যতদূর সম্ভব আকুঞ্চিত। 'বল্লেন'-এর উচ্চারণ 'বোল্লেন'—'ও'কার-এর উচ্চারণও যতদূর সম্ভব ঘোরালো।

—বোলচি, লোমবস্ত্র বের কবে পরুন, একটু কিছু মুখে দিতে হবে তো?

লোমবস্ত্র কি জিনিস, পাড়াগাঁয়েব মানুষ দ্রব ঠাকরুন কখনও শোনেন নি—তবে জিনিসটা যে বস্ত্রজাতীয দ্রব্য তা বুঝতে পাবলেন, বল্লেন—সে তো আমার নেই।

—লোমবস্ত্র নেই? আপনি জপ করেন কি পোরে?

—এই সাদা থান পোবেই জপ করি, আর কোথায় কি পাবো?

বাড়িখানা গলিব মুখে হলেও প্রায় সদর রাস্তাব ওপরে। অনেক রাত পর্যন্ত গাড়ি-ঘোড়া রাস্তাব গোলমাল থামে না। নিবিবিলি বনজঙ্গলের মধ্যে বাড়িতে একা একা দ্রব ঠাকরুনের চিরদিনের অভ্যাস, এত গোলমালে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি। উঃ, কি মুশকিলেই পড়া গেল! নাঃ, কাশীর লোক ঘুমোয় কখন?

কানু তাব পরদিন বন্ধুব মাব হাতে পল্লীবাসিনী পিতামহীকে সমর্পণ করে কর্মস্থানে চলে গেল, তার ছুটি ফুবিয়েচে। বন্ধুর মার নাম নীরজাবাসিনী, দ্রব ঠাকরুনের চেয়ে তাঁর বয়স দু'পাঁচ বছর কম হবে, মাথার চুল এখনও পাকে নি—তবে সেটা স্বাস্থ্যের গুণেও হতে পাবে।

দ্রব ঠাকরুন এর সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে বিকেলে বেড়াতে গেলেন—খুব লোকজনের ভিড়, গান, বক্তৃতা, কথকতা। এক গেরুয়া কাপড় পরা সন্নিসির চারিপাশে খুব ভিড়, নীরজা সেখানে জুটলেন গিয়ে। কর্মবাদ, সেবাধর্ম ইত্যাদি নিয়ে সন্নিসি কি সব কথা বলে যাচ্ছেন, দ্রব ঠাকরুন অতশত বুঝতে পারলেন না। ফিরবার পথে দ্রব ঠাকরুন জিজ্ঞেস করলেন—উনি কেডা?

—উনি রামকৃষ্ণ মঠের একজন বড় ইয়ে—স্বামী সেবানন্দ।

—কি মঠ?

—কেন, রামকৃষ্ণ মঠের কথা শোনেন নি? ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের—মস্ত বড় কাণ্ড ওঁদের—

—রাম আর কৃষ্ণ দুই ঠাকুরের নামে বুঝি?

নীরজা বিস্ময়ে দ্রব ঠাকরুনের দিকে চেয়ে বল্লেন—আপনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম শোনেন নি?

—না। কে তিনি—কই না—এখানে আছেন?

নীরজা আর কোন কথা বল্লেন না। এমন বর্বরের সঙ্গেও তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন যে রামকৃষ্ণদেবের নাম পর্যন্ত জানে না। দ্রব ঠাকরুনের কোনও দোষ নেই, তিনি অজ্ঞ সেকেলে লোক, অজ পল্লীগ্রাম ছেড়ে জীবনে কখনও কোথাও যাননি। গোপীনাথপুরের জঙ্গলে ও-নাম কখনও কারও মুখে শোনেনও নি। তিনি জানেন, রাম, কৃষ্ণ, রাধা, দুর্গা, লোচনপুরের জাগ্রত কালী, কালীঘাটের কালী ইত্যাদি। অতবড় কোনও ঠাকুরের কথা কই—কেউ তো তাঁকে বলে নি?

দ্রব ঠাকরুন ভয়ে ভয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গিনী তাঁকে নিতান্ত নাস্তিক, অজ্ঞ, মূর্খ বলে না ঠাওরান।

দিন কয়েক যেতে না যেতেই দ্রব ঠাকরুন বুঝে নিলেন সঙ্গিনীটি ধর্মবাতিকগ্রস্তা। সাধু-সন্নিসির ভক্ত। যদি কোথাও নতুন ধরনের সাধু মন্দিরে কি ঘাটে বসে আছে, তবে আর নিস্তার নেই। সেখানে বসে অমনি গরুড়ের মত হাত জোড় করে বক্‌বক্ বকুনি জুড়ে দেবে। আর কি-সব জিজ্ঞেস করবে, কর্মফল কি, পুনর্জন্ম কি হেনো তেনো। রাস্তা-ঘাটে বেরুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, বাসায় ফেরবার নামটি নেই। এত বিরক্ত ধরে দ্রব ঠাকরুনের—কিন্তু তিনি কি করবেন? কাশীর রাস্তা চেনেন না—একাও বাসায় ফিরতে পারেন না সঙ্গিনী না ফিরলে।

একদিন বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি দেখতে গেলেন দুজনেই।

সেখানে এক সন্ন্যাসিনী নাটমন্দিরে বসে আছেন, গেরুয়া কাপড় পরনে, মাথায় জটা, অনেক মেয়েছেলের ভিড় হয়েচে সেখানে। নীরজা তো সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে সর্বদা একপায়ে খাড়া, চারিপাশের ভক্তের দলে গেল মিশে তাঁকে নিয়ে। দ্রব ঠাকরুন শুনতে লাগলেন কেউ জিজ্ঞেস করচে, মাইজি, ঠাকুরের দেখা পাওয়া যায়?

কেউ বলচে—মাইজি, আমার মেয়ের মাদুলি দেবেন তো আজ?

—আজ আমার হাতখানা দয়া করে দেখবেন কি?

নীরজা জিজ্ঞেস করলেন—মাইজি, আমার ভক্তি হচ্ছে না কেন?

দ্রব ঠাকরুন শুনে মনে মনে হেসে আর বাঁচেন না। সর্বদা সাধুসন্নিসি নিয়েই আছো, এখানে প্রণাম, ওখানে ধন্না, দু'ঘণ্টা ধরে নাম টেপা—এতেও যদি তোমার ভক্তি না হয়ে থাকে, গঙ্গার জলে ডুবে মরো গিয়ে—ঢং দেখে আর বাঁচি নে! মরণ আর কি!

তারপর সবাই চলে গেল—নীরজা সেই যে সেখানে চোখ বুজে ধ্যানে না কি যোগে বসলো আর ওঠে না। দ্রব ঠাকরুনও কিছু বলতে সাহস পান না। এদিকে তাঁর মনে পড়লো সুজি একদম নেই, সেকথা এতক্ষণ মনে ছিল না, এত রাত হয়ে গেল কোথায় বা সুজি কেনা হবে। রাত্রে একটু মোহনভোগ খাওয়া, তাও আজ ধর্মের ভিড়ে বুঝি বা হয় না।

বসে বসে দ্রব ঠাকরুন বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মন্দির থেকে বাঙালী মেয়েরা প্রায় সব চলে গিয়েচে, এদেশী লোক যারা হিন্দি মিন্দি বলে, তাদের দলই যাচ্ছে আসচে। কি জানি ওদের কথা তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না, বলতেও পারেন না।

আজ মাস তিনেক গ্রাম থেকে এসেচেন। বেশ শীত পড়ে গিয়েচে কাশীতে। মুংলি গোরুটার কথা এত করেও আজকাল মনে পড়চে। শীতের রাত্রে পাছে মুংলির কষ্ট হয় বলে তিনি গোয়ালে আগুন করে রাখতেন। তাঁর গাছটাতে খুব ডুমুর হয়েচে নিশ্চয়, কে জানে একটা গাছ ডুমুর কারা খাচ্চে? কম ডুমুর হয় গাছটাতে? আহা, ন'বৌ কি মুংলিকে

অত যত্ন করচে?—তাঁর মত? তিনি যে পেটের মেয়ের মত...না, তাঁর চোখে জল এসে পড়ে।

আজই এতকাল পরে ন'বৌয়ের পত্র এসেচে দেশ থেকে...তাই বেশি করে মনে পড়চে দেশের কথা। ন'বৌ লিখেচে মুংলি ভালো আছে, শীগগির বাছুর হবে। তাঁর বাড়ির দাওয়ার খুঁটি না বদলালে নয়। কানু যা বিন্দেকে যেন চিঠি লেখা হয় সেজন্যে।

নীরজা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—দিদি, চলো যাই...সত্যি কি পবিত্র স্থান, না? ইচ্ছে হয় না যে আবার সংসারে ফিরে যাই, রাঁধি খাই।

দ্রব ঠাকরুন মনে মনে বল্লেন—মরো না এখানে শুকিয়ে হত্যে দিয়ে—কে মাথার দিব্যি দিয়েছে বাঁধতে খেতে!

নীরজা বল্লেন—করন্যাসটা অভ্যেস করচি কি না, প্রায় হয়ে এল—

দ্রবময়ী নীরব। মাগীটা পাগল নাকি? কি সব বলে বোঝাও যায় না। রাত দুপুর বাজলো, বাবা, এখন বাসায় চল্ দিকি!

বাসায় এসেও কি তাই নিস্তার আছে?

নীরজা ডাকলেন তাঁর ঘর থেকে—ও দিদি, একটু গীতাপাঠ করি শোনো—

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তাঁকে যেতে হয়। গীতা-টীতা ওসব তিনি বোঝেন না। সুবচনীর ব্রতকথা, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শিবরাত্রির ব্রতকথা এসব শোনা তাঁর অভ্যেস আছে, বেশ দিব্যি বুঝতেও পাবেন—এসব শক্ত শক্ত কথার কি কাণ্ডমাণ্ড, এক বর্ণও যদি তিনি বোঝেন। আর মাগীর চোখ উলটে, কান্না কান্না মুখের ভাব করে পড়বার ভঙ্গিই বা কি! দ্রব ঠাকরুন না পারেন হাসতে, না পারেন হাসি চাপতে। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে গা!

নীরজা পড়তে পড়তে বলবেন—আহা-হা! কি চমৎকার!

দ্রব ঠাকরুন বসে ঢুলতে ঢুলতে ভাববেন—থামলে যে বাঁচি—

সকালে উঠে নীরজা বল্লেন—আজ আমার গুরুদেব আসবেন, দিদি দু'খানা লুচি ভেজে দিও তো আমার ঘরে বসে।

বেলা দুটোর সময় এক সন্নিসি এসে হাজির। বেশ মোটা ভুঁড়িওয়ালা, এই লম্বা দাড়ি। নীরজা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে দু'বার মাথা ঠুকলেন গুরুদেবের পাদপদ্মে। আহারাদির যোগাড় করতেই কাটলো সারাদিন—তিনসের দুধ মেরে একসের হল, ঘরে রাবড়ি মালাই তৈরি হল। লুচি ভাজা হল। সন্ধ্যার সময় নীরজা বসলেন গুরুর কাছে কি সব ক্রিয়া শিখতে। আসন না মাথামুণ্ডু তাই শিখতে। যত বা এ বকে, তত বা ও বকে। মনে হল বুঝি কানের পোকা সব বেরিয়ে যায়।

গুরুদেব বাঙালী। রাত নটার পরে দ্রব ঠাকরুনকে ডাক দিলেন।

বল্লেন—তোমার বাড়ি কোথায়?

—গোপীনাথপুর, যশোর জেলা—

—কে আছে বাড়িতে?

—নাতিরা আছে, তাদের ছেলে বৌ আছে।

—তুমি কাশীবাস করতে এসেচ?

—হ্যাঁ।

—নাম কি?

—দ্রবময়ী দেব্যা—

—দীক্ষা হয়েচে?

—না।

নীরজা চোখ কপালে তুলে বল্লেন—কি সর্বনাশ! দীক্ষা হয়নি এতদিন? তা তো জানতাম না?

গুরুদেব বল্লেন—দীক্ষা নিতে হবে মা তোমাকে।

—আমার পয়সা নেই, দীক্ষা নিতে গেলে খরচ আছে। নাতিরা এগারো টাকা করে মাসে পাঠায়—তার মধ্যে ঘর ভাড়া, তার মধ্যে খাওয়া। পয়সা পাই কোথায়?

—দীক্ষা না নিলে কাশীবাসে ফল কি মা?

—ফলের জন্যে তো আসিনি, শরীরডা সারাতি এসেছিলাম।

নীরজা রাগেব সুরে বল্লেন—শরীর আগে না পরকাল আগে?

দ্রব ঠাকরুন চুপ করে রইলেন।

গুরুদেব বল্লেন—নীরজা-মার কথার উত্তর দাও—চুপ করে থাকলে হবে না।

নীরজা বল্লেন—গীতার ভক্তিযোগ সেদিন পড়ছিলাম, শুনলে তো দিদি? কর্মের চেয়েও ভক্তি বড়, স্বয়ং ভগবান বলচেন—

আঃ কি বিপদ! মাগীর সব সময়েই কি আবোল-তাবোল বকুনি?

মুখে বল্লেন—আমি তো কিছু বুঝি নে, আপনারা যা বলেন। তবে এবার কিছু হবে না। নাতি সাতটাকা পাঠিয়েছিল, তা ঘর ভাড়াতেই গিয়েচে। হাতে টাকা না থাকলি—

তবুও দুজনই নাছোড়বান্দা। দীক্ষা নিতেই হবে।

গুরুদেব বল্লেন—কাশীবাস করচো মা, তোমার যথেষ্ট বয়েস হয়েচে। গুরুদীক্ষা না নিলে যে সবই মাটি। আজ আছ, কাল নেই। পৃথিবী কিছুই না—ইহকাল কিছুই না—

নীরজা বল্লেন—গুরুর মুখেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইহকালেও তিনি, পরকালেও তিনি—

দ্রব ঠাকরুন মনে মনে বল্লেন—আ মরণ মাগীর! তবে সোয়ামী কোথায় যাবে মেয়েদের? ঢং দ্যাখো না—! যাই হোক, বহু তর্ক করেও দ্রব ঠাকরুনকে দ্রব করা গেল না। নাম দ্রবময়ী হলে কি হবে, ভেতরে বেজায় শক্ত। নীরজা অবিশ্যি তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি মতে একজন সত্তর বছরের মৃত্যুপথযাত্রিণীর ভালো করবারই চেষ্টা করছিলেন, সে রাজী না হলে তিনি আর কি করবেন?

নীরজার ভক্তি—হ্যাঁ, সে দেখবার মত একটা জিনিস বটে। গুরুর পাদোদক পান না করে তিনি দাঁতে তৃণ কাটবেন না। গুরুর বাক্য বেদবাক্যের চেয়েও মূল্যবান তাঁর কাছে। পুরনো একছড়া সোনার হার ছিল, সেটা বিক্রি করে এসে টাকা তুলে দিলেন গুরুদেবের হাতে।

কথাটা শুনে দ্রব ঠাকরুন জিজ্ঞেস করলেন—অতগুলো টাকা দিয়ে দিলে গুরুদেবকে?

—টাকা সার্থক হল, দিদি—

—তোমার নিজের হার?

—ও আমার বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে দিয়েছিল—তিনি হাতে করে দিয়েছিলেন—

—সেই হাব তুমি দিয়ে দিলে বেচে?

—দিদি, সংসার অনিত্য, সবই অনিত্য। কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী? সবই ভগবানের মায়া। মায়ায় সব ভুলে থাকা—গুরুই কেবল নিত্য বস্তু।

—তা তো বটে।

এ মাগীর মুখে সব সময় বড় বড় কথা। দিগে যা তোর সব কিছু গুরুর পাদপদ্মে বিলিয়ে,—তাঁর কি? বিয়ের পরে স্বামী নিজের হাতে যে হারছড়া দিয়েছিল, তা কোনও মেয়েমানুষ এভাবে ঘ্যাচয়ে দিতে পারে? গভীর রাত পর্যন্ত শুধু এই কথাটিই বার বার তাঁর মনে পড়ে। সে সব দিন ঝাপসা হয়ে গিয়েচে, মনের আকাশ বিস্মৃতির মেঘে ঢাকা ওই গোপীনাথপুরের ভিটে অমন ছিল কি তখন? ফুলশয্যার রাত!

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, গত আষাঢ় মাসের প্রথমে উত্তর দিকের ভাঙা পাঁচিলের গায়ে এতটুকু একটা শসাগাছ নতুন বর্ষার জল পেয়ে গজিয়েচে দেখে তিনি শুকনো কঞ্চি কুড়িয়ে একটা মাচা বেঁধে দিয়েছিলেন—এতদিনে গাছ বড় হয়েচে, কত শসার জালি পড়েচে গাছটাতে। কে খাচ্চে সে বনের মধ্যে? হয়তো কনকা আসে লেবু তুলতে—এক গাছ লেবু রেখে এসেছিলেন। সে-ই হয়তো শসা পেড়ে নিয়ে যায়—কে জানে?

হঠাৎ কি একটা কুস্বরে দ্রব ঠাকরুন চমকে ওঠেন। নীরজার ঘর থেকে শব্দটা আসচে। মাগী এত রাত্রে করে কি? হুস্ হুস্ করে অত জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলচে কেন? ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা লাগলো নাকি?

দ্রব ঠাকরুন ডাকলেন—শুনচো—ওগো—কি হয়েচে? ওগো—

নীরজা বল্লেন—ডাকচেন কেন দিদি?

—বলি ও শব্দ কিসের?

—কুম্ভকের রেচক-পূরক অভ্যেস করচি—অনেক রাত ভিন্ন হয় না কিনা,—ঠাকুর ভাই বলে গেলেন।

সে আবার কি রে বাবা! মাগী তো ঘুমুতেও দ্যায় না রাত্তিরে?

দ্রব ঠাকরুন বল্লেন—যাক গে—ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা হয় নি তো?

—না দিদি—ঘুমুইনি এখনও। ঘুমুলে যোগের ক্রিয়া হয় না। জীবনটা যদি ঘুমিয়েই কাটাবো, তবে পরকালের কাজ করবো কখন?

—তা বেশ, বেশ।

—দিদি—ঘুমুলেন?

—না, কেন?

—নির্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমার মনে শান্তি পাচ্চি নে, পাবোও না। দেহ কি জন্য দিদি? ঘুমুবার জন্যে নয়। আরামের জন্যে নয়—শুধু নিজের কাজ করে যাওয়ার জন্যে। দিন কিনে নাও, শুধু দিন কিনে নাও—

দ্রব ঠাকরুনের পিত্তি জ্বলে গেল। কিন্‌গে যা দিন মাগী, যদি তোর পয়সা থাকে রাত্তিরে একটু ঘুমুতে দে অন্তত।

শীতকাল এসে গেল। কানু বড়দিনের ছুটিতে একবার কাশী এসে পিতামহীর সঙ্গে দেখা করে গেল।

দ্রব ঠাকরুন তাঁকে বল্লেন—কানু ভাই, অন্য একটা বাসা পাওয়া যায় না?

কানু বিস্মিত হয়ে বল্লে—কেন, এখানে কি হল? সত্যর মা রয়েচেন, এই তো সব চেয়ে ভালো—

—ও মাগী পাগল।

—পাগল! সে কি!

—না বাবু, বেজায় ধর্মিষ্টি। অত ধর্মিষ্টি আমাব পোষাবে না। আমাকে তুই সবিয়ে নিয়ে যা—

কানু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে। ঠাকুরমার যেমন কাণ্ড।

বল্লে—আচ্ছা ঠাক্‌মা শেষ বয়সে কাশীবাস করতে এলে—না হয় তুমিও হও একটু ধর্মিষ্টি। হ্যাঁ, উনি ওই রকমের বটে। সত্য বলছিল, মা কিছুতেই দেশে থাকতে চান না। এই গত বোশেখ মাসে সত্যর ছোট ভাইয়ের বিয়ে গেল, ওঁর ছোট ছেলেব—ওঁকে কত চিঠিপত্তর, কত অনুবোধ— কিছুতেই গেলেন না। বল্লেন, যে মায়া একবার কাটিয়েচেন, তাতে আর জড়িয়ে পড়তে চান না। ছোট ছেলে টেলিগ্রাম পর্যন্ত করলে, কোনও ফল হল না।

দ্রব ঠাকরুন অবাক হয়ে বল্লেন—বলিস কি রে কানু, সত্যি?

—মিথ্যে বলচি তোমার কাছে ঠাক্‌মা?

—আমায় এখান থেকে তুই সরিয়ে দে ভাই।

—ছিঃ—আচ্ছা, তুমি অত নাস্তিক কেন ঠাক্‌মা? ওঁব সঙ্গে থেকে একটু ধর্ম শেখো না। চিবকালই বিষয় আর সংসাব নিয়েই তো কাটালে।

—হাঁপ লেগে মবে যাবো যে এখানে থাকলে—

—আবার ওই সব নাস্তিকের মত কথাবার্তা—ঠাক্‌মা তুমি কি?

শীত কেটে গ্রীষ্ম এল, চলে'ও গেল। আবার আষাঢ় মাসের প্রথম। দেশের খবব নেই অনেকদিন। ন'ঠাকরুনেব চিঠি আগে আগে আসতো—গত তিন চার মাস তাও বন্ধ। কথায় কথায় একদিন নীরজাকে কথাটা বলেই ফেল্লেন।

—দেশে কে আছে আপনার? শুনেচি সেখানে থাকে না কেউ?

—বাড়িটা, গাছটা পালাটা—

—দিদি, এখনও ঐ সবের মায়া? বিশ্বনাথের পাদপদ্মে মন সমর্পণ করুন, সব বন্ধন ঘুচে যাবে। কেউ কিছু নয়, কিছু নয়—একমাত্র তিনিই সত্যি। বলে নীরজা চোখ কপালে তুলে ওপরেব দিকে চেয়ে রইলেন। দ্রব ঠাকরুন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—ওই যাঃ, দাঁড়'ও, কড়ার দুধটুকু বুঝি বেড়ালে খেয়ে গেল! নাঃ, বেড়ালের জ্বালায়—যত বা বেড়াল, তত বা বাঁদর। অমন গামছাখানা সেদিন—

—দিদি, আজ আমার সঙ্গে চলুন, কেদার ঘাটে কাশীখণ্ডের ব্যাখ্যা করবেন উপীন কথক। শোনবার জিনিস। কাশীতে এসে কাশীখণ্ড শুনতে হয়—

—আমার শরীর ভালো না, আজ থাক, তুমি যাও—

নীরজা নাছোড়বান্দা, অবশেষে নিয়ে গেলেন দ্রব ঠাকরুনকে। কেদার ঘাটে এর আগেও দু'তিন বাব দ্রব গিয়েচেন সত্যর মার সঙ্গেই। ওপরের রানার চওড়া চাতালের একপাশে ফর্সা রোগামত কথকঠাকুর কথকতা শুরু করেচেন—তাঁকে ঘিবে বাঙালী মেয়ে-পুরুষের ভিড়। পুরুষের চেয়ে মেয়ে অনেক বেশি।

সত্যর মা জিজ্ঞেস করলেন—দিদি, প্রণামী কিছু এনেচেন তো?

—তা তো বল্লে না—আনিনি—

—আট আনার কম দেওয়া যায় না। আচ্ছা, আপনারটা আমি দিয়ে দেব এখন—

—আমার আট আনা না দিয়ে চার আনা বরং দ্যাও। নাতিরা ক'টাকা বা পাঠায়?

—এখানে যা দেবেন দিদি, পরকালে তোলা রইল—

বর্ষার গঙ্গায় ঢল নেমেচে। কেদার ঘাটের সামনের নদীতে কাদের বড় একটা বজরা ভেসে চলেচে, দু'তিনখানা পানসিতে সুসজ্জিতা নরনারী নদীভ্রমণে বার হয়েচে। রামনগরের দিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—উঁচু বাড়ির ছাদের কার্নিসে তরল সোনার মত ঝিলমিল করচে রাঙা রোদ। কথকঠাকুর সুকণ্ঠে গান ধরেচেন, কাশী সকল তীর্থের সার, মৃত্যুর সময় মণিকর্ণিকার ঘাটে স্বয়ং বিশ্বনাথ কানে মন্ত্র দেন—মানুষের শিবলোক-প্রাপ্তি ঘটে—এই হল গানের অর্থ।

দ্রব ঠাকরুনের মন অজ্ঞাতে অনেকদূর চলে গেল। তাঁর খয়েরখাগী গাছে কত কাঁঠাল হয়েচে এই আষাঢ় মাসে, বড্ড কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শেকড়ে পর্যন্ত কাঁঠাল। তিনটে আম গাছে আমও নিশ্চয়ই খুব ধরেছিল—নাতিরা কি গিয়েচে আম খেতে? তাদের সেদিকে দৃষ্টি নেই। বারোভূতে লুটে খাচ্চে।

রাত্রি নামলো। নীরজা বল্লেন—চলুন দিদি—

দ্রব ঠাকরুন লক্ষ্য করেচেন সমস্ত সময় নীরজা মাগী ফোঁস ফোঁস করে কেঁদেচে। আর কেবল বলেচে—আহা-হা-হা!

যদি এ মাগীর সঙ্গ ছাড়তে পারতেন।—কিন্তু তা হবার নয়, কানু শুনবে না।

বাসায় এসে নীরজা দেখলেন তাঁর সঙ্গিনীর মন বড় খারাপ—অন্যমনস্ক ভাব, বিশেষ কোনও কথা বলে না।

কাশীখণ্ড শুনে আজ তা হলে খুব ভালো লেগেচে বোধ হয়। পাষাণ বুঝি গলেচে।

নীরজা বল্লেন—কি ভাবচেন দিদি?

—একটা গাছ কাঁঠাল দেশে। খয়েরখাগীর কাঁঠাল, সে তুমি কখনও খাওনি—খেলে বুঝতে।

—দিদি, এখনও আপনার মায়ার বন্ধন গেল না? আপনার তো দুটো একটা গাছ, আমার তিনটে বড় বাগান—কলমের বোম্বাই, মাল্‌দ' ফর্জালি—মায় ন্যাংড়া পর্যন্ত। আমি তো ফিরেও চাইনি ওসব দিকে। ছেলেরা কাঁদে, বলে, এখন কি কাশীবাস করবার সময় হয়েচে তোমার? আমি বলি, না, সংসারের মায়ায় আর না। গানে বলে—কেবা কার পর, কে কার আপন? (এই মরেচে, মাগী আবার শুরু করেচে!) কালশয্যা পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে, দেখে পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

—তা আমি বলি—এতকাল তো সংসারের বন্ধনে ঘুরে আশার স্বপ্ন অনেক অনেক দেখলুম। এইবার পরকালের কথা ভাবি। আর আমার এই যে গুরুদেব, উনি দেহধারী মুক্ত পুরুষ— ওঁর কৃপায়—(নীরজা উদ্দেশে প্রণাম করলেন।)

দ্রব ঠাকরুন মুখে বল্লেন—তা তো বটেই—

—চলুন দিদি, কাল বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে সেই মাইজির কাছে আপনাকে নিয়ে যাই—আপনার বয়স আমার চেয়ে বেশি, আপনার এখন উচিত গুরুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সব বন্ধন মুক্ত হয়ে একমনে কাশীবাস করা। আমাদের আর ক'দিন দিদি? শমন তো দোরে দাঁড়িয়ে—সব রকম তো দেখলুম শুনলুম।

দ্রব ঠাকরুন মনে মনে বল্লেন—তোমার মুণ্ডু করলুম, মাগীর কথার আবার ধরন

শোনো না, ভাটপাড়ার ভট্‌চার্জি এসেচেন! মুখে বল্লেন—মুংলি বলে একটা গাই গোরু ছিল আমার—বড্ড ন্যাওটা। যেখানে যাবো, সেখানে যাবে। আমার হাতে না খেলে তার পেট ভবতো না। এই বেশ কচি কচি বাঁশপাতা এনে মুখে দেতাম তুলি—আর—

—আঃ, আবার ওই সব কথা আপনার মুখে! জড়ভরতের কথা জানেন তো? অত বড় জ্ঞানী—পূর্বজন্মের এক হরিণের মায়ায় তাঁর সব গেল। ভগবানের চিন্তা করুন —ভগবানের চিন্তা করুন—সব মিথ্যে। সব মিথ্যে।

দ্রব ঠাকরুন কোনও কথা বল্লেন না। তাঁর ওব কথা একেবারেই ভালো লাগে না। মাগী যেন কী! কি বলে, কি করে! মাগী এমন পাষাণ যে, ছোট ছেলের বিয়েতে বাড়ি গেল না! মুখ দেখতে আছে ওর? ছিঃ—

সারারাত্রি স্বপ্নের ঘোরে দেখলেন, তাঁর গোপীনাথপুরের ভিটেতে চালাঘরের ছাঁচতলায় ম্লান মুখে ছলছলে চোখে তাঁব মুংলি দাঁড়িয়ে রয়েচে—ন'বৌ তাকে যত্ন করচে না, বুড়ি হয়েচে মুংলী, তেমন দুধ ত আর দিতে পাবে না—মুংলিকে তিনি তার মায়ের পেট থেকে টেনে বাব কবে এতকাল নিজের মেয়েব মত পুষেছিলেন—তিনি নেই, কে ওকে দেখে? কাঁঠাল হয়েচে বটে খয়েবখাগী গাছটাতে! এত কাঁঠাল তিন চার বছরের মধ্যে হয়নি। তিনি নাইতে যাচ্চেন নদীতে, মুখজ্যে গিন্নি বলচে—হ্যাঁ খুড়ীমা. এবাব তোমাব গাছে কী কাঁঠাল ধবেচে! তা আমায় একটা দিও, তোমাব নাতিদের খেতে দেবো—

খড উড়ে উড়ে পড়চে বাড়িব চাল থেকে। কানু বা বিন্দে দেশে যায়নি, ঘরও সাবায়নি। এবাব বর্ষায় কি টিকবে চালে খুঁচি না দিলে?

কনক বলচে—অ ঠাক্‌মা, একটা নেবু দেবা? আমাব মার অরুচি হয়েছে, কিছু খেতি পাবে না—

সকালে উঠে নীরজা নিজেই গঙ্গাস্নান কবে এসে স্বপাক হবিষ্যান্ন চড়িয়েচেন এবং প্রতিদিনেব অভ্যাসমত ইষ্টমন্ত্র জপ শেষ করে গাল-বাদ্য সহকারে শিবপূজা করচেন। দ্রব ঠাকরুনের একটু বেলা হয়েচে আজ উঠতে। মনও খুব ভার। তাঁর আপনার জন পড়ে রইল—তাঁর মুংলি, তাঁর খয়েরখাগী গাছটা, তাঁর ডুমুর গাছ—আর তিনি কোথায়! আরও ওই মাগীর জ্বালায়..

নীরজার গাল-বাদ্য থামলো। দ্রব ঠাকরুনকে বল্লেন,— আজ বড় সুখবর পেলুম দিদি—গঙ্গাস্নানে গিয়ে গুপ্তিপাড়ার সইয়ের সঙ্গে দেখা—সেও আমার মত কাশীবাস করচে— বাঙালীটোলায় থাকে, বল্লে, গুরুদেব আসচেন সামনের সোমবারে। হরিদ্বার থেকে ফেরবার পথে আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে তবে যাবেন। সইও একই গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েচে কিনা। আজ বড় শুভদিন আমার। গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেই বেঁচে আছি, এবার এলে আপনাকে দীক্ষা নিতেই হবে দিদি, আমি ছাড়বো না। গুরুদীক্ষা না হলে দেহ পবিত্র হয় না, ভাবসাগর পার হতে হলে গুরুর চরণরূপ ভেলা চাই আগে—নইলে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হবে যে দিদি?

দ্রব ঠাকরুন বল্লেন—তা তো ঠিক, তা তো ঠিক—

গুরুদেবের আগমনের পূর্বেই শনিবার সকালের গাড়িতে কানু এসে হাজির হল। দ্রব ঠাকরুন নাতির কাছে কেঁদে পড়লেন—তুই আমায় গুপীনাথপুরে নিয়ে চল্ ভাই, আমার আর কাশীবাসে কাজ নেই—বাবা বিশ্বনাথ মাথায় থাকুন। ও মাগীর কাছে আর দু'মাস

থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

ফলে সোমবার কাশীতে গুরুদেবের শুভাগমনের দিন দুপুরের ট্রেনে দ্রব ঠাকরুন দেশের ইস্টিশানে তাঁর বোঁচকা-তোরঙ্গ নিয়ে নাতির সঙ্গে এসে নামলেন।

—ন'ঠাকরুন শুনে ছুটে এলেন—ও দিদি—দিদি—

—হ্যাঁ ন'বৌ—আমার মুংলি ভালো আছে?

—ভালো নেই দিদি। ওঠে না, খায় না—তোমার যাওয়ার পর থেকেই, গোয়ালে শুয়েই থাকে।

—সে আমার মন বলচে ভাই, তুমি কি বলবে। তাকে রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেই তো আর টিকতে পারলাম না, চলে অ্যালাম। কানুকে বল্লাম, নিয়ে চল্ ভাই গুপীনাথপুর, মাথায় থাকুন বাবা বিশ্বনাথ—মুংলি কোথায়? ওকে কচি বাঁশপাতা খাওযাবো নিজের হাতে, স্বপ্ন দেখিচি।

একটু পরে ন'ঠাকরুন দড়া ধরে মুংলিকে নিয়ে এলেন। সত্যিই তার সে চেহারা নেই। সব কাজ ফেলে দ্রব ঠাকরুন ছুটে গিয়ে তার গায়ে-মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। মুংলির চোখে জল পড়ে, তাঁরও চোখে জল পড়ে।

ন'ঠাকরুন বল্লেন—আর জন্মে ও তোমার মেয়ে ছিল দিদি—আর জন্মের মায়ার বাঁধন—

—রক্ষে করো ন'বৌ—তুমিও বড় বড় কথা বলতে শুরু করলে নাকি, সেই মাগীর মত? মুংলি এ জন্মেই আমার মেয়ে—আর জন্ম-টন্ম ছেড়ে দাও।

—কে মাগী, কার কথা বলচো—

—সে বলবো এখন সব। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি দেশে এসে—বাবাঃ—

কানু হেসে বল্লে—নাঃ, ঠাক্‌মাকে নিয়ে আর পারা গেল না—এমন নাস্তিক—কাশীপ্রাপ্তি অদৃষ্টে থাকলে তো?

—তুই ভাই বল্, ন'বৌ বলো—আমার এই ভিটেতেই যেন তোদের কোলে শুয়ে সকলের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে যেতে পারি। কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়া কাশী। তিনি এই উঠানের মৃত্তিকেতে শুয়েছিলেন ওই তুলসীতলায় —আমাকেও তোরা ওখানে--

আঁচলের খুঁট দিয়ে দ্রব ঠাকরুন চোখের জল মুছলেন।

বেলা যায় যায়—আষাঢ়ান্ত সুদীর্ঘ দিনমানের শেষে সূর্য ঢলে পড়েচে পশ্চিম দিকের নিবিড় বাঁশবনের আড়ালে। ঘেঁটকোল ফুল কোথাও জঙ্গলে ফুটেচে, বাতাসে তার কটু উগ্র গন্ধ। দ্রব ঠাকরুনের মন শান্তিতে, আনন্দে, উৎসাহে পূর্ণ হয়ে গেল। এগারো বছরের নববধূ এই বাড়ির উঠানে পা দিয়েছিলেন, এখন তাঁর বয়েস তিন কুড়ি ছয়।

কনক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—ঠাক্‌মা, ভালো আছেন? এয়েচেন শুনে ছুটে দেখতি অ্যালাম—আমাদের কথা মনে ছিল?

বরযাত্রী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়



॥ ১ ॥

ত্রিলোচনের বিবাহ। বরযাত্রীদের মধ্যে রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর ঘোঁৎনা আসিয়া হাজির হইয়াছে, গন্‌শার অপেক্ষা; সে আসিলেই এদিককার দলটা পূর্ণ হয়। ত্রিলোচন সাজগোজের মধ্যে এর পূর্বেও আসিয়া কয়েকবাব খোঁজ লইয়া গিয়াছে, আবার তর্জনীর ডগায় একটু স্নো লইয়া মুখ বাঁকাইয়া দক্ষিণ গলাটা নির্মমভাবে ঘষিতে ঘষিতে আসিয়া হাজির হইল; প্রশ্ন করিল, "এল র‍্যা?"

ঘোঁৎনা বলিল, "ওর মামা ওকে যে রকম আগলে বসে আছে দেখলাম—"

এমন সময় হালদারদের বাড়ির পাশের গলিটায় সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ হইল, এবং গন্‌শা সবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এবং সবেগেই দলটির মাঝখানে প্রবেশ করিয়া ব্রেক চাপিয়া নামিয়া পড়িল। জবাবদিহি হিসাবে বলিল, "গ-গ গন্‌শাকে আটকায়, সে এখনও মা-মায়ের পেটে।"

ছোকরা একটু তোতলা; রাগিলে কিংবা উৎসাহিত হইলে এক-একটা অক্ষর প্রায়ই দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়। ডান দিকের ভ্রূটায় একটা হেঁচকা টান দিয়া সামলাইয়া লয়।

রাজেন বলিল, "তোর কিন্তু না গেলেই ভাল হত গন্‌শা। এতদিন হাঁটাহাঁটি করে সাহেব যদি বা ইন্টারভিউয়ের জন্যে আজ ডাকলে, বরযাত্রী যাওয়ার লোভে—"

ঘোঁৎনা বলিল, "তাতে আবার আজকাল চাকরির যা বাজার।"

গন্‌শা বলিল, "তিলুর বিয়েতে আমি যাব না! এর পর আমাব নি-নিজের বিয়েতে বলবি গ-গ্ গন্‌শা, তোর গিয়ে কাজ নেই, তুই চা-চ্চাকরির খোঁজ কর্‌গে।"

গনেশের কথাটা বলিবার হক আছে। সে ত্রিলোচনকে তাস খেলিতে শিখাইয়াছে, সিগারেট খাইতে শিখাইয়াছে, চলন্ত ট্রামে উঠা-নামা করিতে শিখাইয়াছে, এবং নিয়মিতভাবে বায়স্কোপের সিরিয়াল-অসিরিয়ালে লইয়া গিয়া পৃথিবীর যত সিনেমা-

জ্যোতিষ্কদের নাম মুখস্থ করাইয়া তাহাকে সকল দিক দিয়া লায়েক করিয়া তুলিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। আপাতত এ কয়দিন ধরিয়া দাম্পত্য-নীতিতে জোর তালিম দিতেছে সে-ই, এবং বিশেষ করিয়া দাম্পত্য-রাজ্য করায়ত্ত করিবার পূর্বে বাসর-দুর্গটি কি করিয়া অতিক্রম করিতে হইবে, তাহারও কৌশল-কানুন অধিগত করা হইতেছে ঐ গন্‌শারই নিকট।

ত্রিলোচন কৃতজ্ঞচিত্তে বলিল, "না না, এসে ভালই করেছিস। বউদি আবার বাসরঘরের যা ভয় লাগিয়ে দিয়েছে, ভাবছি আর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আর জল খাচ্ছি। যার সঙ্গে বিয়ে, সে একলাটি থাকলেই দিব্যিটি হত। কার কথার যে কী উত্তর দোব, কার কানমলা সামলাব, কে গোঁফজোড়াটা নেড়ে দেবে, তার ওপর আবার গানের ফরমাশ আছে, কারুর হেঁয়ালি আছে।"

কে. গুপ্ত ত্রিলোচনের পাশাপাশি তাহাদের ফুটবল-টীমে ব্যাক খেলে। বলিল, "তা বটে; পাঁচটা ফরওয়ার্ডকে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়!.."

ত্রিলোচন বলিল, "দুজনে মিলে, আর এ একলা। গোঁফজোড়াটা নয় ফেলে দোব গন্‌শা, যতটা হালকা হয়। বিয়ে হয়ে গেলে আবার না হয় তখন---"

গোবর্চাঁদ বলিল, "তা হলে তো নাক-কান কেটে, মাথা মুড়িয়ে বাসরঘরে ঢুকতে হয়।"

গন্‌শা বলিল, "বরং ক কন্ধকাটা হয়ে ঢুকলে তো আরও ভাল হয়। দেখবে, বরের গ-গ্ গলারই বালাই নেই গাইতে বলা মিছে।"

ত্রিলোচন চিন্তিতভাবে বলিল, "তোদের তামাশা বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমার এদিকে যে কী হচ্ছে তা---। আবার তার ওপর সকাল সকাল লগ্ন পড়ে গেছে কপালগুণে।"

কে গুপ্ত বলিল, "খুব স্টেডি থাকবেন মশাই, নার্ভাস হলেই প্রেস করে ধরবে। একটা বড় দেখে নিতবর সঙ্গে নিলে---"

গন্‌শা একটু রাগিয়া উঠিল; বলিল "বা-বরবাড়ির দারোয়ান কি গা-গ্-গাড়ির সহিসকে তো আর নিতবর করবে না মশাই; সে সব আপনাদের ছা-চ্ছাত্‌র দেশে চলে।"

বেহারের ছেলে। সুদূর ছাপরার এক মহকুমার স্কুল হইতে পাস করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছে, বাংলার ছেলেদের সঙ্গে এখনও কথায় পারিয়া উঠে না। কে. গুপ্ত চুপ করিয়া গেল।

ঘোঁৎনা বলিল, "বাসরঘরের ভয়ে যদি বিয়ে ছাড়তে হয় তো কলিশানের ভয়ে গাড়ি চড়াও ছাড়তে হয়।"

গোরাচাঁদের কথাবার্তায় প্রায়ই একটু আহার্যের গন্ধ থাকা নিয়ম; বলিল, তা হলে কাঁটার ভয়ে মাছ খাওয়া ছাড়তে হয়।"

কবি রাজেন বলিল, "কণ্টকের ভয়ে গোলাপফুল ছাড়তে হয়।"

গন্‌শা সাইকেলটা রাখিতে গিয়াছিল, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বরযাত্রীদের মালা এসেছে?"

ত্রিলোচন বলিল, "সে সব ঠিক আছে—মালা, গোলাপজল, এসেন্স। আর আমি যাই দেখিগে, সবাই একটু মিষ্টিমুখ করে যাবি তো?"

গোবর্চাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, যা শীগ্‌গির যা, কী কী আছে র‍্যা।"

ত্রিলোচনকে ফিরাইয়া ঘোঁৎনা বলিল, "আর শোন্, ওদিকে কে কে যাচ্ছে বল্ তো?

বেশি ভেজাল বাড়লে আবার ফুর্তি জমবে না।"

ত্রিলোচন বাঁ হাতের আঙুলের পর্ব গুনিতে গুনিতে বলিল, "বাবা এক, মেসো দুই, সেজপিসে, সহায়রামবাবু, এই হল চার, আর আর—"

বাংলা দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কে. গুপ্ত ভয়ে ভয়ে মনে করাইয়া দিল, "একজন পুরুত যাবে না?"

ত্রিলোচন গুনিল, "পুরুত পাঁচ, দীনে নাপতে ছয়। পুরুতমশাই নিজে যেতে পারবেন না, তাঁর কাকা ন্যায়রত্নমশাই যাবেন।"

গোরাচাঁদ একটু অস্বস্তির সহিত বলিল, "এই ছজনেও মিষ্টিমুখ করবে তো।

ঘোঁৎনা বলিল, "পুরুত-ঠাকুরের কাকা? সে বুড়ো তো রাতকানা, আবার কালাও তার ওপর; কার সঙ্গে বিয়ে দিতে কার সঙ্গে দিয়ে দেবে!"

ত্রিলোচন বলিল, "তাকে দীনে সামলাবে।"

রাজেন বলিল, "একা দীনে ব্যাটা কজনকে সামলাবে? ওদিকে সহায়রাম চাটুজ্যের যাওয়া মানে বোতলের শ্রাদ্ধ।"

ত্রিলোচন বলিল, "সহায়রামবাবু আর সেজপিসে রাত্তিরেই চলে আসবে; কাল তাদের আপিসের মেল-ডে কিনা, ছুটি পেলে না। আর বোতল? দু পাঁট সাফ হয়ে গেছে, দু ডজন চপ কাটলেট—"

গোরাচাঁদ বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেন মিছিমিছি তিলুকে আটকাচ্ছিস সবাই? সাজগোজে দেরি হয়ে যাবে, ভাল করে একটু সাজতে হবে তো? কথায় বলে ববসজ্জা।... ঐ সঙ্গে কিছু চপ কাটলেট সরিয়ে ফেলগে ত্রিলোচন, ট্রেনে কাজ দেবে।"

উপর হইতে ছোট বোন ডাকিল, "দাদা, গল্প করছ, জামাকাপড় পরতে হবে না? বউদি চন্দন-টন্দন নিয়ে বসে আছেন যে!"

গোরাচাঁদই উত্তর দিল, "তোদের সব তাড়াতাড়ি।" ত্রিলোচনের গেঞ্জিতে একটা টান দিয়ে বলিল, "আগে গিয়ে কি যেন মিষ্টিমুখের কথা বলছিলি, দেখে শুনে দিগে। তাড়াতাড়িতে ভুলে গেলে তোর মার মনে আবার শুভদিনে একটা খটকা থেকে যাবে। ও সাজগোজের জন্যে ভাবিস নি, আজকাল আবার মেলা সাজগোজ করাটা ফ্যাশান নয়, না রে গন্‌শা?"

গন্‌শা বলিল, "তা বইকি. আজকাল যত—"

ত্রিলোচন পা বাড়ালই, গন্‌শা হঠাৎ সামলাইয়া বলিল, "মা-ম্মালা, গোলাপজল, এসেন্স পাঠিয়ে দিগে, আর আমার জন্যে একটা সিল্কের রুমাল আর ভা-ভ্-ভালো শাল পারিস তো, পা-প্পালিয়ে এসেছি কিনা; আর দেখ..."

ত্রিলোচন দরজার নিকট ফিরিয়া দাঁড়াইতে গন্‌শা বাঁ হাতটা তুলিয়া সিগারেটের টিন আঁটে এই পরিমাণ একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি মুদ্রা সৃজন করিয়া বলিল, "বা-ব্বাগাবি একটা!"

উত্তরে ত্রিলোচন বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমা আঙুল দুইটা তুলিয়া ধরিয়া হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, "সে হয়ে গেছে—এই!"

গন্‌শা বিরক্ত হইয়া গোরাচাঁদের দিকে চাহিয়া বলিল, "বে-ব্বেচারা বিয়ের সময় একটু সাজগোজ করবে না তো ওর দিদিমাকে গঙ্গাযাত্রা করবার সময় করবে? খ্যাঁটের গন্ধ পেলে তোর জ্ঞান থাকে না গোরে?" আমায় আবার সা-স্সাক্ষী মানতে কে বলছিল ব্যা? একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, অমনই 'না রে গন্‌শা'?"

॥ ২ ॥

যেখানে বিবাহ সে গ্রামটার মূল নাম গোকুলপুর : পরে 'কালসিটে গোকুলপুরে' দাঁড়ায় কবে নাকি গ্রামের লোকেরা এক মাতাল গোরার দলকে উত্তম-মধ্যম দিয়া এই সামরিক খেতাবটা অর্জন করে। মুখে মুখে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এখন শুধু 'কালসিটে'তে দাঁড়াইয়াছে.

বরযাত্রীর দলও প্রায় গোরাব মত শত্রুস্থানীয়, তাই গ্রামে কোন বরযাত্রী আসিলেই ছেলে-ছোকরারা সুযোগমত কানে তুলিয়া দেয়, "এ জায়গার নাম কালসিটে মশাই, একটু সমঝে চলতে হবে।"

গ্রামটা ডায়মন্ডহারবারের কাছাকাছি, স্টেশন হইতে মাইল তিন-চার দূর।

বাড়িটা নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা। গ্রামের সব বাড়িই এই রকম। যেখানে জঙ্গল নাই, সেখানে খানা-ডোবা, দুই-একটা মাঝারি সাইজের পুকুরও আছে, সব জল টইটম্বুর। জলটা ঘাটের কাছে একটু দেখা যায়, তাহার পরই ঘন সতেজ পানার কার্পেট।

সদর আর অন্দর আলাদা আলাদা, রসি দুয়েকেব তফাত হইবে। উৎসব উপলক্ষে সদরবাড়ির সামনে একটি ছোট শামিয়ানা পড়িয়াছে। শামিয়ানার চারিদিকে খুঁটিকে কাচের পাত্রে মোমবাতির নিষ্প্রভ আলো, মাঝখানে একটা তীব্রজ্যোতি গ্যাসের আলো—বকমধ্যে হংস যথা শোভা পাইতেছে। অন্দববাহির মিলিয়া আবও গোটাকতক গ্যাসের আলো।

শামিয়ানার মধ্যে ববেব আসর। বব বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছে এবং দূরে পাড়ার কোন মেয়ের দল বাড়ির মধ্যে যাইতেছে দেখিলেই বাসরঘব স্মরণ কবিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছে, "বাপ রে, দফা সারলে আজ।" তাহাকে ঘিরিয়া তাহার বন্ধুবর্গ। সবচেয়ে কাছে গনশা একটা মখমলের বালিশ বুকে চাপিযা ত্রিলোচনের দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে ত্রিলোচনও মুখটা বাড়াইয়া আনিতেছে এবং একটু আধটু কথাবার্তা হইতেছে।

একটু দূরে কর্তারা। বলা বাহুল্য, সকলেই অপ্রকৃতিস্থ কম-বেশি করিয়া। সহায়বামবাবু কন্যাযাত্রীদের কয়েকজনেব সঙ্গে বেশ জমাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য তিনি কতশত জায়গায় বরযাত্রী হইয়া গিযাছেন, কিন্তু এমন ভদ্র কন্যাপক্ষ কোথাও দেখেন নাই। নানারকম উদাহরণ দিয়া অশেষ প্রকারে কথাটা সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মুশকিল, তাহারা কোন রকমেই কথাটা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। তাহাদের মধ্যেও সব অল্পবিস্তর নেশা করিয়াছে এবং ধরিয়া বসিয়াছে, তাহারা অতি দীনহীন ইতর; বরপক্ষীয়েরা বরং অতিশয় ভদ্র ও সম্মানার্হ, এ গ্রামে এ রকম বরযাত্রী কখনও আসে নাই।

কথাটা অমায়িক মৃদু হাস্যে, হাতজোড় প্রভৃতি বিনয়োচিত প্রথায় হইয়াছিল; ক্রমেই কিন্তু সে ভাবটা তিরোহিত হইয়া যাইতে লাগিল, এবং একটা জেদাজেদির সঙ্গে সবাব মুখ গম্ভীর হইয়া আসিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিসে একটু উষ্ণ হইয়া জড়িতস্বরে বলিলেন, "কেমনতর লোক আপনারা মশাই? একটা ভদ্রলোক সেই থেকে বলছে, আপনাদের মতো ভদ্রলোক দেখি নি, তা কোনমতেই মানবেন না? ভারি জ্বালা তো!"

এদিককার একজন তাঁহারই মতো ভারী আওয়াজে উত্তর করিল, "আর আমাদেব কথাটা বুঝি কিছু নয় তাহলে মশাই? আমরা এতগুলো ভদ্রলোক মিথ্যেবাদী হলাম?"

ত্রিলোচনের পিসের পোষকতা পাইয়া সহায়রামবাবুর আত্মসম্মান ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রাগিয়া গলা চড়াইয়া বলিলেন, "কটা ভদ্রলোক আছে আপনাদের মধ্যে গুনে দিন তো দেখি, চিনতে পারছি না। ভদ্রলোকের মান রাখতে জানেন না, আবার ভদ্রলোক বলে পরিচয় দিতে যান!"

বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, তাঁহার উচ্চারণ আরও বেশি গাঢ় এবং অস্পষ্ট।

পিছন হইতে একটা ছোকরা শাসাইল, "এটা কালসিটে মশাই, মনে থাকে যেন!"

একটা বাড়াবাড়ি রকম কিছু হইতে যাইতেছিল, কন্যাবাড়ির লোকেরা এবং কয়েকজন বয়স্ক লোক আসিয়া তাড়াতাড়ি থামাইয়া দিল। সহায়রামবাবু আর ত্রিলোচনের পিসেকে ধরিয়া সদর-বাড়ির ঘরে উঠাইয়া লইয়া গেল, এবং ওদিককার কয়েকজনকেও সরাইয়া আসরের নিদারুণ ভদ্রাভদ্র সমস্যাটা কতক হালকা করিয়া দিল।

রাজেন তাহার নিজের লেখা কবিতা বিলি করিতে যাইতেছিল, ঘোঁৎনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল, কানের কাছে মুখ দিয়া বলিল, "এই, সব ক্ষেপে রয়েছে, এখন আর ঘাঁটাস নি। যারা পড়তে জানে না, ভাববে ঠাট্টা করছে।"

রাজেন ক্ষুণ্ণমনে বলিল, "তাহলে এগুলো কী হবে? এত কষ্ট করে লিখলাম ছাপালাম, কেউ পড়বে না?"

গোরাচাঁদ আশ্বাস দিল, "ভাবিস নি, আমি কাল শেয়ালদার মোড়ে বিলি করিয়ে দোব'খন। আজকাল একটা ছোঁড়া জ্যাঠার 'সন্ন্যাসী-প্রদত্ত দদ্রুভৈরবে'র হ্যান্ডবিল বিলোয় কিনা, সঙ্গে একখানা করে তোর 'হর্ষোচ্ছ্বাস' দিয়ে দেবে।"

রাজেন কোন উত্তর দিল না, নাক-মুখ কুঞ্চিত করিয়া পদ্যের বান্ডিলটা হাতের মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল।

ত্রিলোচন ভীতভাবে গন্‌শার দিকে মুখটা সরাইয়া লইয়া গিয়া বলিল, "দেখলি তো পিসে আর সহায়রামবাবুর কাণ্ডটা, ওঁদের আর কী? ওঁরা দুজনেই তো এই গাড়িতে লম্বা দেবে, সব ঝোঁকটা গিয়ে পড়বে আমার ওপর। ভাবটা বুঝেছিস তো? ব্যাটারা বাড়িতে সব মেয়েদের খবর দিতে গেল, আসরের শোধ বাসরে তুলবে।...আঃ, গোলমালে আবার গানের অন্তরটা দিলে ভুলিয়ে। তারপর কি র‍্যা গন্‌শা, 'মুহা পঙ্কজ সোঙ্‌রি'? একটু মাথাটা সরিয়া আন, সুর করেই বল্।"

গন্‌শা মখমলের বালিশের উপর তর্জনীর টোকা দিতে দিতে ত্রিলোচনের মুখের উপর ভাব-ব্যাকুল চোখ দুইটা তুলিয়া গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল, "মুহা পঙ্কজ সোঙ্‌রি সোঙ্‌রি চিত মোর ব্যা—ব্যা—ব্যা।"

রাজেন সরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতেছিল, এই গাঁটের মাথায় নিজের গলাটা জুড়িয়া দিল, "ব্যাকুল হোয়, নয়না নিদ জানত নেহি, মানত নেহি—"

গন্‌শা গাহিতেছিল, "জঁ-জ্জ-জ্জানত নে-ন্নে—"

রাজেনের হাতটা টিপিয়া বলিল, "তুই থাম, এগিয়ে যাচ্ছিস তা-ত্তাড়াহুড়ো করে।"

রাজেন এই রকম চারিদিকেই থাবা খাইয়া নেহাত অপ্রসন্ন ভাবে মুখটা ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, এমন জানিলে কখনই আসিত না। গন্‌শার ব্যবহারে তাহার দুঃখটা বিশেষ এইজন্য যে গানটি তাহার স্বরচিত, যদিও গন্‌শার সুর দেওয়া। রাজেন 'বাসর তাণ্ডব' নাম দিয়া ঝালোয়ার প্রদেশের রাজপুত-কাহিনী অবলম্বন করিয়া একটা নাটক লিখিতেছে। ঝালোয়ার সামন্ত সুব্বা সিং বাসরঘরে রাজপুত বীরাঙ্গণা-পরিবৃত হইয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূ মীরাবাঈয়ের উদ্দেশ্যে তন্ময় হইয়া গানটি গাহিতেছেন, এমন সময় খবর পাওয়া গেল, দুর্গপাদদেশে মুঘল সৈন্য।

এই সময় ত্রিলোচনের বিবাহের হাঙ্গামা আসিয়া পড়ায় নাটকটা আর অগ্রসর হয় নাই। রাজেন স্থির করিয়াছিল, রাজপুতদের জিতাইবে, কিন্তু গন্‌শার দুর্ব্যবহারে মেজাজটা

অত্যন্ত তিক্ত হইয়া যাওয়ায় মনে মনে ভাবিতেছে, গনেশশঙ্কর নাম দিয়া একটা তোতলা দাগাবাজ ব্রাহ্মণকে দাঁড় করাইয়া রাজপুতবাহিনীকে মুঘলের হাতে বিধ্বস্ত করাইয়া দিবে।

গোরাচাঁদ কে. গুপ্তকে বলিতেছিল, "লুচি ভাজার গন্ধ বেরুচ্ছে, কি রকম খাওয়াবে কে জানে!"

এমন সময় ত্রিলোচনের পিতা ডাক দিলেন, "বাবা গোরাচাঁদ, শুনে যাও একটা কথা।"

গোরাচাঁদ কাছে গিয়া বসিল। ত্রিলোচনের পিতার চোখ দুইটি বেশ একটু রক্তাভ, বেশ অনায়াসেই যে চাহিয়া আছেন এমন বোধ হয় না। গোরাচাঁদের কাঁধের উপর কোমলভাবে স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, আমার ত্রিলোচন আর তোমরা কি আলাদা?"

গোরাচাঁদ এ প্রশ্নের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না; কিন্তু প্রশ্নকর্তার অবস্থা দেখিয়া সহজে অব্যাহতি পাইবার আশায় উত্তর করিল, "আজ্ঞে না, আমরা সবাই আপনার ছেলের মতন, কিছু তফাত নেই তো। তিলুকে নিজের ভাই জেনেই তো এসেছি সব।"

"তা হলে একটি কথা, কেউ তোমরা এখানে অন্নস্পর্শ কোরো না আজ।"

গোরাচাঁদ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ আবার কি ফ্যাসাদ! একটু চুপ করিয়া থাকিবার পর তাহার একটা সম্ভাবনার কথা মনে হইল; বলিল, "আজ্ঞে, আমরা যা ত্রিলোচনও তাই; কিন্তু ওর আজকে বিয়ে বলে কিছু খেতে নেই, আর আমরা তো শুধু বরযাত্রী হয়ে এসেছি কিনা—"

"সেজন্যে নয়। এদের আক্কেলটার কথা ভাবছি, আমাদের কি অপমানটা করলে দেখলে না? আমি যৎপরোনাস্তি রেগেছি গোরাচাঁদ; এই আমি আর তোমাদের মেসো বসে আছি, বর তুলে নিয়ে যাক তো আমাদের সামনে থেকে!"

গোরাচাঁদ ভীত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, সেটা কি ভাল হবে? খেতে বারণ করেন সে কিছু শক্ত কথা নয়, কিন্তু এরা যেরকম অবুঝ আর বেয়াক্কেলে লোক দেখছি, বর উঠতে না দিলে একটা হাঙ্গাম—"

"ওরে, এই দিক পানে; অন্দরে নিয়ে যা, ওই দিক দিয়ে ঘুরে যা!"

কয়েকটা ভারী দই-ক্ষীরের তিজেল বাঁকে লইয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিতেছে, কর্তাগোছের একজন তাহাদেরই নির্দেশটা দিল। গোরাচাঁদ সতৃষ্ণনয়নে দেখিয়া লইয়া বলিল, "কি যে বলছিলাম? হ্যাঁ, বর না উঠতে দিলে একটা হাঙ্গাম—এমন কি, না খেলেও একটা রীতিমত হাঙ্গাম করতে পারে। তাই বলছিলাম—"

ত্রিলোচনের পিতা গন্‌শাকে ডাক দিতে যাইতেছিল, গোরাচাঁদ ত্রস্তভাবে বলিল, "আমি দিচ্ছি ডেকে, আপনি কষ্ট করতে যাবেন কেন? হ্যাঁ, ও বরং চালাক আছে, যা বলে—"

গিয়া গন্‌শাকে বলিল, "তিলুর বাবা ডাকছেন রে।" একটু চাপা গলায় তাড়াতাড়ি টিপিয়া দিল, "দেখিস যেন আত্মীয়তা করতে যাস নি; তা হলে আমার মতন বেকায়দায় ফেলে খাওয়া বন্ধ করবে, ভয়ানক খাপ্পা হয়েছে এদের ওপর।"

এই সময় কন্যাকর্তা গলায় গামছা দিয়া করজোড়ে বরের আসরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাধারণভাবে সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এইবারে বরকে নিয়ে যাবার—। কই, বেহাইমশাই কোথায়? এই যে—"

কাছে গিয়া বলিলেন, "তা হলে দাদা, অনুমতি দিন এইবার।"

গোরাচাঁদ গন্‌শা ত্রিলোচন সকলেই রুদ্ধশ্বাসে একটা বিষম দুর্ঘটনার অপেক্ষা করিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিতা একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে-সুস্থে উঠিয়া কন্যাকর্তাকে বুকে জড়াইয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "তিলু তো তোমারই ছেলে ভাই, আজ যদি—ওফ!"—গলাটা অশ্রুরুদ্ধ হইয়া পড়ায় আর বলিতে পারিলেন না।

যাইবার সময় ত্রিলোচন বন্ধুদের দিকে একটা বিপন্ন অসহায় ভাবের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল। কে. গুপ্ত একটু কাছে ছিল, সাহস দিয়া বলিল, "যান, ভগবান আছেন।"

বর চলিয়া গেলে গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি ত্রিলোচনের পিতার নিকট গেল; ডাকিল, "জ্যাঠামশাই!"

ত্রিলোচনের পিতা শোকাচ্ছন্নভাবে মাথাটা হাতের তেলোয় ধরিয়া বসিয়া ছিলেন, মুখ তুলিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, "কে গোরাচাঁদ? গোরা রে, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত —ওফ।"

গোরাচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ। বলছিলাম, আর তবে না-খাওয়ার হাঙ্গামাটাও করে কাজ নেই, কি বলেন? যখন মিটেই গেল—"

॥ ৩ ॥

বর চলিয়া গেলে কন্যাপক্ষের একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বরযাত্রীদের মধ্যে কারা এই গাড়িতে ফিরে যাবেন যেন?"

ঘোৎনা বলিল, "হ্যাঁ, সহায়রামবাবু আর বরের পিসেমশাই, তাঁরা ঐ ঘরে রয়েছেন।"

প্রশ্নকর্তা বলিল, "দুজন তা হলে? বলেন তো আপনাদের সবারই জায়গা করে দিই; কজন আছেন সব মিলিয়ে?"

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি সামনে আগাইয়া বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়! আছি, আমি এক, ঘোৎনা দুই—

গন্‌শা নিচু গলায় ধমক দিয়া বলিল, "খা-খ্‌ খালি খালি খাই খাই, স্ত্রী-আচার দেখবি নি? রাজুকে খোঁ-খ্‌ খোঁজ নিতে পাঠালাম কি করতে?...আজ্ঞে না, আমরা একটু ফূর্তি-টুর্তি করি, খাওয়া তো রোজই—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ঠিক, একটু আমোদ-আহ্লাদ, গান-বাজনা করুন।..কই হে, এঁদের ডেকে নাও তোমরা। শিবপুর থেকে এসেছেন, গান-বাজনার দেশ; বলে, গাইয়ে বাজিয়ে শূর, তিনে শিবপুর..."

সভার এক দিকে গান-বাজনা হইতেছিল। এক চুড়িদার-পাঞ্জাবি-পরা ছোকরা শীর্ণ কাঁধের উপর কেশভারাক্রান্ত মাথাটা প্রচণ্ড বেগে নাড়িয়া নাড়িয়া গান গাহিতেছে, সাত-আটটি সমবয়সী মন্দিরা বাজাইয়া, শিস দিয়া, হাততালি দিয়া, তুড়ি বাজাইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেছে। আশপাশের আর সকলে সমস্ত দলটির মৃত্যুকামনা করিতেছে।

ভদ্রলোকের কথায় একজন বলিল, "আমরা তো তাই চাই। আপনারা দয়া করে—"

গন্‌শা সবার মুখপাত্র হইয়া বলিল, "মা-মাপ করবেন; আমাদের মধ্যে কেউ গা-গ্‌ গাইতে জানে না।"

ওদিকফার একজন বলিল, "সে কথা শুনব কেন মশাই? সাদা কথাতেই আপনার অমন গিটকিরি বেরুচ্ছে, গাইতে বসলে—"

অপর এক ছোকরা জুড়িয়া দিল, "গিটকিরি ছাড়া তো কিছু বেরুবেই না।"

গন্‌শা একটা রাগারাগি গণ্ডগোল করিতে যাইতেছিল, রাজেন আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাঁধে হাত দিয়া চাপা গলায় বলিল, "হাঁড় ক'খানির মায়া রাখ?"

গন্‌শা ফিরিয়া বলিল, "কেন, কি হয়েছে?"

তাহলে স্ত্রী-আচার দেখবার নাম কোরো না, যা করে বেঁচে এসেছি, আমিই জানি। বাইরে দাঁড়িয়ে যাব কি না যাব ভাবছি, একটা কেলে রোগা ছোঁড়া এসে বললে, ভেতরে চলুন না, বাইরে কষ্ট করছেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ কোথা থেকে এসে কাঁধের উপর হাত দিয়ে— কে মশাই আপনি? ফিরে দেখি, ইয়া লাস, আমার পায়ের গোছ তার হাতের কব্জি। পরে একজনের কাছে খবর নিয়ে জানলাম, কনের কাকা, নাম জগুদা। থতমত খেয়ে বললাম, বরযাত্রী—স্ত্রী-আচার দেখছি।"

"শুনে সুখী হলাম। একলা যে?"

"বললাম, 'তারা আসব আসব করছে।'

"শুনে সুখী হলাম, তাঁদের ডেকে নিয়ে আসুন। একটিতে আমার হাতের সুখ হবে না।. কালসিটেতে এসে স্ত্রী-আচার দেখবে? মাতলামির আর জায়গা পাও নি?"

"আমি তো ভয়ে কেঁচোটি হয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে এলাম। দেখি, সেই হারামজাদা ছোঁড়াটা কোণে দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছে : যদি কখনও শিবপুরে পাই ব্যাটাকে—"

গান-বাজনার কথা লইয়া গন্‌শার রাগটা চড়িয়াই ছিল, আরও ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল, "ইডিয়ট। ভী-ভ্ ভীরু কোথাকার! বি-বিয়ে দেখতে এসে যদি স্ত্রী-আচারই দেখলাম না তো—। চল্ সবাই, দে-দ্দেখি কে কি করে!"

গন্‌শা দৃপ্তভাবে পা ফেলিয়া অগ্রণী হইল, আর সবাই সাহস এবং উৎসাহের অনুপাতে আগু পিছু হইয়া চলিল। রাজেন শুধু ভীরু অপবাদটা দূর করিবার জন্য গন্‌শার পাশে রহিল।

সদর ছাড়াইয়া একটু দূরে যাইতেই তাঁহার সঙ্গে দেখা। গায়ে একটা সোয়েটার মাত্র, সবল পেশীগুলো জাগিয়া আছে। একটা গামছা কাঁধে ফেলিয়া এদিকেই আসিতেছিলেন, রাজেন দূর হইতে চিনাইয়া দিল; অবশ্য চিনাইয়া না দিলেও কোন ভুল হইত না।

কাছে আসিয়া রাজেনকে লক্ষ্য করিয়া একটা খসখসে গম্ভীর আওয়াজে বলিলেন, "এই যে, সবাইকে ডেকে এনেছেন!"

রাজেনের মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল, আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, মানে হচ্ছে এরাই সব বললে—"

ঘোঁৎনা আগাইয়া আসিয়া বলিল, "গোরাচাঁদ বললে, বরং খেয়ে নিলে হত; আমি বললাম, তা হলে কনের কাকাকে গিয়ে বললেই হবে, তিনি সব করছেন কম্মাছেন—"

রাজেন বলিল, "আমি বললাম, আর জগুদা লোকও বড় ভাল।"

গন্‌শা বলিল, "লো-ল্লোক ভাল শুনে আমি বললাম, চ-চ্চল তা হলে আম্মো যাই, জগুদার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয়ও হবে। সে-স্‌সে একটা মস্ত সৌভাগ্য কিনা।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "বেশ বেশ; কিন্তু দু-একটা জিনিস এখনও বাকি আছে। যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে তো গোরাচাঁদবাবু না হয়—"

ঘোঁৎনা বলিল, "সেই খুব ভাল কথা। গোরাচাঁদ, তুই তা হলে—। কোথায় গেল গোরাচাঁদ?"

শুরুতেই যেই ঘোঁৎনা 'গোরাচাঁদ বলল' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিল, গোরাচাঁদ বহির্মুখী একটি ছোট্ট দলে ভিড়িয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে পাওয়া গেল না।

ভদ্রলোক চলিয়া গেলে কেহ আর কোন কথা কহিল না। শুধু কে. গুপ্ত একটু ছাপবেয়ে ইডিয়ম মিশ্রিত করিয়া বলিল, "খুব হট্টাকট্টা জোয়ান, গ্র্যান্ড ফুল ব্যাক হয়, গোষ্ঠ পালের জোড়া!"

আরও ঘণ্টা দুয়েক কাটিল। দলটা খানিকটা স্রোতের কুটাকাঠির মতো এদিক সেদিক করিয়া কাটাইল। দুই একজন সহায়রামবাবুদের সঙ্গে চলিয়া যাইতেও চাহিল; বাকি সবাই তাহাদের আটকাইয়া রাখিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই আবাব আসরে আসিয়া জুটিল। ভাঙা আসর, এখানে সেখানে এক-আধজন শুইয়া গড়াইযা আছে। আশেপাশের লোক বিরল, আলোও বেশিব ভাগ নির্বাপিত। গোরাচাঁদ একটা বালিশেব উপর কাত হইযা বলিল, "খাইয়েছে মন্দ নয়, তবে একটু একটেরেয় পড়ে গিয়েছিলাম, এই যা।"

খানিকক্ষণ খাওয়ার আলোচনাই চলিল।

গোরাচাঁদ আবার বলিল, "রাজ্ তোর পদ্যটা পড় তো একটু, শুনি। গোড়াটায় বেশ লিখেছিস—'আজকে সখা দিল্-পেয়ালায় ফুর্তি-সরাব উছলে ওঠে'।"

ঘোঁৎনা বিরক্তভাবে বলিল, "আরে দুৎ, উছলে ওঠে! তিলুর বিয়েটা জমতেই পেলে না, পদে পদে বাধা, এ যেন—। গন্‌শা কোথায়? দেখছি না যে?"

রাজেন বলিল, "তাই তো!"

শুইয়া বসিয়াই চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

কে. গুপ্ত হঠাৎ ঘোঁৎনার কাঁধটা নিজের কাছে টানিয়া বলিল, "দেখুন তো, গণেশবাবুর মতোই না?"

ঘোঁৎনা বলিল, "তাই তো বোধ হচ্ছে; অন্ধকারে ওখানে কি করছে ছোঁড়া?"

সদর-বাড়ির বাঁ দিক দিয়া একটা রাস্তা স্টেশনের দিকে গিয়াছে এবং তাহারই একটা সরু ফেঁকড়া ঘন বনজঙ্গল রাবিশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া অন্দর-বাড়ির পিছন দিকে হারাইয়া গিয়াছে। সেই রাস্তাতেই একটা বিচালির গাদার আড়ালে গন্‌শাকে দেখা গেল, অতি সন্তর্পণে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে আসিতেছে। বিচালিটা পার হইয়া বেশ সহজ ভাব ধারনা করিল। দলের মধ্যে আসিয়া উৎসুক প্রশ্ন নিবারণ করিয়া চাপা গলায় বলিল, "চুপ!"

বলিয়া নিজেও একটু চুপ করিয়া রহিল। ঘোঁৎনা তাহার কাপড হইতে একটা চোবকাঁটা ছাড়াইয়া লইয়া প্রশ্ন কবিল, "কোথায় গিয়েছিলি রে গন্‌শা?"

গন্‌শা মুখটা একটু নিচু করিল, সবাই ঘেঁষিয়া আসিলে বলিল, "তি-তিলুব বাসরঘর দেখে এলাম।"

'সে কি!' 'দুৎ, মিছে কথা!' 'মাইরি?'—বলিতে বলিতে সবাই আরও ঘেঁষিয়া আসিল। কে গুপ্ত বলিল, "ত্রিলোচন-বাবু আছেন তো?—কানটান—জামায় রক্তটক্ত—"

"আপনার ত্রিলোচন এখন সহস্র-লোচন ইন্দ্র হয়ে বসে আছে, চা-চ্চারিদিকে অপ্সরী, কিন্নরী, ঠানদিদি!"

রাজেন কল্পনায় চিত্রটা আঁকিয়া লইয়া বলিল, "উঃ, যেতে হবে মাইরি!"

গন্‌শা জানাইয়া দিল, অভিযানটা বেজায় শক্ত। সরু রাস্তাটা একটু গিয়া আর নাই তাহার পর দূরের গান বাজনা আর মাঝে মাঝে হাসির শব্দ লক্ষ্য করিয়া, ঘন আগাছার মধ্য দিয়া ছাই, গোবর, ভাঙা ইঁট, সুরকির গাদা প্রভৃতির উপর দিয়া বাড়ির পিছন দিকে পৌঁছিতে হইবে। সে আরও মারাত্মক জায়গা, চাপা জঙ্গল, ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুইটা ঘর পার হইয়া বাসরঘরটা। খড়খড়ি দেওয়া পাশাপাশি দুইটা জানালা শীতের জন্য বন্ধ; একটার জোড়ের কাছটা একটু ফাঁক হইয়া গিয়াছে, আর অন্যটাতে একটা খড়খড়ির নিচের দিকে একটা ছোট্ট ফালি ভাঁড়িয়া গিয়াছে। "ভ-ভগবানের দয়া"—বলিয়া গন্‌শা বিবরণ শেষ করিয়া প্রশ্ন করিল, "বো-বোঝো : চাও যেতে কেউ?"

ঘোঁৎনা বলিল, "আলবত যাব, এর আর বোঝাবুঝি কি আছে?"

কে. গুপ্ত বলিল, "সাপখোপ—"

ঘোঁৎনা ধমক দিয়া বলিল, "রাত্তিরে ঐ নাম করছেন? আচ্ছা কাঠগোঁয়ার তো!"

কে. গুপ্ত ধাঁধায় পড়িয়া চুপ করিয়া গেল।

গন্‌শা বলিল, "তবে হ্যাঁ, জঙ্গলের ওদিকে খানিকটা ফাঁকা মা-ম্মাঠ আছে, যদি তাড়া করে তো—"

গোবাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "কি দেখলি জানালার ফাঁক দিয়ে গন্‌শা? এক ঘর বুঝি সব সুন্—"

রাজেন বাধা দিল, "থাক, বর্ণনা করলে আবার বাসি হয়ে যাবে!"

"সে কবাও যায় না!"—বলিয়া গন্‌শা সকলের উৎসুক কল্পনাকে একেবারে চরমে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল।

॥ ৪ ॥

দুইটা জানালার মধ্যে হাত চারেকের জায়গা। একটা রাজেন আর গন্‌শা, অপরটা ঘোঁৎনা আর কে. গুপ্ত দখল করিল।

পথে গোরাচাঁদের পা দুইটা হাঁটু পর্যন্ত একটা গোবরগাদায় ডুবিয়া গিয়াছিল। গন্‌শার কানের কাছে ফিসফিস করিয়া বলিল, "ওরে গন্‌শা, বড্ড কুটকুট করছে; উঃ, কি করি বল্‌ তো?"

গন্‌শার মন তখন অন্য রাজ্যে। একটি ষোড়শী আসিয়া কনের মুখের ঘোমটা তুলিয়া ত্রিলোচনকে বলিতেছে, "এই দেখ ভাই। আহা, বেচারী এইজন্যে মনমরা হয়েছিল গো। দেখ দিকিন কেমন!"

গোরাচাঁদ গন্‌শার কাঁধটা একটু টিপিয়া বলিল, "শুনেছিস? গেলাম, গেলাম মাইরি, গোবরটা নিশ্চয় পচা ছিল।"

গন্‌শা ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে প্রশ্ন করিল, "কি করে জানলি?"

গোরাচাঁদ খিঁচাইয়া বলিল, "কি করে জানলি! ভয়ানক কুটকুট করছে যে পা দুটো!"

গন্‌শা চোখ দুইটা ছিদ্রপথে আরও ভাল করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

গোরাচাঁদ নিরাশ হইয়া অপর জানালায় চলিয়া গেল, ঘোঁৎনার জামার খুঁটে একটা টান দিয়া বলিল, "ঘোতু, পচা গোবরের কোন রকম ওষুধ—"

"না, হয় না; ফেলে দে।"—বলিয়া ঘোঁৎনা তাড়াতাড়ি আবার দৃষ্টিটা গবাক্ষবদ্ধ করিল।

ষোড়শী ঢলঢলে চোখ দুইটি তখন বরের মুখের উপর রাখিয়া আবদারের সুরে বলিতেছে, "হ্যাঁ ভাই বর, অমন চাঁদপানা মুখখানা দেখিয়ে দিলাম, মজুরি হিসেবেও একখানা গান—"

একটি কিশোরী বলিল, "হ্যালা সরীদি, জানিস না, দয়া করলে কি আকে রস দেয়? কানে মোচড় না দিলে কি গান বেরোয়?"

ঘোঁৎনা কে. গুপ্তকে টিপিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দেখলেন, ঐটুকু মেয়ে অবলীলাক্রমে বিদ্যাসুন্দর আউড়ে দিল।"

কে. গুপ্ত প্রশ্ন করিল, "সে আবার কি?"

ঘোঁৎনা মুখ ঘুরাইয়া মনে মনে বলিল, "তোমার মুণ্ড, কাটখোট্টা!"

ওদিকে রাজেন গন্‌শাকে প্রশ্নে প্রশ্নে বোঝাই করিতেছিল, "পোষ মাসে বিয়ে হয় না, না রে গন্‌শা? ধর যদি তেমন জরুরি হয়? আচ্ছা মাঘ মাসে? মাসের গোড়ায় দিনটিন আছে কিনা খোঁজ রাখিস্?"

ঘরের ভিতর শানমলার অনেকগুলি সমর্থনকারিণী জুটিয়া গেল। ত্রিলোচন ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াইয়া বলিল, "থামুন, আমি গাইব, তবে কথা হচ্ছে, গানের অন্তরটা হারিয়ে যাচ্ছে, বাংলা নয় কিনা। যদি এতবার ভেতরের বারান্দায় গন্‌শাকে ডাকিয়ে পাঠান তো—"

গন্‌শা তাড়াতাড়ি মুখটা সরাইয়া লইয়া অতিরিক্ত উৎকণ্ঠার সহিত ফিসফিস করিয়া বলিল, "কি সর্বনাশ বল্ দিকিন! ইডিয়ট! এক্ষুনি ওদিকে ডাক পড়বে, এখন কি করা—"

রাজেন দেখিতেই ছিল, হাতটা একবার 'না'স ভঙ্গিতে নাড়িয়া গন্‌শাকে টানিয়া লইল। গন্‌শা শেষের দিকটা শুনিতে পাইল, "আমরা গন্‌শা কি ঢ্যাপসা, এদের ডাকতে যাই আর কি!—"

গোরাচাঁদ গন্‌শা আর রাজেনের মাঝখানে মুখটা গুঁজিয়া দিয়াছিল। হঠাৎ পায়ের চিড়চিড়ানিটা বাড়িয়া যাওয়ায় একরকম নাচিতে নাচিতেই সরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে গন্‌শাকে টানিয়া লইয়া চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আবার চাগিয়েছে রে, গেলাম মাইরি!"

"তুই সব মাটি করলি; আয় তো এদিকটায় ফাঁকায় একটু সরে। সেই মেয়েটা এতক্ষণ বোধ হয়—"

পাশেই হঠাৎ দুয়ার খোলার আওয়াজ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই একরাশ এঁটো পাতা, খুরি, গেলাস দুইজনের মাথায় কাঁধে পিঠে সজোরে আছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর তাহাদের ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই, "ওগো বাবা গো, ডাকাত!"—বলিয়া স্ত্রীকণ্ঠে একটা চীৎকার, ঝনাৎ করিয়া দুয়ার বন্ধ, সশব্দে পতন, গোঙানি, বিভিন্ন কণ্ঠে হাঁকাহাঁকি, বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি, সবগুলা যেন একমুহূর্তে সংঘটিত হইয়া বাড়িটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল।

দলটার যে যেখানে ছিল, একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিবার সময় নাই, শুদ্ধ জীবধর্মের প্রেরণায় কাজ। কোন রকমে বাঁচিতে হইবে, যেমন করিয়া হোক না কেন।

কে. গুপ্ত যেদিক হইতে আসিয়াছিল, সোজা সেই দিকে ঘুরিয়া ছুট দিল; সদরের দিকে নয়, একেবারে সোজা।

"ঐ পালায়, পেছু নাও!"

"উত্তর দিকে ছুটেছে!"

ঘোৎনা পলাইবার উপক্রম করিয়া ঘুরিতেই একটা গাছে ধাক্কা লাগিল। বোধ হয় পেঁপে গাছ, খুব মোটা।

ওদিকে কে হাঁকিল, "না, বন্দুক না নিয়ে বেবিও না; খবরদার! টোটা ভরে বেরুবে।"

ঘোৎনা তরতর করিয়া পেঁপেগাছটার উপর উঠিয়া পড়িল। একটু উপরে উঠিয়াই টের পাইল, কতকগুলা ডাল বাহির হইয়া একটা ঝোপ; আপাতত সেখানটায় একটু থামিল।

গন্‌শা গোরাচাঁদের কোমরেব ব্যাপাবটা টানিয়া বলিল, "স-স্‌সামনেই ফাঁকা মাঠটা শীগগির নেমে পড়।"

রাজেন বলিল, "তার চেয়ে চেঁচিয়ে বল, আমরা বরযাত্রী।"

"তুই আলাপ ক-ক্করগে মুখ্যু।—বলিয়া গন্‌শা গোরাচাঁদকে একরকম টানিতে টানিতেই পা বাড়াইল।

পাশেই বাসরঘরে একটু যেন ধস্তাধস্তি হইতেছে। একজন বয়স্কার গলার আওয়াজ, "ওবে না না, জানালা খুলিস নি, ওদের হাতে বন্দুক থাকে, ওরে অ নীহার! কি নির্ভয় মেয়ে সব বাবা আজকালকাব।"

জানালাটা টানা হিঁচড়ানির মধ্যে খুলিযা গেল। রাজেন এক রকম লাফ দিয়াই গন্‌শা আর গোরাচাঁদকে ধবিয়া ফেলিল। তাহার পরেই পাতলা আগাছাটার মধ্য দিযা ছুট। হাত কয়েক পরে জমিটা সামনে একটু নামিয়া গিযাছে, তাহাব পরেই ফাঁকা। তিনজনে ঢালুটুকু একরকম লাফ দিয়াই কাটাইল; পবক্ষণেই ঝপাং ঝপাং ঝপাং করিয়া তিনটা শব্দ।

"ওরে পুকুরে পড়েছে--খিড়কির পুকুরে, তিনটে!"

খিরকির দরজা খুলিযা গেল।

"লালঠেনে হবে না, গ্যাস-লাইটাব নিয়ে আয়।"

"একটা টর্চ হলে হত,—বরযাত্রীদের কাছে একটা আছে, নিয়ে আয়; তারা ঘুমোচ্ছে বোধ হয়, জাগিযে দে।"

তিনজনে প্রাণপণে সাঁতার কাটিতে লাগিল। রাজেন চাপাস্বরে বলিল, "এই তোব মাঠ? কী ভীষণ পানা বে বাবা! উফ!"

গন্‌শা বলিল, "ঘা-ঘ্‌ ঘাস ভেবেছিলাম। ডুব-সাঁতার কাট্‌।"

সমস্ত পাড়ায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বেটাছেলের গলার আওয়াজ ক্রমেই বেশি শোনা যাইতেছে। নানা রকম প্রশ্ন, উত্তর, হুকুম।

"এই পুকুরে?"

"হ্যাঁ, ঘিরে ফেল। লাঠি শড়কি যাই হোক সবাই একটা একটা হাতে রেখো, ভয়ঙ্কব লাস এক-একটা।"

"রঘো বাগ্‌দীকে খবর দেওয়া হয়েছে?"—এটা যেন জগুদার স্বর।

এক কোণ হইতে গগনবিদারক আওয়াজ আসিল, "এজ্ঞে, এই যে মুই রামদা নিয়ে রয়েছি। নেমে পড়ব?"

এপার হইতে উত্তর হইল, "না, ঘিরে ফেল চারিদিক থেকে।...ওরে, কুকুর দুটোকে খুলে দে।"

"দেখতে পাচ্ছ কেউ?"

রঘো বলিল, "যেন তিনটে মাথা ওদিকপানে।..."

গন্‌শা ডুব দিল।

"দুটো!"

রাজেন ও গোরাচাঁদ ডুব দিল।

"গোঁত্তা দিয়েছে সব।"

"নজর রাখিস।"

রাজেন মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কতক্ষণ ডুবে থাকা যায়?"

গোরাচাঁদ প্রতিপ্রশ্ন করিল, "কতক্ষণ ভেসে থাকা যায়? আমার পেটে জায়গাই ছিল না,--তার ওপর জল।"

রাজেন বলিল, "পানার জল।.. উঃ, কি কামড়ায় র‍্যা!"

গন্‌শা বলিল, "মা-স্মাছ—বোধ হয় পো-প্লোষা মাছ।"

রাজেন বলিল, "উঃ, পোষাই বটে ওদের, ছিঁড়ে ফেললে।"

গোরাচাঁদ বলিল, "আবাব পচা গোবরের চার পেয়েছে কিনা?"

যে টর্চ আনিতে গিযাছিল, খিড়কিব নিকট হইতে চেঁচাইয়া বলিল, "বরযাত্রীরা তো নেই জগুদা, দু-জন খালি মদ খেযে নাক ডাকচ্ছে। ডাকাত পড়েছে বলতে বললে, পড়ে থাক, উঠিও না।"

পুকুরের এদিক হইতে জগুদাব কর্কশ আওযাজ হইল, "আপনাবা তা হলে কোন্ দিকে আছেন মশাই? একবাব টর্চটা বের করুন না?"

অপর একজন বলিল, "তারা আবার এই সময় কোথায় গেল? পরের ছেলে—ভাববার কথা তো।"

গোবাচাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "এই গন্‌শা, এই তালে জানিযে দে, আমবা এখানে, কোন ভাবনা নেই।"

রাজেন বলিল, "আব টর্চটা ভিজে গেছে।"

গন্‌শা বোধ হয় জানাইতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক এই সময়ে পাশে একটা ঢিল আসিয়া পড়ায়, সে সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে ডুবিয়া পড়িল।

"ঐ যে ঐখানেই একটা ঘায়েল হয়েছে!"—সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা ছোট বড় ঢিল আসিয়া আশপাশে পড়িল। একটা বন্দুকেব আওয়াজও হইল।

আব দেরি করা চলে না। গোরাচাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে চেঁচাইয়া বলিল, "ঢিল ছুঁড়বেন না আপনারা।"

রাজেন বলিল, "বন্দুকও ছুঁড়বেন না।"

একজন কথা বাঁকাইয়া বলিল, "বটে বটে, কি ছুঁড়তে তা হলে হুকুম হয়?"

একজন ইয়ারগোছের ছোক্‌রা ও কিনারা হইতে বলিল, "ফুল ছুঁড়ুন, চন্দনে ডুবিয়ে।"

গোরাচাঁদ একটু নিস্তব্ধ হইয়া গেল, আধমিনিটটাক মাত্র। তাহার পর সকলের বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। ওপারে কে একজন বলিল, "রসিক আছে তো!"

পেঁপেগাছ হইতে ঘোঁৎনা এই তালে বলিতে যাইতেছিল, "আমি একজন আছি এখানে"—কিন্তু অবিশ্বাসের বহর দেখিয়া আর বলা হইল না।

পাশের কিনারা হইতে উত্তর আসিল, "ঐ যে শুনেছে বরযাত্রীদের পাওয়া যাচ্ছে না —ওরে আমার চালাক রে!"

তিনজন এই দিকেই অগ্রসর হইতেছিল, পায়ে মাটি ঠেকিল। রাজেন বলিল, "না,

দিব্যি করে বলছি, আমরা বরযাত্রী, উঠলেই টের পাবেন।...থু থু, কি পানা রে বাবা!"

গন্‌শা লম্বা ডুব দেওয়াতে অতিরিক্ত হাঁপাইতেছিল। রাজেন বলিল, "রঘু বাগদী এদিকে নেই তো?"

আবার সেই উৎকট বক্রোক্তি, "বটে! ওরে রঘুকে ডাক্।"

তিনজন আবার ঝপাঝপ করিয়া জলে পড়িল। তখন জগুদার কণ্ঠের আওয়াজ হইল, "আচ্ছা উঠে আয়, কিন্তু এক এক করে। রঘু, তুই একটু ওদিকেই থাক, তোয়ের থাকবি কিন্তু!"

রাজেন প্রথমেই উঠিল। হাত-পা এক রকম অবশ হইয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গে পাঁক, পানা, কুটাকাঠি। ঠকঠক করিয়া কাঁপুনি। কোমরে জড়ানো র‍্যাপারের পরতে একটা বড় চাঁদামাছ লণ্ঠনের আলোয় চকচক করিতেছে। বুকটা হাপরের মতো উঠানামা করিতেছে, কোন রকমে দুইটা কথা ধাক্কা দিয়া বাহির করিল, "এই দেখুন।"

পূর্বপরিচিত সেই কালো লম্বা ছেলেটা বলিল, "বাঃ, কি চমৎকার!"

আর একজন বলিল, "চোখ জুড়িয়ে গেল!"

গোরাচাঁদ উঠিয়া আসিল। রাজেনেরই মতো, অধিকন্তু কাপড়টা খুলিয়া গিয়াছে, নীচে আন্ডারওয়ার। রাজেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "এ গোরা।"

সেই ফাজিল ছেলেটা বস্ত্রের সংক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হাইল্যান্ডার গোরা বলুন!"

গন্‌শা ফিরিয়াই আবার ডুব দেওয়ার পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল; অর্ধমৃত অবস্থায় উঠিয়া আসিল। গোরাচাঁদেরই অনুরূপ, বাড়তির মধ্যে মাথায় একটা ছোট্ট কচুরিপানার চূড়া

সেই ছেলেটা পিছন হইতে সম্ভ্রমের স্বরে বলিল, "কমান্ডার-ইন্-চীফ।"

"উঠেছে উঠেছে, ওই দিকে।"—শব্দ করিতে করিতে চারিদিকের লোক আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল, "কি বলছে? এরাও বরযাত্রী? দড়ি নিয়ে এস।"

অন্য একজন বলিল, "বরযাত্রীরা নেই কিনা, ধরা পড়ে তাদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে।"

সেই দুষ্টবুদ্ধি ছোকরাটা সামনে আসিয়া বলিল, "আরে, তাদের যে ইস্টিশানের দিকে যেতে দেখলাম। আর তাদের দেখলেই জগুদা তক্ষুনি চিনে ফেলত, না জগুদা?"—বলিয়া একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

"দেখতেও হত না, গলা শুনেই চিনতাম।"—বলিয়া একবার তাহার দিকে কেমন একভাবে চাহিয়া, হঠাৎ নিজের গলাটা পরিষ্কার করিবার দরকার পড়ায় জগুদা সরিয়া পড়িল।

কন্যাকর্তা বৃদ্ধগোছের। ছেলেটার দিকে পিটপিট করিয়া চাহিয়া বলিলেন, "তুই যেতে দেখলি তাদের? তা হবে, কয়েকজন চলে যাবে বলে তখন গোঁ ধরেছিল, আর তারা ছিল ছ-সাতজন।"

গোরাচাঁদ বলিল, "পাঁচজন ছিলাম।"

জগুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আর তাদের মধ্যে একজন তোতলা ছিল সবচেয়ে হারামজাদা।"

গনশা তাড়াতাড়ি দম লইয়া বলিল, "এই যে ম-ম্মশাই, আম্মো রয়েছি : বে ব্বেজায়—"

"মা-ম্মাইরি! অমনিই তো-ত্তোতলা সেজে গেলে!"

কন্যাকর্তা বলিলেন, "অত তোতলা ছিল না তো।"

দুই-তিনজন ধূর্তামি করিয়া বলিয়া গেল, "একজন বোবা ছিল।"

"একজন খোনা ছিল।"

"একটা খোঁড়া ছিল।"

"তা এখনও হতে পারে।"

কন্যাকর্তা প্রশ্ন করিলেন, "বরযাত্রী তো ওদিকে কী করছিলেন সব?"

তিনজন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওযি করিতে লাগিল। রাজেন গনশাকে একটু ঠেলিয়া বলিল, "বল না রে।"

গনশা মুখটা খিঁচাইয়া বিরক্তভাবে কহিল, "আরে দুৎ, আমার কথা বে-ব্বেশি আটকে যাচ্ছে, বি-ব্বিশ্বাস করবে না।"

গোরাচাঁদ কহিল, "রাজেন বললে, দিব্যি খাঁওয়ালে ভদ্দরলোকেরা; চল্, ত্রিলোচন বোধ হয় এতক্ষণ বাসবে গান ধরেছে, দিব্যি নিবিবিলিতে—"

গনশা যোগাইয়া দিল, "পু-প্পুকুরধারটিতে বসে—"

"দিব্যি নিবিবিলিতে পুকুরধারটিতে বসে একটু—"

রাজেন থাকিতে পারিল না, বলিল, "আমি বললাম থাক, দরকার কি? মেয়েছেলেরা রয়েছেন—"

গোরাচাঁদ গনশার দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি হানিল, একটু উপস্থিত বুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল, "আমি বললাম, মেয়েছেলেরা গান ধরলে উঠে পড়ব, তাঁরা তো আমাদের বোনেরই তুল্য।"

গনশা বলিল, "মা-ম্মার পেটের বোনের—"

কন্যাকর্তা গর্জন করিয়া উঠিলেন, "সব ধাপ্পাবাজি! মার পেটের বোনের! কেউ গেল থানায়? রঘু!"

রঘু বাগদী পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল; বলিল, "এজ্ঞে, এই যে আছি মুই। আপনাদেরও যেমন হয়েছে কত্তা, ঐসব কথা পেত্তয় করেন। আয়েশ করে গান শোনবার কি নন্দনকানন রে! সব একেলে সৌখীন ডাকাত, দেখছেন না?"

রঘুর উপস্থিতিতে এবং কথাবার্তায় সবাই আরও ঘাবড়াইয়া গেল। রাজেন বলিল, "আচ্ছা পুলিশ ডাকবার আগে আমাদের কর্তাদের কাছে নিয়ে চলুন না একবার, তাঁরা তো ভুল করবেন না।"

গোরাচাঁদ বলিল, "না হয় বরের কাছে।"

কর্তা শাসাইয়া উঠিলেন, "খবরদার, বরের কাছে যেন না নিয়ে যাওয়া হয়।"

পিছন হইতে একজন বৃদ্ধগোছের লোক বলিলেন, "আর দেখ, বর যেন ঘর থেকে না বেরোয়; কোথায় কে আছে, কত রকম বিপদ হতে পারে, দুর্গা দুর্গা।"

জগুদা বলিল, "আচ্ছা বরকর্তার কাছেই নিয়ে চল সবাইকে। রঘু, পাশে পাশে থাকিস।"

তিনজনেই নিজের নিজের মূর্তির দিকে চাহিয়া বলিল, "তা হলে একখানা করে শুকনো কাপড় আর জামা—"

সমস্ত দলটাতে একটা চেঁচামেচি গোছের পড়িয়া গেল।

"মাইরি?"

"ওদের জামাই সাজিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

"একটা চৌঘুড়ি নিয়ে এস।"

"যেমন ভাবে পুকুর থেকে উঠেছিলে সেই রকম ভাবেই যেতে হবে, তাতেও যদি চেনে, তবেই—"

সেই দুষ্টবুদ্ধি ছেলেটা বলিল, "দময়ন্তী নলকে অমন অবস্থাতেও কি করে চিনেছিলেন? ববং যে পানাগুলো খসে গেছে, আবার চাপিয়ে দাও।"

অগত্যা সেই অবস্থাতেই অগ্রসর হইতে হইল। দলটা রঙবেরঙের মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে আগে-পিছে চলিল।

সদর বাড়িতে মাঝখানের ঘরটিতে কর্তা ও বরের মেসো এক জায়গায় মড়ার মতো পড়িয়া। এক কোণে পুরুতঠাকুর তাঁহার বধিরতার কল্যাণে গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য। বাহিরের বারান্দায় দীনে নাপতে কাজকর্ম সারিয়া কর্তাদের বোতলঝাড়া একটু প্রসাদবিন্দু পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার ষোল আনা ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে।

দলটা বাবান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জগুদা 'বেয়াই-মশাই।' বলিয়া বরকর্তাকে জাগাইতে যাইতেছিল, সেই ছেলেটা হঠাৎ সামনে আসিয়া বলিল, "দাঁড়ান দাঁড়ান, ওরাই আগে দেখাক কে বরের বাবা, কে ববের মামা, কে বরের বোনাই, কে বরের—"

তিনজনে কটমট করিয়া তাহার পানে চাহিল। গোরাচাঁদ বলিল, "কেন, ঐ তো ববের বাপ।"

গনশা টীকা করিল, "ভ-ব্‌ভতারণবাবু।"

"ঐ বরের মেসো অনন্তবাবু, ঐ পুরুতমশাই—কালা, রাতকানা; বাইরে দীনে নাপতে।"

ছেলেটা দমিবার নয়, চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, "সব খোঁজ নিয়েছে রে!"

একজন বলিল, "বোধ হয় শিবপুর থেকে ধাওয়া করেছে!"

অনেক ডাকাডাকি এবং পরে ঠেলাঠেলির পর ভবতারণবাবু 'উ' করিয়া একটা শব্দ করিলেন। দুই-তিনজন চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল, "দেখুন তো, এই কি আপনাদেব বরযাত্রী?"

অনেকবার প্রশ্ন করায়, অনেক কষ্টে কর্তা রক্তাভ চক্ষু দুইটি চাড় দিয়া অল্প একটু উন্মীলিত করিলেন; আরও অনেক চেষ্টার পর প্রশ্নটার মর্মগ্রহণ করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "কে বাবা, নন্দি-ভিরিঙ্গি, থিলোচনের বরযাত্রা এশ্চো! এক শিল্‌ম চড়াও তো বাবা!"

তিনজনেই একরকম আর্তস্বরেই চীৎকার করিয়া বলিল, "জ্যাঠামশাই, আমরা গোরাচাঁদ, রাজেন, গনেশ—"

"গজানন, শিঃ, তুই শেষ্কালে বাপের বিয়ে দেখতেলি?"—বলিয়া অবশ অঙ্গুলি দিয়া সবাইকে সরিয়া যাইতে ইশারা করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বৃথা পরিশ্রম ভাবিয়া তাঁহাকে আর কেহ জাগাইতে চাহিল না।

বরের মেসো অনন্তবাবুর একটুও সাড়া পাওয়া গেল না। গোরাচাঁদ নিরাশভাবে বলিল, "হা ভগবান!"

পুরোহিত মহাশয়কে তোলা হইল। কথাটা তাঁহাকে শুনাইতে এবং ভাল করিয়া বুঝাইতে সবিশেষ বেগ পাইতে হইল। তিনি বলিলেন, "ডাকাতরা বলছে বরযাত্রী? তা আমি তো রাত্রে দেখতে পাই না বাবা, প্রাতঃকাল পর্যন্ত তাদের বসিয়ে রাখ না হয়।"

গোরাচাঁদ অগ্রসর হইয়া পদধূলি লইয়া বলিল, "ন্যায়রত্নমশাই, আমি গোরাচাঁদ।"

"গোবাচাঁদ? এস দাদা, আজকের দিনে আর কি আশীর্বাদ করব? শীঘ্র একটি বিবাহ হোক, কন্দর্পকান্তি হও—"

সেই সর্বঘটের ছেলেটা একটু কাছে ঘেঁষিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "কন্দর্পকান্তি আশীর্বাদের আগেই হয়ে বসে আছে!"

পাশ থেকে কে একজন বলিল, "মানস-সরোবরে চান করে।"

ন্যায়রত্নমশাই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বইকি, তোমরা সুপুরুষ তো আছই, তা গোরা রে, এরা কি বলছেন, ডাকাতরা নাকি বলছে, তারা বরযাত্রী? কি অনাসৃষ্টি! চিনে দাও তো দাদা।"

বাজেন বলিল, "এরা বলছে—এরা বলছেন বরযাত্রীরা ডাকাত।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় একটু ধাঁধায় পড়িয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ঠিক অর্থ গ্রহণ হচ্ছে না, ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত!"

দলের একজন ডান হাতটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিল, "সামলাও ন্যায়ের ধাক্কা এখন, তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল? ডাকাতরা ববযাত্রী, না ববযাত্রীরা ডাকাত?"

গনশা মরীয়া হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "ম-ম্মশাই আমি পারলে সো-স্‌সোজা করেই বলতাম, কি-কিন্তু সত্যিই তোতলা; দয়া করে একবার বর তি-ত্তিলুর কাছে নিয়ে চলুন, তারপর পু-প্পু, লিশে দিয়ে দেবেন না হয়। উঃ, শী-শ্‌-শীতে কালিয়ে গেলাম!"

বলা বাহুল্য, কথাবার্তার ভঙ্গিতে অনেকের সন্দেহটা মিটিয়ে আসিতেছিল, বিশেষ করিয়া বয়স্থদের মধ্যে। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "তাই নিয়ে চল না হয়, রঘুকে এগিয়ে দাও।"

কর্তা বলিলেন, "জগু, বাড়ির মেয়েদের তা হলে বলগে।"

দলটি তিনজনকে ঘিরিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠানদিদি আর মেয়েরা বরের চারিদিকে ব্যূহ সৃষ্টি করিয়া বাহির-হইতে-পাওয়া খবরের টুকরাটাকরাগুলা লইয়া নিজের নিজের কল্পনাশক্তির পরিচর্চা করিতেছিল, কর্তা চেঁচাইয়া বলিলেন, "একবার বরকে বাইরে পাঠিয়ে দাও!"

"ওমা, কি অমঙ্গুলের কথা, কি হবে! কোনমতেই না"—বলিয়া সবাই ব্যূহটা আরও সুদৃঢ় করিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। কন্যাকর্তাকে নিজেকেই ভিতরে যাইতে হইল।

এমন সময় একটা কাণ্ড হইল। ঘোৎনা পুকুরের দিকটা খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব সন্তর্পণে পেঁপেগাছ হইতে নামিয়া চুপিসাড়ে সদর-বাড়িতে দলটির পেছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেখানকারই কথাবার্তায় আত্মপ্রকাশের উৎসাহ না পাইয়া খুব সাবধানে বাড়ির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ত্রিলোচনের দ্বারা সনাক্ত হইবার সুযোগটা হারানো কোনওমতেই সমীচীন হইবে না ভাবিয়া "কি হয়েছে র‍্যা গন্‌শা? এত গোলমাল কিসের?"—বলিতে বলিতে ভিড় ঠেসিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, এবং সঙ্গে "অ্যাঁ, তোদের এ কি দশা!"—বলিয়া হাত চোখ কাঁধের ভঙ্গি সহকারে একখানি নিখুঁত অভিনয় করিল।

তিনজনেই বলিয়া উঠিল, "ঘোঁৎনা যে! কোথায় ছিলি? দেখ না, এ ভদ্দরলোকের কোনমতেই—"

ঘোঁৎনা গাছের উপর হইতে পুকুরপাড়ের সব কথাই শুনিয়াছিল; বলিল, "তোর যখন আমার বারণ না শুনে পুকুরের দিকে গান শুনতে গেলি—"

মুরুব্বিয়ানায় গোরাচাঁদের গা জ্বলিয়া উঠিল, গন্‌শা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে টিপিয়া থামাইল।

"আমি ভাবলাম দুজোর একটু বেড়িয়ে আসা যাক। খানিকটা দূরে গেছি, এদিকে একটা সোরগোল। তাড়াতাড়ি ফিরলাম। একে অজানা জায়গা, তায় রাত্তির, খানিকটা এদিক, খানিকটা ওদিক করে শেষে পথ ভুলে—"

"একটা পেঁপেগাছে উঠে পড়লাম!"

সবাই এই শেষের বক্তা সেই ফাজিল ছোকরাটির পানে চাহিল। তাহার ঠিক মোক্ষম জায়গাটিতে আসিয়া দাঁড়াইবার কেমন গূঢ় শক্তি আছে, ইতিমধ্যে কখন ঘোঁৎনার পাশটিতে আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে। সে নিজের টিপ্পনীর পর আর কিছু না বলিয়া ঘোঁৎনার চারিদিকের লোকেদের সরাইয়া দিয়া ঘোঁৎনাকে একটু সামনে আগাইয়া দিল। সকলেই দেখিল, তাহার পিছনে কোমরে জড়ানো র‍্যাপারের সঙ্গে বাঁধা দুইটা ডাঁটাসুদ্ধ পেঁপের পাতা, একটা শুকনো, একটা পাকা— মাঝারি সাইজের। গাছে থাকিতে কখন আটকাইয়া কাপড়ের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে, ঘোঁৎনার সাড় হয় নাই।

"দোসরা ধাপ্পাবাজ! লাগাও চাঁটি।" একটা গোলমাল উঠিতেছিল, এমন সময় শ্বশুরের সঙ্গে ত্রিলোচন আসিয়া বকে দাঁড়াইল।

"সত্যিই যে তোরাই দেখছি! আমি বলি, বুঝি ডাকাতই পড়ল। তা জলে ঝাঁপ দেওয়ার কুবুদ্ধি হল কেন? আর কে. গুপ্ত কোথায়? গোরা, তোর দাড়িতে কী ঝুলছে, মুখ তোল্ তো!"

দাড়িতে বোধ হয় একটা পানার শিকড় ঝুলিতেছে, কিন্তু মুখ তুলিবার তখন আর গোরাচাঁদের অবস্থা ছিল না,—গোরাচাঁদেরও নয়, গন্‌শারও নয়, রাজেনেরও নয়, ঘোঁৎনারও নয়।

সন্দেহ সম্পূর্ণ কাটিয়া যাওয়া মাত্র একটা রব পড়িয়া গেল—

"ওরে, শুকনো কাপড় নিয়ে আয় তিনখানা।"

"কাপড় জামা, র‍্যাপার,—শীগগির।"

"চা করতে বলে দে, দেরি না হয়।"

"আহা, ভদ্দরলোকের ছেলে, বাসরঘর দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল তো—"

সেই ছেলেটা বলিল, "স্পষ্ট করে বললেই হত জগুদাকে।"

"ওরে, নিয়ে এলি কাপড়? দেরি কেন?"

কাপড় আসিল দুই দিক হইতে। বাসরঘরের ভিতর হইতে লইয়া আসিল একটি কিশোরী। চারিখানি বেশ চওড়াপেড়ে শাড়ি, চারিটি সায়া, চারিটি ব্লাউজ। একটু মিষ্ট ধারালো হাসি হাসিয়া বলিল, "বাসরঘরে ওঁদের চারজনকে ডাকছেন।"

ত্রিলোচন কবিরাজ

দিবাকর শর্মা

আর কোনও শব্দ কানে আসিতেছিল না, শুধু পায়ের খড়ম জোড়ার সঙ্গে ফুটপাথ ঘর্ষণের ফলে অবিশ্রাম নানা ছন্দে খটাস্ খটাস্ ধ্বনি উঠিতেছিল, তাহাই শুনিতে শুনিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চলিতেছিলাম, সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ মনে হইতেছিল, সকালে 'জেন্টস্ রেস্তোরাঁ ডিল্যাক্স'-এ এক পয়সার এক কাপ চায়ের সঙ্গে তিনদিনকার বাসি রুটির একখানা পোড়া টোস্ট খাইয়াছিলাম, ক্রমাগত তাহারই ঢেকুর উঠিতেছিল। সমস্ত দিন বাড়ি ফিরিব না সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু কোথায় দিন কাটাইব স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। পরিচিত দুই একটি বন্ধুর বাড়ি কাছেই ছিল, যাইতে পারিতাম, কিন্তু মনে মনে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের উপরই কেমন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কাহারও কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। দুই একটি ঝি বাজার লইয়া পাশ দিয়া চলিয়া গেল, কেহ কেহ আঁচলের চাবির গোছা দিয়া মৃদু অথচ সতর্ক আঘাতও করিয়া গেল, ফিরিয়াও চাহিলাম না। প্রতি মুহূর্তেই মন উত্তরোত্তর সংসারে বীতরাগ হইয়া উঠিতেছিল। সমস্ত জগৎটাই যদি কেওড়াতলা অথবা কাশীমিত্রের ঘাট হইয়া যাইত তাহাতেও কোনও আপত্তি ছিল না।

সহসা পথের ধারের একটি ঘরের মধ্যে পুরুষের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। জানালা দিয়া দেখি অনেকগুলি লোক কেহ সরবে কাঁদিতেছে কেহ রুমালে চোখ মুছিতেছে। কেহ মরিয়াছে মনে হইল, কিন্তু বাড়ির সম্মুখে খাট দেখিলাম না, উপরে চাহিলাম—দেখিলাম বাড়িখানার প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা সাইনবোর্ড, সোনালি অক্ষরে লেখা 'প্রেমার্তি হরণ ঔষধালয়', তাহারই নিচে লেখা শ্রীত্রিলোচন কবিরাজ। ঔষধালয় ও কবিরাজ উভয়কেই নূতন মনে হইল, কাজেই কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু অচিরাৎ বুঝিলাম ভুল করিয়াছি, কবিরাজ এবং ঔষধালয় কোনটিই নূতন নহে, যেহেতু সাইন বোর্ডের সোনালি অক্ষরে কালো দাগ পড়িয়াছে এবং সদরের যে ঘরে রুদ্যমান জনগণকে দেখিলাম তাহারই পাশে একটা বড় হলঘর, তাহার আসবাবপত্রও অতি পুরাতন এবং ফরাসের একশ'-একটি স্থানে কালি এবং তেলের দাগ: ক্যাশবক্সের সম্মুখে যে লোকটি বসিয়াছিলেন তিনিও অতি প্রাচীন। বুঝিলাম এইটি কবিরাজ মহাশয়ের ডিস্‌পেনসারি। ক্যাশবাক্সরক্ষক ভদ্রলোকটি আমাকে আগ্রহের সঙ্গে দেখিতেছিলেন, সহসা ডাকিলেন, 'আসুন, ভিতরে আসুন।'

ভিতরে ঢুকিয়া ফরাসে বসিলাম। দেয়ালে একখানি প্রকাণ্ড আকারের মদনভস্মের অয়েল পেন্টিং ছিল, সেইখানি দেখিতেছি এমন সময় ভদ্রলোকটি কহিলেন, 'জানেন তো, বাড়িতে ব্যবস্থা নিলে দর্শনী আট টাকা!' কহিলাম, 'কিসের দর্শনী?'

'কবরেজ মশায়ের। ব্যাধি অবশ্য আপনার তিনদিনেই নির্মূল হবে। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।'

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, 'এই কথা বলবার জন্যে ডেকেছেন বুঝি। ব্যাধি আমার নেই।'

বৃদ্ধ কহিলেন, 'অবশ্য আছে। এই ব্যাধি নেই এমন পুরুষ এবং নারী জগতে নেই মশাই, রাজা রাজড়া থেকে—'

কথা সমাপ্ত হইতে দিলাম না, বিদ্রূপ করিয়া কহিলাম, 'আপনি অন্তর্যামী দেখছি।'

বৃদ্ধ নির্বিকার ভাবে কহিলেন, 'প্রায়। এই তেষট্টি বচ্ছর বয়স হল মশাই, আঠার বছর থেকে কবরেজ মশায়ের কম্পাউন্ডারি কচ্ছি। প্রত্যহ গড়পড়তায় তিন শ' রুগীকে ওষুধ দেই। বর্ষা আর বসন্তে এই রুগী হয় দুনো। ত্রিশটি ছেলে মোড়ক বেঁধে অবকাশ পায় না। নিজে দেখছি তো কবরেজ মশায়ের ওষুধ নৈলে কারো চলে না। আর আপনি কি না—'

একটু সম্ভ্রম হইল, কহিলাম, 'কি ব্যাধির কথা বলছেন জানলে—' বৃদ্ধ কহিলেন 'সাইনবোর্ড দেখেননি? যাবতীয় প্রণয়-ঘটিত ব্যাধির চিকিৎসা এখানে ওষুধ এবং মুষ্টিযোগ সহযোগে করা হয়। দর্শনী আট টাকা, ওষুধ বিনামূল্যে। এর চেয়ে সুবিধে পাবেন না কোথাও? প্রণয়-ঘটিত অনেক প্রকার ব্যাধির নাম ও তাহার বহুবিধ পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন বড় বড় মাসিক ও সংবাদপত্রে আবাল্য দেখিয়া আসিতেছি, এ পর্যন্ত তাহার প্রয়োজন হয় নাই। আর আজ,—বৃদ্ধ কহিলেন, ভাবছেন? ভাবছেন বুঝি কোনও ব্যাধি নেই আপনার। কবরেজ মশায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই বুঝতে পারবেন ব্যাধি আছে কি না? আপনার আর বয়েস কি মশাই, আমি শ্রীবলরাম রসনিধি, পাঁচ পাঁচটি স্ত্রীকে নিমতলার ঘাটে পার করেছি, এই তেষট্টি বছর বয়েস, এখনও আমাকে মাঝে মাঝে কবরেজ মশায়ের কাছে ব্যবস্থা নিতে হয়।' প্রতিবাদ করিলাম না, কিন্তু মনে হইল হয়তো ব্যাধি আমারও কোথাও আছে। গৃহিণীর সহিত ঝগড়া করিয়া আসা অবধি মাথাটা টন্ টন্ করিতেছিল, ভাবিলাম হয়তো একটা প্রণয়ঘটিত কোনও ব্যাধি হইবে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করির এমন সময় রসনিধি মহাশয় সসম্ভ্রমে কহিলেন, 'ওই কবরেজ মশাই আসছেন।' পরক্ষণেই হুঁকা হাতে ত্রিলোচন কবিরাজ মহাশয় মোহমুদ্গার আবৃত্তি করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। বয়স সত্তর পার হইয়া গিয়াছে, মাথার সম্মুখের দিকে চুলের উৎপাত নেই। পিছনে কয়েক গুচ্ছ শুভ্র কেশ, তাহাতে একটি ধুতুরী ফুল। কবিরাজ মহাশয়ের ললাটে একটি যাত্রার দলের মহাদেবের ধরনে ললাটনেত্র আঁকা, তাহার মধ্যে একটি রক্তচন্দনের অক্ষিতারকা। ফরাসে বসিয়াই কবিরাজ মহাশয় আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কেন জানি না, আমি চোখ বুজিলাম। কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, 'ভয় নাই, আরোগ্য হবে।' পরে হুঁকায় টান দিয়া কহিলেন, 'রোগীগণকে উপস্থিত কর—' মাধাই—'কবিরাজ মহাশয়ের আহ্বান শুনিয়া গুটিকয়েক অল্প বয়সের শিক্ষার্থী ডিস্‌পেনসারিতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কবিরাজ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া রোগীদের বসিবার ঘরে চলিয়া গেল। আমি ফরাস ছাড়িয়া একটি টুলের উপর গিয়া বসিয়া সতৃষ্ণনেত্রে রোগীদের ঘরের দরজার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

রোগীদের ঘর হইতে নানারূপ গুঞ্জন দীর্ঘশ্বাস অস্ফুট স্ফুট রোদন শুনিতে পাইলাম। তাহার পরই কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্রদের কাঁধে ভর দিয়া রোগীরা আসিতে শুরু করিল। একি। প্রায় যে সকলেই আমার পরিচিত। রসনিধি মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা দেখিতেছি মিথ্যা নহে। রাজনৈতিক নেতা হইতে আরম্ভ করিয়া মাসিক পত্র সম্পাদক পর্যন্ত সর্ববিধ ব্যক্তিই কবিরাজ মহাশয়ের নিকট চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন। একটা বিশেষত্ব এই দেখিলাম যে, সকলেই কাঁদিতেছেন, কিন্তু কেহ কাহারও দিকে চাহিতেছেন না। অতি বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বৎসরের বালক পর্যন্ত রোগ দেখাইতে আসিয়াছে। একটা প্রশ্ন মনে জাগিল, উঠিয়া রসনিধি মহাশয়ের কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কহিলেন, 'হ্যাঁ মেয়েরাও আছেন তবে তাঁরা দোতলায়। এঁদের ব্যবস্থার পর তাঁদের ব্যবস্থা হবে।'

কবিরাজ মহাশয় হাঁকিলেন, 'অগ্রে অল্প বয়স্কগণকে উপস্থিত কর।' এক সঙ্গে পাঁচ

সাতটি স্কুলের ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া ফরাসে বসিল। কবিরাজ মহাশয় গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, 'পরীক্ষায় ফেল করিয়াছ?'

সকলেই সমস্বরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে উত্তর দিল, 'হুঁ।'

কবিরাজ মহাশয় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। রসনিধির দিকে ফিরিয়া কহিলেন, প্রাতে মোহমুদ্গার গুড়িকা একমাত্রা, পথ্য উপবাস।' ব্যবস্থাপত্র লইয়া ছেলে কয়টি দর্শনী দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

এইবার বয়স্ক রোগীরা আসিতে শুরু করিলেন। প্রথমে যিনি আসিলেন তাঁহাকে চিনিতাম না। তিনি কবিরাজ মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কবিবাজ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পেশা কি?' ভদ্রলোক কাঁদিতে কাঁদিতেই কহিলেন, 'পত্রিকা সম্পাদক।'

'হুঁ। কবিতা ছাপা হয়?'

'আজ্ঞে তাতেই তো—'

'হুঁ। লেখিকার কাছে পত্রলিখন কার্য করা হইয়াছে?'

'আজ্ঞে। তাঁর জবার পেয়েই তো—' বলিয়াই ভদ্রলোক আবার কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি কবিরাজ মহাশয়ের অভ্রান্ত নির্দেশ দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। কবিবাজ মহাশয় হাত বাড়াইয়া রোগীর নাড়ি দেখিলেন, তাহার পর কহিলেন, 'ব্যবস্থা—প্রাতে ও সন্ধ্যায় অশ্রুভৈরব বটি, মধ্যাহ্নে স্বল্পপ্রণয়ান্তক', তাহার পর রোগীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, পত্রিকা সম্পাদন ত্যাগ কর।'

এই সময় ক্ষীণ একটি আর্তনাদ শুনিলাম, পরক্ষণেই মাধাই আসিয়া জানাইল যে, দ্বিতলে একটি বোগিণীর মূর্ছা হইতেছে। ত্রিলোচন কবিরাজ উঠিলেন এবং এক টিপ নস্য নাসারন্ধ্রে টিপিতে টিপিতে দ্বিতলে চলিয়া গেলেন, এই অবসরে আমি রসনিধি মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিয়া কহিলাম, 'যদি কিছু মনে না করেন—' রসনিধি কহিলেন, 'আদৌ মনে কর্ব না, প্রশ্ন করুন।'

ত্রিলোচন কবিরাজের জীবন-কাহিনী জানিবার জন্য দুর্নিবার আগ্রহ হইতেছিল, 'কহিলাম, কবিরাজ মশাযকে অনেক দিন থেকেই জানেন আপনি! তাঁর সম্বন্ধে—' রসনিধি কহিলেন, 'ত্রিলোচন কবরেজের কথা জানেন না আপনি? আচ্ছা সংক্ষেপে শুনুন তবে, পঞ্চাশ বছর আগেক্কার কথা। কবরেজ মশায় পড়তেন সিদ্ধান্তকৌমুদী আমরা পড়তাম মুগ্ধবোধ। অকস্মাৎ একদিন গ্রামের রজকনন্দিনী ধৈর্যময়ী ত্রিলোচন কবরেজের নামে অভিযোগ করল যে, তিনি তার অঙ্গ স্পর্শ করেছেন। অধ্যাপক মশায় চতুষ্পাঠী থেকে তাঁকে বিদায় দিলেন। ত্রিলোচন কবরেজ সেই থেকে সংসার ত্যাগ করেন। তারপর এ দেশ সে দেশ ঘুরে দেখলেন যে, জগতে প্রেমব্যাধিই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। তখন জীবহিতের জন্য এই ব্যাধির ওসুধ খুঁজতে তিনি গেলেন হিমালয়। সেখানে সিদ্ধবাবা মদনমথনজীর নিকট দীক্ষা নেন, তিনিই তাঁর প্রেমব্যাধি আরাম করেন। তারপর গুরুর আদেশে তিনি লোকহিত সাধনের জন্য গুরুদত্ত ওষুধপত্তর নিয়ে সংসারে আসেন এবং এই ডিসপেনসারি খোলেন। তাঁর ছাত্রেরা কেউ বিবাহ করতে পারে না; তবে আমার পৈতৃক বৃত্তি বলিয়া আমার সম্বন্ধে তাঁর অন্য ব্যবস্থা ছিল। তা তাঁর কৃপাতেই হোক আর ভাগ্যবলেই হোক পাঁচ পাঁচটার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি। গুরু হে তুমিই সত্য।' বলিয়া রসনিধি হাতজোড় করিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিলেন। এই সময় কবিরাজ মহাশয় আবার

আসিয়া ফরাসে বসিলেন। এইবার আমিও ভক্তিভরে কবিরাজ মহাশয়ের পদধূলি লইলাম। কবিরাজ মহাশয় মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

রোগীরা তখনও কাঁদিতেছিল। ত্রিলোচন কবিরাজ হাঁকিলেন, চুপ! ক্রন্দনধ্বনি থামিয়া গেল, শুধু ফোঁস-ফোঁসানি শোনা যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় রোগী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়স বছর পঁচিশ, গায়ে একটা রঙিন পাঞ্জাবি, চোখ কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে, মাথার চুল রুক্ষ। ফরাসে বসিয়াই ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। ত্রিলোচন কবিরাজের খোলা নস্যদানী হইতে খানিকটা নস্য ফরাসে উড়িয়া পড়িল, কবিরাজ মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর রোগীর নাড়ি দেখিয়া কহিলেন, 'রোগের বিবরণ বর্ণনা কর।'

কেমন করিয়া পাশের বাড়ির ছাদে শাড়ি শুকাইতে দেখিয়া তাঁহার রোগের প্রথম সূত্রপাত হয় এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে অনিদ্রা অরুচি দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, ভদ্রলোক তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শেষে গত সন্ধ্যায় শাড়ির অধিকারিণী তাঁহার মাথার ছাত হইতে একঝুড়ি তরকারির খোলা ফেলিয়া দেওয়াতে অনেকগুলি নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। কবিতা রচনা করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার অন্যতম। এই পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া পকেট হইতে একটি কলার খোসা কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রোগী পুনরায় কহিলেন, 'তাঁর স্মৃতিচিহ্ন রেখেছি আমি—খোসা নয়, এ ফুল।' কবিরাজ মহাশয় তাঁহার হাত হইতে খোসা লইয়া পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর সেটা ফেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'হুঁ! জঞ্জাল প্রক্ষেপকারিণীর বয়স কত?' রোগী চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ষোল—ষোল! sweet—'

ত্রিলোচন কবিরাজ ধমক দিয়া কহিলেন, 'চুপ! ব্যবস্থা—কিশোরীকালানল প্রাতে, সন্ধ্যায় দীর্ঘশ্বাসারি ঘৃত বুকে মালিশ। যাও দক্ষিণের বাতায়নে একটি স্থূল যবনিকা প্রলম্বিত কর গে।'

ইহার পর ক্রমাগত রোগীরা আসিতে লাগিলেন, একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম যে, সকলেই অসঙ্কোচে সকলের সম্মুখে রোগের গূঢ় নিদান উদ্‌ঘাটন করিতেছেন। লজ্জার লেশমাত্র কাহারও নাই। বৃদ্ধ অনুকূল চক্রবর্তীকে চিনিতাম। চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর সহিত বনিবনা না হওয়াতে তিনি সম্প্রতি বিশ্বম্ভর পাকড়াশীর প্রৌঢ়া পত্নীকে দেখিয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছেন এবং এদিকে পাকড়াশী মহাশয় অনুকূলবাবুর চতুর্থ পক্ষের সহধর্মিণীকে কাশীবাস করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন—সঙ্কল্পের ফলে তাঁহার অরুচি মাথাঘোরা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিয়াছে। উভয়ের রোগের এই পারিবারিক গোপন নিদানের কথা উভয়ে পরস্পরের সম্মুখেই বর্ণনা করিয়া গেলেন, বলিতে বাধিল না। দেখিয়া ত্রিলোচন কবিরাজের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি আমার ভক্তি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল।

রোগী ক্রমাগত আসিতেছে, ব্যবস্থা লইতেছে, বিরাম নাই। এদিকে বেলা বাড়িয়া উঠিল দেখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ঝড়ের মত একজন ঘরে প্রবেশ করিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিলেন—'প্রাণ যায়—প্রাণ যায়।'

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। বাস্তবিকার অন্যতম সদস্য রাতুল। সহসা রাতুল রায় হরিকুমারের স্বপ্নরাজ্য হইতে বাস্তব শহরে আসিলেন কি করিয়া? ঘর সুদ্ধ সমস্ত লোক নিস্তব্ধ। যে সকল রোগীরা ক্ষণকাল পূর্বেও ফোঁস ফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছিলেন তাঁহারাও নবাগত রোগীর অবস্থা দেখিয়া কৌতূহলে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলেন।

ত্রিলোচন কবিরাজ রাতুল রাহার দিকে একবার চাহিলেন—তাহার পর উঠিয়া আলমারি হইতে বেল কাঠের স্টেথস্কোপটি বাহির করিয়া রাতুল রাহার বুকে লাগাইলেন, রোগী চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ব্যথা! ব্যথা! বুক আর নেই—ঝাঁঝরা হয়ে গেছে কবরেজ মশাই!'

ত্রিলোচন কবিরাজ ধমক দিলেন, রোগী চুপ করিলেন। নাড়ি পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, 'হুঁ। রোগ জটিল।'

রাতুল রাহা হতাশ হইয়া কহিলেন, 'সারবে কি? না ফাঁদে বন্ধ হয়ে—'

ত্রিলোচন কবিরাজ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, 'ভয় নাই। অবস্থা বল।'

রোগী কহিলেন, 'অবস্থা নেই আর। হৃদয়ের নাভিশ্বাস উঠেছে।'

ত্রিলোচন কবিরাজ চক্ষু মুদিয়া কহিলেন, 'হুঁ। বল।'

রাতুল রাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'প্রেম আমার বুকে নীড় বেঁধেছিল—সেই ছোটবেলা থেকে। সেই নীড়ে হাজারো প্রেমপাখি ডিম ফুটে বেরিয়েছে। তারা জগৎ ঘুরে সবাই এখন হৃদয়-খাঁচায় আসতে চায়। কিন্তু ঠাঁই নাই,—ঠাঁই নাই।' বলিয়া রাতুল রাহা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

ত্রিলোচন কবিরাজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, 'স্পষ্ট করে বল।'

রাতুল রাহা যাহা বলিলেন তাহার ভাবার্থ এই যে একাদিক্রমে উনিশটি কুমারীকে তিনি প্রেম নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে নিবেদিতাগণের অভিভাবক এবং অভিভাবিকারা সন্ধান পাইয়া রাহা মহাশয়কে 'বাস্তবিকা' হইতে কুমারীগণের প্রেমার্ঘ গ্রহণ করিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছেন; ফলে তাঁহার ইহলৌকিক জনক জননী শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ঘটক বলিতেছেন যে রাহা মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এক বৎসরে একান্নটি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং যথোপযুক্ত মর্যাদা পাইয়াছিলেন। শুনিয়া পুরোহিত ঠাকুরেরা অত্যন্ত খুশি হইয়াছেন এবং পঞ্জিকা দেখিয়া একটা আসন্ন সুতহিবুক যোগের সন্ধান করিতেছেন। ত্রিলোচন কবিরাজ খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, 'রোগ জটিল। রীতিমত চিকিৎসা আবশ্যক। তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্যবস্থা বলিতে লাগিলেন, 'প্রাতে বৃহৎ প্রেমাঙ্কুশ-লৌহ পূর্ণমাত্রা ও পুরোহিত। নিসূদন রস-অর্ধবটি; মধ্যাহ্নে বিবাহ বিদ্রাবণ রস ও সন্ধ্যায় ঘটকাশনি ও খট্টাঙ্গাবলেহ। পথ্য প্রথম তিন দিবস লঙ্ঘন পরে অবস্থা মত।' ব্যবস্থা মত ঔষধ লইয়া যখন রাহা মহাশয় বাহির হইয়া যাইতেছিলেন তখন হরিকুমারের বর্তমান সংবাদ জানিবার অভিপ্রায়ে আমিও উঠিলাম। ত্রিলোচন কবিরাজ পিছন হইতে ডাকিলেন, 'অপেক্ষা কর।' ফিরিলাম, কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, 'তোমাকে আমার একটু প্রয়োজন আছে।' বসিয়া রহিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত রোগী বিদায় হইয়া গেল। তখন ত্রিলোচন কবিরাজ কহিলেন, 'তোমাকে এই প্রথম দেখিলাম কিন্তু তোমার প্রতি আমার কিঞ্চিৎ মমতার সঞ্চার হইয়াছে, যেহেতু দেখিতেছি এই ব্যাধি তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। কিন্তু দেখিলে তো বিদ্বান বুদ্ধিমান খ্যাতিমান ধনী দরিদ্র কেহই এই নিদারুণ প্রেমব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পান নাই।

আমি যদি তোমাদের শহরে চিকিৎসালয় খুলিয়া না বসিতাম তাহা হইলে কি হইত তাহা ভাবিতে পারিতেছি না। প্রথম যৌবনে এই ব্যাধি আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, গুরু দীক্ষা লইয়া উদ্ধার পাইয়াছি কিন্তু এখনও আমার মাঝে মাঝে তোমাদের নূতন নূতন খানকয়েক উপন্যাস ও কবিতার বই পড়িয়া আবার দুই একটি উপসর্গ দেখা দিতেছে। কাজেই গ্রন্থপাঠ একরূপ বর্জন করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার প্রাণান্ত

চেষ্টা সত্ত্বেও এই দারুণ সংক্রামক ব্যাধি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তোমরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছ বলিয়াই বোধ হয় এত শীঘ্র রোগগ্রস্ত হও। পূর্বে যেখানে কণ্ঠাশ্লেষ ব্যতীত রোগোৎপত্তি হইত না সেখানে এখন একটি কটাক্ষই দেখিতেছি—আবার স্কুল কলেজে এবং নব্য সাহিত্যিক-সঙ্গে শাড়ির আঁচল ও চাবির গুচ্ছ পর্যন্ত রোগবীজাণু ছড়াইতেছে। ভবিষ্যতে সম্ভবত পদশব্দ শুনিয়াই তোমরা মূর্ছা যাইবে।

লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলাম। পকেটে পয়সা না থাকিলে এখনও গৃহিণীর আসিবার শব্দ শুনিলে মূর্ছার উপক্রম হয়, তাহা আর বলিতে পারিলাম না। ত্রিলোচন কবিরাজ কহিলেন, 'তুমি অদ্য যাও। তুমি রোগগ্রস্ত হও নাই, সুখের কথা কিন্তু ব্যাধিসঙ্কুল নগরে যেখানে মেয়ে স্কুলের গাড়ি হইতে বায়স্কোপের ছবি পর্যন্ত এই দারুণ রোগের বীজাণু ছড়াইতেছে, সেখানে রোগগ্রস্ত হইতে বেশি সময় লাগে না। সাবধানের বিনাশ নাই, কাজেই প্রতিষেধক মদনমর্দন বটি ও কটাক্ষরি অঞ্জন লইয়া যাও। সপ্তাহে একটি করিয়া বড়ি শীতল জল সহ সেবন করিবে ও প্রত্যহ চক্ষে কটাক্ষরি অঞ্জন একবার করিয়া লাগাইবে। আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, রোগিণীরা অপেক্ষা করিতেছেন।' আমি প্রণাম করিলাম। কবিরাজ মহাশয় পুনরায় মোহমুদ্গর আবৃত্তি করিতে করিতে দোতলায় চলিয়া গেলেন।

বাহির হইয়া প্রথমেই দ্রুতপদে কাশীমিত্রের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া গঙ্গাজল অনুপানে ত্রিলোচন কবিরাজের একটি বটি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। সেবনের সঙ্গে সঙ্গে নারীজন সংক্রামক সর্বপ্রকার চিন্তা তিরোহিত হইল, গৃহিণীর কথাও ভুলিয়া গেলাম। মনে হইতে লাগিল জগতে আমি একাকী—আমার কেহ নাই, কেহ নাই, কেহ নাই।'

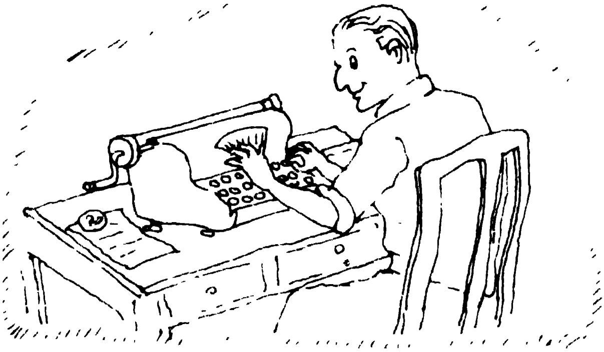
সম্মুখে দুর্গতিনাশিনী গঙ্গা খল খল করিয়া হাসিতে হাসিতে বহিয়া যাইতে লাগিলেন।*

---

*এই রচনা প্রেসে দিবার পরই আমরা বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। আমাদের বুড়া কম্পোজিটার হইতে আরম্ভ করিয়া দপ্তরীর নয় বৎসরের ছেলেটি পর্যন্ত ত্রিলোচন কবিরাজের ঠিকানা জানিবার জন্য বার বার করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। এমন কি প্রসিদ্ধ মুষ্টিবীর অবলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক ও সংবাদপত্র তাত্ত্বিক বৈকুণ্ঠ চাটুয্যে, কেলটিকসভ্যতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষক বারিদবরণ চৌধুরী, সংবাদপত্র সেবক ঔপন্যাসিক উৎফুল্ল দত্ত, প্রসিদ্ধ পাঁচালী-গায়ক স্বর্ণবণিককুলতিলক ভবভূত লাহা পর্যন্ত পত্র লিখিলেন। রচনায় ঠিকানা না থাকাতে—অবস্থা বুঝিয়া আমরা শ্রীযুক্ত দিবাকর শর্মার নিকট পত্র লিখি। তিনি উত্তরে জানাইয়াছেন—

"গৃহিণী কর্তৃক তাড়িত হইয়া সমস্ত জগতের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি হইতে বাহির হই। শেষে ক্লান্ত হইয়া গয়লামাসীর খোলার ঘরের বারান্দায় চাদর বিছাইয়া শুইয়া পড়ি। নিদ্রিত অবস্থায় ত্রিলোচন কবিরাজকে স্বপ্নে দেখি এবং বাড়িতে ফিরিয়াই স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিয়া ফেলি। রচনাটি তাহাই। তবে ভরসা আছে স্বপ্ন ফলিবে—যেহেতু ত্রয়োদশীর দিন স্বপ্ন দেখিয়াছি এই কথা বলিয়া আপনার বন্ধুদিগকে ভরসা দিবেন। ইতিমধ্যে পারিবারিক তাড়নার ফলে যদি পুনরায় স্বপ্ন দেখি তবে ত্রিলোচন কবিরাজকে তাঁহার পার্থিব ঠিকানাটি জিজ্ঞাসা করিব। ইতি—শ্রীদিবাকর শর্মা।"

আশ্বিন ১৩৩৮ সম্পাদক, শঃ চি



এখন কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে সাংবাদিক, ত্রিশ বছব আগে এ রকম ছিল না। তখন আমরা সাংবাদিককে দেখতে খবরের কাগজের অফিসে যেতাম।

বর্তমানে সাংবাদিক-পপুলেশন বৃদ্ধির কারণ—এ যুগটাই হচ্ছে সংবাদের যুগ। দুই যুগের সংবাদেও তফাৎ কত! আগে ঘটনা আগে ঘটত, এখন সংবাদ আগে ঘটে। চাই সাংবাদিক প্রতিভা।

কিছুকাল আগে এক সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হঠাৎ আলাপ। আমার বাড়ির সামনে কয়েকদিন তাঁকে ঘুরতে দেখেছিলাম একখানা নোট বই ও পেন্সিল হাতে। দেখতাম তিনি মাঝে মাঝে সে নোট বইতে কি সব টুকে রাখছেন। পুলিসের লোক ভেবেছিলাম আগে। অদম্য কৌতূহলবশত একদিন দু'এক কথায় আলাপ শুরু করলাম, ক্রমে আলাপ জমে উঠল।

তিনি যে সাংবাদিক সে পরিচয় তিনিই দিয়েছিলেন।

তখন কলকাতা শহরে দুর্ভিক্ষে পথে পথে লোক মরছিল। একদিন বলেছিলাম তাঁকে, "কেমন দেখছেন সব?" আমার প্রশ্নটি অবশ্য নিতান্তই অর্থহীন; উদ্দেশ্য, কোনও রকমে একটু আলাপ জমানো।

তিনি বললেন, "অদ্ভুত।"

"কি পরিমাণ লোক মরছে?"

"স্বাভাবিক।"

কথাটা ভাল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, "স্বাভাবিক মানে কি? রিপোর্টটা কি ভাবে লিখছেন? যত লোক মরছে ততটাই কি আপনি আশা করছেন?"

"মৃত্যুর কথা কিছু লিখছি না।"

"কেন?"

"আমাদের দেশে ওটা খবর নয়।"

"বলেন কি? এত মৃত্যু, এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু!"

সাংবাদিক বললেন, "আমার চোখে এর কোনওটাই অস্বাভাবিক নয়।"

"আপনি অবাক করলেন আমাকে।"

"আমি ঠিকই বলছি। খবর কাকে বলে বোধ হয় জানেন না। কুকুর মানুষকে কামড়েছে এটি খবর নয়, মানুষ কুকুরকে কামড়ালে খবর হয়। বিলেতের এক কাগজের অফিসের গল্পটা জানেন? বার্তা সম্পাদকের কক্ষে সবাই বিচলিত, উত্তেজক কোনও খবর সেদিন আসে নি। এ দিকে রাত বারোটা বাজে, শেষ কপি দেবার সময় উপস্থিত। এমন সময় এক সহকারী তার নিজের কুকুরটি পাশের ঘর থেকে ধরে এনে টেবিলে তুলে তার পা কামড়াতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে খবর তৈরি হয়ে গেল। সম্পাদক তাঁর সহকারীকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলেন।"

"তা হলে যারা মরছে তাদের খবর কি করে হতে পারে?"

"হতে পারে, যারা মরছে তারা যদি মারতে পারত। কিন্তু যাক সে কথা, আজ গোটা দুই খবর পেয়েছি। একটুক্ষণ আগে দুজন কেরানি আমার পাশ দিয়ে বলতে বলতে ছুটে গেল---ভরপেট খেয়ে এ ভাবে হেঁটে অফিসে যেতে তাদের বড়ই কষ্ট হচ্ছে, ভিড়ের জন্য ট্রামে-বাসে উঠতে পারেনি তারা।"

"খবর হল কোথায়, বুঝতে পারছি না।"

"কেরানি হয়েও পেট ভরে খেতে পেয়েছে এটি অবশ্যই খবর। আর একটি খবর—অবশ্য এটি আগেই আমার জানা উচিত ছিল—এই শহরে কোথাও ঘি পাওয়া যায় না।"

আমি বললাম, "এ তো পুরানো খবর, আমরা সবাই জানি, কারণ সব ঘি-তেই ভেজাল থাকে।"

সাংবাদিক বললেন, "ভেজাল ঘিও পাওয়া যায় না।"

"বলেন কি, হঠাৎ কি হল? আমি তো জানি ভেজাল ঘি-তে বাজার ছেয়ে গেছে. আপনি অসম্ভব কথা বলছেন।"

"অসম্ভব কথা বলছি বলেই সংবাদ হিসাবে এর দাম খুব বেশি। আর অসম্ভব বলেই এ তথ্য আবিষ্কারে আমার দেরি হয়েছে।"

কথাটা শুনে একটু বিরক্ত বোধ করলাম। বললাম "মিথ্যাকে সত্য বলে চালানোটাও কি সংবাদ সৃষ্টি না কি?"

সাংবাদিক এ প্রশ্নে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন, "সত্য আর মিথ্যা বলে কোন জিনিস নেই। ও দুটির মাপকাঠি কি? আপনি চোখে দেখেছেন বলে ভাবছেন ঠিক দেখছেন, এই তো? কিন্তু একটা জিনিস বা একটা ঘটনার কতটুকু আপনি এক সঙ্গে এক সময়ে দেখতে পান? প্রত্যেকটি জিনিস বা ঘটনার অনেকগুলো ডাইমেনশন আছে, স্থান ও কালের মধ্যে তার বিস্তার আছে. আপনি হাজার চেষ্টা করলেও একই সময়ে কোনও জিনিসের সব দিক দেখতে পান না, আজ পর্যন্ত কোনও মানুষ তা পায় নি। অতএব আপনার কাছে যা সত্য তাই বলছেন সত্য, শুধু আমার কাছে যা সত্য সেটি আপনি মানছেন না। কিন্তু যন্ত্র দিয়ে মেপে দেখলে বুঝতেন সবই আংশিক সত্য। আসল জিনিসের একটুখানি অংশ দেখেই আমরা সত্য মিথ্যা নিয়ে এত মারামারি করি।"

আমি বললাম, "কিন্তু তাই বলে কোনও জিনিস আছে এবং নেই একই সঙ্গে সত্য হয় কি করে?"

"তাও হয়, মশায়, একই সঙ্গে একটি জিনিস চলছে এবং চলছে না, একই সঙ্গে একটি জিনিস ছোট এবং বড়, ভাল এবং মন্দ হতে পারে। বিজ্ঞান এ কথা স্বীকার করেছে। আপেক্ষিকবাদ পড়ুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন, আপনি যাকে একমাত্র সত্য বলে চেপে ধরে আছেন, দেখবেন তা আপনার মুঠোর মধ্যেই মিথ্যা হয়ে আছে।"

আমি বললাম, "তা যদি হয় তাহলে আপনার কথাগুলোও তো সত্য না হতে পারে?"

"অবশ্যই না হতে পারে। আমি তো বলছি না যে আমার কথা ধ্রুব সত্য।"

"তাহলে বাজারে ঘি-ও নেই, ভেজাল ঘি-ও নেই, এই দুটি কথাকে আপনি খবর হিসাবে চালাবেন কি করে?"

"এটা সম্পূর্ণ পৃথক প্রশ্ন। আপনি যেদিক থেকে দেখে বলছেন বাজারে ভেজাল ঘি আছে, আমি সেদিক থেকে দেখছি না। আমি অন্য দিক থেকে দেখে বলছি বাজারে ঘি-ও নেই ভেজাল ঘি-ও নেই।"

"তা হলে কি আছে?"

"আছে 'বিশুদ্ধ ঘি' অথবা 'খাঁটি ঘি'। ঘি নেই। 'বিশুদ্ধ ঘি' অথবা 'খাঁটি ঘি' ঘি থেকে পৃথক। তেমনি ধরুন বাজারে দুধ নেই, আছে শুধু বিশুদ্ধ দুধ। হোটেল নেই, আছে পবিত্র হোটেল।"

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হচ্ছিলাম, এমন সময় সামান্য কিছু দূরেই গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটাতে আমাদের আলোচনা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। একখানা বাস দারুণ শব্দ করে থেমে গেল, সবাই চিৎকার করে উঠল এক সঙ্গে। মুহূর্তে সেই বাস ঘিরে দুর্ভেদ্য ভিড় জমে উঠল। শোনা গেল বাস একটি স্কুলের মেয়েকে চাপা দিয়েছে।

ভিড় ঠেলে দুর্ঘটনা দেখবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আমার ছিল না, বলা বাহুল্য আমার সঙ্গে আলাপ-রত সাংবাদিক বন্ধু পূর্বেই অদৃশ্য হয়েছিলেন সেই ভিড়ের মধ্যে।

অতিরিক্ত আরও একটি দুর্ঘটনা ঐ একই সঙ্গে ঘটেছে শোনা গেল বাইরে থেকেই। বাস-এর ড্রাইভারকে উপস্থিত জনতা ইতিমধ্যেই মেরে আধমরা করে ফেলেছে।

পরদিন খবরের কাগজে দুর্ঘটনার বিবরণ পড়তে অতি-উৎসাহবশত তিন খানা কাগজ কিনলাম। সত্য-দৃষ্টি সম্পর্কে নবলব্ধ জ্ঞানই আমাকে এ কাজে প্রেরণা যুগিয়েছিল। যাচাই করে দেখছিলাম বিভিন্ন রিপোর্টার একই ঘটনা কিভাবে দেখেছে।

একখানা কাগজ লিখেছে, মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল পথে, বাস তার ঘাড়ে এসে পড়ে। আর একখানা কাগজ লিখেছে—বাস-চালকের কোনও দোষ নেই, মেয়েটি এমন অতর্কিতে চলন্ত বাস-এর সামনে এসে পড়ে যে সে অবস্থায় বাস থামানোর প্রশ্নই ওঠে না। আর এক কাগজ লিখেছে মেয়েটি কলার খোসায় পা পিছলে চলন্ত বাস-এর নিচে পড়ে গেছে।

কয়েকদিন পরে দেখা হল সাংবাদিকের সঙ্গে। বললাম, "আপনি সেদিন ঠিকই বলেছিলেন—একই ঘটনা নানা জনে নানা ভাবে দেখে।"

"কি করে বুঝলেন?"

"দুর্ঘটনার পর দিন আমি তিনখানা কাগজ কিনেছিলাম—দেখলাম কোনওটার সঙ্গেই কোনওটা মেলে না, তিন কাগজে তিন রকম রিপোর্ট।"

তিনখানা কাগজের নাম বললাম। সাংবাদিক মৃদু হেসে বললেন, "ঐ তিনখানা কাগজেরই রিপোর্টার আমি নিজে।"

তাসের ঘর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যা

অমর শখ করিয়া চায়ের বাসনের সেট কিনিয়াছিল। ছয়টা পিরিচ, পেয়ালা, চাদানি ইত্যাদি রঙ-চঙ করা সুদৃশ্য জিনিস, দামও নিতান্ত অল্প নয়—চার টাকা। চার টাকা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে অনেক।

অমরের মায়ের হুকুম ছিল, সেটটি যত্ন করে তুলে রেখো বউমা, কুটুম্বসজ্জন এলে ভদ্রলোকজন এলে বের করো।

কলিকাতা-প্রবাসী, হরেন্দ্রবাবুরা দেশে আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বাড়ির মেয়েরা অমরদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিবেন; তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনে বাড়িতে বেশ সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে।

মা বলিলেন, চায়ের সেটটা আজ বের কর তো গৌরী।

গৌরী বাড়ির মেয়ে—অমরের অবিবাহিতা ভগ্নী। মা চাবির গোছাটা গৌরীর হাতে দিলেন। গৌরী বাসনের ঘর খুলিয়া জার্মান-সিলভারের ট্রে-সমেত সেটটি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল, পাঁচটা কাপ রয়েছে কেন-মা, আর একটা কাপ কি হল? এই দেখ বাপু, সবে এই আমি বের করে আনচি, আমায় দোষ দিও না যেন।

বিরক্ত হইয়া মা বলিলেন, দেখ না ভালো করে খুঁজে, ঘরেই কোথাও আছে। পাখা হয়ে উড়ে তো যাবে না।

গৌরী সেটটা সেইখানে নামাইয়া আবার ভালো করিয়া ঘর খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, পাখাই হল, না কেউ খেয়েই ফেলল—সে আমি জানি না বাপু, তবে ঘরের মধ্যে কোথাও নেই।

দুমদাম করিয়া মা ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, তোমার দোষ কি মা, আমার কপালের দোষ। তোমরা চোখ কপালের ওপর তুলে কাজ কর, নীচের জিনিস দেখতে পাও না।

গৌরীর চোখ হয়ত কপালের উপরেই উঠিয়া থাকে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে গৌরীর অপরাধ প্রমাণিত হইল না। পেয়ালাটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

মা হাঁকিলেন, বউমা, বউমা!

বউমা—অমরের স্ত্রী শৈল—উপরে তখন ঘর-দুয়ার ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া অতিথিদের বসিবার স্থান করিতেছিল, সে নীচে আসিয়া শাশুড়ির কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আমায় ডাকলেন?

শাশুড়ি বাসন-অন্ত-প্রাণ, সিন্দুকের চাবি পুত্রদের দিয়া বাসনের ঘরের চাবি লইয়াই বাঁচিয়া আছেন। পেয়ালাটার খোঁজ না পাইয়া ফুটন্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত বার্তাকুর মত সশব্দে জ্বলিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, হ্যাঁ গো রাজার কন্যে, নইলে বউমা বলে ডাকা কি ওই বাউড়িদের, না ডোমেদের?

শৈল নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর করা তার অভ্যাস নয়।

শাশুড়ি বলিলেন, একটা পেয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না কেন, কি হল?

একটু নীরব থাকিয়া বধূ বলিল, ও আমিই ভেঙে ফেলেছি মা।

শাশুড়ি কিছুক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বেশ করেছ মা, কি আর বলব বল।

সত্য কথা, এমন অকপটভাবে অপরাধ স্বীকার করিলে অপরাধীকে মার্জনা করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শাশুড়ি বলিলেন, পাঁচটাকেও ফেলে দেব আমি চুরমার করে ভেঙে।

রাগ গিয়া পড়িল চায়ের সেটটার উপর।

শৈল সবই নীরবে সহ্য করে, সে নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ি বলিলেন, ভেঙেছ বলা হল, বেশ হল, আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, ওপরের কাজ সেরে এস, জলখাবারগুলো করতে হবে।

শৈল উপরে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে হাসিমুখে আসিয়া রান্নাঘরে শাশুড়ির কাছে দাঁড়াইল।

শাশুড়ির মনের উত্তাপ কমিয়া আসিয়াছিল, বলিলেন, নাও তোমাদের দেশের মত খাবার তৈরি কর।

শৈল খাবারের সাজ-সরঞ্জাম টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, সমস্তর ভেতরই মাছের পুর দোব তো মা?

—অ্যাঁ, মাছের পুর? হ্যাঁ, তা দেবে বইকি, বিধবা তো কেউ আসছে না।

ময়দার ঠোলার ভিতরে মাছের পুর দিতে দিতে শৈল বলিল, জানেন মা, এর সঙ্গে যদি একটুখানি হিঙ দেওয়া হত—ভারি চমৎকার হত। বাবার আমার হিঙ ভিন্ন কোনও জিনিস ভালো লাগে না।' আর যে-সে হিঙ আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেন না; আফগানিস্থান থেকে কাবুলী সব আসে, তারাই দিয়ে যায়।

শাশুড়ি বললেন, পশ্চিম ভালো যায়গা মা, আমাদের পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে কি তুলনা হয়, না সে সব জিনিস পাওয়া যায়?

শৈল বলিল, পশ্চিমেও সে হিঙ পাওয়া যায় না মা। কাবুলীরা সে সব নিজেদের জন্য আনে, শুধু বাবাকে খুব খাতির করে কিনা, টাকাকড়ি অনেক সময় নেয়—তাই সে জিনিস দেয়। শুধু কি হিঙ, যখন আসবে তখন প্রত্যেকে আঙুর, বেদানা, নাশপাতি, বাদাম, হিঙ —এ সব ছোট ছোট ঝুড়ির এক এক ঝুড়ি দিয়ে যায়। পাঁচজনের মিলে সে হয় কত! কাঁচা জিনিস অনেক পচেই যায়।

ও-ঘরের বারান্দা হইতে ননদ গৌরী মৃদুস্বরে বলিল, এই আরম্ভ হল এইবার।

অর্থাৎ বাপের বাড়ির গল্প আরম্ভ হইল। সত্য কথা, শৈলর ওই এক দোষ; বিনীত, নম্র, মিষ্টিমুখী, সুন্দরী বউটি প্রত্যেক কথায় তাহার বাপের বাড়ির তুলনা না দিয়া থাকিবে না।

পাশের বাড়িতে তুমুল কোলাহল উঠিতেছিল, শাশুড়ি এবং বধূতে কলহ বাধিয়াছে।

শৈলর শাশুড়ি বলিলেন, যা হবে, তাই হোক মা। আমার বউ ভালো হয়েছে, উত্তর করতে জানে না; দোষ করলে বকব কি, মুখের দিকে চাইলে মায়া হয়।

শৈল বলিল, ওঁর ছেলে স্ত্রীকে শাসন করেন না কেন? জানেন মা, আমার দাদা হলে আর রক্ষে থাকত না। সঙ্গে সঙ্গে বউকে হয়ত বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। একবার বউদি কি উত্তর করেছিলেন মায়ের সঙ্গে, দাদা তিন মাস বউদির সঙ্গে কথা কননি। শেষে

মা আবার বলে কয়ে কথা বলান। তবে দাদার আমার বড্ড বাতিক—খদ্দর পরবে হাঁটু পর্যন্ত, জামা সেই হাত-কাটা—এতটুকু। তামাক না, বিড়ি না, সিগারেট না,—সে এক বাতিকের মানুষ!

শাশুড়ি বোধ হয় মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন; নাও নাও, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নাও। দেখো, যেন মাছের কাঁটা না থাকে।

শৈল বলিল, ছোট মাছ—কাঁটা বাছতেই হাত চলছে না মা; তবে এই হয়ে গেল।

কড়ায় এক ঝাঁক সিঙাড়া ছাড়িয়া দিয়া, সে আবার বলিল, মা আমার কক্ষনো ছোট মাছ বাড়িতে ঢুকতে দেন না। দু সেরের কম মাছ হলেই, সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেবেন। কুচো-মাছের মধ্যে ময়া, আর কাঠ-মাছের মধ্যে মাগুর।

শাশুড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, নাও নাও, সেরে নিয়ে চুল-টুল বেঁধে ফেল গে।

কেশপ্রসাধন-অন্তে শৈল কাপড় ছাড়িতেছিল।

ননদ গৌরী প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া বলিল—উঃ, রঙ বটে তোমার বউদি! তুমি যা পড়বে, তাতেই তোমাকে সুন্দর লাগবে, আর আমাদের দেখ না, যেন কাঠ পুড়িয়ে—

শৈল বলিল, এ যে দেবার নয় ভাই, নইলে তোমাকেও দিতাম। আমার আর কি রঙ দেখছ! বাবা মা দাদা আমাব অন্য বোনদের যদি দেখতে, তবে দেখতে রঙ কাকে বলে; ঠিক একেবারে গোলাপফুল।

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল, বল কি বউদি, তোমার চেয়েও ফরসা রঙ?

—হ্যাঁ ভাই, বাড়ির মধ্যে আমিই কালো।

শাশুড়ি আসিয়া চাপা গলায় বলিলেন, আর কত দেরি বউমা, ওরা যে সব এসে গেছেন।

শৈল তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া বলিল, এই যে মা, হয়ে গেছে আমার।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের মহার্ঘ উজ্জ্বল সজ্জা ভূষণ রূপ সমস্তকে লজ্জা দিয়া শৈল আবির্ভূতা হইল— নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রকলার মত।

প্রবাসিনীর দল মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, শৈল হাসিমুখে প্রণাম করিল।

ও-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, এ যে চাঁদের মত বউ হয়েছে তোমার দিদি। লেখাপড়া-টড়াও জানে নাকি?

শৈল মৃদুস্বরে বলিল, স্কুলে তো পড়ি নি, বাবা স্কুলের শিক্ষা বড় পছন্দ করেন না। বাড়িতে পড়েছি, ম্যাট্রিক স্ট্যান্ডার্ড শেষ হয়েছিল, তারপরই—

কথাটা অসমাপ্ত থাকিলেও ইঙ্গিতে সমাপ্ত হইয়া গেল।

ও-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, কে জানে মা, আজকাল কি যে হাল হল দেশের, মেয়েদের আর কলেজে না পড়লে বিয়ে হচ্ছে না! আমার বউমা তো কলেজে পড়ছিল; বিয়ের পর আমি সব ছাড়িয়ে দিলাম।

শৈল উত্তর দিল, কলেজের কোর্স আমিও কিছু পড়েছি। তবে আমার বোনেরা সব ভালো করে পড়ছে; বাড়িতে দাদাই পড়ান, পড়াশোনায় দাদার ভয়ানক বাতিক কিনা, জানেন—বছরে পাঁচ-সাতশ টাকার বই কেনেন—বাঙলা, ইংরিজী! বিলেত থেকে ইংরিজী বই আনাবেন। কাজকর্ম যদি করতে বলবেন মা,—কাজকর্ম অবিশ্যি বাবারই

বিজনেস আছে—সেই বিজনেস দেখতে বলেন তো বলবেন, সম্মুখে জ্ঞানসমুদ্র মা, চোখ ফেরাবার আমার অবকাশ নাই।

—কোথায় তোমার বাপের বাড়ি?

—এলাহাবাদ। এলাহাবাদ গেছেন নিশ্চয়ই, আমাদের সেখানে তিন পুরুষ বাস হয়ে গেল। বাবা সেখানে কন্ট্রাক্টরি করেন।

—কি রকম পান-টান?

—আমি তো ঠিক জানি না। তবে মেজভাই বলেন মাঝে মাঝে, এরকম করে আর চলবে না মা, তুমি বাবাকে বল। পাকা বাড়িগুলো ভাড়া দিয়ে নিজে সেই খোলার বাড়িতে থাকবেন, টাঙায় চড়ে কাজ দেখে বেড়াবেন, মোটর কিনবেন না, এ করে চলবে না। বাবা বলেন, এ আমার পৈতৃক বাড়ি, যেমন আছে তেমনই থাকবে, ভাঙবও না, অন্য কোথাও যাবও না। আর গাড়ি, গাড়িও আমি কিনব না, ছেলেরা বিলাসী হবে। আমি রোজগার করছি, তারা যদি না পারে! জানেন, লোকে বলে—মহেন্দ্রবাবু এক হিসাবে সন্ন্যাসী!

শৈল কথা শেষ কবিয়া মৃদু মৃদু হাসি হাসে।

প্রবাসিনী গিন্নী একবার শৈলর শাশুড়িকে বলিলেন, তাহলে ছেলের তোমার বেশ বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছে দিদি। তোমাদের চেয়ে অনেক বড় ঘর। তত্ত্ব-তল্লাস করেন কেমন বেয়াইরা?

বিচিত্র সংসার, বিচিত্র মানুষেব মন, কোন কথায় কে যে আঘাত পায়, সে বোঝা বোধকরি, বিধাতারও সাধ্য নয়। 'তোমাদের চেয়ে বড় ঘর'—এই কথাটুকুতেই অমরের মা আহত হইয়া উঠিলেন, তিনি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, কে জানে দিদি, বড় না ছোট, সে জানি না। তবে বউমাই বলেন, বাপেদেব এই, বাপেদের ওই, কিন্তু তত্ত্ব-তল্লাসও দেখি না, আজ দুবছর ওই দুধের মেয়ে এসেছে, নিয়ে যাওয়ার নাম পর্যন্ত নেই।

শৈল মুহূর্তে বলিয়া উঠিল, জানেন তো মা, বাবার আমার অদ্ভুত ধরন! তিনি বলেন, যে বস্তু আমি দান করলাম, সে আবার আমি কেন আমার বলে ঘরে আনব! তবে যাকে দান করলাম সে যদি স্বেচ্ছায় নিয়ে আসে, তখন তাদের আদর করব, সম্মান করব, আমার বলব। আর তত্ত্ব-তল্লাস এত দূর থেকে করা সম্ভব হয়ে উঠে না; কিন্তু টাকা তো চাইলেই দেন তিনি, যখন চাইবেন, তখনই দেবেন।

শাশুড়ি বলিয়া উঠিলেন, কি বললে বউমা, তোমার বাবা আমাদের টাকা দেন—কখন, কোন কালে?

শৈল বলিল, আপনাদের কথা তো বলি নি মা; আপনি জিজ্ঞাসা করে দেখবেন—একশ, পঞ্চাশ, আশি—চাইলেই তিনি দেন, কেন দেবেন না?

শাশুড়ির মুখ কালো হইয়া উঠিল। শুধু স্বগ্রামবাসী নয়, উপস্থিত মহিলাবৃন্দ প্রবাসিনী—দেশ-দেশান্তরে এ সংবাদ রটিয়া যাইবে। অমরের মায়ের মাথা যেন কাটা গেল।

তিনি বলিলেন, ভালো, অমর আসুক, আমি জিজ্ঞাসা করব। কই ঘুণাক্ষরেও তো আমি জানি না!

ও-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, তোমায় হয়ত বলে নি অমর। দরকাব হয়েছে শ্বশুরের কাছে নিয়েছে।

অমরের মা বলিলেন, সে নেবে কেন ভাই? সে নেওয়া যে তার অন্যায়—নীচ কাজ। ছিঃ, শ্বশুরের কাছে হাত পাতা, ছিঃ!

অমর কাজ করে কলিকাতায়, সেখানে সে অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করিয়া থাকে। ব্যবসা হইলেও ক্ষুদ্র তাহার আয়তন, সঙ্কীর্ণ তাহার পরিধি, তবুও সে স্বাধীন; তাই মা দুইবার করিয়া সে বাড়ি আসিয়া থাকে। অমরের মা রোষকষায়িত নেত্রে পুত্রে আগমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের সম্মুখে যে অপমান তাঁহার হইয়াছে, সে তিনি কিছুতে ভুলিতে পারিতেছেন না। শুধু তাঁহার সংসারের অসচ্ছলতাই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ কর নাই, তাঁহাকে মিথ্যাবাদিনী সাজিতে হইয়াছে। এ কয়দিন বধূর সঙ্গেও একক বাক্যালাপও করেন নাই। শৈল অবশ্য সে বিষয়ে দোষী নয়, সে সদাসর্বদাই মুখে হাসি মাখিয়া শাশুড়ির আজ্ঞার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সংসারের নিয়ম—কাল অগ্নির উত্তাপও হরিয়া থাকে, মনের আগুনও নিবিয়া আসে কিন্তু শৈলর দুর্ভাগ্য, শাশুড়ির মনের আগুন-শিখা হ্রস্ব হইতে না হইতে ইন্ধনের প্রয়োগে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। পাড়ায় ঘরে ঘাটে এই লইয়া যে কানাকানি চলিতেছিল, সেটা ভালোভাবেই ক্রমশ জানাজানি হইয়া গেল।

সেদিন সরকারদের মজলিসে একদফা প্রকাশ্য আলোচনার সংবাদ অমরের মা স্বকর্ণে শুনিয়া আসিলেন।

দিন দশেক পরেই কিসের একটা ছুটি উপলক্ষ্যে অমর বাড়ি আসিবার কথা জানাইয়া দিল। শৈলর মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কথাটা মিথ্যা, বারবার সঙ্কল্প করিয়াও সে এ বিষয়ে স্বামীকে কোনও কথা লিখিতে পারে নাই—কোনও অনুরোধ জানাইতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হইয়াছে। তাহার হাত চলে নাই, ঠোঁট কাঁপিয়াছে, চোখে জলও দেখা দিয়াছে; সে চিঠির কাগজখানা জড়ো করিয়া মুড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। শৈল আপনার শয়নকক্ষে স্তব্ধ প্রতীক্ষায় স্বামীর জন্য বসিয়া রহিল, অমর আসিলেই সে তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িবে।

অকস্মাৎ অমরের উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে চোরের মত নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া সে আশ্বস্ত হইল। ক্রোধের প্রসঙ্গ তাহাকে লইয়া নয়, অমর বচসা জুড়িয়া দিয়াছে কুলীর সহিত।

—এই আধ মাইল—মালের ওজন আধ মণ পঁচিশ সের, তোকে দু আনা দিলাম —আবার কত দেব?

লোকটাও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিতেছিল, তখন আপনি চুকিয়ে নেন নাই কেন মশায়? তখন যে একেবারে হুকুম ঝাড়ালেন—এই, ইধার আও। আমাদের রেট তিন আনা করে—দ্যান, দিতে হবে।

—নিকালো বেটা হারামজাদা, নিকালো বলছি—এই নে পয়সা, কিন্তু এখুনি নিকালো সামনে থেকে বলছি।

পয়সা ফেলিয়া দিয়া অমর ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বাড়ি ঢুকিল।

—দেখ না, লোকসান যেদিন হয়, সেদিন এমনি করেই হয়। পঞ্চাশটা টাকা একজন মেরে দিয়ে পালাল, তারপর ট্রেন ফেল, আবার বাড়ি এসেও চারটে পয়সা লোকসান।

মাও বোধকরি প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি শান্ত অথচ শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, তার জন্যে তোমার চিন্তা কি বাবা? বড়লোক শ্বশুর রয়েছেন, তাকে লেখ তিনিই পাঠিয়ে দেবেন।

অর্থ না বুঝলেও শ্লেষতীক্ষ্ণ বাক্যশর আঘাত করিতে ছাড়ে নাই। অমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তার মানে?

মা বলিলেন, সেই জন্যই তো তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাবা। আমি শুনব—তুমি আমাকে তোমার রোজগারের অন্ন খাওয়াও, না তোমার শ্বশুরের দানের অন্নে আমাকে পিণ্ডি দাও? তুমি নাকি তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা চাও, আর শ্বশুর তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেন—একশ, পঞ্চাশ, আশী, যখন যেমন তোমার দরকার হয়?

ক্লান্ত তিক্তচিত্ত অমরের মস্তিষ্কে মুহূর্তে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, কে, কোন হারামজাদা হারামজাদী সে কথা বলে?

মা ডাকিলেন, বউমা!

শৈলর চক্ষের সম্মুখে চারিদিক যেন দুলিতেছে—কি করিবে, কি বলিবে, কোনও নির্ধারণই সে স্থির করিতে পারিল না।

শাশুড়ি আবার বলিলেন, চুপ করে রইলে কেন, বল, উত্তর দাও?

শৈল বিহ্বলের মত বলিয়া ফেলিল, হ্যাঁ, বাবা দেন তো।

অমর মুহূর্তে উন্মত্তের মত দেওয়ালে মাথা কুটিতে আরম্ভ করিল।

মা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

অমর বলিল, ও বাড়িতে থাকলে আমি জলগ্রহণ করব না।

মা বলিলেন, আমার মাথা কাটা গেল—হরেনবাবুর বাড়ির মেয়েদের কাছে। এমন বউ নিয়ে আমিও ঘর করতে পারব না বাবা।

বিচারক যেখানে বিধিবদ্ধ বিধানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সেখানে বিচার হয় না, বিচারের নামে ঘটে—স্বেচ্ছাচার; তাই ওইটুকু অপরাধে শৈলর অদৃষ্টে গুরু দণ্ড হইয়া গেল,—সেই রাত্রেই তাহার নির্বাসনের ব্যবস্থা হইল। রাত্রি বারোটার ট্রেনে শৈলর দেবর তাহাকে লইয়া এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেল।

শৈলকে দেখিয়াই তাহার মা আনন্দে বিস্ময়ে আকুল হইয়া বলিলেন, এ কি শৈল, তুই যে এমন হঠাৎ?

শৈল ঢোঁক গিলিয়া বলিল, কেন মা আমাকে কি আসতে নেই? তোমরা তো আনলে না, কাজেই নিজেই এলাম।

মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মা বলিলেন, ওরে, আনতে কি অসাধ, না আমার মনেই ব্যথা হয় না, কিন্তু কি করব বল?

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, বাবুর রোজগার কমে গেছে, বাজার নাকি বড় মন্দা। তার ওপর হৈমির বিয়ে এসেছে—খরচ যে করতে পারছি না মা।

শৈল অবকাশ পাইয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

মা বলিলেন, সঙ্গে কে এসেছে শৈলী? জামাই?

শৈল বিবর্ণ মুখে বলিল, না, আমার দেওর এসেছে।

—কই সে—ওমা, বাইরে কেন সে?—ঘরের ছেলে। ওরে দাই, দেখ তো, বড়দিদির দেওর বাইরে আছেন, ডাক তো। বল—মা ডাকছেন।

শৈলর বুক দুরদুর করিতেছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অমরের আদেশ ছিল, সে যেন সেখানে জলগ্রহণ না করে। কঠিন শপথ দিয়া আদেশ দিয়াছে অমর।

দাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কই কেউ তো নেই!

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সে কি? কোথায় গেল সে?

শৈল বলিল, তাকে ট্রেন ধরতে হবে মা, সে চলে গেছে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে মা যেন অভিভূত হইয়া গেলেন।—ট্রেন ধরতে হবে—চলে গেছে, সে কি?

শৈল বলিল, তাকে সিমলে যেতে হবে মা—একটা খুব বড় কাজের সন্ধান করতে যাচ্ছে; যে ট্রেনে আমরা নামলাম, এই ট্রেনই সে গিয়ে ধরবে, থাকবার তার উপায় নেই।

মা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, ফেরবার সময় নামতে বলে দিয়েছিস তো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শৈল বলিল, বলে তো দিয়েছি মা, কিন্তু নামতে বোধহয় পারবে না, খুব জরুরি কাজ কিনা। সিমলে থেকে কলকাতায় যাবে একটা কার চিঠি নিয়ে, সময়ে পৌঁছুতে না পারলে তো সব মিছে হবে।

এই সময়েই শৈলর জ্ঞানান্বেষী বড়দাদা বাড়ি ঢুকিল। পরনে তাহার খদ্দর সত্য, কিন্তু জরিপাড় শৌখিন খদ্দরের ধুতি, গায়েও শৌখিন পাঞ্জাবি, মুখে একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেট; হাতে কতকগুলি মাছ ধরিবার চারের উপকরণ।

শৈলকে দেখিযাই সে বলিল, আরে, শৈলী কখন, অ্যাঁ?

হাসিমুখে শৈল বলিল, এই তো দাদা। ভালো আছেন আপনি?

—হ্যাঁ। তা বেশ, কই, তুই নতুন লোক, খাস বাঙলা দেশের মানুষ—কই, দে তো চারগুলো তৈরি করে, দেখি, তোর হাতের কেমন পয়! মাছ ধরতে যাব আজ দেহাতে —এক জমিদারের তালাওয়ে।

শৈল উপকরণগুলি হাতে লইয়া বলিল, চলুন না দাদা, একবার আমাদের ওখানে কত মাছ ধরতে পারেন একবার দেখব।

—তোদের ওখানে পুকুরে খুব মাছ, না-রে?

—আমাদেরই পুকুরে খুব বড় বড় মাছ—আধ মণ, পনেরো সের, পঁচিশ সের এক একটা মাছ। জানেন দাদা, তখন প্রথম গেছি, একটা আঠারো সের কাতলা মাছ এনে দেওর বললে, বউদিকে কুটতে হবে। ওরে বাপ রে, সে যা আমার ভয়! এখন আর আমার ভয় হয় না—আধ মণ, পঁচিশ সের মাছ দিব্যি কেটে ফেলি।

—যাবার ইচ্ছে তো হয় রে, হয়ে ওঠে না। কলকাতা যাই, তাও অমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সময় হয় না। আবার তুই অবিশ্যি যদি কলকাতায় থাকতিস, তবে নিশ্চয় যেতাম।

শৈল বলিল, আচ্ছা, দেখব, আমাদেরও কলিকাতায় বাড়ি হবে এইবার—

অর্ধপথে বাধা দিয়া দাদা বলিল, কলকাতায় তোদের বাড়ি হচ্ছে নাকি?

শৈল বলিল, জায়গা কিনেছেন। ধীরে ধীরে হবে এইবার।

মা পুলকিত হইয়া প্রশ্ন করেন, জামাই এখন বেশ পাচ্ছেন, না রে শৈলী?

শৈল মুখ নত করিয়া বলিল, দেশেও দালান করবেন।

মাস দুয়েক পরই কিন্তু শৈলর মা অনুভব করিলেন, কোথাও একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে, জামাই বা বেয়ান কেহই তো শৈলকে পত্র দেন না, সংবাদ লন না। তিনি স্বামীকে বলিলেন, দেখ, তুমি বেয়ানকে একখানা পত্র লেখ।

মহেন্দ্রবাবু নিরীহ ব্যক্তি। শৈল অন্যের সম্বন্ধে যতই অত্যুক্তি করিয়া থাক, তাহার পিতার উপার্জনকে যতই বাড়াইয়া বলিয়া থাক, পিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অত্যুক্তি সে করে নাই। সত্যই তিনি সাধু প্রকৃতির নিরীহ ব্যক্তি।

মহেন্দ্রবাবু স্ত্রীর কথায় শঙ্কিত হইয়া পরদিনই বেয়ানকে পত্র দিলেন। লিখলেন—আমি আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তি, শৈলকে চরণে স্থান দিয়া আপনি আমাব প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি—প্রার্থনা করি, সে অনুগ্রহ হইতে আমি বা আমার শৈল যেন বঞ্চিত না হই। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সেখানে কি ঘটিয়াছে, শৈল কি অপরাধ কবিয়াছে! কিন্তু অপরাধ যে করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে কোনও কথা প্রকাশ করে নাই; তবুও এই দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যে কই কোনও আশীর্বাদ তো আসিল না! শ্রীমান অমর বাবাজীবনও তো কোনও পত্র দেন না! দয়া করিয়া, কি ঘটিয়াছে, আমাকে জানাইবেন; আমি নিজে শৈলকে আপনার চরণে উপস্থিত করিয়া তাহার শাস্তি দিব।

তারপর শেষে আবার লিখিলেন—অমর সংবাদ না দিলেও শৈলর নিকট তাহার উন্নতির কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কলিকাতায় বাড়ি করিবে শুনিয়া পরম আনন্দ হইল। আপনার মেজছেলের পরীক্ষার সংবাদ শুনিলাম, কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হইতে পারে নাই। আশীর্বাদ করি, বি.এ.-তে সে যোগ্যস্থান লাভ করিবে।

পত্রখানা পড়িয়া অমরের মায়েব চক্ষে জল আসিল।

মনে তাঁহার ক্রোধবহ্নি জ্বলিতেছিল, ইন্ধনের অভাবে সময়ক্ষেপে সে বহ্নি নিবিয়া গিয়াছে। প্রতি পদে তাঁহার শৈলর প্রতিমার মত মুখ মনে পড়িত। বলুক সে মিথ্যা, তবু মিষ্ট কথার সুরটি তাঁহার কানে বাজিত। আজ বেয়াইয়ের পত্র পড়িয়া তাঁহার সকল গ্লানি নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া গেল: শুধু বিদূরিত হইয়া গেল নয়, পুত্রবধূর উপর মন তাঁহার প্রসন্ন হইয়া উঠিল, পত্রের শেষভাগটুকু পড়িয়া আবার তিনি সেখানটা পড়িলেন—কলিকাতায় বাড়ি ইত্যাদি।

তিনি অমরকে পত্র দিলেন। বেয়াইকে লিখিলেন—বউমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর কোনও অপরাধ হয়? তবে কার্যগতিকে সংবাদ লইতে পারি নাই, সে দোষ আমারই। শীঘ্রই অমর বউমাকে আনিবার জন্য যাইবে।

পত্র পাইবা মাত্র শৈল পুলকিত হইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল।

অমর আসিয়াছে। দশ-বারো সেরের একটা মাছ সে সঙ্গে আনিয়াছে। শৈল তাড়াতাড়ি সেটা কাটিতে বসিল।

বলিল, বড় জাতের মাছ বোধ হয় ধরা পড়ে নি। এগুলো মাঝলাজাত।

ওদিক হইতে ভ্রাতৃজায়া বলিল, এই আরম্ভ হল। শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভালো আর কারও হয় না!

রাত্রে অমরের নিকট শৈল নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। অমর একখানা পত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, এসব কি বল তো?—'একটি বড় মাছ যেমন করিয়া হউক আনিবে, এখানে আমি আমাদের অনেক মাছ আছে বলিয়াছি।' বেশ, আমাদের ষোল-আনা একটাও তো পুকুর নেই, অথচ—ছিঃ! আর, 'এখানে মুক্তার গহনার চলন হইয়াছে, আমার জন্য ঝুটা মুক্তার মালা একছড়া'—ও কি—ও কি, কাঁদছ কেন, শৈল, শৈল?

শৈল বিছানায় মুখ গুঁজিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল। সে কথা যে অমরকে মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়!

অদ্বিতীয়া

বনফুল



বেশ ছিলাম।

আপিসে সাহেব এবং গৃহে মা ষষ্ঠী আমার প্রতি সদয় ছিলেন। সাহেব আমার মাহিনা বাড়াইয়াছেন এবং মা-ষষ্ঠী আমার সংসার বাড়াইতেছিলেন। আমার পিতৃমাতৃকুলে আর কেহ ছিল না। উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু টাকাও জুটিয়া গিয়াছিল। খাসা ছিলাম।

প্রভাবতী অর্থাৎ আমার গৃহিণী গড়ে বছরে দেড়টি করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া চারি বৎসরেই আমাকে ছয়টি পুত্রকন্যার মালিক করিয়া তুলিয়াছিলেন—মাঝে দুইবার যমজ হয়।

এবম্বিধ প্রজাবৃদ্ধিসত্ত্বেও কোন অভাব ছিল না। হঠাৎ কিন্তু বেকুব বনিয়া গেলাম। পঞ্চম বর্ষেও গৃহিণী তাঁহার স্বাভাবিক গর্ভভার বহন করিতেছিলেন। এবার কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক হইলেও সহজ ছিল না বোঝা গেল। কারণ তিনি মারাই গেলেন। তিনি তাঁহার পিত্রালয় শান্তিপুরে ছিলেন। যদিও আমার শ্বশুর ও শাশুড়ি উভয়েই অনেককাল স্বর্গী হইয়াছেন কিন্তু আমার শ্যালক বিনোদ ডাক্তার বলিয়া প্রভা প্রতিবারই সেখানে যাইত। বিনোদ লিখিতেছে—

"হঠাৎ 'এক্লেম্প্‌সিয়া' হইয়া দিদি ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। আপনাকে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। 'কিডনি' খারাপ ছিল। সেজদি ছেলেদের লইয়া সম্বলপুরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিঠি বোধ হয় পাইয়াছেন।"

পাইলাম ত। তিনি লিখিতেছেন—"কি করিবে বল ভাই। সবই অদৃষ্ট। তোমার

ছেলেমেয়েরা এখন আমার কাছে কিছুদিন থাকুক। আমি ত বাঁজা মানুষ। আমার কোন অসুবিধা হইবে না। ছেলেরা ভালই আছে। কোন ভাবনা করিও না। ইতি..."

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ছুটির দরখাস্ত করিলাম। কপালগুণে আমার সাহেবও বদলি হইয়া গিয়াছিলেন। ছুটি সুতরাং মঞ্জুর হইল না!

॥ দুই ॥

দুই মাস পরে।

সম্বলপুরবাসিনী শ্যালিকার আর একখানি পত্র পাইলাম। তিনি অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছেন—

"প্রভা সতীলক্ষ্মী ভাগ্যবতী ছিল। সে গেছে, বেশ গেছে। জাজ্বল্যমান সংসারে স্বামী ছেলেপুলে সব রেখে গেছে। কিন্তু তোমার তা বলে সংসারটা ছারখার করা ত ভাল দেখায় না। উচিতও নয়। আমার কথা শোনো। আবার বিয়ে কর তুমি। এখানে একটি বেশ ডাগর ডোগর মেয়ে আছে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়—বলো, সম্বন্ধ করি। আমার ত মেয়েটিকে বেশ পছন্দ। তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।"—ইত্যাকার নানারূপ কথা।

সাত দিন ভাবিয়া—অর্থাৎ এক টিন চা ও পাঁচ টিন সিগারেট নিঃশেষ করিয়া আমি এই চিরন্তন সমস্যার যে মীমাংসা করিলাম তাহা মোটেই অসাধারণ নয়। সেজদিকে যে পত্র দিলাম তাহা অংশত এইরূপ—

"বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রভার কথা সর্বদাই মনে পড়ে। কিন্তু দেখ সেজদি, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর নির্ভর করে ত সংসার বসে নেই। সে আপনার চালে ঠিক চলছে ও চলবে। সুতরাং ভাবপ্রবণ হওয়াটা শোভন হলেও সুযুক্তির নয়—

এটা ঠিকই। তাছাড়া দেখ আমরা "মা ফলেষু কদাচন" দেশের লোক। আর তোমরাও যখন বলছ—তখন আর একবার সংসারটা বজায় রাখাব চেষ্টাই করা যাক্!.. দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে আবার পছন্দ অপছন্দ! তোমার পছন্দ হয়েছে ত?..."

ক্রমশ বিবাহের দিন স্থির হইল। সম্বলপুরেই বিবাহ। সেজদি বুদ্ধিমতী। লিখিয়াছেন—"ছেলেদের লাহোরে বড়দির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বাপের বিয়ে যে দেখতে নেই।" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

যথাকালে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরিয়া হপ্তাখানেকের ছুটি লইয়া সোজা রওনা হইয়া পড়িলাম। একাই! এ বিয়ের কথা কাউকে বলিতে আছে? কি ভাবিয়া গোঁফটা কামাইয়া ফেলিলাম। একে এই কালো মোটা চেহারা—তাহার উপর কাঁচাপাকা একঝুড়ি গোঁফ লইয়া বিবাহ করিতে যাইতে নিজেরই কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

বিবাহ-বাসর।

ওই অবগুণ্ঠিতা চেলি-পরা মেয়েটিই আবার আমার সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে। প্রভাকেও একদিন এই ভাবেই পাইয়াছিলাম—সে কোথায় চলিয়া গেল। আজ আবার আর একজন আসিয়াছে। ইহার 'কিড়নি' কেমন—কে জানে! নানারূপ এলোমেলো কথা মনে আসিতে লাগিল। প্রভার মুখ বারবার মনে পড়ে। ছেলেগুলো না জানি এখন কি করিতেছে?...মৃত্যুর পরও কি আত্মা সত্যি থাকে?...এ মেয়েটি বেশ বড়সড় দেখিতেছি—কিন্তু ভারি জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে—একেবারে মাথা নীচু করিয়া! আচ্ছা প্রভার আত্মার যদি—গৃহ্যামি। গৃহ্যামি!

যন্ত্রচালিতবৎ বিবাহ-অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটি কিছুতেই ঘোমটা খুলিল না। সেজদি বলিলেন—ভারি লাজুক। বাসরঘরেও শুনিলাম ভারি লাজুক আপাদমস্তক মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। আমিও ঘুমাইলাম। সেজদি লোক জমিতে দে নাই। তাছাড়া এ দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ, কে আর আমোদ করিতে চায়? মেয়েটির আপন বলিতে কেহ ছিল না। পরের বাড়িতে মানুষ। সেজদির বাড়িতেই বিবাহ—বলিতে গেলে সেজদিই কন্যাকর্তা! সুতরাং বিবাহ-উৎসব জমে নাই।

* * * *

জমিল ফুলশয্যার রাতে।

বক্ষে অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখি আমার ছয়টি সন্তান ও আরও একটি নবজাত শিশু লইয়া স্বয়ং প্রভা খাটে বসিয়া! স্বপ্ন দেখিতেছি না কি?

প্রভা কহিল—"ছি, ছি, সেজদিরই জিৎ হল!"

"মানে?"

"মানে আবার কি? এবার ছেলে হওয়ার সময় ভারি কষ্ট হয়েছিল। অপরাধের মধ্যে সেজদিকে বলেছিলাম যে আমি মরে গেলে ওঁর ভারি কষ্ট হবে। সেজদি বল্লে—'হাঁ হবে। তিনমাস যেতে না যেতে ফের বিয়ে করবে।' আমি বললাম—'কক্‌খনো নয়' তারপর বাজি রেখে সেজদি আর বিনোদে মিলে এই ষড়যন্ত্র! আমিও শান্তিপুরেই ছিলাম আজ এই সন্ধেবেলা এসেছি। এসে দেখি সেজদিরই জিৎ। পাড়ার মানকে ছোঁড়াকে কনে সাজিয়ে সেজদি বাজী জিতেছে। একশটি টাকা দাও এখন! ছি ছি—কি তোমরা! অমন গোঁফটা কি বলে কামালে?"

আমার অবস্থা অবর্ণনীয়!

* * * *

পরদিন প্রভাতে সেজদির পাওনা চুকাইয়া দিয়াছি। এখন গোঁফটা উঠিলে যে বাঁচি



ভূতোর চন্দ্রবিন্দু

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়



বিভূতি ওরফে ভূতোকে সকলেই গোঁয়ার বলিয়া জানিত। কিন্তু সে যখন বিবাহ করিয়া বৌ ঘরে আনিল তখন দেখা গেল বৌটি তাহার চেয়েও এক কাঠি বাড়া, অর্থাৎ একেবারে কাঠ-গোঁয়ার। কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি হইতেও বেশি বিলম্ব হয় নাই।

ছোট শহর, সকলেই সকলকে চেনে। ভূতোকে সকলেই চিনিত এবং মনে মনে ভয় করিত। গ্যাট্টা-গোঁট্টা নিরেট চেহারা; কথাবার্তা বেশি বলিত না। টাকাকড়ি সম্বন্ধে তাহার হাত যেমন দরাজ ছিল, তেমনি বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে মুখ ফুটিবার আগেই তাহার হাত ছুটিত। বাড়িতে তাহার এক সাবেক পিসী ছিলেন এবং বাজারে ছিল এক কাঠের গোলা; পিসী বাড়িতে ভাত রাঁধিতেন এবং গোলা হইতে সেই ভাতের সংস্থান হইত। কাঠ কিনিতে আসিয়া যে সব খদ্দের দরদস্তুর করিত তাহাদের প্রায়ই পিঠে চেলা কাঠ খাইয়া ফিরিতে হইত।

ভূতোর সম্পর্কে 'চন্দ্রবিন্দু' নামক একটি শব্দ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। একবার ফুটবল খেলিতে গিয়া ভূতো প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের পেটে হাঁটুর গুঁতো মারিয়া তাহাকে চন্দ্রবিন্দু করিয়া দিয়াছিল। নেহাত খেলা বলিয়াই ভূতোর হাতে দড়ি পড়ে নাই, কিন্তু তদবধি 'ভূতোর চন্দ্রবিন্দু' কথাটা শহরে প্রবচন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিজের নামের সম্মুখে চন্দ্রবিন্দু বসিবার ভয়ে ভূতোকে সহজে কেহ ঘাঁটাইত না।

যাহোক, এই সব নানা কারণে ভূতো পাড়ার ছোকরা-দলের চাঁই হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থাৎ পাড়ায় ছেলেরা থিয়েটার করিলে খরচের অধিকাংশ সে বহন করিত এবং কাহারও সহিত ঝগড়া হাতাহাতি করিবার প্রয়োজন হইলে সকলে মিলিয়া তাহাকে সম্মুখে

আগাইয়া দিত। ভূতোর অবশ্য কিছুতেই আপত্তি ছিল না; বস্তুত মারামারির গন্ধ পাইলে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখাই দায় হইত।

ভূতোর বৌয়ের নাম বিবাহের আগে পর্যন্ত ছিল ক্ষান্ত, এখন হইয়াছে পুষ্পরানী। তাহাকে তন্বী শ্যামা শিখর-দশনা বলা চলে না, কিন্তু স্বাস্থ্য ও যৌবনের গুণে দেখিতে ভালই বলা যায়। মুখখানি গোল, বড় বড় চোখ, গাল দুটি উঁচু উঁচু; শরীরও গোলগাল বেঁটেখাটো, দেখিলে বেশ মজবুত বলিয়া বোঝা যায়। বৌকে ভূতোর বেশ পছন্দই হইয়াছিল। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রে হঠাৎ দুজনেব মধ্যে ফারখৎ হইয়া গেল। কারণ অতি সামান্য। বাত্রে শযন কবিতে গিয়া ভূতো হৃদয়ের উদারতাবশত প্রস্তাব করিযাছিল যে বধূ খাটের ডান পাশে শয়ন করুক, কারণ ডান পাশের জানালা দিয়া বাতাস আসে। ক্ষান্ত কিন্তু ডান দিকে শুইতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার বরিয়াছিল। দুজনেই গোঁয়ার; ভূতো যতই জোর দিয়া হুকুম করিয়াছিল, ক্ষান্ত ততই মাথা নাড়িয়াছিল; ফল কথা ভূতোর উদারতা সে-দিন সার্থক হয় নাই, ক্ষান্ত শেষ পর্যন্ত বাঁ পাশেই শুইয়াছিল। বিপরীত দিকে মাথা কবিয়া শুইলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারিত, কিন্তু গোঁয়ার বলিয়া কেহই কথাটা ভাবিয়া দেখে নাই।

সে-রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভূতোব ইচ্ছা হইয়াছিল, গলা টিপিয়া বৌকে চন্দ্রবিন্দু করিয়া দেয়; কিন্তু স্ত্রীজাতির গায়ে হাত তোলা অভ্যাস ছিল না বলিয়া তাহা পারে নাই, শেষে মনে মনে তর্জন গর্জন করিয়াছিল। সকালে উঠিয়াই সে পাশের ঘরে নিজের পৃথক শয়নের ব্যবস্থা করিযাছিল এবং বৌয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। পিসী সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কাহারও কথায় থাকিতেন না; বিশেষত চন্দ্রবিন্দু হইবার ভয় তাঁহারও ছিল, তাই তিনি দেখিয়া-শুনিযাও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। তাহার পর ছয়-সাত মাস কাটিয়াছে কিন্তু ভূতোর পারিবারিক পরিস্থিতি পূর্ববৎ আছে।

ক্ষান্তর মুখ দেখিয়া তাহার মনের কথা ধরা যায় না। সে কান্নাকাটি করে নাই, বাপের বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চাহে নাই; বরঞ্চ ভূতোর সংসারটি পিসীর হাত হইতে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। ভূতোর জীবনযাত্রা সেজন্য কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই। সে সকালবেলা চা খাইয়া গোলায় চলিয়া যাইত, দুপুরবেলা আসিয়া স্নানাহার করিয়া খানিক নিদ্রা দিত তারপর আবার গোলায় যাইত। রাত্রে ফিরিয়া আহার করিয়া পুনরায় নিদ্রা দিত। ক্ষান্ত নামক একটি মানুষ যে বাড়িতে আছে তাহা সে লক্ষ্যই করিত না। ক্ষান্তও বিশেষ করিয়া নিজেকে ভূতোর লক্ষ্যবস্তু করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত না।

ভূতোর বিবাহ-ব্যাপারটা যে ভালো উৎরায় নাই, এ কথা তাহার দলের সকলেই অনুমান করিয়াছিল এবং মনে মনে খুশি হইয়াছিল। সকলের মনেই ভয় ছিল, বিবাহের পর বৌয়ের খপ্পরে পড়িয়া ভূতো দলাদলি ছাড়িয়া দিবে—এমন তো কতই দেখা যায়। পুরুষের বহির্মুখী মন দাম্পত্য জীবনের স্বাদ পাইয়া অন্তর্মুখী হয়। কিন্তু দেখা গেল, ভূতো নির্বিকার, বরং তাহার দাঙ্গা করিবার স্পৃহা আরও বাড়িয়া গেল। একদিন সে এক শ্বাদন্ত কাষ্ঠক্রেতার মুখে ঘুষি মারিয়া তাহার দাঁত ভাঙিয়া দিল, কিন্তু ক্রেতার দাঁতেও বিষ ছিল, ভূতোর হাত কাটিয়া গিয়া বিপর্যয় ফুলিয়া উঠিল। ডাক্তার আসিয়া ঔষধ, ফোমেন্ট, ব্যান্ডেজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিলেন; কয়েক দিন ভূতোকে বাড়িতেই আবদ্ধ থাকিতে হইল। ক্ষান্ত তাহার যথারীতি পরিচর্যা করিল কিন্তু দুজনের মধ্যে একটি কথারও বিনিময় হইল না।

এইভাবে চলিতে লাগিল। ভূতো সারিয়া উঠিয়া আবার গুণ্ডামি আরম্ভ করিল। সে কদাচিৎ বাড়িতে থাকিলে দলের ছেলেরা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইত। একদিন দুপুরবেলা ভূতো ঘুমাইতেছিল, ছেলেরা একেবারে তাহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত।

—'ভূতোদা, দিন দিন অরাজক হয়ে যাচ্ছে। তুমি একটা কিছু না করলে আর তো পাড়ার মান থাকে না।'

জানা গেল, মানিক নামক দলের একটি ছেলে এক বিলাতি কুকুরছানা পুষিয়াছিল। কুকুরছানাটিকে সে সযত্নে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কারণ বাঁধিয়া না রাখিলে কুকুরের রোখ কমিয়া যায়। কিন্তু আজ সকালে কুকুরশাবক দড়ি কাটিয়া পলায়ন করিয়াছিল এবং মুক্তির আনন্দে একেবারে বদ্যিপাড়ায় উপস্থিত হইয়াছিল। অতঃপর বদ্যিপাড়ার নৃশংস ছোঁড়ারা তাহাকে ধরিয়া ল্যাজ ও কান কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

মানিক প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলিল—'এ কুকুরের কান কাটা নয় ভূতোদা, আমাদের পাড়ার কান কেটে নিয়েছে ওরা। এর জবাব তুমি যদি না দাও—''

কার্তিক বলিল—'বদ্যিপাড়ার ছোঁড়াগুলোর বড় বাড় বেড়েছে, ধরাকে সরা দেখছে। সে-দিন থিয়েটার করেছিল, লোকে একটু ভাল বলেছে কি না, অমনি আর মাটিতে পা পড়ছে না; যেন ভাল থিয়েটার আর কেউ করতে পারে না! তুমি যতক্ষণ ওদের একটাকে ধরে চন্দ্রবিন্দু না করে দিচ্ছ ততক্ষণ ওরা ঢিট হবে না ভূতোদা।'

ভূতো উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'হুঁ।' এবং লংক্লথের পাঞ্জাবিটা গলাইয়া লইয়া দলবল সব বাহির হইয়া গেল। ক্ষান্ত পাশের ঘর হইতে সমস্তই দেখিল, শুনিল, কিন্তু মুখ টিপিয়া রহিল। কেবল তাহার বড় বড় চক্ষু দুটি অনেকক্ষণ ধরিয়া জ্বলিতে থাকিল।

এবার ব্যাপার কিছু বেশি দূর গড়াইল। ভূতোর গোলাতেই সাধারণত দলের আড্ডা বসে, কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনার পরদিন সকালে ভূতোর বাড়িতে দল জমিয়াছিল; মহা উৎসাহে সকলে বিগত দিনের ঘটনা আলোচনা করিতেছিল ও চা খাইতেছিল; এমন সময় থানার সব্-ইন্সপেক্টর পরেশবাবু দেখা দিলেন। ছেলের দল তাঁহাকে দেখিয়া নিমেষ মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। পরেশবাবু খুব খানিকটা উচ্চহাস্য করিলেন, তার পর উপবেশন করিয়া কহিলেন, 'বিভূতিবাবু, আপনার নামে অনেক কথা আমাদের কানে এসেছে কিন্তু উড়ো খবর বলে আমরা কান দিইনি। এবার কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ও-পাড়ার রতন থানায় সানা লেখাতে এসেছিল। আপনি কাল তাকে চড় মেরেছিলেন, ফলে সে আর কানে শুনতে পাচ্ছে না।'

ভূতো বলিল—'বেশ তো, করুক না মামলা। চড় মারার জন্যে পাঁচ টাকা জরিমানা বই তো নয়।'

পরেশবাবু বলিলেন—'রতন যদি সত্যিই কালা হয়ে যায় তাহলে দু'বছর ম্যাদ পর্যন্ত অসম্ভব নয়।' তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—'যাহোক, আপনি দুষ্টু-বজ্জাত লোক নয়, তাই আপনাকে সাবধান করে দিয়ে গেলাম। ব্যাপারটা আমি চেপে দেবার চেষ্টা করব, কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি একটু মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলবেন। নাচাবার লোক দুনিয়ায় অনেক আছে; কিন্তু যে নাচে পায়ে খিল ধরে তারই।'

পরেশবাবুর উপদেশের ফলেই হোক অথবা উপলক্ষের অভাবেই হোক, অতঃপর কিছু দিন ভূতো শান্তশিষ্ট হইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সরস্বতী পূজা আগাইয়া আসিতেছিল; ভূতোর দল সরস্বতী পূজার সময় থিয়েটার করে, উদ্যোগ-আয়োজন পুরা দমে আরম্ভ

হইয়াছিল। রাত্রে ভূতোর গোলায় একটা চালার নীচে মহলার আসর বসে। ভূতোর অবশ্য অভিনয় করিবার সখ নাই, কিন্তু সে অভিনেতাদের চা তামাকের ব্যবস্থা করিতে সারাক্ষণ সেইখানেই থাকে এবং প্রয়োজন হইলে গানের মহলার সঙ্গে একটু আধটু মন্দিরা বাজায়। আর্টের সঙ্গে ভূতোর সম্পর্ক ইহার বেশি নয়।

নির্দিষ্ট দিনে মহা ধুমধামের সহিত থিয়েটার হইল। অভিনয় কিন্তু শত্রুপক্ষ ছাড়া আর কাহাকেও বিশেষ আনন্দ দান করিতে পারিল না। দৈব দুর্বিপাকের উপর কাহারও হাত নাই, অভিনয়ের মাঝখানে সীনের দাঁড় যদি হঠাৎ ছিঁড়িয়া যায়, হারমোনিয়ামের মধ্যে ইঁদুর ঢোকে এবং কাটা সৈনিক স্টেজের মেঝের উপর পিপীলিকার যৌথ আক্রমণে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া 'বাপ রে' বলিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে অভিনয় জমিবে কি করিয়া? শত্রুপক্ষ সদলবলে দেখিতে গিয়াছিল, তাহারা প্রাণ ভরিয়া হাততালি দিল। ভূতোর দলের মনে আর সুখ রহিল না।

ব্যাপার এইখানেই শেষ হইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু মফঃস্বলের শহরে এক রাত্রি থিয়েটার হইলে সাত দিন ধরিয়া তাহার প্রেতকৃত্য চলে। পরদিন দুপুরবেলা বদ্যিপাড়ার কয়েকটা ব্যাদ্ড়া ছেলে ভূতোর গোলার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং রাস্তায় দাঁড়াইয়া নানা প্রকার টিট্‌কারি কাটিতে লাগিল। ভূতো গোলায় ছিল না, অভ্যাসমত বাড়ি গিয়াছিল, কিন্তু গতরাত্রের অভিনেতাদের মধ্যে কয়েক জন মচ্ছিভঙ্গভাবে সেখানে বসিয়া ছিল। বাছা বাছা বচনগুলি তাহাদের কানে যাইতে লাগিল। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত তাহাদের সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।

কিন্তু ভূতো নাই, এই দুর্মুখ শিশুপালগুলাকে শায়েস্তা করিবে কে? কিছুক্ষণ অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া কার্তিক তাহার অনুজ গণেশকে বলিল,—'গণশা, চুপি চুপি গিয়ে ভূতোদাকে খবর দে তো। আজ সব মিঞাকে চন্দ্রবিন্দু করিয়ে তবে ছাড়ব—'

গণেশের বয়স কম, গায়ে জোরও আছে, সে বলিল— 'কিন্তু আমরাও তো পাঁচ জন আছি—ওদের ধরে আচ্ছা করে ঠুকে দিলেই তো হয়—'

কার্তিক চোখ পাকাইয়া বলিল—'পাকামি করিস্‌নি গণশা। যার কর্ম তাকে সাজে। ঠুকে দেবার হলে আমরা এতক্ষণ দিতুম না! যা শীগ্‌গির ভূতোদাকে খবর দে— আমরা ততক্ষণ ঘাপটি মেরে আছি। খবর দিয়েই তুই ফিরে আসবি কিন্তু।'

ধমক খাইয়া গণেশ নিঃশব্দে খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া গেল। ওদিকে শিশুপালদের বাক্যবাণ তখন স্তরে স্তরে আরও শাণিত ও মর্মভেদী হইয়া উঠিতেছে।

ভূতোর মনও আজ ভাল ছিল না। আহারাদির পর সে বিছানায় শুইয়া ছিল কিন্তু ঘুমায় নাই। এমন সময় গণেশ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া—'ভূতোদা, তুমি শীগ্‌গির এস, বদ্যিপাড়ার চ্যাংড়ারা এসে গোলার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের গালাগালি দিচ্ছে—' বলিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল, তখন ভূতোর বুকের ধিকি-ধিকি আগুন একেবারে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এমনি একটি সুযোগেরই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে আজ দেখিয়া লইবে—বদ্যিপাড়ায় চন্দ্রবিন্দুর পল্টন তৈয়ার করিবে!

তড়াক করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া সে একটা র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া লইল, তারপর দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ক্ষান্ত কখন অলক্ষিত ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দৃশ্যটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, ভূতো রাগ ভুলিয়া কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল;

তারপর গভীর ভ্রূকুটি করিয়া দ্বারের কাছে আসিল। স্বামী-স্ত্রীতে ফুলশয্যার পর প্রথম কথা হইল। ভূতো বলিল—'পথ ছাড়।'

ক্ষান্তর মুখ কঠিন, ডাগর চোখ আরও বড় হইয়াছে; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—'না, তুমি যেতে পাবে না।'

নারীজাতির এই অসহ্য স্পর্ধায় ভূতো স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে চাপা গর্জনে বলিল—'সর বলছি!'

ক্ষান্ত চোয়াল শক্ত করিয়া বলিল—'না, সরব না।'

ভূতোর আর সহ্য হইল না, সে রূঢ় ভাবে ক্ষান্তকে হাত দিয়া সরাইয়া দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিল। ক্ষান্তও ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে পরিবর্তে ভূতোকে সবলে এক ঠেলা দিল।

এই ঠেলার জন্য ভূতো যদি প্রস্তুত থাকিত তাহা হইলে সম্ভবত কিছুই হইত না কিন্তু সে ক্ষান্তর শরীরে এতখানি শক্তির জন্য প্রস্তুত ছিল না; অতর্কিত ঠেলায় বেসামাল ভাবে দু'পা পিছাইয়া গিয়া সে বেবাক ধরাশায়ী হইল। ক্ষান্ত ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, তাহার আজ গোঁ চাপিয়াছে ভূতোকে কিছুতেই বাহিরে যাইতে দিবে না। তাই, ভূতো আবার ধড়মড় করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সে ক্ষুদিতা ব্যাঘ্রীর মত তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ওদিকে বদ্যিপাড়ার দল দীর্ঘকাল একতরফা তাল ঠুকিয়া শেষে ক্লান্ত ভাবে চলিয়া গেল। গোলার মধ্যে কার্তিকের দল মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল। গণেশ অনেকক্ষণ ফিরিয়া আসিয়াছে কিন্তু ভূতোর দেখা নাই। শেষে আর বসিয়া থাকা নিরর্থক বুঝিয়া কার্তিক গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তিক্ত স্বরে কহিল—'দুত্তোর! ভূতোদারই যখন গাড় নেই তখন আমাদের কিসের গরজ। চল্ বাড়ি যাই।'

কার্তিক ভাইকে লইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু বাকি তিনজন গেল না, তিন হাঁটু এক করিয়া বসিয়া রহিল। দীর্ঘকাল চিন্তার পর মানিক বলিল—'খবর পেয়েও ভূতোদা এলো না—এর মধ্যে কিছু ইয়ে আছে। জানা দরকার।—যাবি ভূতোদার বাড়ি?'

তিনজনে ভূতোর বাড়ি গেল। বাড়ি নিস্তব্ধ, কেহ কোথাও নাই। ভূতোর ঘরের দরজা ভিতর হইতে চাপা রহিয়াছে। মানিক ইতস্তত করিয়া দরজায় একটু চাপ দিল। দরজা একটু ফাঁক হইল।

সেই ফাঁক দিয়া তিনজনে দেখিল, ভূতো মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে এবং মাঝে মাঝে ঘাড় তুলিয়া বক্ষ-লীনা ক্ষান্তর মুখে চুম্বন করিতেছে।

লজ্জায় ধিক্কারে তিনজনে দরজা হইতে সরিয়া আসিল। তাহাদের বীর অধিনায়কের যে এমন শোচনীয় অধঃপাত হইবে তাহা তাহারা কল্পনা করিতেও পারে নাই। অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে তাহারা ভাবিতে লাগিল,—ভূতো এতদিনে নিজেই চন্দ্রবিন্দু হইয়া গিয়াছে।

একদা ছিলেন

মনোজ ব

দেড় যুগ পরে কলকাতায়। আচমকা কিষণলালকে দেখলাম। শহর বদলেছে, কিন্তু কিষণলাল যেমন-কে-তেমন। কলেজে পড়ার সময়েও এই ছিল।

ট্যাক্সি ছেড়ে একছুটে গিয়ে ধরে ফেললাম : কোথায় থাকিস এখন তুই? কি করিস?

তুই যা করিস, তাই। বিজনেস। খবর রাখি সব। তোর হল সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টস, আমার হোটেল। এ-ও বেশ ভাল।

সগর্বে ছাপা-কার্ড বের করে দিল। হোটেল-ডি-প্যারী। ওল্ড বালিগঞ্জে মোদিপাড়া আছে কোথায়, সেই ঠিকানা।

কোথায় উঠেছি, ক'দিন থাকব—ইত্যাদি জবাব নিয়ে কিষণলাল চুক চুক করে : আমার হোটেল থাকতে গ্রেট-ইস্টার্নে কেন উঠতে গেলি? জানবি কেমন করে, সে অবিশ্যি একটা কথা। এখন তো জানলি, থেকে যা কয়েকটা দিন।

কিষণলালের হাত এড়ানো অসাধ্য, সে আমলেও দেখতাম। বলল, কয়েকটা দিন না হোক, একটা দিন। আচ্ছা, একটা বেলা? ঘাড় নাড়লে ঘাড় মুচড়ে ভেঙে দেবো। ডিনারের নেমন্তন্ন—কাল সন্ধ্যায়। বড়লোক হয়েছিস তুই— সমস্ত জানি। তা হোটেল-ডি-প্যারীও নিতান্ত ফেলনা নয়। মিনিস্টার থাকেন, স্টার থাকেন, রাজা থাকেন—

কিন্তু মালিকের চালচলন ও সাজ-পোশাক দেখে এত সমস্ত বৃহৎ কাণ্ড বিশ্বাস হতে চায় না। কিষণলাল এবার নামওয়ারি পরিচয় দিচ্ছে : মিনিস্টার পশুপতি সামন্ত, তোর তো বস ছিল রে—মনে পড়ছে না?

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি : জন্তুপতি? তোর হোটেলে আছেন তিনি?

দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটি—করিডরে পায়চারি করতেন, পদদাপে রাইটার্স বিল্ডিং-এর ভিত অবধি কাঁপত। তবু পুরো নন আধাও নন, সিকি-মিনিস্টার। ডেপুটি মিনিস্টার। চাকরিতে আমি তখন নতুন ঢুকেছি, উপরওয়ালার কাছে হাত কচলে পদোন্নতির চেষ্টায় আছি। উন্নতি কেউ যদি দিতে পারেন, সে পশুপতি। তৃণজ্ঞান করেন না কাউকে। আমার দেখা এক ঘটনা।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিস্তর খেটেখুটে পুলের নকশা বানিয়ে এনেছেন, দৃষ্টি মাত্রে পশুপতি কিছু হয়নি কিছু হয়নি করতে করতে খচাখচ পেন্সিলে ঢেরা কেটে দিলেন। হুকুম হল : নতুন করে বানিয়ে আনুন। 'ইয়েস সার' বলে ইঞ্জিনিয়ার ঘাড় নেড়ে বেরুলেন। বাইরে এসে ফেটে পড়লেন : চেয়ারের গুণ—নাম সই করতে তো কলম ভাঙে চেয়ারে বসলেই সর্ববিদ্যা-বিশারদ। আমার কি! মাইনে খাচ্ছি—যতবার বলবে, ততবার করব। বানের জলে পুরানো-পুল ভাসিয়ে নিয়ে যাক না—আমার কি!

প্রতিকার নেই, চীফ-মিনিস্টারের কাছে বললেও চেপে যাবেন তিনি, যেহেতু পাকা তিন ডজন এম. এল. এ. পকেটে নিয়ে ঘোরেন পশুপতি—ইলেকসন জিতিয়ে আনা থেকে তাদের অশন-বসন বসবাসের যাবতীয় দায়ঝক্কি তাঁর। পশুপতি চটলে মুহূর্তমাত্রে

গণেশ উলটে দেবেন। অন্তরালে বলাবলি হত : এম. এল. এ.-কে বলে ঐ ক'টাকে? পশুপতি জন্তু পুষেছেন—তিন ডজন গরু-ভেড়া-ছাগল। সেই সুবাদে পশুপতি স্থলে প্রাঞ্জল বাংলায় জন্তুপতি তাঁর নাম দিয়েছিল।

এ হেন মিনিস্টার থাকেন নাকি হোটেল-ডি-প্যারীতে!

স্টারও থাকেন—কিষণলাল সগর্বে বলল। স্টুডিও-য় নিয়ে গিয়ে সেই যে সেবার মধুমালতীকে দেখালাম—মনে পড়ছে না?

ওরে বাবা, বলে কি! সর্ব অঙ্গে শিহরণ আমার।

'পদ্মিনী' ছবি তোলা হচ্ছে তখন। প্রোডিউসার বলবন্ত কাপুর, হিরোইন মধুমালতী। এই কিষণলাল প্রোডাকসন-অ্যাসিস্টান্ট হয়ে কাজ করছে।

আমায় বলল, অফিস পালিয়ে পারিস তো স্টুডিও-য় চলে আয়। মধুমালতীকে দেখাব।

মধুমালতী দর্শন বাবদে অফিস পালানো কোন ছার—এভারেস্টে উঠতে পারি, উত্তরমেরুতে গিয়েও হাজির হতে পারি।

কখন যাব?

খুব খানিকটা আগে গিয়ে কি হবে? নিত্যিদিন মধুমালতী দেরি করে আসে। বলবন্ত কাপুর, জানিস তো, কোটিপতি লোক—হাতে ধরে সেই লোক বলে দিয়েছে, আজকের দিনটা অন্তত হিরোইন সময় মতো আসে যেন। দিব্যি করে গেছে মালতী, নটা বাজতে বাজতে পৌঁছে যাবে। কিছু তবু বাদ-সাদ দেওয়া ভাল।

বিড়বিড় করে কিষণলাল কী একটু হিসাব করল। বলে, বারোটা নাগাদ আসিস তুই। হিরোইনের মোক্ষম অ্যাকটিং সেই সময়টা।

কাজেকর্মে আরও কিছু দেবি হয়ে গেল, পৌঁছুতে প্রায় একটা। এসে দেখি, কাকস্য পরিবেদনা! রং মেখে পোশাকআশাক পরে আর্টিস্টরা আড্ডা জমাচ্ছে, বিড়ি-সিগারেট ফুঁকছে, দরবারের বিশাল সেটে ঈষৎ পরিমাণে দিবানিদ্রাও সারছে কেউ কেউ। সাউন্ড-ক্যামেরা-লাইট সকলে তৈরি। পাত্তা নেই শুধু হিরোইনের। কাপুরের টাক-মাথায় অল্প কয়েকটি চুল—ক্রোধবশে তা-ও বোধকরি ছিঁড়ে শেষ করবেন। বলছেন, সন্ধ্যার ফ্লাইটে হিরো বম্বে পাড়ি দিচ্ছে। এত করে বললাম—কথা দিল, কালীর নামে দিব্যি করল। দেবতা-গোঁসাই বলেও তো মাগী কেয়ার করে না।

পরক্ষণে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সভয়ে বললেন, বড্ড আলগা মুখ আমার। ঘুণাক্ষরে এসব কেউ মুখের আগায় আনবেন না। বাপ্পা সেই আটটা থেকে ধন্না দিয়ে আছে, এতক্ষণের মধ্যে একটা খবর পর্যন্ত দিল না। ফ্যানেদের প্রেম-নিবেদনের জ্বালায় বাড়িতে নাকি ফোন রাখার জো নেই—তা ক্যামাক স্ট্রীটের যত ফোন সমস্ত কেটে দিয়ে গেছে, এমন তো শুনিনি।

সামান্য পরেই ক্রিং ক্রিং। কাপুর লম্ফ দিয়ে পড়ে রিসিভার ধরলেন : তোর আক্কেলটা কী বাপ্পা, গোটা ইউনিট হাঁ করে রয়েছে—অ্যাঁ, কি বললি? কী করি আমি এখন? জলে ঝাঁপ দিই, না গাড়ি-চাপা পড়ি?

সকলে ব্যাকুল হয়ে শুধাচ্ছে : হল কি কাপুর সাহেব?

ফোনের মুখে কাপুর বলে যাচ্ছেন, বসেই যখন গেছেন সাঙ্গ হতে দে। তারপরে আর

একটা সেকেন্ডও যেন দেরি না হয়।

ফোন ছেড়ে কৌতূহলীদের বলছেন, লাঞ্চ খাচ্ছে। স্টুডিও-র ভোজনে নাকি জুত হয় না। বিলিতি হোটেলের খানা আনিয়ে দিই, তার উপরে দই-রাবড়ি মিষ্টি মিঠাই, তার উপরে যত রকম ফল মার্কেটে মেলে। তবু নাকি পেট ভরে না। ফিতে নিয়ে একদিন পেটের খোলে কত জায়গা, মেপে জু:প দেখব।

ম্যানেজার কুলপতি মুৎসুদ্দিকে বললেন, বাপ্পাকে পাঠানো ভুল হয়েছে। ছাগলের যদি চাষ হত, লোকে গরু কিনতে যেত না। আপনি যান চলে। সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে ইদিকে. হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে আসুন।

ট্যাক্সি নিয়ে কুলপতি ছুটলেন। কাপুব স্থির থাকতে পারেন না—সদর রাস্তা অবধি চলে যান এক একবার, ফিরে আসেন : কী খাওযা রে বাবা! গোটা হিমালয় চিবিয়ে খাওয়া যায় এতক্ষণে।

কুলপতির ফোন এল : লাঞ্চ সেরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছেন। সেটের উপরে হাই উঠবে, এক ধার দিয়ে এন. জি. হতে থাকবে, সে বড় বিশ্রি। আর্টিস্টেরও বদনাম।

হিরো ক্ষেপে গেলেন শুনে · মধুমালতীই সব, আমরা কেউ কিছু নই। পাঁচটা বাজলেই গোঁফ-চুল ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ব, একটা মিনিটও বাড়তি নয়। শুধু হিরোইন নিয়ে শুটিং করবেন তখন।

কাপুরের গাড়ি নিয়ে খোদ ডিরেক্টরই সাঁ করে বেরিয়ে গেলেন। আরও আধ ঘণ্টা-- ঘুম থেকে টেনে তুলে মধুমালতী সহ এসে পড়লেন স্টুডিও-য়। লোকজন চক্ষের পলকে চাঙ্গা। উল্লাসের জোয়ার। চতুর্দিকে ছুটোছুটি পড়ে গেছে।

কিন্তু যাঁকে ঘিরে এত কাণ্ড, স্থির অবিচল তিনি। নরলোকের পানে একটি বারও তাকালেন না, বটগাছের শীর্ষদেশে দৃষ্টি নিবদ্ধ। চিতোরলক্ষ্মী গাছের মধ্যে কি পেয়ে গেলেন, ভেবে পাইনে।

মালুম হল অনতিপরে। কাপুরের দিকে চেয়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলে উঠলেন, ডালের ফাঁকে সূর্য লুকিয়ে যাচ্ছে—কী সুন্দর দেখুন।

কাপুর মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, নিসর্গ-দৃশ্যে তাঁর কেমন মুখভাব হল, ঠাহর কবতে পারিনি।

মধুমালতী বললেন, বেলা শেষ হয়ে এল—কাজ হবে আর কেমন করে? মুডও নেই আজ। প্যাক আপ।

নমস্কার সেরে অলস-গমনে মধুমালতী গাড়ির দিকে চললেন।

এত তড়পাচ্ছিলেন, এখন কিন্তু কথাটি নেই কাপুরের মুখে। দুধাল গাইয়ের লাথি নির্বাকভাবে খেতে হয়। এ গাভী অতিশয় দুগ্ধবতী। মধুমালতী ঠোঁট নেড়েছেন—এক নাগাড়ে ছটি মাস অন্তত সে-ছবি হাউস-ফুল নেবে।

মালিক নির্বাক, কিন্তু কিষণলাল থাকতে পারে নি। কথাবার্তা আমার সঙ্গে হচ্ছিল। বলল, কমসে-কম একটি হাজার গলে জল।

বলেছে আস্তে আস্তে। আর ঠাকরুনের কানও চুলের বোঝার তলে ঢাকা। সে কান কত লম্বা না-জানি, কথাগুলো ঠিক ঠিক তিনি ধরে নিয়েছেন। থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, মধুমালতীকে নিতে অমন বিস্তর হাজার গলে যায়। সবাই জানে। যারা তা পারে, তারাই শুধু কন্ট্রাক্ট করতে যায়।

কাপুর এইবারে খেঁকিয়ে উঠলেন—মধুমালতীকে নয়, কিষণলালের উপর : গিয়ে থকে আমার টাকা গেছে। তোমাদের মাথায় কী ঘোল-ঢালা যাচ্ছে শুনি? যাও, ফোড়ন কাটতে হবে না এখানে দাঁড়িয়ে।

সেই মধুমালতীর এখন নাকি কিষণলালের হোটেলে স্থিতি!

আরও আছেন। রাজা বাহাদুর কনকনারায়ণ।

করেছে কি কিষণলালটা—অষ্টবজ্র-সম্মেলন জমিয়েছে হোটেল-ডি-প্যারীতে! কলকাতা শহরে রাজপথের উপর আমাদের কথোপকথন—একটা আয়না পেলে বড্ড ভাল হত। চোখের মণি বিস্ময়ে নির্ঘাৎ মিঠেকুমড়োর সাইজে এসে গেছে—আয়নায় বস্তুটা দেখে নিতাম।

কলেজে পড়তাম আধা-শহর জায়গায়—এই রাজাদের প্রতিষ্ঠিত কলেজে, রাজবাড়ির কম্পাউন্ডের ভিতর। রাজবাড়ি এক পেল্লায় ব্যাপার, কম্পাউন্ডে চক্কোর মেরে আসতে পুরো বেলা কেটে যায়। পিলখানায় হাতি, আস্তাবলে ঘোড়া, গাঙের ঘাটে চিত্র-বিচিত্র বজরা। দিবারাত্র চারিদিক গম গম করে। এমনি রাজার নানান অখ্যাতি—কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া। আমার নিজেরই ব্যাপাব। বাবা মাবা যাবাব পর মাইনে আর হস্টেলচার্জে তিন-শ টাকার মতো বাকি পড়েছে, পড়াশুনোয় ইস্তফা দেবার গতিক। কনকনারায়ণের কানে গেছে : সে কী কথা, সামান্য টাকার জন্যে ছেলেটার পড়া বন্ধ হবে! কলেজের প্রাপ্য শোধ কবে দিলেন এবং ভবিষ্যতেব জন্যে একটা বৃত্তি মঞ্জুর হয়ে গেল। অথচ আমি নিজে কিছু বলতে যাই নি—প্রিন্সিপাল না দেওয়ানজী, রাজকর্ণে খবরটা কে তুলেছিলেন, আজও বলতে পারব না।

রাজার রাজ্য গবর্নমেন্টে নিয়ে নিল। রুড়কিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি—বৃত্তান্তটা লোকমুখে শুনেছি, স্বচক্ষে দেখিনি। কনকনারায়ণ সবে খেতে বসেছেন তখন। রাজবদনে অন্ন ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়, গৌরচন্দ্রিকা বিস্তর। বিশাল বগিথালা—ভাত বিরিয়ানি লুচি যেদিন যেমন বাঞ্ছা, পূর্বাহ্নে ফরমাশ হয়ে যায়। থালা ঘিবে তরকারির বাটি—কমসে-কম তিরিশখানি পদ। হেডরাঁধুনি হাজির আছে, পিছনে আরও তিন-চারটে বাঘা-বাঘা রাঁধুনি। কনকনারায়ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন আয়োজনের উপর, তারপর খুশি মতন কয়েকটা জিনিস নিরিখ করলেন। সেইগুলো বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত সরে গেল। হেডরাঁধুনি চাখছে প্রতিটি তরকারি, রাজা ঘুন হয়ে দেখছেন—চামচে কেটে নেওয়া, মুখগহ্বরে ফেলা, চিবিয়ে গলাধঃকরণ—আদ্যন্ত প্রক্রিয়াটি। শুধু হেডরাঁধুনিতে হয় না কোন কোন ক্ষেত্রে, অন্য রাঁধুনিদেরও চাখতে হয়। ডবল তে-ডবল সতর্কতা। চলে যাবার সময় প্রতি জনে হাঁ করে দেখিয়ে যাবে, মুখের মধ্যে অবশিষ্ট কিছু নেই—সবটুকু পেটে গেছে। কনকনারায়ণের বাপের আমলে খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল—রানীঠাকরুনের আদেশ মতে তখন থেকে এই বন্দোবস্ত।

খাদ্য পরীক্ষা অন্তে একটি-দুটি গ্রাস সবেমাত্র মুখে তুলেছেন, হুড়মুড় করে দেওয়ানজী এসে হাজির। বিরক্ত হয়ে কনকনারায়ণ বললেন, খেতেও দেবেন না?

পুরানো লোক দেওয়ানজি, অন্দরে আসার এক্তিয়ার আছে। তা বলে এতখানি বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করা কঠিন। মুখ কালো করে রাজা বললেন, আসুনগে দেওয়ানজি। যা কিছু আর্জি, ঘুম থেকে উঠে বিকেলবেলা শুনব।

শখ করে তিনি রোদের মধ্যে ছুটতে ছুটতে আসেন নি। টেলিগ্রাম এসেছে—মেলে ধরে দেওয়ান বললেন, রাজ্য আর নেই।

তড়াক করে উঠে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে কনকনারায়ণ মায়ের মহলে ছুটলেন রানীঠাকরুন নামে সর্বজনা জানে তাঁকে, এস্টেট আসলে তাঁরই। মৃত্যুর পর কনকনারায়ণে অর্শাবে।

মহল বেশ খানিকটা দূর। রাজাবাহাদুর তীরবেগে ছুটলেন। খেতে খেতে আচমকা উঠে পড়েছেন—খালি পা খালি-মাথা। কী সর্বনাশ! জুতো নিয়ে জুতোবরদার ছুটল পিছন পিছন। ছাতা হাতে ছাতাবরদার ছুটেছে। ইতস্তত করে দেওয়ানও ছুটলেন—স্বমুখে রানীঠাকরুনকে যাবতীয় বৃত্তান্ত বলবেন। বরকন্দাজগুলোও ছুটতে লেগেছে। বাইরের লোক দেখলে ভাবত, বাজাকে তাড়া করেছে এতগুলো লোক।

নাগাল পায় না কেউ। নাদুসনুদুস রাজদেহে এত তাগত কে জানত। মহলে পা দিয়েই কনকনারায়ণ আর্তনাদ করে উঠলেন : মাগো—

কী হয়েছে, কী হয়েছে—বলতে বলতে রানীঠাকরুন এসে পড়লেন। কনকনারায়ণ আকুল হয়ে বলেন, সর্বনেশে খবর মা। এস্টেট আর আমাদের নেই, গবর্নমেন্টে বাজেয়াপ্ত। আমি যা, পিছনে ঐ যারা সব আসছে ওরাও তাই।

ছেলে কি বলছে রানীঠাকরুণ কানে নেন না। পিছনের উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়লেন : খালি পায়ে কেন রাজা বাহাদুর? ছাতাই বা কেন মাথায় ধরা হয়নি? হপ্তার মাইনে জরিমানা—দু-জনেরই। শুনে রাখবেন দেওয়ানজি, ব্যবস্থা করবেন। বারদিগর ভুলচুক হলে বরখাস্ত হবে ওদের দল সুদ্ধ।

এঁদের ছাড়াও তা-বড় তা-বড় আরও আছেন হোটেলে—কিষণলাল বিবরণ দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু কী হবে—তিনটি যা মুশল ছাড়ল, তাতেই ধরাশয়ী আমি। দাওয়াত তৎক্ষণাৎ শিরোধার্য করে বললাম, পরিচয় করিয়ে দিবি কিন্তু ভাল করে। আগে থেকে একটু গেয়ে রাখিস।

হোটেল-ডি-প্যারী নিঃসন্দেহে মস্তবড় ব্যাপার, কিন্তু বিস্তর কাল কলকাতা ছাড়া বলে খুঁজে পাচ্ছিনে। মোদি-পার্কও নয়। ওষুধের কারখানার পাশ দিয়ে রাস্তা— কিষণলাল বলে দিয়েছে। কারখানা অনেক কষ্টে পেলাম— পাশের রাস্তা নিতাই মুদি লেন।

কারখানারই একটা লোক হদিস দিয়ে দিল : গাছের গায়ে লটকে রেখেছে বটে—মোদি পার্ক। আপাতত ডোবা—ডোবা বুজিয়ে পার্কই হবে বোধহয় ওখানটা। হাঁ, হাঁ—ডোবার ধারে হোটেলও তো আছে, কারখানার লোকে খায়। ট্যাক্সি ছেড়ে পায়ে হাঁটুন সাহেব, গলিতে গাড়ি ঢুকবে না।

গলি ধরে তখন পদব্রজে এগোচ্ছি। চিনতে পাছে অসুবিধা ঘটে—কিষণলাল দেখি পথে দাঁড়িয়ে আছে। সাইনবোর্ডও দেখিয়ে দিল। তক্তার উপর সাদা অক্ষরগুলো রোদে বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। কিষণলাল আঙুল বুলিয়ে দেখাল, গড় গড় করে তখন পড়ে গেলাম—হোটেল-ডি-প্যারী।

কিষণলাল হি-হি করে হাসে : শৌখিন নামের বাবদ করপোরেশন যখন বাড়তি লাইসেন্স-ফী নিচ্ছে না, নামে কেন কঞ্জুসপনা করতে যাব? নিতাই মুদি লেনের মুদি-টাও থেতলে দুমড়ে 'মোদি' করে রেখেছি। এ বাজারে নামেরই আসল দাম, বুঝে দেখ

হোটেলের নাম যদি 'হিন্দু ভোজনালয়' হত, গোড়াতেই তুই উড়িয়ে দিতিস। কারসাজিটুকু আছে বলেই আনতে পেরেছি।

তোর রাজাবাহাদুর-মিনিস্টার-সিনেমাস্টারেও কারসাজি নাকি?

ঘাড় নাড়ল কিষণলাল : আদি ও অকৃত্রিম। চোখে দেখা আছে—মিলিয়ে নিবি। উপরে থাকেন। এক নম্বর দু-নম্বর তিন নম্বর তিন ঘরে পাশাপাশি তিনজন।

দোতলা টিনের ঘর। রসুইবাস খানাপিনা নিচের তলায়, বোর্ডাররা উপরে। ঢাউশ ছাতা মাথায় এক ব্যক্তি এই সময় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ঠুক ঠুক করে উপরে উঠে যাচ্ছেন। কিষণলাল আঙুল দেখাল : ঐ তো একজন—রাজা কনকনারায়ণ। চেয়ে দেখ, মিলিয়ে নে।

ছাতা মাথায় কেন রাত্তিরবেলা?

কিষণ বলে, অভ্যেস যে চিরকালের। সেকালে ছাতাবরদারে ছত্রধারণ করত, নিজেই এখন ছাতা ধরে চলেন।

আহা, কী হয়ে গেছে চেহারা। টাকা একদিন খোলামকুচির মতো ছড়াতেন। আমি তো চিরঋণী এই মানুষটির কাছে।

কিষণলাল বলে, মিনিস্টার স্টার সে দুটি ঘরেই আছেন। তোর কথা বলে রেখেছি, যাবি তো চল। টেবিল সাজাতে থাকুক ততক্ষণ এদিকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই পয়লা রুমে পশুপতি সামন্ত। ভূতপূর্ব মিনিস্টাব এবং ভূতপূর্ব জন্তুপতি। রুম মানে নিতান্তই এক খুপরি। শ্মশানে যে জাতীয় খাট যায় তেমনি একটা কোনক্রমে পড়েছে। দুটো মানুষ আমরা তার মাঝে ঢুকে পড়ে দাঁড়ানোর জায়গা পাচ্ছিনে।

পশুপতি খাতিব করে খাটের উপর নিজের পাশে আহ্বান করলেন : বসুন—

পূর্বপরিচয় দিয়ে বলি, রাইটার্সবিল্ডিং-এ আমি এক সময়ে চাকরি করে গেছি। আপনি তখন ছিলেন।

একগাল হেসে পশুপতি বললেন, এখন আছি।

চমক লাগল। ইলেকসনে হেরে ভূত হয়েছিলেন। তার উপব সরকারি টাকা গাপ কবার দায়ে মামলা ঝুলছে। বম্বের এক কাগজে পড়েছিলাম।

সন্দেহ নিরসন পশুপতি নিজেই করে দিলেন : আমি রসাতলে ডুবেছি, হরিহর রায় টাল সামলে কিন্তু এখনও সেই মিনিস্টার। চিরকালের এয়ারবন্ধু লোক—ধন্না দিয়ে পড়লাম : রাক্ষসের প্রাণ-ভোমরা কৌটোর মধ্যে থাকে, আমার প্রাণ তেমনি রাইটার্সে। ও-জায়গা ছাড়া হয়ে একটা দিনও বাঁচব না। হরিহর কথাটা বুঝলেন, নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন।

চোখ টিপে মৃদু কণ্ঠে কিষণলাল বলল, অর্ডারলি—

কানে গিয়েছে কথাটুকু। পরম আহাম্মক কিষণটা— মুখের উপরে বলে এমনি করে! পশুপতি কিন্তু তিলেকমাত্র লজ্জিত নন। বললেন, যা আমার বিদ্যে, দুইরকম শুধু হওয়া চলে। এয়ারকন্ডিসন্ড কামরায় গদির চেয়ারে-বসা মিনিস্টার, অথবা কামরার বাইরে টুলের-উপর-বসা মিনিস্টারের আরদালি। আগেরটা চুটিয়ে করেছি, পরেরটা করছি এখন। রাইটার্স বিল্ডিং ঠিকই আছে।

কিষণলালের দিকে দৃষ্টির খোঁচা দিলেন। অর্থাৎ : কেটে পড়ো, গোপন বার্তাচিত এইবার। কিষণলালও ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় : ডিনার-টাইম হয়ে গেল, কী করছে দেখিগে।

দ্রুত সে নিচে নেমে গেল।

গলা নামিয়ে পশুপতি বললেন, ইলেকসন সামনে। টুল থেকে আবার চেয়ারে ওঠার বাসনা। বিজনেসম্যান আপনি, আমার সঙ্গে পুরানো সম্পর্কও আছে একটা। কিছু ধার ছাড়ুন।

জোর দিয়ে বললেন এ-ও বিজনেস—আহা-মরি বিজনেস। আপনার ধারণায় আসবে না। লেগে গেল তো মুনাফার মুড়োল্যাড়া নেই। আর আমার ক্ষেত্রে লাগবেই-— ঘাঁত-ঘোঁত সমস্ত জানা। মিনিস্টারই হব, বরাবর যেমন হয়ে এসেছি। ছ-মাসের মধ্যে সুদ সহ আপনার টাকা শোধ করে দেব। তার উপরে, আমি তো কেনা হয়ে রইলাম একেবারে। লাইসেন্স, পারমিট যেটা যখন আবশ্যক, চড়-চড় করে বেরিয়ে আসবে। বম্বে পড়ে থাকতে হবে না, কলকাতায় থেকেই লাল হয়ে যাবেন।

অবিরাম বলে চলেছেন, কমা-ফুলস্টপ নেই। দু-নম্বর থেকে রমণীটি এসে বেরিয়ে উদ্ধার করলেন। সরাসরি ঢুকে পড়ে আমার কবজি এঁটে ধরলেন : ও কিষণলাল-বাবুর বন্ধু, আমার ঘরে একবারটি। আমারও অনেক কথা। চিনতে পারছেন না? এমনি না হোক, ছবিতে অঢেল দেখেছেন। মধুমালতী।

দৃকপাত না করে হিড়হিড় করে দু-নম্বরে এনে ঢোকালেন —নিজের এক্তিয়ারে। হাত ধরে মধুমালতী ঘরে নিয়ে এলেন—সে আমলে যদি হত? দেহটা ফেঁপে ফুলে বেলুন হয়ে গিয়ে আকাশে তো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি এতক্ষণ!

দরমার বেড়া। চৌদিকের চারখানা বেড়াই ছবিতে ঠাসা। ললনাদের ছবি—রাজকন্যা, রাজরানী, হালফ্যাসানের আধুনিকা ইত্যাদি, ইত্যাদি। কী রূপ, কী সাজসজ্জা! ছবির দিকে আঙুল ঘুরিয়ে মধুমালতী পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন : চিতোরলক্ষ্মী পদ্মিনী, সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান, প্রেম-বৃন্দাবনের শ্রীরাধা, দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা, বসন্তবিহারের মঞ্জুলা, কুহকিনীর শান্তা...

দু-চক্ষু আমার উপর স্থাপিত করে বলেন, সমস্ত আমি। একলা আমি—বিলকুল সমস্ত। নানান মেক-আপে। ঠাহর করে করে দেখুন। অথচ আজকে আর কেউ ডাকে না—হিংসুটে ডিরেক্টররা চক্রান্ত করেছে।

একবার ছবির দিকে তাকাই, একবার মধুমালতীর দিকে। মেলাচ্ছি। দেয়ালজোড়া তন্বী নায়িকারা, আর দরমার ঘরে লোলচর্মা স্ত্রীলোক। রম্ভা-মেনকা-তিলোত্তমারা এবং এক শাকচুন্নি। মনে মনে মোহমুদ্গার আওড়াচ্ছি : মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্বম্। চক্রান্ত কেউ যদি করে থাকে, সিনেমা-ডিরেক্টর নয়—মহাকাল স্বয়ং।

তারপরেই আসল কথা : বম্বে পড়ে থাকতে হবে কেন—কলকাতায় বুঝি ব্যবসা হয় না? ছবি করুন, আমি হিরোইন। গল্পও লিখতে জানেন শুনলাম—তবে তো আরও ভাল। আগাপাস্তলা আমায় খাটিয়ে নিতে পারবেন। ছবি রিলিজের দিন পুলিশ ডাকতে হবে বক্স-অফিস সামলানোর জন্যে। টিয়ার-গ্যাস ছাড়বে তারা। ফ্যানরা ট্রাম পোড়াবে, বাস পোড়াবে, দশ-বিশটা হাসপাতালে যাবে। বরাবর হয়ে এসেছে, এখনও হবে তাই।

উত্তেজনার বশে রক্ষে হাতটা ছেড়েছিলেন, হুঁ-হাঁ দিয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ি।

তিন নম্বরে রাজা কনকনারায়ণ, ওঁকে দেখতে পেয়েই উঠে এসেছি। জীবনে যা-কিছু উন্নতি, ওঁরই দয়া মূলে রয়েছে। উনি না হলে লেখাপড়ায় ইস্তফা পড়ত, পাড়ার মস্তান হয়ে ঘুরতাম।

টিমটিমে হেরিকেনের আলোয় হাতল-ভাঙা চেয়ারে রাজাবাহাদুর বসে। এ-ঘরটা কিছু বড়। গোটা তিনেক পোর্টম্যান্টো ও কয়েকটা টুল এদিক-সেদিক ছড়ানো— মাঝখানটায় তিনি। গম্ভীর, স্থির। মনে হল, দরবার করে বসে আছেন সেকালের মতো— অদৃশ্য পারিষদবর্গ চতুর্দিকে। আমি গিয়ে প্রণাম করলাম।

চোখের উপর দিয়ে এলাম, এতক্ষণ বুঝি তাকিয়েও দেখেননি। রাজকীয় মেজাজই আলাদা। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, কে তুমি? কী চাই?

আপনার কলেজের ছাত্র ছিলাম। যদি কোন সেবায় লাগতে পারি—

বেনেবৃত্তি করে দুটো পয়সা হয়েছে, শুনলাম বটে কিষণলালের কাছে।

গর্জন করে উঠলেন : পয়সার গরম দেখাতে এসেছ? বেরোও।

ছিন্ন সাজগোজ, মলিন বিষণ্ণ চেহারা। তা হলেও মর্জিমেজাজ যাবে কোথা? রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমায় দরজার পথ দেখিয়ে দিলেন।

নিচে এসে দেখি, টেবিল-সজ্জা সারা—ন্যাপকিন-ডিস কাঁটা-ছুরি-চামচে যেমনটি যেখানে লাগে। কিষণলাল কিঞ্চিৎ অভিমানের সুরে বলল, স্টার-মিনিস্টার-রাজা—দেখে এলি তো সব? কারসাজি নয় তাহলে?

সংক্ষেপে টিপ্পনী ছাড়ি : ছিলেন একদা—

তাতে কি হল! হিটলারের গুঁতোয় একদিন তা-বড় তা-বড় স্বাধীন গবর্নমেন্টের ব্যাপারেও তো ঠিক এই জিনিস। রাজ্যপাট ছেড়েছুড়ে লন্ডনের ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে পাশাপাশি সব দপ্তর সাজিয়ে বসেছিল।

ঠুনঠুন ঠুনঠুন ডিনারের ঘণ্টা। নারায়ণপুজোর আরতিতে পুরুতে যে রকম ঘণ্টা বাজায়। বাজাচ্ছে লোকাভাবে, হোটেল-ডি-প্যারীর প্রোপাইটার কিষণলাল স্বয়ং। টেবিলের কেন্দ্রস্থলে কোর্সগুলি এনে এনে রাখছে—ভাত, সজনে-ডাঁটার চচ্চড়ি, চুনোপুঁটির ঝোল, বরুই-এর অম্বল। ছুরি-কাঁটায় এই সমস্ত সাপটানো সমস্যা বটে, তবে আমার বেলা তত নয়। চীনারা দু-খানা মাত্র কাঠি সম্বল করে তরল সুপ অবধি মুখে তুলে গলাধঃকরণ করে—চীনে গিয়ে আমিও কয়েকটা দিন এই ম্যাজিকে পাঠ নিয়ে এসেছিলাম। স্বদেশে এতদিন পরে আজ কাজে লাগবে।

অতিথিরা একে একে নেমে এলেন। দিক্‌পালগণের মধ্যে আমিও—সামান্য ব্যবসাদার মানুষ। বুঝুন। আজব জিনিস দেখি। আসন নিয়েই কনকনারায়ণ চুঃ চুঃ আওয়াজ দিলেন, কোন দিক থেকে বিশাল এক হুলোবেড়াল এসে পড়ল। তরিতরকারি একটু একটু চামচেয় তুলে রাজাবাহাদুর বেড়ালের মুখে ধরছেন।

ফিসফিস করে কিষণলাল বলল, খাওয়ার আগে অন্যে চাখবে—রাজমাতা নিয়ম করে গেছেন। মানুষ নেই তো পোষা-বেড়ালে সেই কাজ করে দিচ্ছে।



একটি ঠোঁটের ইতিহাস

প্রমথনাথ বিশী



বিশ্বকর্মা যে-ঘরটাতে বসিয়া মূর্তি তৈয়ারি করেন, সে-ঘরটা সর্বদা তালা চাবি বন্ধ থাকে। যখন তিনি শিল্প কার্য করিতে থাকেন, ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেন। বাহিরে গেলে শক্ত তালা চাবি আঁটিয়া যান। এমন কি দু'চার দণ্ডের জন্যে বাহির হইলেও তালা চাবি আঁটিতে কখনও ভোলেন না। তাঁহার ছোট ছেলেটিকে বড় ভয়। নাবালক ছেলেটা সর্বদা গুল্‌তি তৈরি করিবার জন্য নরম মাটি খুঁজিয়া বেড়ায়, আর পিতার শিল্প শালার মতো এমন তৈরি কাদার তাল আর কোথায় সুলভ। কিন্তু বিশ্বকর্মার বয়স হইয়াছে। একদিন ঘর বন্ধ না করিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন, ঠিক সেই অবসরে ছোট ছেলেটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। একটা সম্পূর্ণপ্রায় মূর্তি পড়িয়াছিল; গুল্‌তির মাটির লোভে সে তার ঠোঁটে যেমনি হাত দিয়াছে, অমনি বিশ্বকর্মার আওয়াজ কানে গেল,—'ঘরে কে রে? নস্তু বুঝি, দাঁড়া আসছি।' গুল্‌তি সংগ্রহ আর হইল না, নস্তু এক দৌড়ে পালাইল। বিশ্বকর্মা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন সব ঠিক আছে। নস্তুর হাতের চাপে মূর্তির নীচের ঠোঁট-টা যে একটু বাঁকিয়া গিয়াছে—তাহা আর বুড়া বিশ্বকর্মার ক্ষীণ দৃষ্টিতে পড়িল না। তারপরে যথাসময়ে সেই মূর্তি জেলা মেদিনীপুরের গোবিন্দ মণ্ডলের ঘরে আকাট মণ্ডল রূপে ভূমিষ্ঠ হইল। এই গল্প সেই আকাট মণ্ডলের কাহিনী কিংবা আরও বিশিষ্টভাবে বলিতে গেলে বিশ্বকর্মার অসাবধানতায় এবং নস্তুর গুল্‌তির লোভে তাহার ঠোঁট যে ঈষৎ বাঁকিয়া গিয়াছিল—ইহা তারই ইতিহাস। একটি তরল মতি বালকের জন্য সারা জীবন একটা মানুষকে কত দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইয়াছিল—তাহা শুনিলে পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, অপরাধ করিলেন বিশ্বকর্মা আর ফল ভোগ করিল নির্দোষ আকাট মণ্ডল। নস্তুকে দোষ দিয়া লাভ

নাই—সে বালকমাত্র—ফলাফল বিচার তাহার স্বভাব নয়।

আকাট মণ্ডলের জন্মের কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার জননীর মৃত্যু হইল। রাগে দুঃখে গোবিন্দ মণ্ডল ঘর হইতে বাহিরে যাইবার সময়ে সদ্যোজাত শিশুর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। গোবিন্দ মণ্ডল বলিয়া উঠিল—'দেখনা, বেটা মাকে মেরে ফেলেছে, আবার হাসছে!' সত্য সত্যই আকাটের দন্তহীন শিশুর মুখে একটা হাসির আভা লাগিয়া ছিল। পার্শ্ববর্তীরা তাকাইয়া দেখিল এবং বিস্মিত হইল। সকলেই মনে মনে বুঝিল—এ ছেলে অপয়া।

বিচক্ষণ পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে হাসিটি শিশুর স্বেচ্ছাকৃত নয়। ওই যে নস্তুর হাতে তাহার নীচের ঠোঁটে একটু চাপ লাগিয়াছিল, তার ফলে ঠোঁট-টা এমন ভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে—যাহাতে বিদ্রূপ-সঞ্জাত একটা হাসির ছাপ ওখানে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। এ হাসি যেমন তাহার স্বেচ্ছাকৃত নয়, তেমনি তাহা দূর করিবার শক্তিও তাহার নাই, বস্তুত ওটা হাসিই নয়। কিন্তু সংসারের সকল মানুষ তো আর আমার পাঠকের মতো বিচক্ষণ নয়, তাহারা এত তলাইয়া বুঝিতে চায় না; সে শক্তি, সে ইচ্ছা তাহাদের নাই। তাহারা ওটাকে হাসি বলিয়াই মনে করিতে লাগিল—এবং তাহাদের ভুল বোঝার ফলাফল ভোগ করিতে করিতে আকাট মণ্ডল জীবন যাপন করিতে শুরু করিল।

গোবিন্দ মণ্ডল আকাটকে বেশিদিন বাড়িতে রাখিল না। দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার কয়েকদিন আগে তাহাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিল। আর আনিল না। মাতুলরা ধার্মিক, ধর্মের পুরস্কারস্বরূপ আকাটকে লাভ করিল। তাহাদের অনেকগুলি গোরু ছিল, রাখাল ছিল না, আকাট রাখালের কাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু এমন করিয়া তো চলে না। পাড়ার লোকেরা নিতান্ত অধার্মিক—ভাগ্নেকে দিয়া রাখালের কাজ করানো তাহাদের ভাল লাগিল না; তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল। কাজেই ধার্মিক মাতুলগণ তাহাকে পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দিল—বলিল, দেখো, ভাগ্নে ও ছেলের মধ্যে আমরা কোন ভেদ করি না। কিন্তু তাহার গোচারণের খ্যাতি গুরুমহাশয়ের কানে উঠিয়াছিল, তিনি আকাটকে বলিলেন—ওরে তুই মাঠে গিয়ে আমার গরুগুলো দেখ। ওতেই হবে বাবা, গুরুর আশীর্বাদে ওতেই তোর বিদ্যা হবে। অতএব আকাট পুনরায় মাঠে গেল। পড়িবার সময়ে সে গোরু চরায়, এমনি করিয়া কয়েক বছর গোরু চরাইবার পরে গোরুর চড়া দাম দেখিয়া গুরুমহাশয় গোরুগুলি বেচিয়া দিলেন। তখন আর আকাটের প্রয়োজন নাই দেখিয়া গুরুমহাশয় মাতুলদের বলিলেন আকাটের পড়া শেষ হইয়াছে। মাতুলরা তাহাকে পাশের গ্রামের হাইস্কুলে ভর্তি করিয়া দিল।

সেই স্কুলে গিয়া প্রথম দিনেই তাহার বাঁকা ঠোঁট তাহাকে বিপদে ফেলিল। পণ্ডিতমহাশয় ক্লাসে ঢুকিয়াই তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কিরে বড়ো যে হাসছিস্। সে বলিল—কই পণ্ডিতমশাই, হাসছি কই? তবে রে বেটা মিথ্যাবাদী। এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয় ঝুটি ধরিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। যাইবার সময়ে বলিলেন—তোর কিছু হবে না, বেটা আকাট মুখু। সেই হইতে পিতৃদত্ত নামটার পরিবর্তে গুরুদত্ত ওই বিশেষণটা তাহার গায়ে আটকাইয়া গেল। লোকে তাহাকে আকাট বলিয়াই ডাকিতে ডাকিতে ক্রমে মৌলিক নামটা ভুলিয়াই গেল। আমরাও তাহাকে ওই নামেই উল্লেখ করিয়া আসিতেছি।

এই ঘটনার পর হইতে তাহার উপরে পণ্ডিতমহাশয় কেমন যেন জাত ক্রোধ হইয়া

গেলেন। তিনি ক্লাসে ঢুকিয়াই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—'কিরে হাসছিস্ যে বড়ো।' আকাট বলিত—'*কই হাসলাম পণ্ডিতমশাই!*' পণ্ডিতমশাই ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিতেন—দেখ্ তোরা ও হাসছে কিনা। সহপাঠীগণ তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিত আকাটের মুখে হাসিই বটে। একদিন ব্যাপারটা লইয়া একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। ফলে পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে খুব এক চোট মারিলেন। আকাট কাঁদিতে লাগিল। তখন তিনি ছাত্রদের ডাকিয়া বলিলেন, দেখেছিস্ বেটার বজ্জাতি। চোখে জল কিন্তু মুখের হাসিটি যায়নি—এমন শয়তানকে ইস্কুলে রাখবো না। যা দূর হয়ে যা। আকাট সেদিনের মত ইস্কুল ত্যাগ করিল এবং পরেও আর ইস্কুলে গেল না। তাহার পড়াশোনা ওইখানেই শেষ হইল।

অতঃপর আকাট চাকুরির সন্ধানে কলিকাতায় আসিল। একটি সাহেবী অফিসে চাকুরি পাইল। Lift-এর দরজা খোলা ও বন্ধ করা তাহার কাজ। সারাদিন এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে lift-এর দরজা খুলিয়া দেয়; আবার লোক উঠিলে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়; lift হুস করিয়া পাতালপুরীতে নামিয়া যায়। এই ভাবে তাহার কাল যায়—হঠাৎ তাহার একদিন সৌভাগ্যোদয় হইল। একদিন lift হইতে বাহির হইয়া তাহার দিকে বড়ো সাহেবের চোখ পড়িল। তিনি বলিয়া উঠিলেন 'I like Such a Smiling face' এরকম Smiling face নাকি ইণ্ডিয়াতে সদাসর্বদা চোখে পড়ে না। বড়ো সাহেব তাহাকে তাঁহার খাস খানসামার কাজ দিলেন। মাহিনাও অবশ্য বাড়িল। আকাট ভাবিল বিধাতা এতদিনে প্রসন্ন হইয়াছেন কিংবা বিধাতা বরাবরই প্রসন্ন কেবল মানুষের অন্যায় অত্যাচারের জন্যই তাহার যত কষ্ট। সে বিধাতাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া মানুষকে মনে মনে বাপান্ত করিয়া, নূতন কোট ও চাপরাশ পরিয়া বড়ো সাহেবের দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু বেশিদিন দাঁড়াইয়া রহিতে হইল না। সেদিন বড়ো সাহেব তাহার মেমের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আফিসে আসিতেছিলেন দরজার কাছে আকাটকে দেখিয়া গর্জিয়া উঠিলেন—Grinning Idiot! এবং গর্জনের পিছনে শিলাবর্ষণের মতো একটি প্রচণ্ড ঘুষি তাঁহার নাকে আসিয়া পড়িল।

এখন সাহেবী অফিসের একটি সুনিয়ম এই যে এরকম চড় ঘুষিটা খাইলে অন্যত্র তাহার ঔষধ সন্ধান করিতে হয় না। সরকারী খরচে ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই আফিসের ডাক্তার আকাটের নাকে একটি পটি বাঁধিয়া দিল। দেশী আফিসে এমন বিধান শৃঙ্খলা নাই। সেখানে চড়-চাপড় খাইলে নিজের খরচে ঔষধ সংগ্রহ করিতে হয়।

পটি বাঁধা নাক, আকাট অসুখের বাবদ তিনদিন ছুটি পাইল। সে বাসায় ফিরিয়া ভাবিতে লাগিল, কেন এমন হইল? বিধাতাপুরুষ তো অবিবেচক নহেন, সাহেবও সদয়. তবে তাহার নাকটা বদ্ধপটি হইল কেন? এমন সময়ে নাকে ঔষধ লাগাইবার প্রয়োজন হইলে সে ঔষধের তুলি লইয়া আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আয়নার ভিতরে হাসিতেছে কে? সে চমকিয়া উঠিল! তার নিজেরই তো ঠোঁট বটে! এদিকে নাকটা জ্বলিয়া যাইতেছে; ঠোঁটের হাসি সেই জ্বলুনিকে যেন চতুর্গুণ বাড়াইয়া দিল। আর একটু হইলেই সে নিজের গালে এক চড় বসাইয়া দিয়াছিল আর কি! সে রাগে দুঃখে আয়নার সুমুখ হইতে সরিয়া আসিল। সরিয়া আসিল বটে কিন্তু সেই বিদ্রূপের হাসিটা মন হইতে কিছুতেই সরিল না। সে নিজেকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিল—এবং প্রতিদিনের স্তূপীকৃত

ধিক্কার জমিয়া উঠিয়া এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিল যাহার আড়ালে ওই হাসিটা প্রচ্ছন্ন হওয়া দূরে থাকুক, তাহার উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত শিখরের তুষারের শুভ্রতায় সেই বিদ্রূপের হাসির নির্জীব ছটা অনির্বাণ হইয়া জ্বলিতে লাগিল। এতদিন তাহার হাসি দেখিয়া অপরে রাগিত, এবার তাহার নিজের রাগিবার পালা, নিজের উপরে। সারাদিন ওই হাসি! আবার ঘুমের মধ্যেও ওই হাসিটা নিঃশব্দ বিভীষিকা সঞ্চার করিয়া তাহার স্বপ্নকে পীড়িত করিতে থাকে। স্বপ্ন ও জাগরণের ভীতির সাঁড়াশি আক্রমণে আকাট পাগল হইয়া যাইবার মতো হইল।

কিন্তু সে পাগল হইল না। তার কারণ সংসারে পাগলামির একমাত্র ধন্বন্তরি ঔষধ সে পান করিয়া বসিল। আকাট বিবাহ করিল। বিবাহের পরে কিছুকাল ভালই চলিল। বিবাহের পরে কিছুকাল ভালই চলে। তখন তো স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বাস্তবরূপ দেখে না, পরস্পরের স্বপ্ন দেখে। যতদিন স্বপ্ন চলে, কোন বালাই থাকে না, কারণ স্বপ্ন চালনার কোন খরচ নাই। কিন্তু ক্রমে স্বপ্ন কাটিয়া আসিতে থাকে, আর বাস্তবরূপ ধীরে ধীরে চোখে পড়িতে আরম্ভ করে।

এতদিন আকাট তাহার পত্নীর স্বপ্ন দেখিতেছিল, সেদিন মোক্ষদাসুন্দরীকে চোখে পড়িল। মোক্ষদাসুন্দরী তাহার স্ত্রীর নাম বটে। মোক্ষদাকে চোখে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আকাট দেখিল তাহার একটা নাক আছে, আর নাকে আছে একটা মস্ত নথ।

ওদিকে মোক্ষদারও চোখে পড়িল—তাহার স্বামীর ঠোঁটে একটা বিদ্রূপের হাসি। মোক্ষদা ভাবিল ওই হাসিটা নিশ্চয় তাহার নথটা লক্ষ্য করিয়া। কারণ অনেক স্থানেই তাহার নথটা হাসি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সে কখনও ভাবিতে পারে নাই তাহার স্বামীও এটা লইয়া বিদ্রূপ করিবে।

সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল—বড় যে হাসছ! একটা দিতে তো পারো না।

স্বামী বলিল—হাসলাম আবার কই?

স্ত্রী বলিল—আমি যেন কিছু বুঝি না! বয়স কত অনুমান করো!

এখন মোক্ষদার বয়স লইয়া একটু গোলমাল ছিল। তাহার বয়স পিতৃপক্ষ কম বলিয়া চালাইয়া দিয়াছিল। এটা এমন নূতন কিছু নহে। পুরুষের বয়স চাকুরির খাতায় কম করিয়া লিখানো হয়। আর মেয়েদের বয়স বিবাহের বেলায়।

স্বামী-স্ত্রীতে এই লইয়া ঝগড়া সুরু হইয়া গেল। কোন স্বামী-স্ত্রীতে না ঝগড়া হয়। এখনকার দিনে যমুনা পার হইয়া মথুরায় গিয়া বিরহ যাপনের সুবিধা নাই। দাম্পত্য ক্রোধের কুটিলা গতিই এখন যমুনার কাজ করে। কাজ করিবার ফলে উভয়ে কিছুদিন (কয়েক ঘণ্টাও হইতে পারে) মাথুর পালা উদ্‌যাপন করে—তারপরে আবার ভাব-সম্মিলন।

কিন্তু সাধারণ স্ত্রীর তুলনায় মোক্ষদাসুন্দরী কিছু বেশি অভিমানী, বিশেষ তার দুর্বল স্থান ওই নথটা। নথটা নাকি তাহার পরলোকগতা মাতার সম্পত্তি, তাই বিশেষ যত্নে সে নাকে ধারণ করিত, অবশ্য পাকা সোনায় তৈরী—সেটাও অন্যতম কারণ।

একদিন গভীর রাত্রে মোক্ষদা ঘুম ভাঙিয়া দেখিল তাহার স্বামীর ঠোঁটে সেই বিদ্রূপের হাসি। ভাবিল স্বামী নিদ্রিতা পত্নীর নাকে নথটা দেখিয়া হাসিতেছিল—এখন ঘুমের ভান করিতেছে। আকাট সত্যই ঘুমাইতেছিল—হাসিটা তাহার স্বাভাবিক—অর্থাৎ অস্বাভাবিক। স্ত্রী তাহাকে ডাকিয়া জাগাইল। বলিল—ঘুমিয়েও কি একটু শান্তি পাবো না?

আকাট বলিল—অশান্তি কি? ঘুমোও না।

—ঘুমোও না! তোমার কি হচ্ছিল?

আকাট বলিল—ঘুম।

—বটে! আর মিথ্যে বল্‌তে হবে না। আমি সব বুঝি!

সে যে কি বোঝে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিল না বটে, কিন্তু পরদিনই সে বাপেরবাড়ি চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে শ্বশুরবাড়ির যাবতীয় অস্থাবর লইয়া গেল। কেবল স্থাবর বলিয়া বাড়িটা লইতে পারিল না।

আকাট বুঝিল যে তাহার দাম্পত্য-জীবন শেষ হইল। ওই বিদ্রূপের হাসিটাই ইহার মূল। তখন সে লোটা কম্বল লইয়া, গেরুয়া পরিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া সংসার ছাড়িল।

আকাট শুনিয়াছিল সন্ন্যাসীরা বনে যায় কিন্তু বন যে ঠিক কোথায় তাহা সে জানিত না। বাংলা দেশের লোকে সুন্দরবনের নাম জানে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের নামটাও জানে। সন্ন্যাসীর প্রতি বাঘের আচরণ কি রকম সে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা আকাটের হইল না। কাজেই সে হাওড়া স্টেশনে গিয়া বিন্ধ্যাচলের একখানা টিকিট করিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

গাড়িখানা তৃতীয় শ্রেণীর। তার একান্তে দুইজন সাহেবী পোশাক পরিহিত যুবক সিগারেট টানিতে টানিতে ইহলোক, পরলোক, সন্ন্যাস, সংসার আসক্তি, 'ত্বয়া, হৃষীকেশ', 'মাফলেষু', ইত্যাদি গভীর বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। এসব আলোচনার অধিকার তাহাদের আছে, কারণ তাহারা জীবন-বীমার দালাল। এখনি বর্ধমানে নামিয়া জীবন-বীমার শিকার সন্ধান শুরু করিবে।

যুবকদের মধ্যে ক বলিল—ভোগের দ্বারাও ত্যাগের ভূমিকা সৃষ্টি করতে হয়। ভোগ না করিলে ত্যাগ করা যায় না।

'খ' বলিল—ত্যাগই যদি করতে হয় তবে আবার ভোগের উৎপাত সৃষ্টি-কেন?

'ক' বলিল—মেঘ না হলে কি বৃষ্টি সম্ভব? মেঘটা সঞ্চয়—বৃষ্টি ত্যাগ!

'খ' বলিল—আমাদের দেশে কত সাধু-সন্ন্যাসী আছেন—সবাই কি ভোগী ছিলেন?

'ক' বলিল—যে-সব সাধু-সন্ন্যাসী এক সময়ে ভোগী ছিলেন—তাঁরাই ত্যাগে শান্তি পেয়েছেন। যাঁরা ভোগের বস্তুর অভাবে সংসার ত্যাগ করেছেন তাঁদের cynic বলা যেতে পারে।

এমন সময়ে 'ক'-র দৃষ্টি আকাটের দিকে পড়িল—এবং তাহার ঠোঁটের বিদ্রূপের হাসিটি সে দেখিতে পাইল।

তখন সে 'খ'কে ডাকিয়া বলিল—ওই দেখ এক গেরুয়াধারী। কিন্তু ওর ঠোঁটের বিদ্রূপের হাসিটা লক্ষ্য করেছ? ওর ভোগের মূল ক্ষয় হয়নি। ভোগের ইচ্ছা ওর ষোল আনা আছে, কিন্তু সংসার ওর সম্বন্ধে কৃপণ। ওই হাসি দিয়ে সে সংসারকে ধিক্কার দিচ্ছে।

'খ' সমস্তই দেখিল। এমন চাক্ষুষ প্রমাণের পরে আর তর্ক চলে না। তাই সে একটি সিগারেট ধরাইল।

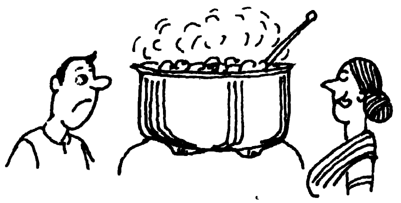
আকাট দেখিল সে আবার ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বিন্ধ্যাচল যাওয়া তার আর হইল না। সে 'খানা জংশনে' নামিয়া পড়িল। স্টেশনের পাশে এক বটগাছতলায় সে আস্তানা পাতিল। কিন্তু গেরুয়া একেবারে ব্যর্থ হইবার নয়। সন্ন্যাসী দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহার

শিষ্য জুটিতে শুরু করিল। তাহার শিষ্যরাও সেই হাসিটি লক্ষ্য করিল--তাহারা গুরুর নাম দিল 'হাসিয়া বাবা'।

সারা জীবন সে হাসির কুফল ভোগ করিয়া আসিয়াছে— এইবারে হাসির সুফল ভোগ করিবার তাহার পালা। শুধু সুফল নয় সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, সন্দেশও ছিল। বিধাতাপুরুষকে একেবারে নির্দয় বলা যায় না—ওই অনিচ্ছাকৃত হাসিটি যদি তিনি দিয়া থাকেন, তবে তাহার বাবদ এবার অমৃতবণ্টনও তিনিই করিলেন। সুখে দুঃখে, শীতে গ্রীষ্মে, দিনে রাত্রে তাহার মুখে হাসি লাগিয়া আছে—ইহাই হইল তাহার সব চেয়ে বড় মাহাত্ম্য। হাজার হাজার বছরের দুঃখে কষ্টে যে দেশের লোক হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে—তাহারা ওই হাসির ছটায় আধ্যাত্মিক স্বর্গের চরম দীপ্তি দেখিতে পাইল। এবং তাহার ফলস্বরূপ আকাটের বৃক্ষতলাশ্রিত আস্তানা অচিরকালের মধ্যে সুবৃহৎ মন্দিরে পরিণত হইল। ইহাতে বিধাতাপুরুষ বিস্মিত হইলেন কিনা জানি না, তবে আকাট হইল। কিন্তু অনেক ঠেকিয়া তাহার শিক্ষা হইয়া গিয়াছিল—তাই সে কিছু প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর হইয়া চাপিয়া বসিয়া রহিল। এইভাবে দীর্ঘকাল 'খানা জংশনে' সে কাটাইল। তাহার নাম ও খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—কাজেই বহু লোকের মোহ মুক্তির ফলস্বরূপ বহুতর ভূসম্পত্তি ও অস্থাবর সঞ্চয় করিয়া অবশেষে একদিন 'হাসিয়া বাবা' দেহরক্ষা করিল।

এইরূপে আকাট মণ্ডলের জীবন শেষ হইল। কিন্তু একেবারে শেষ হইল না। শিষ্যরা গুরুর দেহ সমাধিস্থ করিয়া তাহার উপরে প্রকাণ্ড এক মঠ তৈয়ারী করিয়া দিল—তাহার নাম দিল 'হাসিয়া বাবার মঠ'।

হাসিয়া বাবা স্বর্গে গেল।'নস্তুর বালকসুলভ অনবধানতায় সারা জীবন যে দুর্ভোগে ভুগিয়াছে—তাহাই সে বিধাতার কাছে নালিশ করিল। বিধাতা নথীপত্র দেখিয়া ন্যায়বিচার করিলেন। আকাটের পুণ্যফল নস্তুর হিসাবে জমা করিয়া দিলেন—কারণ নস্তু-ই তাহার পুণ্যের কারণ। আর আকাটের মাটির পিণ্ডটাকে চটকাইয়া শিল্প শাখার একান্তে ফেলিয়া রাখিলেন—নূতন মূর্তি তৈরী করিবার উদ্দেশ্যে। ইহার পরেও কে বলিবে যে বিধাতাপুরুষ নিরপেক্ষ নহেন।



করুণাময়ের করুণা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়



সিনেমার ছবি তৈরি করতে গিয়ে একবার কিরকম বিপদে পড়েছিলাম শুনুন।

ছবির জন্যে যিনি টাকা খরচ করছিলেন তিনি নিজে আসতেন না। একজন ভদ্রলোককে রেখেছিলেন তাঁর হয়ে কাজ করবার জন্যে। ভদ্রলোকের নাম করুণাময় ভটচাজ।

করুণাময় প্রথম যখন এলেন—বলেছিলেন সিনেমার ব্যাপার কিছুই তিনি জানেন না। তারপর চার-পাঁচ দিন শুটিং হয়ে যেতেই দেখলাম সবই তিনি জেনে ফেলেছেন। এবং এত বেশি জেনেছেন যে, আমাকে পর্যন্ত শেখাতে আরম্ভ করলেন।

একদিন বললেন, ছবির খরচ তো বেশি হয় না, শুধু আপনাদের দোষেই খরচটা বেড়ে যায়।'

'আমাদের দোষ কিরকম?'

করুণাময় বললেন, 'আপনারাই তো সবাইকে বেশি বেশি করে পাইয়ে দেন।'

'আমরা পাইয়ে দিই?'

'তা না তো কী? বদ্যিনাথবাবু তো থিয়েটারে অ্যাক্‌টিং করেন, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখে রক্ত উঠে যায়, মাইনে পায় দুশো টাকা। আর এখানে বলে কিনা—রোজ তিনশো টাকা করে নেবে। এক পাড়াতেই থাকি। বাজারে রোজ দেখা হয়। থলে হাতে নিয়ে ট্যাঙোস্ ট্যাঙোস্ করে কচুর ডাঁটা আর ওলের ডাঁটা খুঁজে বেড়ায়, আর এখানে বলে কিনা—মাংস

ছাড়া উনি খেতে পারেন না। হেঁটে হেঁটে জুতো ছিঁড়ে গেল আর আমরা ডাকলেই বলে কিনা—গাড়ি এনেছেন?'

এই বলে তিনি খিঁক্ খিঁক্ করে এমন হাসি হাসতে লাগলেন আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে যে আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। বললাম—'ও কথাগুলো বলবেন না ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে। ওরা দেবে আমাদের জব্দ করে।'

করুণাময় বললেন, 'আর আমি জব্দ করতে জানি না?'

বললাম—'দয়া করে না জানলেই ভাল হয়।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! জব্দ করতে শুরু করলেন তিনি। যার দুশো টাকা পাওনা তাকে একশো টাকা দিয়েই পকেটের লাইনিং উল্‌টে দেখিয়ে দিলেন—'আজ আর নেই দাদা। কাল দেব।'

কাল মানে আবার যেদিন শুটিং হবে সেইদিন। অর্থাৎ দশ-পনেরো দিন পরে।

সামান্য দু-দশ টাকা পাওনা যাদের—তারাও দেখলাম—আমার কাছে এসে কান্নাকাটি আরম্ভ করলে। বুঝলাম—টাকা বাকি রেখে সকলকেই জব্দ করতে আরম্ভ করেছেন তিনি। সেদিন তাঁকে ডেকে বললাম—'এ রকম করবেন না করুণাময়বাবু। আমাদের বদনাম হয়ে যাবে। কেউ আর আমাদের ছবিতে কাজ করতে চাইবে না।'

করুণাময় বললেন, 'ওদের বাপ কাজ করবে। টাকা দিয়ে কাজ করাচ্ছি, মাগ্‌না তো করাচ্ছি না!'

বললাম—'গরিব মানুষ। আজকালকার দিনে টাকা বাকি রাখলে ওদের কষ্ট হয়।'

'আপনি চুপ করে থাকুন!'

বললাম—'চুপ করে থাকতে পারছি না যে?'

করুণাময় বললেন, 'আপনার কমিশন পেতে দেরি হচ্ছে বুঝি?'

'আমার কমিশন কি বলছেন?'

করুণাময়ের মুখে আবার তেমনি বাঁকা-বাঁকা হাসি!—'হেঁ হেঁ বাবা, আমি কি আর বুঝি না ভেবেছেন? টাকতি চার আনা কমিশন তো নিঘ্‌ঘাৎ! নইলে কি এমনি-এমনি পাইয়ে দিচ্ছেন ওদের?'

এত বড় অপমানজনক কথা কেউ আমাকে কোনওদিন বলেনি। ভাবলাম, ছবির মালিককে কথাটা জানিয়ে দেবো। বলবো—'করুণাময়ের হাত থেকে করুণা করে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। হয় নিজে থাকুন, নয়ত অন্য কোনও লোকের ব্যবস্থা করুন।'

বললেন বটে অন্য লোক দেবেন। কিন্তু অন্য লোক আর আসে না।

শুটিং-এর দিন দেখলাম বেশ সেজেগুজে সিল্কের শার্ট পরে করুণাময় এলেন আমাকে করুণা করতে।

এসেই আমাকে আক্রমণ!—'আমার নামে লাগিয়েছেন বুঝি কর্তাকে?'

তারপরেই হাতজোড় করে বলেছিলেন, 'লাগাবেন না দাদা। গরিব মানুষ—আপনাদের আশীর্বাদে দু-পয়সা করে খাচ্ছি। তাড়াবেন না আমাকে। আমি সব ঠিক ম্যানেজ করে দেবো দেখুন।'

তিনিই ম্যানেজ করতে লাগলেন। আমি আর কোনও কথা বললাম না।

একদিনের শুটিং হয়ে গেল।

কিন্তু স্বভাব-ধর্ম মানুষ সহজে ছাড়তে পারে না। করুণাময়ও পারলেন না। স্টুডিও-

ক্যান্টিনের বিল মেটাতে গিয়ে লাফিয়ে উঠলেন—'বাবাঃ! তি-রি-শ টাকা? দেখেছেন? ব্যাটা ডাকাত। একটা চপের দাম চার আনা!'

বলেই বিলটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি।

বললাম—'ওইরকমই নিয়ে থাকে।'

করুণাময় বললেন, 'আপনি মশাই ভারি ঠাণ্ডা লোক। আমি হলে সব ব্যাটাদের জব্দ করে দিতাম।'

বললাম—'থাক আর ওকে জব্দ করবেন না। খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।'

'খাওয়া বন্ধ কি হলেই হল নাকি?'

করুণাময় বললেন, 'খাওয়ার ব্যবস্থা কাল থেকে আমি করব।'

আমি আর কথা বাড়ালাম না। বললাম—'করুন।'

পরের দিন 'শুটিং' করতে গেছি। একজন 'ইলেকট্রিসিয়ান' একটা চায়ের কাপ নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'দেখুন স্যার কি রকম চা।'

বললাম—'আমাকে কি দেখাচ্ছ? ক্যান্টিন-এ গিয়ে বল।'

ইলেকট্রিসিয়ান বললে, 'ক্যানটিন থেকে তো চা আসছে না স্যার। চা আসছে স্টুডিওর বাইরের একটা দোকান থেকে। ওরা ভাঁড়ে চা বিক্রি করে।'

কথা তখনও শেষ হয়নি। করুণাময় কোথায় ছিলেন, ছুটতে-ছুটতে এসে বললেন, 'ক্যানটিন স্টপ করে দিয়েছি যে!'

জিজ্ঞেস করলাম—'এতগুলি লোকের খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে তাহলে?'

করুণাময় বললেন, 'সব ম্যানেজ করেছি স্যার, আপনি শুটিং চালিয়ে যান!'

বারোটা বাজল। খাবার ছুটি দিতে হবে। করুণাময় আমার কাছে এসে চুপি চুপি বললেন, 'আর একটু দেরি করুন, খাবার গাড়ি এখনও আসেনি।'

খাবার গাড়ি আসবে? তাই আসুক।

সাড়ে বারোটা বাজল। গাড়ি কিন্তু তখনও আসে না।

একটা বাজল। লোকজন তখন খাবার জন্য ছট্‌ফট্ করছে। কাজে কারোর মন বসছে না বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি নিরুপায়। করুণাময় বলছেন—'গাড়ি এল বলে।'

অবশেষে দুটোর সময় গাড়ি এল। খাবার ছুটি দিলাম। ছুটি দিয়ে 'আপিস' ঘরে গিয়ে বসেছি, দেখলাম, চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে করুণাময় এক ঝুড়ি মাটির খুড়ি আর এক ডেক্‌চি মাংস গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে এলেন। এসেই চাকরকে হুকুম করলেন—'খুড়িতে তুই মাংস সাজা, ততক্ষণ আমি ছুটে গিয়ে পাঁউরুটি কিনে আনি। ব্যাটা বুদ্ধু ড্রাইভার রুটি আনতে ভুলে গেছে।'

'সর্বনাশ! এরপর রুটি আসবে, তারপর লোকে খাবে?'

'যাব আর আসব স্যার—এই তো হাজরার মোড়। কতক্ষণই বা লাগবে!'

করুণাময় গেলেন রুটি আনতে।

রুটি যখন এল—দেরি বিশেষ কিছু হয়নি; ঘড়িতে তখন প্রায় তিনটে বাজছে।

এক খুড়ি মাংস আর দু-পিস রুটি।—করুণাময়ের মেনু।

খিদের চোটে করুণাময়ের বাপান্ত করতে করতে অনেকে তাই খেলে।

নিচের 'মেক-অ্যাপ' রুম থেকে চাকরটা ফিরে এল এক খুড়ি মাংস আর রুটি হাতে নিয়ে বললে, 'মেক-আপ ম্যান সামসুদ্দীন খেলেন না স্যার।'

করুণাময় কাছেই বসেছিলেন। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন—'কী! ক্যানটিনের রান্না মাংস খেতে পারে আর আমার বাড়ির রান্না মাংস খাবে না?'

বলেই মাংসের বাটিটা একহাতে আর একহাতে চারপিস রুটি নিয়ে নিজেই চলে গেলেন মেক-আপ রুমের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে দেখি করুণাময় এসে দাঁড়িয়েছেন আমার সুমুখে। দেখে আর চিনতে পারি না। মাথা থেকে মাংসের ঝোল গড়াচ্ছে, সিল্কের জামা, ফর্সা ধুতি ঝোলে ঝোলময়। বুঝলাম কি কাণ্ড হয়েছে। সামসুদ্দীনের করুণায় করুণাময় রসময় হয়ে গেছেন!

অনেকে তখন মুখ টিপে টিপে হাসছে। আমার কিন্তু হাসলে চলবে না। শুটিং শেষ করতে হবে। দুটো টাকা নিয়ে সামসুদ্দীনকে গেলাম ঠাণ্ডা করতে। লোকজনদের বললাম—'যাও, তোমরা সেট-এ যাও।'

সেট-এ গিয়ে আবার আরেক বিপদ।

একজনকে হিন্দুস্থানী দারোয়ান সাজিয়েছিলাম। মাথায় ছিল পরচুলা, মুখে ছিল গোঁপ।

সেট-এর আলো জ্বলতেই দেখি--দারোয়ানের মাথায় পরচুলো নেই—মুখে গোঁপও নেই।

'একি ব্যাপার? তোমার চুল আর গোঁপ কোথায় গেল?'

যে লোকটি দারোয়ান সেজেছিল, সে বললে, 'খুলে নিয়ে গেল স্যার।'

'কে খুলে নিলে?'

'যারা ভাড়া দিয়েছিল তাদের লোক।'

জিজ্ঞেস করলুম—'কেন?'

দারোয়ান বললে, 'গেল বারের শুটিং থেকে এই চুল আর গোঁপের ভাড়ার টাকা দেয়নি করুণাময়। তাদের লোক এসেছিল, করুণাময়ের কাছে টাকা চেয়ে চেয়ে হয়রান হয়ে গিয়ে, শেষে আমার মাথা থেকে চুলটা আর মুখ থেকে গোঁপটা জোর করে টেনে খুলে নিয়ে চলে গেল।'

লোকটার সন্ধানে ফ্লোর থেকে বেরোতে যাচ্ছিলাম দারোয়ান বললে, 'তাকে আর পাবেন কোথায় স্যার? ট্রামে চড়ে সে চলে গেল। আমি তার পিছু পিছু ট্রাম লাইন পর্যন্ত ছুটেছিলুম।'

বললুম—'তার পেছনে না ছুটে করুণাময়কে বললেই তো পাবতে।'

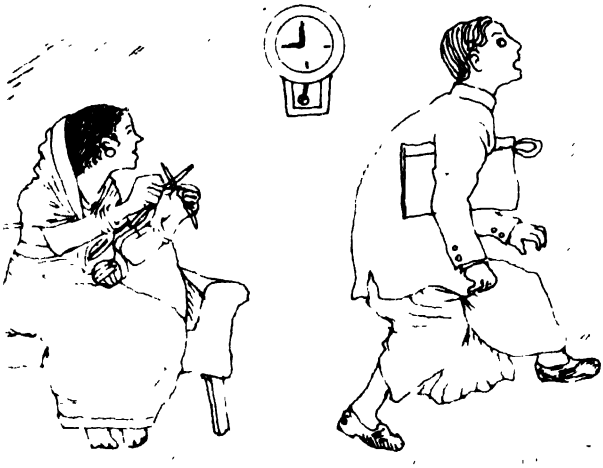
দারোয়ান বললে, 'করুণাময়কে পাব কোথায় স্যার? সে তো ঘরে খিল বন্ধ করে কাপড় শুকোচ্ছে—কিছুতেই দরজা খুললে না।'

ক্যামেরাম্যান বললে, 'খুলবে কেমন করে, আন্ডারওয়ার নেই যে!'

করুণাময়ের করুণায় সে ছবির শুটিং আমার সেইদিন থেকে বন্ধ আছে।

স্বামী মানেই আসামী

শিবরাম চক্রবর্তী



বীরেনবাবু ধীরে ধীরে বাড়ি ঢুকলেন—চোরের মত পা টিপে টিপে। রাত দশটা বেজে গেছে—এক-জন স্বামীর দণ্ডলাভের পক্ষে এই যথেষ্ট প্রমাণ—বীরেনবাবুর তাই এই চোরের দশা।

আসল চোরের পক্ষে অবশ্যি রাত দশটা কিছুই নয়, আসলে তারা যখন খুশি আসতে পারে, যাতায়াতের ব্যাপারে তারা অনেকটা স্বাধীন এবং আপ্‌খেয়ালী। একটা চোরের 'পরগৃহ প্রবেশের' বেলায় যে স্বাধীনতা আছে, অতটুকুও তার নিজ গৃহে নেই এই কথা ভেবে বীরেনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

বীরেনের বউ সেলাই করছিল, চাইল চোখ তুলে, কিছু বলল না। বীরেন কোটটা খুলে রেখে একটু তৈরি হয়েই বসল সোফাটায়। ঝড় যে আসন্ন, মাথার উপর দিয়ে বইবে এক্ষুনি, আবহাওয়া-তত্ত্বে অভ্যস্ত হয়ে সেটা জানার তার বাকি ছিল না।

"আপিস্‌ফেরতা সোজা বাড়ি আসবে ভেবেছিলুম।" বৌয়ের গলায় গুমোট। —"জরুরি কোনও কাজে আটকা পড়ে আসতে দেরি হল বুঝি?'

"আটকা পড়েছিলাম তা সত্যি, তবে বিশেষ যে কোনও কাজে তা না—" তানা-নানায় সুর হয় বীরেনের— "অনেকদিন পরে হরিপদর সঙ্গে দেখা হল। হরিপদ আমার স্কুলের বন্ধু—তাই তার সঙ্গে গল্প করতে করতে—"

"বুঝেচি।" একটা ঝটকা এল নৈঋত কোণ থেকে।—"তোমার মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়। হরিপদ সেখানে জড়িত। আজ হরিপদ, কাল নিরাপদ, পরশু তারাপদ—

পদে পদেই ওরা রয়েছে! নাও গেলো এসে, গিলে কৃতার্থ করো।"

বীরেন বৌয়ের পিছু পিছু খাবারঘরে যায়। স্ত্রীর কাছে বীর কেউই নয়—বিশেষত খাবারঘরে। বড় বড় বক্তৃতা-বাজও ভাতের গ্রাস মুখে তুলে নীরবে অপর পক্ষের বাক্যবাণ হজম করে—করতে বাধ্য হয়। প্রলয়মূর্তি নটরাজও অন্নপূর্ণার কাছে এসে কিরূপ নম্র হয়ে পড়েন (একেবারে স্পীকটিনট!) তার দৃষ্টান্ত কে না দেখেছে?

থালাবাটির ঝনৎকার তুলে দেয় বীরেনের বৌ, "আচ্ছা, ফি দিনই কি এম্‌নি এক একটা আপদ—হয় ইস্কুলের নয় কলেজের নয়তো আপিসের—তোমার বাড়ি ফেরার পথের সামনে পড়ে হোঁচট খায়? আশ্চর্য!"

বীরেনও বিস্মিত হয়—বৌয়ের বলার ধরনে। তিলমাত্র জিনিসকে কি করে যে ও তালমাত্রায় এনে ফ্যালে যা সামলাতে বীরেন দিশে পায় না—তার কানে তালা লাগে—ভাবলে অবাক হতে হয়।

"প্রত্যেক দিন নয়।" প্রতিবাদচ্ছলে সে বলতে যায় : "কোনও কোনও দিন। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হলে কি করব? দেখতে পাইনি ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে আসব? তুমি তাই বলো?"

বীরেনের বৌ কিছু বলে না, ভাতের থালা ধরে দেয়। বীরেনকে হাতমুখের ব্যাপারে বিব্রত করে। তারপরে বলে—"মনে করো আমিও যদি প্রত্যেকদিন এমনি বেরিয়ে যেতুম আর ফিরতুম অনেক রাত করে? আমারও কি বন্ধু-বান্ধব নেই? তুমি তাহলে কী বলতে আমায় শুনি?"

বীরেন গ্রাসটা কোঁৎ করে গিলে এক ঢোক জল খেয়ে নেয়—"কিচ্ছু না। যাওনা কেন বেড়াতে? আমি তো তাই বলি। চুপচাপ বাড়িতে এমনি মনমরা হয়ে বসে না থেকে সই-টইদের বাড়ি গেলে কি সিনেমা দেখে এলে—মন্দ কি?"

"যাবার মতো কোনও চুলো আছে নাকি আমার? থাকলে আর একথা তুমি আমায় বলতে না।" ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির আমেজ দেখা দেয় এবার।

বীরেন অস্থির হয়ে ওঠে—"ওই তো! মেয়েদের ধরনই ওই! একটুতেই কান্না!" বীরেন বৌয়ের বায়না সইতে পারে, রান্না সইতেও রাজি, কিন্তু কান্না ওর অসহ্য। গর্জনে সে কাহিল নয়, কিন্তু বর্ষণে কাতর।

বীরেনের বৌ উদ্গত অশ্রু দমন করে অন্য ভূমিকা নেয় : "তাছাড়া যাব যে সিনেমায় তার সময় কই আমার? সেই সকাল থেকে এই এতটা রাত অব্দি তো তোমাদের দাস্যবৃত্তিই করছি! আমি সিনেমায় গেলে গুষ্ঠির পিণ্ডি কে রাঁধবে শুনি? ছেলেমেয়েদের ইজের ফ্রক—এ সবই বা সেলাই করবে কে? তারপর ঘর-দোর ঝাড়ামোছা—"

"আমি বলি কি, এর কিছু কিছু বাদ দিলে বোধহয় ভালো হয়। বড্ড যেন বেশি বেশি করা হচ্ছে।"

তাই নাকি?" বীরেন বাধা দিয়ে জানায় : "এই যেমন ধরো, ঘর-দোর ঝাড়ামোছার কাজ! এটার যেন একটু বাড়াবাড়ি করা হয় আমার ধারণা। এই সেদিন আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম হয়তো তুমি দেখতে পাওনি, তুমি ঝুলঝাড়া ঝাড়নটা দিয়ে মায় দরজা আমার আগাপাশতলা ঝেড়ে দিলে! তাতে আপাদমস্তকে আমার অনেক আবর্জনা সাফ হয়ে গেল তা সত্যি, কিন্তু মানুষ পরিষ্কার করার রীতি বোধহয় ও নয়।"

বৌকে এবার নিরুত্তর হতে হয়—তার বধূ-জীবনে বোধহয় এই প্রথম এবং জীবনের

এই প্রথম সুযোগে বীরেনও আরও কিছু বলে নেয়—"তাছাড়া সেলায়ের কাজ বলছ, তার জন্য বাজারের দরজি আছে—তাদের অন্ন মারা কেন? আর পিণ্ডি রাঁধার কথা যা বললে, কথাটা নেহাত মিথ্যে বলোনি। আমার মনে হয় ঠিকে ঝিকে আরও গোটা কয়েক টাকা বেশি দিলে সে রেঁধে দিয়ে যাবে এবং এর চেয়ে বেশি খারাপ সে রাঁধতে পারবে বলে আমি আশা করি নে।"

"তা তো বলবেই। তা তো বলবেই তুমি।" বৌয়ের চোখের বিদ্যুৎ এবার বর্ষা হয়ে নামল। "আমি যা করি সব খারাপ, সমস্ত অকাজ! আমার রান্না মুখে তোলা যায় না। আমি কিছু না করলেই তোমার ভালো হয়। ঘরদোর গোল্লায় যাক, কী হবে ঝেড়ে মুছে, বেশ, তবে আর আমি কিচ্ছুটি করব না।" ঝমাঝম বর্ষা!

বর্ষাবিদ্ধ হয়ে বীরেনকে এবার চুপ করতে হয়। রোরুদ্যমানাকে কে রুখবে? বৌ বলেই চলে—"কেন যে তুমি আর সবার স্বামীর মতো নও আমি তাই ভাবি! আর সব স্বামীরা নিজের ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখলে খুশি হয়, বাড়িতে থাকতে ভালোবাসে, নিজের বৌ ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প করতে চায়, মিশতে চায়—তুমি তাদের মতো নও। পাশের বাড়ির নিবারণবাবুকে দ্যাখো তো? কেমন চমৎকার লোক! সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরবেন, কেবল আপিসটুকুই যা বাইরে. নইলে বাড়িতেই সারাক্ষণ। আর কিরকম বৌয়ের বাধ্য!—সর্বদা কাছে কাছে রয়েছেন। নিবারণবাবুর মত হতে কেন যে তুমি পারো না, কোথায় যে তোমার আটকায়—।'

বীরেনের গলায় আটকাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি জল খেয়ে বাধাকে তলায় পাঠিয়ে, অন্নগ্রাসমুক্ত হয়ে চট করে সে উঠে পড়ল। নিবারণবাবুর প্রসঙ্গ ওঠার প্রায় সময় হয়েছে সে টের পেয়েছিল, সে-ঢেউ একবার উঠলে শ্রীমতীকে নিবারণ করা অসম্ভব সে জানত। কথার চেয়ে দৃষ্টান্ত তীক্ষ্ণ। কথার খোঁচা তবু সওয়া যায়, কিন্তু দৃষ্টান্তের খোঁচা অসহ্য। তার সূচিমুখ থেকে বাঁচতে হলে কান হাতে করে দৃষ্টির বাইরে যেতে হয়। বীরেন হাত-মুখ ধুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দার দিকে পালিয়ে গেল। যতক্ষণ না বৌ ঠাণ্ডা হয়, সে না হয় এই ঠাণ্ডাতেই কাটাবে।

খোলা বারান্দাটার ওধারেই নিবারণদের বাড়ি। একেবারে কোণঘেঁষা—কানঘেঁষা! বারান্দার গায়ে হেলান দিয়ে যে একটুকরো আকাশের দেখা মেলে সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল বীরেন। তারাদের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সে—মেয়েদের মন পাওয়া দায়। তার বৌয়ের কথাই ধরা যাক না! অতি তুচ্ছ কারণে, এমন অকারণে সে উত্তাল হয়ে ওঠে যে ভাবতেই পারা যায় না। হয়তো সব দোষটাই বৌয়ের নয়, তার নিজেরও কিছু আছে। বাস্তবিক, ভেবে দেখলে দিনের পর দিন একঘেয়ে খালি ঘরকন্না চালিয়ে কতটা আমোদ পেতে পারে মানুষ? মেয়ে হলেও মানুষ তো! পুরুষের তবু একটা পা বাড়ির বাইরে থাকে, এই একঘেয়েমির অরণ্য থেকে তবু তার বেরুবার পথ আছে, সারাদিনের কোনও না কোনও সময়ে সে মুক্তির স্বাদ পায়। একবারও অন্তত ঘরোয়া বানপ্রস্থ থেকে বেরিয়ে বাইরের জনারণ্যে সে নিজেকে হারাতে পারে। প্রতিদিনই সিনেমা, রেস্তোরাঁ, প্রিয়সঙ্গ—অতটা না হোক তবু রাস্তায় বেরুলে অনেক নতুন মুখ চোখে পড়ে তো। নতুন মুখ আর অচেনা মুখ যত। সব মুখই কিছু অসুন্দর নয়। ফিরে দেখবার মতও কেউ কেউ থাকেই বইকি তার মধ্যে—ফিরে দেখা আর নাও যদি হয়। শুধুই মুখ দেখা—থাকা দেখায় নাই বা থাকলো, তাই কি কম?

তার বৌও তো ইচ্ছে করলে বেরুতে পারে! এধার-ওধার ঘুরেটুরে আসতে পারে এক-আধটু। তার দিকে তো কোনোই বাধা নেই। লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে পড়তে পারে, কত নাচগানের জলসা হয়, সিনেমায় কত ভালো ভালো ছবি আসে—গিয়ে দেখতে পারে তো! একলাই বা কাউকে সঙ্গে নিয়ে—কে আপত্তি করছে? তা না, কেবল সেলাই আর সেলাই! কে বলেছে তাকে এত এত সেলাই করতে আর দিনরাত কেবল ঘরদোরের ঝুল ঝাড়তে— শুনি?

অবশ্যি, তার বৌ যে আরও অনেক বৌয়ের মত নয় এজন্যে সে মনে মনে খুশিই। তার বৌ যে ঘরকন্না নিয়ে জড়িয়ে থাকে সুখী থাকে সেটা একপক্ষে ভালোই। কোনও কোনও মেয়ে যেমন প্রজাপতির মত খালি উড়ছেই, দিন রাতই কেবল ফূর্তি—স্বামীর দিকেও নজর নেই, গেরস্থালির দিকেও না, কেবল তাঁর কষ্টার্জিত টাকা উড়িয়েই খালাস —তার বৌ তেমন নয়। হ্যাঁ, এর জন্য তার বৌকে ধন্য বলতে হয়—বীরেন নিজের মনে মনে বলে। সে নিজেও কম ধন্য নয় একথাও সে মানতে বাধ্য হয়।

এতদূর ভেবে এতক্ষণে বীরেনের বিবেক টন টন করতে থাকে। দূরের তারকালোকের দিকে তাকিয়ে একটু আগেই নিজের গৃহকে সে তাড়নালোক জ্ঞান করেছে, কিন্তু এখন দেখল, না তা নয়, অতটা নয়। দূরবীন না লাগিয়েও অদূরে যাকে দেখা যায় সে নিছক তাড়কারাক্ষুসী না, বরং ধ্রুবতারার সগোত্রীয়াই তাকে হয়তো বলা চলে।

না, এরপর থেকে সে বৌয়ের কথামতই চলবে। আর তার অবাধ্য হবে না। আপিসের ফেরৎ সোজা বাড়ি এসে তার সান্ধ্যকৃত্য! তারপর আর বাড়ির বার নয়। বৌয়ের রূপসুধা, কথামৃত, শ্রীহস্তলাঞ্ছিত খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির পানাহারশেষে লক্ষ্মীছেলের মত শুতে যাওয়া, তারপরে ঘুম থেকে উঠে বাজার সেরে নিয়ে খেয়েই ফের আপিস! এবার থেকে এই হল তার নিত্যক্রিয়া। এবং নৃত্যক্রীড়া।

বৌয়ের খাতিরে বন্ধুবান্ধব সব বর্জন করবে। রাস্তায় তাদের কারও সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই পাওনাদারের মত না দেখার ভান দেখাবে, তাতেও যদি তারা না মানে, ঘাড়ে পড়ে জমাতে আসে, সে চোখ তুলে না চেয়ে ব্রীড়াবনত মুখে সরে পড়ার চেষ্টা করবে। যদি তবু কেউ তাড়া করে—তাকে উপদেশ দেবে, যাও নিজের বৌয়ের কাছে যাও। আমাকে বখিয়ো না।...সত্যি, বৌয়ের চেয়ে আপনার তার কে আছে? কার কে আছে?

এইরূপ সমাধানে পৌঁছে, অনুতাপ-বিদগ্ধ বীরেন বৌয়ের কাছে মার্জনা-ভিক্ষা করে আরও মার্জিত হবার আশায় যখন বারান্দা ত্যাগ করতে যাচ্ছে সেই সময়ে অপ্রত্যাশিতরূপে আরেক সমস্যা দেখা দিল! আরেক দাম্পত্য সমস্যা।

পাশের নিবারণবাবুর ঘর থেকে শ্রীমতী নিবারণীর কলকণ্ঠ কানে এল। তিনিও স্বামীকে শায়েস্তা করতে লেগেছেন।

"বলিহারি যাই তোমায় (বলছিলেন নিবারণের বৌ) কি করে যে দিনের পর দিন এমনি করে বাড়ি কামড়ে পড়ে থাকতে পারো তাই আমি অবাক হয়ে ভাবি! এমন ঘরকুনো মানুষ আমি জন্মে দেখিনি! কেন, সন্ধ্যের পরে একটু বেড়ালে, হাওয়া খেতে বেরুলে কী হয়? বন্ধুবান্ধব পাঁচজনের সঙ্গে মিশলে, আড্ডা দিলে, এখানে-ওখানে গল্পগুজব করলে খানিক—তাও কি তোমার ভালো লাগে না? কেবল আপিস আর ঘর, ঘর আর আপিস! আপিস থেকে ফিরে নির্জীব হয়ে শুয়ে পড়লে! এমন করলে বাতে ধরবে যে!—"

"কেয়াবাৎ!" বারান্দার অন্ধকারের মধ্যে বীরেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। —"বেচারা নিবারণেরও দেখছি সেই দশা। তারও স্বস্তি নেই। যদিও তার অপরাধ আমার ঠিক উলটো বলেই যেন বোধ হচ্ছে।"

নিবারণ কী সদুত্তর দেয় জানবার জন্য পরের কথায় আড়ি পাতা অন্যায়—এবং আড়ি পাততে গিয়ে অধঃপতন লাভ আরও অন্যায়—তা জেনেও, বারান্দা থেকে অনেকখানি সে ঝুঁকল। কিন্তু এত ঝুঁকি নিয়েও কোনও লাভ হল না। প্রত্যুত্তরে নিবারণ আমতা আমতা করে কী যে বলল কিচ্ছু বোঝা গেল না।

সঙ্গে সঙ্গে ওর বৌয়ের গর্জন তেড়ে এল। —"বৌয়ের এত আঁচল ধরা হওয়া কি ভালো? এরকম ন্যাওটা মানুষ মোটেই আমি ভালোবাসিনে। আমার দু-চক্ষের বিষ! সারাটা সন্ধে বাড়িতে বসে থেকে আমার প্রত্যেক কাজে বাগড়া না দিয়ে একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে এলে কি হয় না? তাতে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। একটু পুরুষ মানুষের মত না হয় হলেই! পাশের বাড়ির বীরেনবাবুকে দ্যাখো দিকি। ওরকম কি তুমি হতে পারো না? না কি, ওরকম না হবার জন্যে কেউ তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে পায়ে ধরে সেধেছে?..."

এই পর্যন্ত শুনেই বীরেনের মাথা ঘুরতে লাগল। বারান্দা থেকে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ফিরল সে, কিন্তু বৌয়ের কাছে মার্জনালাভের সঙ্কল্প নিয়ে নয়। সে সাধু ইচ্ছা তার উড়ে গেছে তখন। কী লাভ? মেয়েদের রহস্য তার সামান্য বুদ্ধির বাইরে। তবে এটুকু সে বুঝেচে যে, মেয়েদের কাছে মার্জনা নেই; কখনই না, কোনও ক্ষেত্রেই নয়। আছে সম্মার্জনা, সর্বদা এবং সর্বত্র; এবং এই বোঝাই তার যথেষ্ট। সেই বোঝা আরও বাড়িয়ে আর কী লাভ হবে তার?





ঘনাদা হাই তুললেন।

ঘনদার হাই তোলা একটা অনুষ্ঠান বিশেষ। গরাদের ফাঁক থেকে পুঁচকে দু'পেয়ে জানোয়ারগুলোর বে-আদবি দেখে দেখে সিংহমশাই-এর যখন দিক ধরে যায়, তখন তার আলস্য-ভাঙা দেখবার সৌভাগ্য যদি কারুর হয়ে থাকে তাহলে সে ঘনাদার হাইতোলার কিঞ্চিৎ মর্ম বুঝতে পারবে।—তেমনি বিরাট মুখব্যাদান, তেমনি দণ্ডরুচি-কৌমুদির শোভা ও তেমনি তিন বৎসর তৈলবিহীন গরুর গাড়ির চাকার আওয়াজের মত সুদীর্ঘ একটানা একটি সুরলহরী। সিংহমশাই তবু ঘনাদার মত তুড়ি দিতে পারে না।

ঘনাদার হাইতোলা দেখে আমরা সত্যি তাজ্জব হয়ে গেলাম। তাজ্জব হলাম তাঁর হাই-তোলার দৃশ্যে নয়, তিনি যে হাই তুললেন কি করে শুধু এই কথা ভেবে।

রাম, শিবু ও আমি পরস্পরে হতাশ ভাবে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলাম। হায়, হায়!—সন্ধ্যার সমস্ত আয়োজনটাই মাটি!

সকাল থেকে অবিশ্রান্তভাবে বৃষ্টি পড়ছে। করপোরেশনের কর্তব্যপরায়ণতার দৌলতে সে বৃষ্টির জলের সাধ্য কি যে সহজে রাস্তা থেকে বেরোয়। ট্রাম বাস বন্ধ। কলকাতা প্রায় ভেনিস্ হয়ে উঠেছে বললেই হয়। এহেন সন্ধ্যাটা মেসে বসে জমাবার জন্যে সন্ধ্যা থেকে ঘনাদাকে উস্কে দেবার কি চেষ্টাটাই না করা হয়েছে!

কিন্তু এ বাদলায় ঘনাদাও যেন বাসি মুড়ির মত মিইয়ে গেছেন।

যে-ঘনাদার কাছে তিল ফেলতে না ফেলতে তাল হয়ে ওঠে, জলের ছিটে পড়তে না পড়তে যিনি প্রলয়প্লাবনে আমাদের ভাসিয়ে দেন, সেই ঘনাদাকে আজ সন্ধ্যা থেকে একটু তাতিয়ে তুলতে পর্যন্ত পারা গেল না।

অথচ কোন অনুপানই বাদ পড়েনি।

ঘনাদাকে ধার দিতে দিতে শিশিরের সিগারেট কেস প্রায় খালি হয়ে এসেছে, শিবু ও রাম সেই যে নতুন মার্কিন 'সিগারেট লাইটার'টা তাঁর হাতে দিয়েছে, তা প্রায় বাজেয়াপ্ত হবার সামিল জেনেও এখনও পর্যন্ত একবার ফেরত চায়নি। মেসের ম্যানেজার আমাদের শাসনে ভুলেও একবার ছমাসের বাকি পাওনার কথা তোলেনি এবং আমরা সবাই টমটম চালান থেকে অ্যাটম বোমা পর্যন্ত হেন প্রসঙ্গ নেই যা ঘনাদার সামনে টোপ গিলতে তুলে ধরিনি।

কিন্তু আরাম-কেদারায়-কমন রুমের একমাত্র আরাম-কেদারায় সেই যে ঘনাদা গা এলিয়ে দিয়েছেন, তারপর তাঁকে একটু সোজা করে বসাতেও পারিনি।

মাছ ধরার প্রসঙ্গ দিয়ে শিবু অনুষ্ঠান শুরু করেছে। রাম তাতে ফোড়ন দিয়ে বলেছে, বর্ষার দিনে মাছ নাকি টোপ খায় ভাল।

কিন্তু মাছে টোপ খাক বা না খাক আমাদের টোপ বৃথাই নষ্ট হয়েছে। এমন কি কত বড় এক মহাশের একবার তার ছিপে উঠেছিল, গৌরাঙ্গ সগর্বে তা দুহাত ছড়িয়ে দেখিয়ে দেবার পরও ঘনাদার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি।

মহাশের থেকে ঘনাদা একেবারে দক্ষিণ মেরু সাগরে মহাতিমি শিকারের কথা তুলবেন এই আশাই আমরা করেছিলাম, কিন্তু তার বদলে তিনি ক্লান্তভাবে শুধু একটু সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়েছেন।

মাছ থেকে আমরা পাহাড়ে ওঠার কথা হাতের কাছে এমন একটা হিমালয় থাকা সত্ত্বেও বাঙালীর ছেলেদের কেন যে পাহাড়ে চড়ার এতটুকু উৎসাহ ও যোগ্যতা নেই তা নিয়ে গৌরাঙ্গ দুঃখ প্রকাশ করেছে।

আমরা আড় চোখে চেয়ে দেখেছি ঘনাদা আরাম-কেদারার হাতলের ওপর একটা পা তুলে দিয়ে আর একটু আয়েশ করে শুয়েছেন।

পাহাড়ে চড়া থেকে বন্দুক ছোঁড়া ও তা থেকে আবার ঘোড়ায় চড়ায় আমরা ঘুরে গেছি।

ঘনাদা সিগারেটে সুখ-টান দিয়ে চোখ দুটি মুদ্রিত করেছেন।

হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা ওয়েট লিফ্‌টিং অর্থাৎ ওজন তোলার কথা পেড়েছি। বিজ্ঞানের নজির তুলে শিবু বলেছে—পোকামাকড়েরা যখন নিজেদের চেয়ে বহুগুণ ওজনের জিনিস তুলতে পারে, তখন মানুষেই বা পারবে না কেন?

প্রশ্নটা মাঠেই মারা গেছে।

ঘনাদা হাই তুলেছেন এবং আমরা এবার আশা ছেড়ে দিয়েছি।

মরিয়া হয়েই রাম বোধহয় শেষ চেষ্টা করেছে। কলা-কৌশল সব জলাঞ্জলি দিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছে—"আচ্ছা ঘনাদা, আপনি কখনও ওয়েট-লিফ্‌টিং করেন নি?"

"ওয়েট-লিফ্‌টিং?"—ঘনাদা নেহাত আলস্য ভরে বলেছেন—"না। ওয়েট-লিফ্‌টিং করিনি। তবে একবার একটা পাথর তুলেছিলাম।"

আমরা একেবারে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে বসেছি। গৌরাঙ্গ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করেছে, "পাথর তুলেছেন। কত বড় ঘনাদা?"

আমাদের একেবারে দমিয়ে ধরাশায়ী করে ঘনাদা বলেছেন, "কত বড় আর। এই

এতটুকু নুড়ি—ছটাক খানেক ওজন হবে।"

আমাদের হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস শেষ হবার আগে ঘনাদা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে আবার বলেছেন. "মিকিউ দ্বীপটা তাতেই ত ফেটে চৌচির হয়ে গেল।"

"একটা দ্বীপ ফেটে চৌচির হয়ে গেল। শুধু একটা নুড়ি তোলার জন্যে?"—নিজেদের অজান্তে আমরা প্রশ্ন করে ফেলেছি।

ঘনাদা যেন অবজ্ঞাভরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেছেন,—"হ্যাঁ, তাইতেই ফেটে চৌচির হয়ে সমুদ্রে ডুবে গেল।"

না, আর ঘনাদাকে উস্কানি দেবার দরকার হয়নি।

তিনি নিজেই এবার শুরু করেছেন।

"নিউ হেব্রাইডিজ-এর নাম শুনেছিস্ কখনও? আর শুনে থাকলেও আসলে কি বস্তু বোধ হয় জানিস না। নিউ হেব্রাইডিজ হ'ল নিউজিল্যান্ডের ঠিক উত্তরে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব কোণে কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপের জটলা।

পৃথিবীর মাইল পঞ্চাশ ওপর থেকে দেখলে মনে হবে যেন সমুদ্রের ওপর কটা পাথরকুচি ফাঁক ফাঁক করে সাজিয়ে ইংরেজি 'ওয়াই' অক্ষরটা লেখা।

এই 'ওয়াই'-এর তিনটে হাতা যেখানে এসে মিলেছে সেখানকার 'এফাটা' দ্বীপটাই হ'ল সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী।

এফাটায় দুটো বন্দর,—ভিলা আর হাভানা। ভিলা বন্দরেই সরকারী আস্তানা।

চন্দন কাঠের ব্যবসার জন্যে তখন নিউ হেব্রাইডিজের একেবারে দক্ষিণে 'আনিওয়া' নামে একটি দ্বীপে থাকি। সেখান থেকে সরকারী লাইসেন্স নেবার জন্যে ভিলা বন্দরে কদিনের জন্যে এসেছি।

সরকারী দপ্তরখানা সব দেশেই সমান। আঠারো মাসে তাদের বছর। নিউ হেব্রাইডিজে আবার এ বিষয়ে গোদের ওপর বিষ ফোড়া আছে। একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব সেখানে দোসর। নিউ হেব্রাইডিজের রাজধানী এক কিন্তু কিন্তু রাজত্ব দুজনের। ইংরেজ আর ফরাসী সঙ্গে মিলে সেখানে শাসন করে। সুতরাং সাত দিনের কাজ সাত সপ্তাতেও সারা হল না। ইংরিজি থেকে ফরাসী আর ফরাসী থেকে ইংরেজিতে তর্জমা হ'তে হ'তে আমার লাইসেন্সের আর্জি, কোন্ লালাফিতের জালে যে জড়িয়ে পড়েছে তার হদিসই তখন পাচ্ছি না। ঠিক এই সময় মঁসিয়ে পেত্রার সঙ্গে আমার হঠাৎ আলাপ হয়। আলাপ হ'ল আশ্চর্য ভাবে। রাজধানী ও বন্দর হ'লে কি হয়, ভিলাতে ভালো একটা হোটেল নেই। মালানা নামে একটি দেশী লোকের টিনের চাল দেওয়া একটা মেটে দোতলার ওপরকার একখানা ঘর ভাড়া করে আছি। সেদিন সরকারী দপ্তরখানা থেকে যত অকর্মণ্য কর্মচারীদের সঙ্গে কচসা করে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরছি, এমন সময় ওপরে আমারই ঘরে তুমুল আন্দোলন হচ্ছে বলে মনে হ'ল।

নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে অত্যন্ত অবাক হয়ে ওপরে উঠে গেলাম। ঘরের দরজায় যাবার সময় আমি তালা দিয়ে গেছি নিজের হাতে। সে ঘরে গণ্ডগোল হয় কি করে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে মাঝখানের বারান্দাটুকু পার হবার আগেই মালানার সঙ্গে দেখা। আমার ঘর থেকে সে উত্তেজিত ভাবে বেরিয়ে আসছে। আমায় দেখতে পেয়েই সে হাত পা নেড়ে জানালে যে এখুনি আমাদের পুলিসে যাওয়া দরকার।

পুলিসে যাওয়া দরকার—কেন?

আর কেন? কোথাকার এক ফরাসী গুণ্ডা এসে আপনার ঘর দখল করেছে। আমি কত ঠেকাবার চেষ্টা করলাম, তা শুনলই না। জোর করে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকল। এখুনি আমি থানায় যাচ্ছি।

হেসে বললাম—তার আগে লোকটার চেহারা একবার দেখা দরকার নয় কি।

মালানা সভয়ে বললে,—দেখবেন কি মশাই। সে একেবারে খুনে গুণ্ডা। কি করে বসবে ঠিক নেই।

হেসে বললাম,—আমি কি করব যখন ঠিক আছে তখন ভাবনা কি?

মালানা কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে একটু হতভম্ব হয়ে ভয়ে ভয়ে আমার পিছু পিছু এল।

ঘরে ঢুকেই দেখি আমার জিনিসপত্র চারিদিকে ছত্রাকারে ছড়ান। তারই মধ্যে আমার ডেক-চেয়ারটিতে গা এলিয়ে দিয়ে বিশাল চেহারার একটি লোক নিশ্চিত আরামে পাইপ টানছে। পরনে একটা প্যান্ট ছাড়া আর কিছু নেই। গরমের দরুনই বোধ হয় গায়ের জামা জোড়া সব খুলে ফেলেছে। লোকটার গায়ের চামড়া সাদা এবং গোঁফ-দাড়ির ছাট দেখলে ফরাসী বলেই মনে হয়।

আমায় ঢুকতে দেখেই লোকটা ডেক-চেয়ারে উঠে বসে বাঘের মত ফরাসী ভাষায় হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'কে রে হতভাগা নিগার।'

মালানা ত সেই হুঙ্কার শুনেই তীরের মত ছিটকে গিয়ে পড়ল বারান্দায়। তারপর আর তার চুলের টিকি দেখা গেল না।

মুচকি একটু হেসে আমি একবারে পরিষ্কার বাংলায় বললাম, চিনতে পারছ না সাহেব। আমি তোমার যম।

দুর্বোধ্য ভাষা শুনে আর আমায় হাসতে দেখে সাহেব একেবারে ক্ষেপে গেল। আমায় প্রায় কাঁচা-ই গিলে ফেলবে এমনিভাবে দাঁত কড় মড় করে দাঁড়িয়ে উঠে এবার ইংরিজিতে বললে,—বেরিয়ে যা শীগগির কালা নেটিভ। নইলে তোর গায়ের সমস্ত চামড়া আমি খুলে নেব।

আগের মতই হেসে বললাম—বল কি সাহেব, আমার যে শুনেই গা সুড়সুড় করছে, কিন্তু তার আগে তোমায় যে একটু গা তুলতে হবে, এটা আমারই ঘর কিনা।

আমার মুখে চোস্ত জার্মান শুনে সাহেব প্রথমটা একেবারে থ' হয়ে গেল। যাই হোক সাহেব একেবারে মুখ্‌খু নয়, জার্মান ভাষাটা অন্তত বোঝে জেনে আমার একটু কৌতূহলও তখন বেড়েছে।

প্রথমে হতভম্ব হলেও পরমুহূর্তেই আমার কথার বিষটুকুর জ্বালাতে সাহেব একবারে ফেটে পড়ল—এ ঘর তোমার? প্রমাণ কি তার?

আবার একটু হেসে আমার জিনিসপত্রগুলো দেখিয়ে নিয়ে বললাম,—প্রমাণ ত তুমিই ঘরময় ছড়িয়ে রেখেছ।

বটে!—বলে সাহেব হঠাৎ আমার সুটকেসটা ধরে বাহিরের বারান্দায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—যাও। তোমার প্রমাণ ঘরের বার হয়ে গেছে। আর সুবুদ্ধি যদি এখানও না হয় তা হলে একটি লাথিতে তোমাকেও ওই প্রমাণের পিছু পিছু পাঠিয়ে দেব।

ঘরের মাঝখানেই সাহেবের প্রকাণ্ড কেবিন ট্রাঙ্কটা পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে বললাম—সেটা একটু অভদ্রতা হয় না কি? তার চেয়ে বরং তুমিই পথ দেখো সাহেব,

আমি তোমার মোট বইবার সমস্যাটা মিটিয়ে দিচ্ছি।

ট্র্যাঙ্কটা ছুঁড়ে বারান্দা পার করে নিচে ফেলে দিলাম।

সাহেব এক লহমা হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে একেবারে তোপের গোলার মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জামাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে চেয়ে দেখি জানালার কাছে সচাপ্টে যেমন ভাবে পড়েছিল সাহেব সেইভাবেই শুয়ে আছে। নট্ নড়ন চড়ন নট্ কিচ্ছু।

ঘরের কুঁজো থেকে তার মুখে জল ছিটিয়ে দিয়ে নিজেই এবার গিয়ে তুলে ধরলাম।

সাহেব হাঁকিয়ে উঠে বসে চোখ না খুলেই চেঁচিয়ে উঠল—আমি মরে গেছি, নির্ঘাত মরে গেছি।

তাই একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললাম হ্যাঁ, মরে তুমি নরকে এসেছ। যমরাজ তোমায় অভ্যর্থনা করতে এসেছেন চেয়ে দেখো।

সাহেব এবার চোখ খুলে তাকিয়ে বললে,—অ্যাঁ—মরিনি তাহলে। কিন্তু আমার শিরদাঁড়া ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে।

বললাম—না, তাও হয়নি। উঠে দাঁড়াও দেখি।

সাহেব কিন্তু বসে বসে আমায় ভাল করে লক্ষ্য করে বললে,—তুমি কি জাপানী?

তাবপর নিজেই আবার বললে,—উঁহুঁ, জাপানীদের চেহারা ত এরকম হয় না।

হেসে বললাম, আমি জাপানী নই—বাঙালী। বাংলাদেশের নাম শুনেছ কখনও?

বাংলাদেশ!—সাহেবের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল—বাংলাদেশের নাম শুনিনি আবার? তাগোরের সঙ্গে আমার এত আলাপ ছিল।

তাগোরের সঙ্গে! তাগোর আবার কে?

বাঃ—বাবীন্দ্রা নাত্ তাগোর।

বুঝলাম কবিগুরুর নাম ফরাসী উচ্চারণে এই রকম দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম—তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল? কোথায় আলাপ হয়েছিল?

একটু যেন ভড়কে গিয়ে সে বললে—আলাপ মানে দেখাশোনা আর কি! পারিতে দেখাশোনা হয়েছিল।

বেশ একটু কড়াভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—কি সূত্রে?

সাহেব আরো আমতা আমতা করে বললে—মানে তিনি যখন ওখানে ছিলেন তখন কাগজে তাঁর ফটো দেখেছিলাম।

ধমক দিয়ে এবার বললাম,—সাহেব, আমার কাছে ওসব ধাপ্পা দিয়ে কোন লাভ হবে না। তোমায় পাততাড়ি গুটিয়ে এঘর থেকে সরে পড়তেই হবে। নাও ওঠ।

সাহেব এবার রীতিমত কাঁদুনি গেয়ে উঠল—উঠব ত। কিন্তু যাবো কোন চুলোয় শুনি? পোড়া শহরে কি একটা হোটেল আছে? সারাদিন ঘুরে একটা ঘরের বারান্দা পর্যন্ত ভাড়া পাইনি। আমি কি রাস্তায় গিয়ে শোব?

এবার হেসে ফেলে বললাম,—আচ্ছা, আমার এখানে থাকতে পারো, কিন্তু বেচাল যেন না দেখি।

সাহেব নিজের গর্দানটায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে,—না, আমার গর্দানটা বীমা করা নেই।

মালপত্র নিচ থেকে তুলে এনে তারপর আমরা বেশ জমিয়ে বসে আলাপ শুরু

করলাম। মঁসিয়ে পেত্রা আমারই মত ভবঘুরে লোক। ঝগড়া দিয়ে শুরু হওয়ায় এবং দুজনেই এক ধাতের লোক হওয়ায়, 'দোস্তি'-টা আমাদের খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। আমি ইতিমধ্যে আমার চন্দন কাঠের ব্যবসার কথা বলেছি। মঁসিয়ে পেত্রা মাথা নেড়ে বলেছে,—ওসব চন্দন কাঠ-টাট্ কোন কাজের নয়, এ দ্বীপপুঞ্জের আসল মাল হ'ল গন্ধক। দেখো না এক বছরের মধ্যে এই গন্ধকের ব্যবসায় কি রকম লাল হয়ে যাই।

উদারভাবে পেত্রা তারপর আমাকে তার ব্যবসার ভাগীদার করতে রাজি হয়েছে।

আমি হেসে বলেছি—আগে তুমি গন্ধকের খনি খুঁজে বার কর, তারপর দেখা যাবে।

পেত্রা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছে—ওঃ তুমি আমায় অবিশ্বাস করছ—পাগল ভাবছ আমায়! আচ্ছা দেখতে পাবে একদিন।

পেত্রার আস্ফালন যে একেবারে মিথ্যে নয় একদিন সত্যিই তার প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু সে প্রায় বছর ছয়েক বাদে। এই ছ বছর তার কোন খোঁজই রাখিনি বা পাইনি ইভেটা দ্বীপে মালানার বাড়িরে আমার ঘরে দুদিন থাকার পর হঠাৎ একদিন সকাল বেলা কিছু না বলে কয়ে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল। একটু অবাক্ হ'লেও তার সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামাইনি। এ রকম খামখেয়ালী লোক দুনিয়ায় এ পর্যন্ত অনেক দেখেছি। বিকেলে কি করবে সকালে তারা নিজেরাই জানে না।

ছ বছর বাদে আবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ! এবার খুব অদ্ভুত ভাবে।

আনিওয়া দ্বীপে ফিরে এসে চন্দন কাঠের পেছনে তখনও লেগে আছি। কিন্তু ব্যবসা অত্যন্ত মন্দা। ফিজি দ্বীপের চন্দন কাঠ উজাড় কববার পর বেহিসাবী সদাগরেরা এই দ্বীপে হানা দিয়ে অবাধে যথেচ্ছভাবে চন্দন গাছ কেটে একেবারে সাবাড় করে দিয়েছে বললেই হয়।

ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে আবার কোথাও পাড়ি দেব কিনা ভাবছি এমন সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপারে কৌতূহলী হলে উঠলাম। আনিওলা দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সমুদ্রেব ধারের একটি ছোট গাঁয়ের লোকদের ভেতর একটা চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা লক্ষ্য করছিলাম। সেদিন তার কারণটা জেনে অবাক্ হয়ে গেলাম।

আমাদের গাঁ থেকে মাইল দশেক দূরে সমুদ্রের ওপর আর একটি ছোট দ্বীপ দেখা যায়। দ্বীপ না বলে তাকে সমুদ্রের ভেতর থেকে ওঠা একটা পাহাড় বলাই উচিত। যেদিকে যাও সমুদ্রের ওপর থেকে প্রায় খাড়া পাহাড়ের দেয়াল প্রায় দু'হাজার ফুট উঠে গেছে।

এ দ্বীপটাকে এ অঞ্চলের লোকে অপদেবতার বাসা বলেই জানে। জনমনিষ্যি সেখানে থাকে না। শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে সামুদ্রিক পাখি সন্ধ্যার পর সেই পাহাড়ের নিচের দিকের খাঁজে ও পাথুরে তাকে রাত্রি বাস করতে নামে। দুঃসাহসী দু'চার জন দেশী লোক তাদের ভারা ঝোলান 'কাটা মারান' নৌকোয় দিনের বেলা কখন সেখানে সেই পাখিদের আবর্জনা সার হিসেবে অত্যন্ত দামী 'গুয়ানো' সংগ্রহ করতে যায়। কিন্তু মরে গেলেও সেখানে রাত কাটায় না। এমন কি দিনের বেলাতেও পাহাড়ের ওপর কি আছে তারা কোনদিন সাহস করে চড়ে দেখেনি।

এই ভূতুড়ে পাহাড়ে কিছুদিন থেকে অপদেবতার উৎপাত নাকি আরো বেড়ে গেছে। 'গুয়ানো' কুড়োতে গিয়ে এক দলের জন ছয়েক নাকি আশ্চর্য ভাবে মারা পড়েছে। ওপর থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর ঠিক তাদের লক্ষ্য করেই কে গড়িয়ে দিয়েছিল। আরেক দল

পাহাড়ের ওপর বিকট এক মূর্তি দিনের বেলাতেই দেখতে পেয়েছে।

এসব ছাড়া রাত্রে আজকাল পাহাড়ের ওপর এই গাঁ থেকেই অদ্ভুত ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা যায়, মাঝে মাঝে রহস্যজনক শব্দও সেখান থেকে ভেসে আসে।

পাছে পাহাড়ের অপদেবতার কোপ এই গাঁ পর্যন্ত এসে পৌঁছায়, সেই ভয়েই গাঁয়ের লোক সারা। ভূতের ওঝারাও সময় বুঝে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে ব্যস্ত। অপদেবতাকে ঠাণ্ডা করবার কড়ার দিয়ে তারা ষোড়শোপচারে ভূত পুজোর আয়োজন করেছে।

সর্দারের কাছে ব্যাপারটা সব শুনে, আমি নিজেই পাহাড়ে দ্বীপে যাব ঠিক করলাম। সর্দারের নিষেধ মানা, উপরোধ অনুরোধ যদিবা কাটান গেল, দ্বীপে আমায় নৌকায় পৌঁছে দেয় এমন লোকই পেলাম না গাঁয়ে।

অবশেষে রেগে ছোট একটা ডিঙি নিয়ে নিজেই একদিন বিকেলে দ্বীপের উদ্দেশে রওনা হলাম। সঙ্গে একটা ধারাল ছুরি। আর কুয়ো থেকে যা ডুবে যাওয়া বালতি ঘড়া তোলে সেই রকম কাঁটার গোছা বাঁধা একটা লম্বা মজবুত দড়ি। রাত কাটাবার মত কিছু খাবার দাবারও সর্দার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল, যদিও রাত আমার সেখানে কাটবে কি না সে বিষয়ে তার ঘোরতর সন্দেহ।

আমার ডিঙি সমুদ্রে ঠেলে দেবার সময় সর্দার প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি। এতদিন এক সঙ্গে থাকার দরুন আমার ওর এই সরল অসভ্য মেলানেশিয়ের সত্যি একটা মায়া পড়েছিল। এমন সাধ করে বেঘোরে মরতে যাওয়ায় তাই সে সত্যিই ব্যথা পেয়েছে।

একলা ডিঙি বেয়ে ভূতুড়ে পাহাড়ের দিকে যেতে যেতে নিজেরও কাজটা একটু বেশিরকম গোঁয়ারতুমি বলে মনে হচ্ছিল। কোথায় কোন চুলোয় কি ভূতুড়ে কাণ্ড হচ্ছে, তাতে তোর মাথাব্যথা কেন বাপু! কিন্তু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাওয়াই যার স্বভাব তার উপায় কি।

ভূতুড়ে দ্বীপের ধারে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। সামুদ্রিক পাখিদের অধিকাংশই পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ডানা গুটিয়ে তখন নিজেদের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। দু চারটে দেরি করে ফেরা পাখির পাখার ঝটপটানি শুধু শোনা যাচ্ছে।

সুবিধেমত এক জায়গায় পাহাড়ের ধারে নৌকা বেঁধে ছুরিটা আর দড়ি বাঁধা কাঁটাটা নিয়ে তীরে উঠলাম। তীর মানে ত পাথর। সে পাথরের তীর গজ কুড়ি পরেই পাহাড়ের দেয়ালে শেষ হয়েছে। ছুরিটা কোমরে গুঁজে দড়িবাঁধা কাঁটাগুলো ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। একবার ফস্কাবার পর ওপরের একটা খাঁজে কাঁটা আটকে গেল। ঠিক মত আটকেছে কিনা দড়ি নেড়ে একবার দেখে নিয়ে তাই বেয়ে সেই খাঁজের ভেতর পা দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর আবার কাঁটা ছুঁড়ে ওপরের কোন খাঁজে লাগাবার কসরত।

এমনিভাবে প্রাণ হাতে করে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে যখন উঠলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। আমি পাহাড়ের পশ্চিম দিক দিয়ে উঠেছিলাম। সে দিকটা অন্ধকার হলেও ওপারে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী না পঞ্চমীর চাঁদের আলো পড়ে চারিদিক বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে।

সেই আলোয় সামনে যা দেখা গেল তাতে আমি সত্যি অবাক্! পাহাড়ের ওপরে ছোট একটি হ্রদ। নিচে থেকে এ জলাশয়টির কথা কল্পনাও করা যায় না। কেউ করেও নি এ পর্যন্ত। সমস্ত পাহাড়টা যেন পেয়ালার মত এই হ্রদটিকে ওপরে তুলে ধরেছে।

নিঃসঙ্গ পাহাড়ের চূড়ায় চাঁদের আলোয় ঝলমলে হ্রদটিকে কি সুন্দর যে দেখাচ্ছিল, কি বলব।

দড়ি বেয়ে ওঠার পরিশ্রমে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। হ্রদের ধারে একটা পাথরের চাঁই-এর পাশে বসে মুখ চোখে জল দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সমস্ত শরীর এক মুহূর্তের জন্য কেমন যেন হিম হয়ে গেল।

হ্রদের ঠিক ওপারে জলের ভেতর থেকে সত্যিই একটা বিকট মূর্তি ওপরে উঠে আসছে। মূর্তিটা মানুষের মত সোজা হয়ে হাঁটছে—কিন্তু মানুষের সঙ্গে আর কোন সাদৃশ্য তার নেই। কবন্ধের মত, বর্তুলাকার বীভৎস একটা ধড় যেন দুটো থামের ওপর দাঁড় করানো—তার হাঁটার ভঙ্গিতে এমন অমানুষিক যে আপনা থেকে সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে।

মূর্তিটা জল থেকে উঠে বিশ্রী টলমলে পায়ে দুলতে দুলতে ওপারের পাহাড়ের একটা অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

না,—এ রহস্যের মীমাংসা না করলে নয়। মন শক্ত করে যথাসম্ভব সাবধান হয়ে হ্রদের পাড় দিয়ে ওপারে দৌড়ে গেলাম।

সামনে সুড়ঙ্গের মত সেই গহ্বর। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ছুরিটা কোমর থেকে খুলে নিয়ে তার ভেতর গিয়ে ঢুকলাম। সুড়ঙ্গটা বেশি দীর্ঘ নয়, একটা বাঁক ফিরতেই দূরে একটা আলোকিত জায়গা দেখা গেল। এই কি তাহলে হ্রদের জলের সেই বিকট জীবের আস্তানা? আলো জ্বালবার ক্ষমতাও কি তার আছে?

সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। সুড়ঙ্গটা এখানে একটা মাঝারি গোছের গুহায় শেষ হয়েছে।

গুহার ভেতরে পৌঁছে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। সেখানে কেউ নেই কিন্তু ঘরের এক পাশে একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলছে, দেয়ালে পোশাক-আশাক টাঙান।

এই ভূতুড়ে দ্বীপে এই দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় মানুষ এল কোথা থেকে! জলের তলা থেকে ওঠা সেই অমানুষিক জীবটিই বা গেল কোথায়!

অবাক হয়ে দেয়ালের ধারের পোশাকগুলো লক্ষ্য করছি এমন সময় সমস্ত গুহা কাঁপিয়ে সশব্দে একটা বন্দুকের গুলি আমার কানের পাশ দিয়ে দেয়ালে গিয়ে লাগল।

বিদ্যুৎগতিতে ঘুড়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ছুরিও হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে ওধারের দেয়ালে বিঁধে গিয়ে কাঁপতে লাগল। যে বন্দুক ছুঁড়েছিল তার ডান হাতের জামার আস্তিন সেই ছুরিতে দেয়ালের সঙ্গে আঁট হয়ে গেছে। হাত নাড়াবার তার ক্ষমতা নেই।

লোকটার ওপর এবার ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে বললাম—একি, মঁসিয়ে পেত্রা!

মঁসিয়ে পেত্রা করুণভাবে একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ, আপাতত তোমার বন্দী।

অর্ধেক রাত তারপর আমাদের পরস্পরের খোঁজখবর নিতেই কেটে গেল। কি করে বন্দরের খোঁজে নানা জায়গা ঘুরে মঁসিয়ে পেত্রা শেষে এই দ্বীপে উঠেছে, সব কাহিনী শোনার পর জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু জলের তলার সেই কিম্ভূতকিমাকার জীবটি তাহলে কি?

পেত্রা একটু হেসে আমায় নিয়ে গুহার একদিকের একটি পাথরের দরজা সরিয়ে অন্য একটা ছোট গুহায় নিয়ে গেল। পাথরের দরজাটি এমন কায়দায় বসান যে এমনিতে চোখে পড়ে না। আমারও চোখে পড়েনি।

ছোট গুহার ভেতরে ঢুকে সামনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে পেত্রা বললে, এই তোমার সেই বিকট জীব।

অবাক হয়ে দেখি সামনে দুটো ডুবুরির পোশাক দেওয়ালের ধারে সাজান হয়েছে। পোশাক দুটি সাধারণ ডুবুরীর পোশাক থেকে একটু অবশ্য ভিন্নভাবে তৈরি।

পেত্রা নিজেই সে কথা আমায় জানালে—পোশাকগুলো আমি নিজেই ফরমাশ দিয়ে গড়িয়ে এনেছি।

কিন্তু কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

কেন?—আচ্ছা দেখবে চল— বলে পেত্রা আমায় নিয়ে আবার সেই হ্রদের ধারে গিয়ে বললে, জলে এখন একটু হাত দাও দেখি।

হাত দিয়ে সবিস্ময়ে বললাম,—এ কি, এত রীতিমত গরম। ঘণ্টা তিনেক আগেও ত ঠাণ্ডা দেখেছি!

পেত্রা থেমে বললে, এইটেই এ হ্রদের রহস্য এবং তারই কিনারা করবার জন্যে এই ডুবুরির পোশাক। এ হ্রদ থেকে থেকে হঠাৎ এত গরম হয়ে ওঠে যে ওপারে ঝঞ্ঝার কুণ্ডলি উঠতে থাকে। এদেশে লোকেরা তাই দেখে ভাবে এখানে অপদেবতা আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি ডুবুরির পোশাকে এ হ্রদের জলে নেমে কি পেয়েছ?

কি পেয়েছি, কাল ঠাণ্ডা হবার পর নিচে নামলেই দেখতে পাবে।

পরের দিন জল ঠাণ্ডা হ'তে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। ডুবুরির পোশাক পরে আমরা দুজনে তারপর হ্রদের নিচে নামলাম। পাহাড়ের ওপার হ'লেও হ্রদটি খুব কম গভীর নয়। কিন্তু জল এমন পরিষ্কার যে দেখতে কিছু কষ্ট হয় না।

জলের তলায় পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে আমরা একটা 'স্পিকিং টিউব' অর্থাৎ কথা কইবার রবারের নলের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলাম।

হ্রদের তলায় এক জায়গায় এসে পেত্রা বললে,—নিচের দিকে চেয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছ?

বললাম,—দেখতে পাচ্ছি ত নীলচে একরকম পাথর।

নীলচে পাথর নয়, পৃথিবীর সব চেয়ে দামী রত্ন হীরে যার মধ্যে পাওয়া যায় এ সেই পাথর।

হীরে! উত্তেজিত ভাবে নিচের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে চমকে উঠলাম। নীলচে পাথরের গায়ে সত্যিই নানা জায়গায় আরেক জাতের পাথর এই জলের তলাতেও জ্বল জ্বল করছে।

হীরে! চারিদিকে এত হীরে। এই হ্রদের মধ্যে ত সাতটা সাম্রাজ্যের ঐশ্চর্য তাহলে লুকোন রয়েছে। মনের ওপর যেন রাশ রুখল না। ওরই ভেতর প্রকাণ্ড একটা জ্বলজ্বলে পাথর দেখতে পেয়ে সেটা নেবার জন্য পাগল হয়ে উঠলাম। বাটালি গোছের একটা যন্ত্র পেত্রা সঙ্গে এনেছিল। সেটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে ধারের পাথর আলগা করে যখন সেটা তুললাম তখন অবাক হয়ে দেখি তার নিচে একটা নলের মত গর্ত বেরিয়ে পড়েছে এবং তার ভেতর দিয়ে হুহু করে জল গলে যাচ্ছে!

এই সামান্য ব্যাপারে পেত্রা কিন্তু হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। আমার আরও কয়েকটা হীরে সংগ্রহ করবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সে একেবারে পাগলের মত টানতে টানতে ওপরে নিয়ে গিয়ে তুলল। শুধু তাই নয়, ডুবুরির পোশাক ছেড়ে ফেলেই আমায় কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে, টেনে নিয়ে গেল পাহাড়ের এক প্রান্তে। সেখান থেকে দড়ির একটি সিঁড়ি জলের ধার পর্যন্ত টাঙান এবং জলের ধারে পাহাড়ে একটি খাঁজের আড়ালে একটি ছোট মটর লঞ্চ দেখলাম লুকোন রয়েছে।

দড়ির সিঁড়ি দিয়ে মোটর গেটে নেমে সেটি চালিয়ে মাইল দশেক দ্বীপটি থেকে দূরে যাবার আগে মুখে ফেনা উঠিয়েও পেত্রার কাছ থেকে একটা কথা বার করতে পারলাম না।

অবশেষে অত্যন্ত রেগে বললাম,—আমার কথার জবাব যদি না দাও তাহলে তোমায় বোট থেকে আমি সমুদ্রে ফেলে দেব—বুঝেছ! বল,—এ রকম ভাবে হঠাৎ পাগলের মত পালিয়ে আসার মানে কি?

মানে এখুনি বুঝতে পারবে। কানে আঙুল দিয়ে শক্ত হয়ে বোটের রেলিং ধরে বসো দেখি।

তারপরের কথা আর শুনতে পেলাম না। আমি দ্বীপটির দিকেই মুখ ফিরিয়ে ছিলাম। হঠাৎ আকাশ ফাটানো শব্দে সেই বিরাট পাহাড়ের দ্বীপটি তুবড়ির খোলের মত চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে সমুদ্রের জলে ডুবে গেল।

প্রলয়ের মত যে ঝড় তারপর উঠল, আর যে প্রচণ্ড ঢেউ এসে দৈত্যের মত কিছুক্ষণ আমাদের বোট নিয়ে লোফালুফি শুরু করলে, তাদের হাত থেকে বেঁচে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

এইবার পেত্রাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি বল ত পেত্রা!

ব্যাপার আর কি? তোমার ওই হীরে তোলা! ওই এক ছটাক একটা নুড়ি তোলাতেই এত বড় একটা দ্বীপ ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

তা যাবে না!—পেত্রা বুঝিয়ে দিল—দ্বীপটা আসলে একটা আগ্নেয়গিরি ছাড়া কিছু নয়। ওপরে যে হ্রদ দেখেছি সেটা এককালে ছিল আগুন বেরুবার মুখ, এখন কোন রকমে বুঁজে গিয়ে বহুকালের বৃষ্টির জল জমে হ্রদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিচেকার আগুন যে এখনও নিভে যায় নি, জল মাঝে মাঝে গরম হওয়াতেই তা বোঝা যায়।

হ্রদের তলাটি খুব পুরু নয়। তুমি নুড়ি তোলার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন গোপন ফুটো তাই সেখানে বেরিয়ে পড়ে। সেই ফুটো দিয়ে হ্রদের জল গভীর পাতালের প্রচণ্ড আগুনের ওপর গিয়ে পড়ে। সে জলের তারপর বাষ্প হয়ে উঠতে কতক্ষণ। ওপারে ত সরু একটা ফুটো। বেরুবার পথ না পেয়ে সেই বাষ্প তাই ক্রমশ প্রচণ্ড বেগ পেতে পেতে গোটা পাহাড়টাকে ফাটিয়ে বেরিয়ে গেছে। ঐ নুড়িটুকু তুলেই দ্বীপটাকে তুমি ডোবালে।

ঘনাদার গল্প শেষ হ'লে গৌরাঙ্গ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে,—দ্বীপটার নাম কি ছিল ঘনাদা?

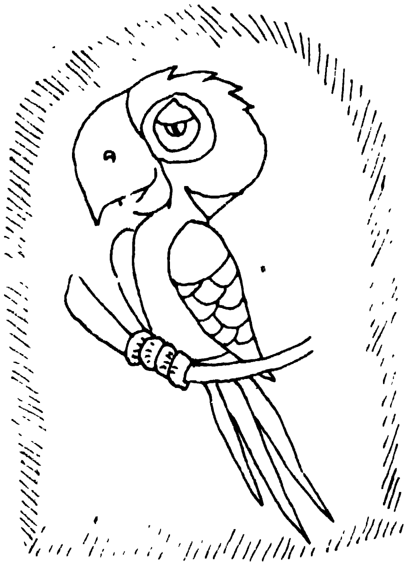
ঘনাদা বিরক্ত হয়ে বললেন, যা ডুবে গেছে তার নামে কি দরকার?

আর সেই ছটাক খানেক হীরেটা?—শিবু জিজ্ঞাসা করলে—সেটা নিশ্চয় হাতছাড়া করোনি।

ঘনাদা হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। শিবুর কথাটা বোধ হয় তাই কানে গেল না।

তোতা কাহিনী

সৈয়দ মুজতবা আলী



পারস্য দেশের গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, আল্লা যদি আরবী ভাষায় কোরান প্রকাশ না করে ফার্সীতে করতেন, তবে মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর 'মসনবী' কেতাবখানাকে কোরান নাম দিয়ে চালিয়ে দিতেন। এ ধরনের তারিফ আর কোন দেশের লোক তাদের কবির জন্য করেছে বলে তো আমার জানা নেই।

মৌলানা রুমী ছিলেন ভক্ত। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন কদম্ববনবিহারিণী শ্রীরাধা যেরকম করে গোপীজনবল্লভ শ্রীহরিকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রেম দিয়ে। রুমী তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মসনবীতে বর্ণনা করেছেন। বেশির ভাগ গল্পচ্ছলে, তারই একটি 'তোতা কাহিনী'।

ইরান দেশের এক সদাগরের ছিল একটি ভারতীয় তোতা। সে তোতা জ্ঞানে বৃহস্পতি, রসে কালিদাস, সৌন্দর্যে রুডল্‌ফ ভেলেন্টিনো, পাণ্ডিত্যে ম্যাক্সম্যুলার। সদাগর তাই ফুরসৎ পেলেই সেই তোতার সঙ্গে দু-দণ্ড রসালাপ, তত্ত্বালোচনা করে নিতেন।

হঠাৎ একদিন সদাগর খবর পেলেন ভারতবর্ষে কার্পেট বিক্রি হচ্ছে আক্রা দরে। তখনই মনস্থির করে ফেললেন ভারতে যাবেন কার্পেট বেচতে। যোগাড়-যন্ত্র তদ্দণ্ডেই হয়ে গেল। সর্বশেষে গোষ্ঠীকুটুমকে জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য হিন্দুস্তান থেকে কি সওদা নিয়ে আসবেন। তোতাও বাদ পড়ল না—তাকেও শুধালেন সে কি সওগাত চায়। তোতা বললে, 'হুজুর, যদিও আপনার সঙ্গে আমার বেরাদরি, ইয়ারগিরি বহু বৎসরের, তবু খাঁচা

থেকে মুক্তি চায় না কোন্ চিড়িয়া? হিন্দুস্তানে আমার জাতভাই কারোর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে আমার এ অবস্থার বর্ণনা করে মুক্তির উপায়টা জেনে নেবেন কি? আর তার প্রতিকূল ব্যবস্থাও যখন আপনি করতে পারবেন, তখন এ সওগাতটা চাওয়া তো কিছু অন্যায়ও নয়।

সওদাগর ভারতবর্ষে এসে মেলা পয়সা কামালেন, সওগাতও কেনা হল, কিন্তু তোতার সওগাতের কথা গেলেন বেবাক ভুলে। মনে পড়ল হঠাৎ একদিন এক বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় একঝাঁক তোতা পাখি দেখে। তখ্খুনি তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমাদের এক বেরাদর ইরান দেশের খাঁচায় বন্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার মুক্তির উপায় বলে দিতে পারো?' কোনও পাখিই খেয়াল করল না সদাগরের কথার দিকে। শুধু দুঃসংবাদটা একটা পাখির বুকে এমনি বাজ হানল যে, সে তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সদাগর বিস্তর আপসোস করলেন নিরীহ একটি পাখিকে বেমক্কা বদ-খবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্যে। স্থির করলেন, এ মূর্খামি দু-বার করবেন না। মনে মনে নিজের গালে ঠাস-ঠাস করে মারলেন গণ্ডা দুই চড়।

বাড়ি ফিরে সদাগর সওগাত বিলোলেন দরাজ হাতে। সবাই খুশ, নিশ্চয়ই 'জয় হিন্দ' বলেছিল ব্যাটা-বাচ্চা সবাই। শুধু তোতা গেল ফাঁকি—সদাগর আর ও-ঘরে যান না পাছে তোতা তাঁকে পাকড়ে ধরে সওগাতের জন্য। উঁহু, সেটি হচ্ছে না, ও খবরটা যে করেই হোক চেপে যেতে হবে!

কিন্তু হলে কি হয়—গোঁপ কামানোর পরও হাত ওঠে অজানতে চাড়া দেবার জন্য (পরশুরাম উবাচ), বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হঠাৎ একদিন তোতার ঘরে। আর যাবে কোথায়—'অস্-সালাম আলাই কুম, ও রহ্মৎ উল্লাহি, ও বরকত ওহু, আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞে হোক। হুজুরের আগমন শুভ হোক ইত্যাদি ইত্যাদি, তোতা চেঁচাল।

সদাগর 'হেঁ হেঁ' করে গেলেন! মনে মনে বললেন, খেয়েছে!

তোতা আর ঘুঘু এক জিনিস নয় জানি, কিন্তু এ তোতা ঘুঘু। বললে, 'হুজুর সওগাত?'

সদাগর ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে। বলতে পারেন না, চাপতেও পারেন না। তোতা এমন ভাবে সদাগরের দিকে তাকায় যেন তিনি বেইমানস্য বেইমান। সওগাতের ওয়াদা দিয়ে গড়্ড্যাম্ ফক্কিকারি! মানুষ জানোয়ারটা এই রকমই হয় বটে! তওবা, তওবা!

কি আর করেন সদাগর। কথা রাখতেই হয়। দুম করে বলে ফেললেন।

যেই না বলা তোতাটি ধপ করে পড়ে মরে গেল। তার একটা বেরাদর সেই দূর হিন্দুস্তানে তার দুরবস্থার খবর পেয়ে হার্টফেল করে মারা গেল, এরকম একটা প্রাণঘাতী দুঃসংবাদ শুনলে কার না কলিজা ফেটে যায়?

দিলের দোস্ত তোতাটি মারা যাওয়ায় সদাগর তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। 'হায়, হায়, কী বেকুব, কী বে-আক্কেল আমি। একই ভুল, দুবার করলুম।' পাগলের মত মাথা খাবড়ান সদাগর। কিন্তু তখন আর আপসোস, ফায়দা নেই—ঘোড়া চুরির পর আর আস্তাবলে তালা মেরে কি লভ্য! সদাগর চোখের জল মুছতে মুছতে খাঁচা খুলে তোতাকে বের করে আঙিনায় ছুঁড়ে ফেললেন।

তখন কী আশ্চর্য, কী কেরামতি! ছুঁড়ে ফেলতেই তোতা উড়ে বসল গিয়ে বাড়ির ছাদে। সদাগর তাজ্জব—হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তোতার দিকে। অনেকক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে শুধালেন, 'মানে?'

তোতা এবারে প্যাঁচার মত গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'হিন্দুস্থানী যে তোতা আমার বদনসিবের খবর পেয়ে মারা যায়, সে কিন্তু আসলে মরে নি। মরার ভান করে আমাকে খবর পাঠাল, আমিও যদি মরার ভান করি, তবে খাঁচা থেকে মুক্তি পাব।'

সদাগর মাথা নিচু করে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু, যাবার আগে আমাকে শেষ তত্ত্ব বলে যাও। আর তো তোমাকে পাব না।'

তোতা বললে, 'মরার আগেই যদি মরতে পারো, তবেই মোক্ষলাভ। মড়ার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, মান-অপমান বোধ নেই। সে তখন মুক্ত, সে নির্বাণ মোক্ষ সবই পেয়ে গিয়েছে। মরার আগে মরবার চেষ্টা করো।'

* * *

এই গল্প ভারতবর্ষে বহু পূর্বে এসেছিল। কবীর বলেছেন,

'ত্যজো: অভিমানা শিখো জ্ঞানা
সত্‌গুরু সঙ্গত তরতা হৈ
কহেঁ কবীর কোই বিরল হংসা
জীবতহী জো মরতা হৈ॥'

(অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যুলাভ করেছেন সেরকম হংসসাধক বিরল')।

আর বাঙলা দেশের লালন ফকিরও বলেছেন,

'মরার আগে মলে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশীদ ধরে জানতে হয়॥'



ভেবেছিলুম, বলব না।

যা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত, যা জগতে কারুর কোন কাজে লাগবে না, শুনে বন্ধুরা লজ্জিত ও শত্রুরা উল্লসিত হবে অথচ কোন পক্ষ বিশ্বাস করবে না, তা আমার সঙ্গে আমার চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে যাক এই ছিল আমার অভিলাষ। কিন্তু বয়স যতই বাড়ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর উপর কর্তৃত্ব ততই কমে আসছে, আর সম্প্রতি অহিফেন অভ্যাস করে অবধি মুখ থেকে সংযমের বল্‌গা খুলে পড়ছে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। বার্ধক্যে নেশার ঘোরে কখন কার সাক্ষাতে কী বলে ফেলব, আমার মৃত্যুর পরে যখন ভক্তরা আমার প্রত্যেকটি উক্তি স্মরণ করে প্রবন্ধ লিখবে তখন আমার দুর্বল মুহূর্তগুলি অমর হয়ে আমাকে ভাবীকালের নিকট হাস্যাস্পদ করতে থাকবে। এর প্রতিকার আমি জ্ঞান থাকতে স্বহস্তে করে যাব। সেই কারণে আজ এই আত্মকাহিনী লিখতে বসা।

উর্বশীর যেমন জন্ম কিংবা শৈশব কিংবা বাল্য কিংবা কৈশোর ছিল না, সে যখন উদিতা হল তখন যৌবনে গঠিতা, আমারও তেমনি জন্ম থেকে কৈশোর, উপরন্তু যৌবন লোকচক্ষুর অন্তরালে লুপ্ত। আমি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করলুম তখন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত। বাল্যের কথা ভালো মনে পড়ে না, স্মৃতির চোখে চাল্‌শে ধরেছে, কাছের জিনিসও ঝাপসা দেখায়। যৌবন যে কোন্‌খান দিয়ে কেমন করে চলে গেল আজ পশ্চাদ্ধাবন করতে গেলে আশ্চর্য লাগে। যেন আমাদের বসন্ত ঋতু। শ্রীপঞ্চমীর সময় একটু উষ্ণ হাওয়া দেয়, দিন দু'তিন মনে হতে থাকে কোথায় কী একটা আয়োজন চলেছে উৎসবের। তারপরেই যা ধুলো, যা গরম।

এই মনে পড়ে, আপনার কথা ভাববার অবসর পাইনি। গোড়াতে সন্ন্যাসী হবার সংকল্প ছিল। কিন্তু বিশুদ্ধ সন্ন্যাসী হতে গেলে যত রকম উপসর্গ চাই কোনটা আয়ত্ত করতে পারলুম না। পলিটিক্স করতে উদ্দীপনা জাত হল, কিন্তু সে পথে সকলে নেতা, কাকে অনুসরণ করব স্থির করতে পারবার পূর্বে অদৃষ্ট পুরুষ আমাকে ঠেলে দিলেন সেবা কর্মে। কোথাও প্লাবন, কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও দুর্ভিক্ষ, কোথাও মহামারী—কিছু না হোক মেলা বা মিছিল—বছরের পর বছর খাটতে খাটতে শরীরটাতে ঘুণ ধরে গেল।

আজ যেমন আমি পাঠক-পাঠিকার আহার-নিদ্রা কেড়ে নিচ্ছি (কিন্তু কেড়ে নিয়ে করছি কি! আমার নিজেরই যে ডিস্‌পেপসিয়া ও ইন্‌সম্‌নিয়া) সেদিন তেমনি আমারও আহার-নিদ্রা ঘুচে গেছল। নিদ্রা অবশ্য বিনা পয়সায় পাওয়া যেত, কিন্তু আহারের সংস্থান সব দিন ছিল না। কঙ্কালসার মূর্তি নিয়ে আমি অবশেষে উঠলুম মধুপুরের এক স্বাস্থ্যনিবাসে। কী জানি কেন জীবনটার প্রতি আমার মায় ছিল। বাল্যকালাবধি যে অনাথ, যার উপার্জনের উপর কেউ নির্ভর করে না, যাকে মেয়ে দিতে কোন দিন কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ এগিয়ে আসেননি, জীবনবীমাওয়ালাদের কাছে যার জীবনের দাম কানাকড়ি, তাকেও কেন জানি বেঁচে থাকতে হবে।

মধুপুরে বেশির ভাগ সময় বিছানায় পড়ে কাটত। উঠে বসতে বল পেতুম না।

কোনদিন আড্ডা দিয়েছি, না খেলেছি তাশ পাশা ব্যাডমিন্টন। ওদের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করিনি, করলেও মিশতে পারতুম না। একা একা থাকি। চোখ বুজে ভাবতে থাকি এই জীবনটাকে কাটাতে জানলে কত রকমে কাটানো যেতে পারত। নিজেকে নানা অবস্থায়, নানা পরিস্থিতিতে, নানা মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে কল্পনা করি। সেই সকল মানুষের মনের ভিতরে, চরিত্রের ভিতরে নিজের কল্পনাকে অনুপ্রবিষ্ট করে দিই। তারা যেন আমার কাগজের নৌকা। তারা কোন্ দিকে ভেসে যায়, তাদের সঙ্গে আমিও ভাসি, ভাসতে ভাসতে দেখি তারা কোন্ ঘূর্ণিতে ঘোরে, কোন্ অঘাটে ভেড়ে, কিসের আঘাতে ডুবে তলিয়ে যায়। এক কথায়, কাল্পনিক কাহিনী বানাই। মন্দ খেলা নয়। এ খেলার বিশেষত্ব এতে সাথীর আবশ্যক করে না, সরঞ্জামও লাগে না।

বানানো কাহিনীগুলি মাঝে মাঝে এত ভালো ওৎরায় যে মনে হয় ওগুলি যেন এক একটি অভগ্ন স্বপ্ন, অতি সত্বর লিপিবদ্ধ না করে রাখলে স্বপ্নেরই মত মিলিয়ে যাবে কিংবা গুঁড়িয়ে যাবে; পুনরুদ্ধার করতে কিংবা পুনর্বার গড়তে পারব না। লিখতে গিয়ে দেখি আরো মজা, কল্পনায় যা অস্পষ্ট ছিল কালির আঁচড় তাকে স্পষ্ট করলে, যা ছিল মুহূর্তের তা হল চিরকালের। কল্পনার মত কলমেরও স্বাধীনতা আছে। আমি ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে ওকে যথেচ্ছ বিহার করতে দিলুম। স্বাধীন লেখনী, শব্দচাতুর্য, বর্ণনাবিভ্রম, রীতিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে চলল।

গল্পরচনার সেই প্রথম দিনগুলি আমি কোনদিন ভুলব না। সে আনন্দের, সে ধৈর্যের, সে চমকের, সে আবিষ্কারের তুলনা নেই। আমার মনের মধ্যে এত ছিল! যেন ঘটনা আপনা হতে ঘটে যাচ্ছে, আমি সাক্ষীগোপাল। চরিত্র আপনা আপনি বিকশিত হচ্ছে, নব নব চরিত্র দ্বারে উঁকি মারছে, পুরাতন চরিত্র ভিড়ের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে। মানস প্রসূত পুত্তলীগুলি রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠছে। ধন্য গল্প লেখক। তুমিই সুখী।

আহার নিদ্রায় অবহেলার ফলে শরীর সারল না। এদিকে স্বাস্থ্যনিবাসের পরিচালক একদিন এসে অপমান করে গেল, দু'মাসের পাওনা বাকী। পোঁটলাপুঁটলি ফেলে রেখে রাতারাতি উধাও হলুম। ঝুলিতে আমার গল্পগুলির পাণ্ডুলিপি। সহায়সম্বলহীন ভাবে এক মাসিকপত্রের আপিসে যখন গেলুম দারোয়ান আমাকে ফকির ভেবে ঢুকতে দেয় না। সম্পাদক বললেন, 'পয়সা খরচ করে ছাপলেও ছাপতে পারি, যদি পছন্দ হয়। কিন্তু দাম দিতে গেলে লোকসান যাবে। জানেন তো মশাই, মাসিকপত্রের সম্পাদককে গয়লা অমনি দুধ দেয় না, মুদি অমনি চাল দেয় না, মেছুনী অমনি মাছ দেয় না, আর সম্পাদকও আপনাদেরই মত ওসব না খেতে পেলে প্রাণে বাঁচে না।'

যাক্, একটা গল্প তাঁর বিনা পয়সায় পছন্দ হল, ছাপবেন বলে আশা দিলেন। নিজের চোখে নিজের নামটা তো ছাপার হরফে দেখতে পাব। একটি বন্ধুর ওখানে দু'বেলা পাতা পাড়লুম। ওদের বিরাট গোষ্ঠী, আমার মত সামান্য প্রাণীকে একটা কোণে একটু আশ্রয় দিতে ওদের আপত্তি হল না।

গল্পটি ছাপা হবার সাত দিন না যেতেই কী করে যে আমাকে খুঁজে গ্রেপ্তার করলে, জানিনে—পুলিস নয়, অন্য এক সম্পাদক। বললেন, 'বিশ্বদেব বাবু না? কন্‌গ্রাচুলেশনস্। আপনার গল্প পড়ে, মশাই, কাল থেকে ধরতে গেলে অভুক্ত রয়েছি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি আপনাকে হাৎড়ে। কী রিয়ালিস্‌ম্, কী ভূয়োদর্শিতা! বাঙালীর সমাজকে অণুবীক্ষণ দিয়ে আপনার মত কে এমন করে দেখেছে? বললেই হল বিশ্বদেব বিশ্বকবির ছদ্মনাম? বিশ্বকবি

কি বাংলাকে গণনার মধ্যে আনেন? আমি ঠিক জানতুম এ এক নব আবির্ভাব।' ভদ্রলোক গদ্‌গদ ভাবে শেষ করলেন, 'আপনাকে লাভ করে আজ সাহিত্যিক কুল পবিত্র, সাহিত্য জননী কৃতার্থা।'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলেও ভদ্রলোক থামলেন না, নিঃশ্বাস নিয়ে হাত দেখিয়ে আমাকে উত্তর দেওয়ার দায় থেকে নিবৃত্ত করলেন! 'না বলবেন না, বিশ্বদেব বাবু। আমিই আপনার আবিষ্কর্তা, আমিই আপনার অস্তিত্বে প্রথম বিশ্বাসী। নিশিনাথ বড় জোর আপনার লেখা প্রথম ছেপেছে। কিন্তু সাহিত্যের ও কী বোঝে? না বলবেন না। বেশি নয়, একটি।'

ভদ্রলোকের গরজ দেখে আমিও একটু চাপ দিলুম।

'দেখুন মশাই, গল্পলেখককে গয়লা অমনি দুধ দেয় না।' ইত্যাদি।

ঈষৎ দমে গিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বেশ, বেশ, আপনার যখন দরকার, নিতান্তই যখন দরকার, তখন—'পাঁচ টাকার একখানি নোট বহুকষ্টে বার করে বারবার নাড়াচাড়া করে যথাসম্ভব বিলম্ব করতে থাকলেন। যতক্ষণ তাঁর দখলে থাকবে ততক্ষণ তাঁর, দিলে তো পরের হয়ে গেল।

এমন সময় আমার প্রথম সম্পাদক বোঁ করে কোত্থেকে এসে খপ্ করে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'খবরদার মধুসূদন বাবু। আমার কাগজের বাঁধা লেখককে তুচ্ছ পাঁচটা টাকা অফার করে অপমান করবেন না। নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে।'

কয়েক বছরের মধ্যে আমি লক্ষপতি। দশ পৃষ্ঠার গল্প একশো টাকার কমে ছাড়িনে। আমার তেইশখানা উপন্যাসের মধ্যে তিনখানার তেইশটা সংস্করণ হয়েছে। অপরিচিত সমালোচক অপরিচিত মাসিকের চোদ্দ পৃষ্ঠা জুড়ে আমার প্রতিভার প্রশস্তি গান করে। সকলের মুখে ঐ এক কথা। বাঙালীর সমাজকে এমন অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে আর কারুকে দেখা গেল না।

নারীরাও সার্টিফিকেট দিয়েছেন। আমি তাঁদেরই একজন। আমি সেই থেকে দাড়ি গোঁপ মুড়িয়েছি। নারী মনের নিভৃত অস্ফুট বার্তা আমিই উদ্ধার করে জগৎকে শোনালুম। নারী যদি হয় লজ্জাবতী লতা আমি নারীর জগদীশ বোস। মেয়েরা শাড়ি পরে কি ধুতি পরে তা-ই কোনোদিন মুখ তুলে দেখিনি, মেয়েদের সঙ্গে আমার লক্ষ্মণের সম্বন্ধ। তা হলে কী হয়, আমি তাদের অন্তর্যামী। আমার তেইশখানা নভেলের কোথাও কেউ নায়িকার রূপ বর্ণনা বেশ বর্ণনা অলঙ্কার বর্ণনা অন্বেষণ করে পাবেন না, কিন্তু পাবেন কী তাদের নিগূঢ় ভাবনা নীরব বেদনা নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সময় সময় কী নিষ্ঠুর হৃদয়হীন তারা হতে পারে। কিন্তু তা বলে শয়তান তারা নয়। তারা দেবীই। যাতে তাদের দেবী বলে চিনতে ভুল না হয় সেজন্যে আমি তাদেরকে স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্র সাধনা করাই। তেমন কৃচ্ছ্র সাধনা ইন্দ্রের শচী তো দূরের কথা শিবের পার্বতীও করেননি। কাজেই তারা দেবীদের চেয়েও দেবী। বিশ্বদেব ভাদুড়ীর গ্রন্থে বেশ্যারাও ব্রহ্মচারিণী, ঝি-রাও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পড়ে, বিধবারা তো বিশুদ্ধতা মূর্তিমতী। চরিত্রের আদর্শ কঠোর বলেই ওরা হৃদয়হীন, ওরা নির্মম—কার প্রতি? না, প্রেমাস্পদের প্রতি। প্রেম পড়তে ওরা ত্রুটি করে না, কে যে ওদের প্রেমিক তাও ওরা জানে, কেবল প্রেমের যা সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি সেইটে ওরা বাঁচিয়ে চলে। নায়ক-নায়িকাতে একটা চুম্বন বিনিময়েরও জো নেই, আলিঙ্গন তো অভাবনীয়।

নারীরা তো আমাকে তাঁদের একজন বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তরুণরাও আমাকে

নিয়ে নারীদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করছেন, আমি যে তারুণ্যেরও উদ্‌গাতা। আমার নায়কগুলি সাধারণত বাপের পয়সায় উচ্ছৃঙ্খল। প্রেমে যখন ওরা পড়বেই, না পড়ে ছাড়বে না, তখন ওদের জন্যে সে ব্যবস্থা আমি করে থাকি। সমাজে বেশ্যা ও বিধবা নামক দুটি বেওয়ারিশ মাল বিদ্যমান থাকতে প্রেমিকের ভাবনা কী? কিন্তু প্রেম তো জীবনের সবখানি নয়, ধনের প্রয়োজন, সামাজিক সম্মানের প্রয়োজন। তরুণ মনের বড় সাধের স্বপ্ন প্রেম, কিন্তু রূঢ় বাস্তবের রৌদ্র এসে স্বপন ভেঙে দিলে তরুণের অন্তর বলে, চাই ধন, চাই মান। আমি রিয়ালিস্ট বলে খ্যাত কেন? কারণ আমার নায়ক বেশ্যাকে কিংবা বিধবাকে বিবাহ করতে না পেরে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব লাভ করে। জাত কুল গণ গোত্র সমস্তই শেষ পর্যন্ত টিকে যায়। অধিকন্তু আসে রাশি রাশি টাকা ও প্রভূত মর্যাদা।

স্ত্রীপুরুষের মিলিত স্তব ইতিমধ্যে আমাকে গড়ের মাঠের গুণীশ্রেষ্ঠদের মত অশ্বারূঢ় করেছে। এখন মনে হয় ঐ যেন আমার জন্মগত অধিকার, আমার প্রকৃত স্থান। খ্যাতিকে আমি সহজে গ্রহণ করতে পেরেছি, কোনদিন তা নিয়ে উত্তেজনা বোধ করিনি। তবু 'ভক্ত' ও 'শত্রু' অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকের মত আমারও অদৃষ্টে জুটেছে। খ্যাতির শুল্ক জোগাতেই হবে—নিরুপায়।

সেই স্বাস্থ্যনিবাসের নাকের কাছে মস্ত বাড়ি করেছি, বিল শুধতে না পারা অপমানকে ব্যঙ্গ করতে। শরীরটা সারেনি, প্রকাশকরা দাদন দিয়ে যেন তেইশখানা হাড় খসিয়ে নিয়েছে। ভক্তরা অনাহূত ভাবে এসে কয়েকদিন আমার এখানে পথ্য ও মাঠে হাওয়া খেয়ে যায়। বলে, 'শরীরটাকে সারিয়ে তুলুন, বিশ্বদেব বাবু। দেশ আপনার কাছে এখন অনেক আশা রাখে। নোবেল প্রাইজ এখন জল থেকে ডাঙায় তোলা বাকি।' আমার ফোটোগ্রাফ অটোগ্রাফ নিয়ে এবং আমার বইয়ের এক সেট ওদের উপহার দিতে হবে জানিয়ে ওরা 'আবার আসব' বলে পরম আপ্যায়িত করে বিদায় হয়।

সব চেয়ে আশ্চর্য, এই আমার বয়স, এই আমার স্বাস্থ্য, তবু এখন আমার কাছে জীবনবীমার এজেন্ট ও বিয়ের ঘটক আনাগোনা করে। তাদের অভ্যর্থনার জন্যে একটা সশস্ত্র গুর্খা পুষেছি, তাতেও ফল হয় না। তারা আসে আমার ভক্তের ছদ্মবেশে। আমার উপন্যাস বাস্তবিক ওরা পড়েছে, কথায় কথায় এর পাকা পরিচয় দেয়। জিজ্ঞাসা করে নতুন কী লিখছি, কবে প্রকাশিত হবে, 'বজ্র ও বিদ্যুৎ' গল্পটার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় কী, 'কে যায়' গল্পটার শেষ অমন হলো কেন, ইত্যাদি। তারপর ধীরে ধীরে প্রসঙ্গটা পাড়ে। ভক্তকে ভাগিয়ে দিতে পারিনে। এজেন্টকে বলি, 'কার জন্যে বীমা করব? আমার তিন কুলে কেউ নেই।' অবশ্য কথাটা সত্য নয়। আমার মাসতুত ভাইদের খুড়তুত ভাইরা ও পুত্রকন্যারা ঘন ঘন আগমন করায় আমাকে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। তারা আর কিছু না হোক সেকেণ্ড ক্লাস রেলভাড়াটা না পেলে নড়বে না।

এজেন্ট বলে, 'আপনার মত লোক স্বার্থপরের মত কেবল নিজের স্বার্থ ভাবলে দেশের অর্থবৃদ্ধি কেমন করে হবে? দেশের কাছে অনেক পেয়েছেন বিশ্বদেব বাবু। দেশকে কিছু দিন।'

ঘটককে বলি, 'বানপ্রস্থের বয়স হলো। এই তো শরীর।'

ঘটক বলে, 'আহাহা। ভোগায়তন শরীর। ভোগ সম্পূর্ণ না হলে বানপ্রস্থের বিধি নেই। শরীরের যত্ন নেবার জন্যে চাই একটি গুণবতী স্ত্রী, তার নাই বা থাকল রূপ (রূপ থাকলে তো তাকে রূপবতীই বলতুম)। হলোই বা তার কিছু বেশি বয়স এবং পিতা যদি তার

দরিদ্র হয় তাতেই বা কী? আপনার পরোপকারী দেশবান্ধব একটি কন্যাদায়গ্রস্তকে উদ্ধার করলে চিরকাল নাম থাকবে।'

একটা মোটা গোছের বীমা করতে হল। যে আসে তাকে দেখিয়ে বলি, 'একটা আছে, আর পারিনে।'

কিন্তু ঘটককে ও কথা বলতে পারি কই?

গোপন করব না। ওদের ইঙ্গিত আমার বড় ভালো লাগে। একটি কল্যাণী বধূ আমার আয়ুর লক্ষণ আপন সীমান্তে ও করযুগলে ধারণ করবে। একটিবার ডাকবে, 'ওগো'। একটি শিশুপত্র বা কন্যা আমার কোলে উঠে একটিবার ডাকবে, 'বাবা'। যে লক্ষ্মীব আশীর্বাদ লাভ কবেছি তিনি ধনসম্পদের দেবী। যে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আমার ঘরে পড়ল না তিনি মঙ্গলময়ী।

কিন্তু লোকে কী বলবে! আমার তরুণ ভক্তরা করবে না কন্‌ফারেন্সের সভাপতি, বলাবলি করবে, যে-মেয়ে আমাদেরই কোন একজনের হতে পারত বুড়োটা তাকে টাকাব জোরে আত্মসাৎ করেছে। আমার নারীভক্তরা আর চিঠি লিখে উচ্ছ্বাস জানাবেন না। আমি যে আজন্ম ব্রহ্মচারী, আমি যে কলির ভীষ্মদেব, আমার এই প্রতিপত্তি আমার সোনার মুকুট। একটিবার মাথায় সোলার টোপব পরলে এই সোনার মুকুট চিরকালের মত খসবে। জানি আমার চেয়ে বয়সে বড় অনেক সাহিত্যিক এখনও দ্বিতীয় তৃতীয়বাব সোলার টোপর পরছেন! বৈষ্ণব পদাবলীর রসাস্বাদন নাকি বিপত্নীক কর্তৃক হবার নয়। কিন্তু আমার তো প্রবৃত্তি হয় না এই বয়সে।

আবার ভাবি কী এমন বয়স। যদি কোন কল্যাণহস্ত এই রোগাতুর দেহটার উপব বীণার যষ্টির মতো ছুঁয়ে যায় তবে এরই ভিতর থেকে যে ঝঙ্কার উঠবে বাংলাদেশ তাব অনুরূপ শোনেনি।

না। কোনদিন ভাল করে স্ত্রীলোকেব পানে তাকাইনি। লজ্জাও করে, ভয়ও করে। স্ত্রীলোককে কল্পনা করেই আমার স্বস্তি, প্রত্যক্ষ করতে আমার হৃৎকম্প। এই তো বেশ আছি। তাকে তেইশখানা বই তেইশটা শিশুর মত শোভা পাচ্ছে। দেখে নিঃসন্তানের চক্ষু জুড়িয়ে যায়।

মনের যখন এইরূপ দোলায়িত অবস্থা তখন একদিন একখানি চিঠি পেলুম। খামেব উপরকার লেখা থেকে জানলুম বামা হস্তের লেখা। আর একখানি প্রশংসাপত্র হবে। তবু পড়ে দেখতে কৌতূহল হল। যেমন প্রত্যেক বার হয়ে থাকে। প্রশংসা জিনিসটা পদসেবার মত। ক্ষমতাশালীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, অথচ একবার ওর স্বাদ নিলে প্রত্যেকবার নিতে লোভ হয়।

কে একজন মঞ্জরী দেবী বিনয়নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন সুমনা চরিত্র আমি কোথায় পেলুম? তাঁর বন্ধুদের ধারণা আমি তাঁকেই মডেল করে সুমনাকে এঁকেছি। কি তা কেমন করে সম্ভব?—তিনি জানতে চেয়েছেন।—আমি কি কখনও তাঁকে দেখেছি? চিনেছি? যদি না দেখে থাকি, না চিনে থাকি, তবে কেমন করে তাঁর মনের ভাবনাগুলি পর্যন্ত আয়ত্ত করেছি? আমি কি তাঁর সখীদের মুখে তাঁর মনের কথা শুনেছি?

আমি একটু রাগই করলুম। প্রকারান্তরে বলা হল আমি ফোটোগ্রাফার। যা আমার শত্রুরাও কস্মিন্‌কালে বলেনি। নিজের ঘরে বসে নিজের প্রাণের কথা লিখি, কারুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাইনে, অপরে আমার ভবন আক্রমণ করে আমার স্তুতি গান

করে যায় এই তো জানতুম। ওদের মধ্যে কেউ কেউ পুরুষের মত কাপড় পরে না বলে তারাই যে নারী এই অনুমান করি। নইলে নারী বলে যে একটা জাতি আছে তা আমার অজ্ঞাত না হলেও অপরিলক্ষিত। ডাকঘরের সাহায্যে নিরীহ ভদ্রলোককে এমন সুকৌশলে গাল পাড়তে তো দেখিনি। এও এক প্রকার দণ্ড যা খ্যাতিমানকে বহন করতে হয়। চার পয়সা খরচ করে যে কোন শত্রু সে বেচারার সকাল বেলাটার প্রশান্তি নাশ করতে সমর্থ।

একটা জবাব লিখতেই হল। রাগ করতে আমিও জানি। কিন্তু এও জানতুম যে যা লিখব তা একদিন না একদিন কাগজে ছাপা হবে। প্রসিদ্ধ লেখকের বাজাব খরচের হিসাব পর্যন্ত ছাপা হয়। লেখনীকে সংবৃত করলুম। মঞ্জরী দেবী তাঁর নামের অগ্রে বন্ধনী দিয়ে 'কুমারী' শব্দটি বসিয়ে দিয়েছেন। লেখাব ছাঁদটিও কচি। বয়স বিশের নিচেই হবে যতদূর আন্দাজ হয়। 'কল্যাণীয়াসু' ও 'তুমি' লিখতেই রাগটা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। দেখলুম বক্তব্য যা ছিল কেমন করে তা রূপান্তর ধারণ করেছে। 'না, আপনাকে জীবনে দেখিনি'—এব স্থলে লিখলুম, 'তোমাকে যদি দেখে থাকি তবে সে আমার নিঃসঙ্গ জীবনেব নিরালায়, আমার আপন মনেব মুকুরে। হয়তো তুমি যখন জন্মাওনি তখন থেকে দেখা। আমার আপন আইডিয়া অন্যের গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়ে মঞ্জরী নাম নিলে, আমি জানলুম না, তাকে গ্রন্থে নামিয়ে সুমনা নামকরণ কবলুম।'

কয়েকদিন পরে আবার সেই আকারের নীল খাম, সেই হাতের লেখা। খুলতেই একখানি ফোটো ঝুপ করে পড়ে গেল। রূপবর্ণনা আমার আসে না। যা তা উপমা দিয়ে পাছে মহানকে হাস্যকব করে তুলি সেই ভয়ে মঞ্জরীব প্রতিকৃতিকে বিশ্লেষণ কবব না। শুধু এইটুকু বলব যে সুমনা যদি কল্পলোক ছেড়ে মরলোকে অবতীর্ণ হত তবে এই রূপই পরিগ্রহ করত।

লিখেছে, রাম না হতে রামায়ণ কেমন করে রচিত হয়েছিল তা এতদিন বিশ্বাস করেনি। মনের প্রবণতা সংশয়ের দিকে। মা পুরাণকে ইতিহাস বলে বিশ্বাস করেন এজন্য তাঁর সঙ্গে কত তর্ক করেছে। আমার এই যে অতিমানুষিক পুরোদৃষ্টির পরিচয় হাতে হাতে পেলে এতে ওকে সংশয়বাদীর প্রতি সংশয়াপন্ন করেছে। ওর ফিলসফির ছাত্রী হওয়া বৃথা। ফিলসফিতে তো এই রহস্যের নিরাকরণ নেই। অবশেষে সম্বোধন পূর্বক নিবেদন করেছে, 'হে মনোজ্ঞ মনীষী, আমার প্রণতি গ্রহণ করুন।'

পুনশ্চ দিয়ে জানিয়েছে, 'একখানি স্ন্যাপশট পাঠাতে হঠাৎ খেয়াল হল।'

এর উত্তরে আমার কিছু বলবার ছিল না। ছবিখানাকে অতি সন্তর্পণে বাক্সবন্দী করলুম, বাইরে রাখলে পাছে কেউ ভুল ভাবে। মাঝে মাঝে বাক্স খুলে আলোয় তুলে দেখি। আমার মানসে সুমনার যে প্রতিমা ছিল এ কি সত্যিই সেই? হাঁ, সেই। 'মনোজ্যোৎস্না' যদি নাট্যাকারে অভিনীত হয়—যেমন আমার 'পেয়ালা প্রেমিক' হয়েছে—তবে মঞ্জরীকে সুমনার ভূমিকায় নিখুঁৎ মানাবে। ইতিমধ্যে একখানা নতুন উপন্যাস আরম্ভ করেছিলুম। তাই নিয়ে এত নিবিষ্ট ছিলুম যে দাড়ি কামাতে ভুলে যাবার মত মঞ্জরীর ছবি দেখাও ভুললুম।

কিন্তু ভুলতে দেয় কই? আবার সেই খাম, সেই গোটা গোটা অক্ষরে আমার নাম ঠিকানা।—'আমার প্রতিদিনের প্রতীক্ষা ব্যর্থ। এক পৃষ্ঠার একখানি চিঠি লেখা আপনাব পক্ষে কিছুই নয়, কিন্তু আপনার এক একটি ছত্র আমার খাদ্য পানীয়। আপনার বাণীর আলোকে আমি জীবনের পথ দেখতে পাই। সুমনাকে অনুসরণ করে চলেছি—আমার পুরশ্চারিণী ছায়া সে।'

এর পর কোন্ ভক্তের ভগবান স্থির থাকতে পারেন?

'বৌ কথা কও' লিখতে লিখতে আলাদা কাগজে মঞ্জরীকে চিঠি লিখতে শুরু করি। কিন্তু লেখবার কী আছে? আমার বাগানের ডালিয়া, আমার বাঘা কুকুর, আমার মালীর হাবা ছেলে, এদের বর্ণনা দিয়ে কোন মতে একটি পৃষ্ঠা ভরান গেল। লেখবার হাত যার আছে তার হাতের ছাইভস্মও সোনা আনে।

এমনি করে সে যাত্রা উদ্ধার পাওয়া গেল। কিন্তু মঞ্জরী ছাড়ে না। তার দাবি সে তার পরবর্তী পত্রে পরিস্ফুট করলে। সে চায় সাত দিনে একখানা করে আমার চিঠি। চাইলেই পারত সাত দিনে একবার করে আমার ফাঁসি। বুঝল না যে দর্শনের ছাত্রীকে লেখবার মত বিষয় আমি কোথায় পাব। বিশ্বকবি 'ভূমা' লিখে প্রকারান্তরে বলে থাকেন 'ঘুমা'। আমার অমন কোন code word নেই। পাঠক-পাঠিকাকে ঘুম পাড়াবার বায়না দিয়ে বিধাতা আমাকে পাঠাননি। বিষয়ের অভাবে অগত্যা তার সেই স্ন্যাপ্‌শটখানা—যার সম্বন্ধে আগের বারে অভিমত দিইনি বলে সে অভিমান জানিয়েছে—তার সম্বন্ধে আমার ধারণা জ্ঞাপন অর্থাৎ গোপন করলুম।

এর পর সে লিখলে, সে যে বাস্তবী নয়, সে যে আমার কল্পলোকের বাসিন্দে, ক্রমশ তার চেতনার ভিতর এই অনুভূতি ব্যাপ্ত আছে। সে মঞ্জরী নয়, সে সুমনা। সে পৃথিবীতে নেই, সে আছে সেই অমর্ত্য জগতে যে-জগতে আছে 'মনোজ্যোৎস্না'র অন্যান্য চরিত্রগুলি—কুমারেশ, অপরাজিতা, পাঁচু খানসামা, গজু মালী, টম কুকুর। মঞ্জরী হিসাবে তার যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, সে মরে যাবে। সুমনা হিসাবে সে অমর। আমার প্রতি তার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, আমি তাকে প্রাণলোক থেকে তুলে নিয়ে অমরলোকে পৌঁছিয়ে দিলুম।—একটি মরা গোলাপ ফুল চিঠির গায়ে এঁটে দিয়েছে।

এরূপ এক একখানা চিঠি আমাকে অভিভূত করে আমার বিবেকে নাড়া দিয়ে যায়। সুমনাকে মঞ্জরী ও মঞ্জরীকে সুমনা বলে প্রতারণা করলুম না তো? অতিরঞ্জন? না, না। সত্যই বলেছি। কবি তার কল্পনার উপাদান এই পৃথিবী থেকে আহরণ করে। কখন সজ্ঞানে, কখন অজ্ঞাতসারে। সেই উপাদান দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে সে গড়ে মানবমানবীব মূর্তি। অবশেষে একদিন ঐ মূর্তিগুলিকে প্রত্যপর্ণ করে পৃথিবীরই হাতে। ওদিকে অনুরূপ উপাদান দিয়ে প্রকৃতিও মাতৃগর্ভের অন্ধকারে মানব-মানবীর মূর্তি বানায়, যথাকালে ঐ মূর্তিগুলিকেও পৃথিবীর কোলে তুলে দেয়। দুই সেট মানবমানবী মূর্তির মধ্যে এমন দুটি কি খুঁজলে মিলবে না, যাদের সাদৃশ্য কেবল ভাবের নয়, রূপেরও? মনের নয়, মুখেরও? ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হতে পারে, কিন্তু সত্য। হোরেশিওর ফিলসফিতে এর সন্ধান পাওয়া যাবে না, কিন্তু হ্যাম্‌লেট একে স্বচক্ষে দেখেছে।

আমি অভিভূত হয়েছিলুম মনে পড়ে। মঞ্জরীকে লিখেছিলুম তার চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজন হলে আমি অর্থ সাহায্য করতে পারি। চিঠিখানা ডাকে দিয়ে ভাবনা হয়েছিল ওখানা হয়ত কোনদিন ছাপা হবে, তখন শত্রুপক্ষ ওর বিরূপ ব্যাখ্যা করবে। করুক, কিন্তু মঞ্জরীর বেঁচে থাকা তার নিজের পক্ষে যেমন অবশ্যক, তেমনি আমার পক্ষেও। কল্পিতাকে জীবিতা বলে জানা অসাধারণ সৌভাগ্যের বিষয়, জগতে এর পূর্বে এমনটি ঘটেছে কি না সন্দেহ। গ্রীক ভাস্কর পিগ্‌মেলিয়ন তাঁর স্বনির্মিত শিলামূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার দেখেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। সে শুধু প্রবাদ। গ্রন্থের নায়িকা গ্রন্থকারের সুমুখে উপস্থিত হয়ে কোনদিন কি বলেছে, 'আমি শকুন্তলা' বা 'আমি মিরান্দা'?

আমার মৃত্যুর পর আমার এই ডায়েরি পড়ে বন্ধুরা বলবেন, বুড়ো বয়সে আফিং ধরে বিশ্বদেবদার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। তাঁর সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বয়সে নিশ্চয়ই তিনি এই তরুণীকে শিশু অথবা বালিকা রূপে কোনদিন দেখে তারপর সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন, গল্পের মধ্যে বিস্মৃতির অর্গল খুলে গেল। একটু খোঁজ করলে প্রকাশ পেত যে যমুনা নদীর বন্যায় দাদা একে ভেসে যেতে দেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলেছিলেন।

শত্রুরা বলবে, বিশ্বদেব বুড়োর বুদ্ধিভ্রংশ যে হয়েছিল সে বিষয়ে আমরাও একমত। তবে তার সঙ্গে কিছু অসাধুতাও ছিল। সোজা লিখলেই হত যে মেয়েটিকে তিনি কোনদিন চাক্ষুষ দেখেননি, সুমনা চরিত্রটি কল্পিত। লিখলেন কিনা মেয়েটিকে তিনি তাঁর জন্মের আগে দেখেছেন। দ্বিতীয় সিরাজুদ্দৌলা! বোকা মেয়ে এই পড়ে সগর্বে পাঠালে তার ছবি। সে ছবি আমাদের চোখে পড়েনি, তবু আমরা জোর করে বলতে পারি যে সুমনার যে ছবি বইতে ফুটেছে—অর্থাৎ ফোটাবার নিষ্ফল চেষ্টা করা হয়েছে—সে ছবির সঙ্গে ও ছবির সাদৃশ্য থাকতে পারে না। কিন্তু নেশার ঘোরে বৃদ্ধ মহারথী লিখলেন কিনা একই ছবি। এর পর যদি মেয়েটির যক্ষ্মা না সারে, যদি পড়াশুনা ও স্বাস্থ্যচর্চা ত্যাগ করে অলসভাবে ধ্যান করতে থাকে যে সে সুমনার মত তিল তিল করে মরলে সেইটেই হবে রোমান্টিক মৃত্যু, তবে সেই বিপত্তির জন্যে দায়ী আমাদের পরলোকগত নারীঘাতক বিশ্বদেব ভাদুড়ী।

দুই পক্ষই ভুল করবেন গোড়াতেই। তাই এ স্থানে খুব স্পষ্ট ভাষায় বলি যে মঞ্জরীর সঙ্গে আমার পত্র ব্যবহারকালে আমার কোন প্রকার মৌতাত ছিল না। বাকিগুলো আমি সংশোধন না করলেও ভাবীকাল করবেন। অতএব মঞ্জরীর প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

মঞ্জরী লিখলে, আমি যে ওর চিকিৎসার জন্যে অর্থসাহায্য করতে ইচ্ছুক এতে আমার মহানুভবতার—মহামানবতার—আর একটি নিদর্শন পেয়েছে। কিন্তু কি লাভ! এই একই রোগে তার বাবা মারা গেছেন, তার দাদাও। এমন কেউ নেই যার জন্যে বেঁচে থাকতে ভালো লাগে। মা অবশ্য আছেন এবং মামারা। কিন্তু ওঁদের সঙ্গে তার অন্তরের যোগ নেই। শুধু রক্তের সম্বন্ধ। ওদের চেয়ে আমি তার আত্মীয়তর। কিন্তু আমার বাঁচা ও মরা দুই সমান। চিরকাল আমার সৃষ্টিতে সে থাকবে।

আমারও মনে হয় ও যে বাঁচতে চাইলে না এর সত্যিকার কারণ 'মনোজ্যোৎস্না'র সুমনাও বাঁচেনি। সুমনাকে সে অনুবর্তন করছিল চোখ বুজে। আমি যদি সুমনাকে দিন দিন মিলিয়ে যেতে না দিয়ে বাঁচিয়ে তুলতুম তা হলে একখানা উপন্যাস মাটি হতো, কিন্তু একটি মানুষ বাঁচবার প্রেরণা পেত। Goethe তাঁর 'Werther' লিখে কত যুবকের আত্মহত্যার হেতু হলেন, ভাবীকাল 'মনোজ্যোৎস্না'র লেখককেও কত মঞ্জরীর মৃত্যুর ভাগী করবে। কি কুক্ষণেই 'মনোজ্যোৎস্না' লিখেছিলুম ও কেন মঞ্জরীকে মিথ্যা বলিনি এ জন্যে আমার পশ্চাত্তাপ হয়। স্বয়ং যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলেছিলেন, আমিও বলতে পারতুম। কিন্তু আমার তো পুরোদৃষ্টি ছিল না। আমি দৈবজ্ঞ নই, জানতুম না যে মঞ্জরীর যক্ষ্মা দেখা দেবে।

আর একদিক থেকে যদি ভাবি তো পরিতাপের অবকাশ থাকে না। 'মনোজ্যোৎস্না'র সুমনা ফুলের গন্ধের মতো মিলিয়ে গেল, পৃথিবীর রূঢ়তা তার সইল না। সুমনার সঙ্গে মঞ্জরীর যখন এমন অলৌকিক সাদৃশ্য তখন দু'জনের যে একই পরিণাম হবে এ তো বিধাতার বিধান। এমন তো হতে পারে যে কুশ-লবের মুখে রামায়ণ গান শোনবার পরে সেই গানের বিবরণকে অনুসরণ করা হল। রামচন্দ্রের শেষ জীবনের কাজ ও সে কাজ সাঙ্গ হল তাঁর তিরোধানে।

মঞ্জরী যে সুমনা এ বিষয়ে তার সংশয়রাহিত্য তাকে মৃত্যুর প্রস্তুত করে রেখেছিল। যা অনিবার্য তার গায়ে ডাক্তারি কবিরাজি ইত্যাদি নানা প্রকার ঠেকা দিতে তার আপত্তি ছিল। তার মা ও মামারা অবশ্য নিজেদের কর্তব্য করেছিলেন। কিন্তু কালো মেয়েকে বাঁচাতেই হবে এ রূপ দৃঢ় সংকল্প তাঁদের ছিল না। তার বেঁচে থাকা এমন কি জরুরী! লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন, যাতে সে জীবনে একটা অবলম্বন পায়। তাঁরা তাকে সমুদ্রের ধারে বাস করতে নিয়ে গেলেন ও আশা করলেন যে ওই তার জীবনরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রতি সপ্তাহেই পুরী থেকে পেতুম সেই নীল খাম, সেই হাতের লেখা। মৃত্যুর ধীর পদক্ষেপ তাকে চকিত করেনি। তাড়াতাড়িতে লিখছি, ভুল-চুক মাফ করবেন, এমন ভাব সে লেখনীর গতিতে ব্যক্ত করেনি, লেখাতেও না। যা ঘটবার তা ঘটতে যাচ্ছে, ত্বরায় অর্থ নেই, শঙ্কাও অমূলক। দশ এগারো মাস এই ছিল তার ধারা। তারপর হঠাৎ তার অসুখ গেল বেড়ে। ডাক্তার তাকে চিঠি লিখতে নিষেধ করে দিলে। লুকিয়ে লিখতে গিয়ে সে ব্যস্ততা ও উত্তেজনা প্রকাশ করলে। আমাকে একবার দেখতে চাইলে।

এতদিনের জানাশুনা। তবু সাক্ষাৎ করবার কথা কোনদিন মনে ওঠেনি। প্রস্তাবটা আমাকে বিব্রত করে তুলল। দেখতে না পেলে মঞ্জরী খেদ নিয়ে মরবে। আর যাওয়া কি আমার মত প্রসিদ্ধ লোকের পক্ষে মুখের কথা? আমার গতিবিধির 'পর সমগ্র দেশের নজর। আমি আমার দেশবাসীর নজরবন্দী। খবরের কাগজের রিপোর্টার আমার উপর পাহারা দিচ্ছে। মধুপুর থেকে কলকাতা গেলে সাড়া পড়ে যায়, হাওড়া স্টেশনে ক্যামেরা ও অটোগ্রাফের খাতা দুটো করে পায়ের উপর ভর দিয়ে ভিড় করে আসে। পুরী যাচ্ছি, টের পেলে স্পেশ্যাল রিপোর্টার সঙ্গে চলবে। মঞ্জরীর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে কী অপরূপ রোমান্স রচিত হবে কে জানে? বন্ধুরা লজ্জিত হবে, শত্রুরা টিটকারি দেবে, বেচারী মঞ্জরী মরেও নিষ্কৃতি পাবে না। তার নাম মুখে মুখে ছড়াবে, ইতরগুলো তার নামে ছড়া কাটবে।

না, মঞ্জরী, যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। আমাকে তো তুমি মাসিকের সাপ্তাহিকের দৈনিকের ছবিতে দেখেছ। আমার বাণীও সপ্তাহে সপ্তাহে শুনেছ। দেখাশুনার কিছু বাকি আছে কি?

আমার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল টপ টপ করে পড়ে আমার নূতন উপন্যাস 'সতীর সতীন'-এর পাণ্ডুলিপি ভিজাল, অক্ষর মুছে দিল। সে যে মরণাপন্ন এ জন্যে নয়, মৃত্যু যার অবধারিত তার জন্যে শোক করে কী হবে? আমি যে তার সামান্য প্রার্থনাটুকু পূরণ করতে পারলুম না ক্ষোভ এই জন্যে। আমি লক্ষপতি, রেলভাড়ার জন্যে ভাবিনে। গরিব কেরানির মত ছুটি চেয়ে পাইনি এও নয়। আমার ভয় আমরা স্তাবকমণ্ডলীকে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে। যতদিন অখ্যাত সেবাকর্মী ছিলুম, ততদিন মানুষকে ভয় করিনি। আজ আমার খ্যাতি আমাকে রেল প্ল্যাটফর্মের পানবিড়িওয়ালার নিন্দাভীরু করেছে।

দিন কয়েক পরে মঞ্জরীর বড় মামার পত্র পেলুম। যা অনুমান করেছিলুম তাই—মঞ্জরী নেই। যা অনুমান করিনি তাও ছিল। মঞ্জরী নাকি মৃত্যুকালে বলে গেছে আমি তার স্বামী।

বড় মামা জিজ্ঞাসা করছেন, তা কেমন করে হল? যেমন করেই হোক মঞ্জরীর মা সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে শীঘ্রই এখানে আসছেন জামাতা বাবাজীকে আশীর্বাদ করতে।

আমি আফিং ধরলুম।

কেবল হিসেব, আর হিসেব! সংসার চালানো মানেই তাই। এ যেন ছেঁড়া জাল দিয়ে মাছ ধবা। একদিক সামলাতে যাও তো আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। প্রশান্ত যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চায় এ ঝামেলা। কিন্তু বাড়িব কর্তার কি নিস্তার আছে এর হাত থেকে! হিসেব তাকে করতেই হয়—মোটা খরচের হিসেব, দমকা খরচের হিসেব, ধার শোধ দেবার হিসেব, টাকা জমানোর হিসেব; স্ত্রী শৈলর উপর ভার দৈনন্দিন সংসারের হিসেবের। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, প্রশান্ত হিসেব করে টাকায়—মাসের প্রথমে; শৈল হিসেব করে পয়সায় আর আনায়—মাসেব তিরিশ দিন।

মাসপয়লা আপিস ফেবত বাড়ি ঢুকবার মুহূর্তে প্রশান্তব মেজাজ একটু ভারিক্কি হয়ে ওঠে। সদব দরজার চৌকাঠটা পর্যন্ত জুতোর ঠোকরে বুঝতে পারে যে এ লোকটি নেহাত হেঁজিপেঁজি নয, বাড়ির হর্তাকর্তা-বিধাতা, এতগুলি লোকেব অন্নদাতা। আজকে চোখ বুজলে ভেসে যাবে এতগুলি লোক। বাড়িব গিন্নি এখন নির্জীব, ঢোঁড়াসাপ। মাইনের টাকাটি হাতে পাবার পব থেকে তাঁর গিন্নিপনা আরম্ভ হবে। ঠিকে ঝি গুলটেনের-মা প্রতি মাসপয়লায় অপেক্ষা করে বাবুব আপিস থেকে বাড়ি ফিরবার। সে এ পাড়াব ডাকসাইটে দজ্জাল ঝি। পোড়া-বাসন মাজবার সময় চিৎকাব করে বে-আক্কেলে বাড়ির লোকদের গালাগালি না দিলে সে গতরে জোর পায় না। কাউকে ছেড়ে কথা বলে না—উঠতে বসতে এমন চাকরি থেকে ইস্তফা দেবার হুমকি দেয়। মাইনে নিতে একটি দিনের তর সইবে না।

সে বাবুকে বাড়ি ঢুকতে দেখে একটুও সরে বসল না। পকেট থেকে টাকাটা বার করে শৈলর হাতে দেবার সময় প্রশান্ত অন্যদিকে তাকিয়েই হাতটা বাড়িয়ে দেয়—নেহাত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে—যেন আজকের ডাকে পাওয়া একখানা সাধারণ চিঠি তার হাতে দিচ্ছে। এইটাই চরম পরিতৃপ্তির মুহূর্ত। ভাব দেখাতে হয়—যাক, একমাসের মতো আমি দায়মুক্ত; আমার শুধু এ সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ, রোজ যেন চাবটি চারটি খেতে পাই, আর সন্ধ্যাবেলার তাসের আড্ডায় যেতে পাই। ব্যস! তাহলেই হল। ছেলেপিলের অসুখবিসুখ আবার বাধিয়ে নিয়ো না যেন! তাহলে খরচকে খরচ, আর আমার 'ব্রিজ'-এর আড্ডায় যাওয়া বন্ধ! ওই একটাই তো আমার নেশা—বিড়ি সিগারেটটা পর্যন্ত খাই না!...

শৈল আট টাকা গুনে গুলটেনের-মায়ের হাতে দেয়। 'বাবা রে বাবা! হল?'

মাইজীর মুখের মৃদু হাসিকে উপেক্ষা করে গুলটেনের-মা মুখঝামটা দেয়—'এর মধ্যে আবার বাবারে বাবা কি? ভিক্ষা নিচ্ছি না কি? বাবু পয়লা মাইনে পাবে, আর আমি পয়লা মাইনে চাইলেই দোষ? আট টাকা দেখাতে এসেছে! এমন আট টাকা ঢের দেখেছি! কাঁড়ি কাঁড়ি পোড়া বাসন! অন্য সব বাড়িতে ঝি-চাকরদেব দশহরা আর হোলিতে একখানা করে কাপড় দেয়—এ বাড়িতে সে পাটও নেই। চাকরির আবার অভাব! সেরিস্তাদারবাবুর বাড়িতে খোশামোদ করছে আমায় ন-টাকা মাইনেতে। নেহাত একটা পুরনো সম্বন্ধ আছে অনেককালের বলে ছেড়ে যাইনি এতদিন। সোজা বলে দিচ্ছি, দশহরা আর হোলিতে যদি

আমায় কাপড় না দেন তাহলে আর কাজ করব না এ বাড়িতে। মাসের প্রথমেই বলে দেন। তাতে গেরস্তেরও সুবিধে, আমারও সুবিধে।'

একবার আরম্ভ হলে, এ এখন থামবার নয়। শৈল কাতর মিনতি জানায়—'আচ্ছা বাপু এখন যা! বাবুকে একটু মুখহাত ধুয়ে জলটল খেতে দিবি, না তাও দিবি না?'

একখানা ময়লা নোট বদলে, রাগে গজগজ করতে করতে গুলটেনের-মা চলে গেল। তার উপর প্রশান্ত চিরকালই বিরক্ত। সংসারের ব্যাপারে সে সাধারণত কথা বলতে চায় না। কিন্তু আজ মাসপয়লার মেজাজে সে বলেই ফেলল।

'ছাড়িয়ে দিলেই হয় এটাকে! আজকাল আবার লোকের অভাব! রেফিউজি ক্যাম্পের হাজারটা লোক ঘোরাঘুরি করছে কাজের খোঁজে। সেই, যে মেয়েমানুষটা সেদিন তোমায় বাঁশের ধুচুনি তয়ের করা শেখাচ্ছিল—সেটা তো ছ'টাকাতেই কাজ করতে রাজী, বললে না?'

'কে চাঁপা? রেফিউজি ক্যাম্পের লোক কে কেমন—জানা নেই, শোনা নেই! গুলটেনের-মা হাজার হলেও পুরনো লোক! ওকে পুজোর কাপড় দেব না ছাই! ও ওরকম বলে!'

প্রশান্ত আর কথা বাড়াতে চায় না। স্ত্রীর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মনের এই দিকটার সঙ্গে সে অপরিচিত। বয়স্থা স্ত্রীলোক ছাড়া আর কাউকে শৈল বাড়িতে ঝি হিসেবে রেখে স্বস্তি পায় না।

সে রাত্রে খেলা জমেছিল ভাল। কেবল শেষ হাতে পার্টনার যদি রুইতন না খেলে হরতন খেলে, তাহলে কিভাবে বদলে যেতে পারত খেলা, সেই কথাই ভাবতে ভাবতে প্রশান্ত বাড়ি ফিরছিল। দোরগোড়ায় এসে চমক ভাঙল। এ কি? বাড়িতে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে! রোজ যখন সে ফেরে তখন বাড়ি নিশুতি। আগে শৈল হেঁসেলে রাত বারোটা পর্যন্ত তার জন্য ভাত আগলে বসে থাকত। বিয়ের পর থেকেই তার অম্বলের ব্যামো। আজকাল বেড়েছে। প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে মাথা ধরে। চেহারা দিনদিনই শুকিয়ে দড়িপাকানো গোছের হয়ে যাচ্ছে। ত্রিশ বছর বয়সে গায়ে কোথায় একটু মাংস লাগবে, তা নয় ঠিক উলটো। কবিরাজমশাই বলেছিলেন, সকাল সকাল খাওয়া, সকাল সকাল শোয়া, এই হচ্ছে এ রোগের একমাত্র ওষুধ। নিজের শ্রীহীন চেহারার কথা ভেবে, সে কবিরাজ মহাশয়ের নির্দেশ মেনে চলতে রাজি হয়েছে। রাতে ঘরের মধ্যে প্রশান্তর ভাত ঢাকা থাকে। তবে আজ জেগে কেন সবাই? প্রশান্তর মনের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। খোকার আবার অসুখবিসুখ হল না কি? এই তো সেদিন অসুখ থেকে উঠল। আবার হয়তো এক খরচের ধাক্কা! দিনকতক সবাই ভাল থাকলেই তার ভিতরের মন বলে যে, আবার এক ঝাঁক ওষুধপথ্যির খরচ আসছে। গতমাসে শৈলর সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপনে একটা মোটা টাকা খরচ হয়েছে। কোথায় ভাবছিল এমাসে কিছু জমাতে পারবে পুজোর সময়ের জন্য। অমনি কি একটা দমকা খরচ আসবে! চিরকাল, সে লক্ষ্য করে আসছে যে, টাকা জমানোর যোগাড় করলেই, আচমকা একটা খরচ ঘাড়ে এসে পড়ে—তা সে বাসন চুরি গিয়েই হোক কিংবা কোনও শালাশালীর হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েই হোক।...

বাড়ি ঢুকে সে অবাক হয়ে গেল। প্রথমটায় চিনতে পারেনি। সাদা লম্বা দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করছেন। কোথায় যেন দেখেছে এঁকে আগে! চেনাচেনা মুখ!

'এই যে প্রশান্ত! তোমার ছেলেমেয়েদের বলছিলাম, স্কুল-বোর্ডিং-এর তোমার সেই 'নিখিলভারত কুলকুচা-প্রতিযোগিতার কথা। এরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।...' এতক্ষণে চিনতে পেরে প্রণাম করল প্রশান্ত। অঙ্কের মাস্টার দ্বারিক মুখুজ্যে। বোর্ডিং-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। ছেলেরা বলত দাড়ি মুখুজ্যে। তখন ছিল কালো দাড়ি; তাই চিনতে পারা যাচ্ছিল না এখন। ভদ্দরলোক দরকারের চাইতেও বেশি কড়া। বোর্ডিং-এ খাওয়া-দাওয়ার পর আঁচানোর সময় একদিন কুলকুচো-কুলকুচো খেলার আবিষ্কার। কে কতদূর জল ফেলতে পারে কুলকুচো করে, এই দিয়েই খেলার আরম্ভ। জীবনে এই একটা খেলাতেই প্রশান্ত ফার্স্ট হতে পেরেছিল। এখনও বেশ মনে আছে— তার 'রেঞ্জ' ছিল মাটিতে দাঁড়িয়ে ন'ফুট ছ'ইঞ্চি; বোর্ডিং-এর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দশ ফুট। তার কুলকুচোর নিশানাও ছিল অব্যর্থ; টার্গেট প্র্যাকটিস্-এর সময় আগে থেকে বন্ধুদের মধ্যে সাড়া পড়ে যেত—এইবার আসছে প্রশান্তর বুলেট! নিজে অবধারিত পাবে জেনে, একটি চায়ের কাপ কিনে, প্রশান্ত 'নিখিল-ভারত কুলকুচা-প্রতিযোগিতা' আহ্বান করেছিল। দাড়ি মুখুজ্যে ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁর বোর্ডিং-এ এই অনাচারের খবর পেয়ে, তিনি প্রশান্তদের স্কুল থেকে রাস্টিকেট্ করার ভয় দেখান। সব মনে আছে। এর পর থেকে তার বিলক্ষণ রাগ ছিল দাড়ি মুখুজ্যের উপর। সেই দ্বারিক মুখুজ্যে!

'আপনি হঠাৎ? আমার ঠিকানা পেলেন কি করে?'

'ঠিকানা পাবার জন্য কি কম কষ্ট করতে হয়েছে! কৃতী ছাত্ররাই তো শিক্ষকদের বুড়ো বয়সের সম্বল। ভাবলাম একবার দেখা করে আসি প্রশান্তর সঙ্গে। হবে এখন সে সব কথা পরে।'

তাঁর ছাত্রের কৃতিত্বের বর্তমান বাজারদর মাগ্‌গিভাতা সমেত মাসিক একশ আটাশ টাকা, এ খবর তিনি জানেন কিনা বোঝা গেল না। এই অবাঞ্ছিত অতিথি এখন কদিন থাকবেন কে জানে! বাড়িতে শোয়ার ঘর তো একখানি! শৈল ছিল রান্নাঘরে। তার কাছেই প্রশান্ত শুনল অতিথির এ বাড়িতে ঢুকবার ইতিহাস।...প্রথম যখন ভদ্দরলোক প্রশান্তর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকেন, তখন শৈল খোকাকে দিয়ে বলিয়েছিল যে বাবা বাড়ি নেই, ফিরতে রাত হবে। তিনি বাইরের সিঁড়ির উপর বসলেন। ঘণ্টাখানেক পর আবার চিৎকার —খোকা মাকে বলো যে আমি তোমার বাবার মাস্টার মশাই; আজ রাতে এখানে খাব। ...এরপর কি চোখকান বন্ধ করে থাকা যায়? এনে বসালাম ঘরে।...

মাস্টারমশাই কেন যে তাঁর কৃতী ছাত্রদের এমন গরুখোঁজা করে খুঁজতে আরম্ভ করেছেন সে খবর জানা গেল খাওয়ার সময়।...তাঁর ছোটমেয়ের বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর। এতদিনে বিয়ের ঠিক হয়েছে এক জায়গায়। সেইজন্য তিনি টাকা সংগ্রহে বেরিয়েছেন। পুরনো ছাত্রেরা যে যা পেরেছে দিয়েছে। অনেকেই আবার তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়ে, পাড়া থেকে দু-দশ টাকা চাঁদাও সংগ্রহ করে দিয়েছে। উনি আন্দাজ দিলেন টাকা ত্রিশ-চল্লিশ আশা করেন এখান থেকে।...

এই রকমই একটা কিছুর ভয় করছিল প্রশান্ত। বৃদ্ধ অঙ্কের মাস্টার ছিলেন; তাই আজও হিসেবে ভুল হয়নি তাঁর! একেবারে পয়লা তারিখে এসেছেন! হাতে কিছু নেই বলবারও উপায় নেই!

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে অনেক আলোচনার পর ঠিক হল, এঁকে কালই বিদায় করতে হবে। নইলে উনি এখন এখানে থেকে চাঁদা তুলে বেড়াবেন পাড়ার লোকের কাছ থেকে। এখানে

থাকা মানেই খরচ। অসুবিধাও অনেক। তার চেয়ে নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছু টাকা থোকে ওঁকে দিয়ে কাল সকালেই বিদায় করে দেওয়া ভাল।

যেতে কি চান। পনেরটা টাকা দিয়ে অতি কষ্টে তাঁকে বাগ মানানো গেল কোনও রকমে। তিনি তো গেলেন; কিন্তু পারিবারিক বাজেটের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল। এটাকে গুরুদক্ষিণা বলে ভাবতে পারলেও মনে তৃপ্তি পাওয়া যেত। কিন্তু দাড়ি মুখুজ্যের উপর সে যে ছিল হাড়ে চটা চিরকাল। একেবারে বিনা নোটিসে পনের টাকা খরচ! শৈলই প্রথম কথা পাড়ল। সংসারের খরচ কমিয়ে এই পনের টাকা পুষিয়ে নেবার দায়িত্ব তারই।

'তবু ভাগ্যি যে কারও কাছে হাত পাততে হয়নি। গুলটেনের-মাকে ছাড়িয়ে দিলেই হয়। দু-মাসেই তাহলে টাকাটা উঠে আসবে।'

'না না। সে হয় না।'

'কেন বিনা ঝিতে কি আমি চালাইনি কখনও?'

'যখন চালিয়েছ, তখন চালিয়েছ। এখন কি তোমার সে-শরীর আছে! দেখ তো, হাতের সব শিরাগুলো বেরিয়ে পড়েছে। আয়নাতে দেখেছ, তোমার চেহারা কি হয়ে যাচ্ছে দিনদিন?'

প্রশান্ত জানে যে শৈলর মনের এই দিকটা বড় স্পর্শ-কাতর।

শৈল রাজি হয় গুলটেনের-মাকে ছাড়িয়ে চাঁপাকে রাখতে। মাসে দু-টাকা করে বাঁচবে। এ মাইনে নেবে ছ'টাকা করে। পনের টাকা পুরোতে লাগবে আট মাস। ততদিন এখানে রেফিউজি ক্যাম্প টিকলে হয়!...শোনা যাচ্ছে যে শিগগিরই এখানকার ক্যাম্প উঠে যাবে। ভালই হবে। চাঁপা-টাঁপার মতো মেয়েদের বেশিদিন রাখা কোনও কাজের কথা নয়। ...আর দু-চার মাসের মধ্যে সে নিজেই বোধ হয় সেরে উঠবে।...

সদ্য বরখাস্ত করা গুলটেনের-মায়ের চিৎকার শৈলর মনের খটকা আরও বাড়িয়ে দেয়। সদ্যনিযুক্তা চাঁপার উদ্দেশ্যে গালাগালি দিয়ে সে পাড়া মাথায় করে।

...'ওই বজ্জাত পাকিস্তানী মাগী, চাল নেই, চুলো নেই, কোথায় বাড়িঘর তার ঠিক ঠিকানা নেই। এখানে এসে, লম্বালম্বা গপ্পো ঝাড়ে, ওর নাকি তিনশ বিঘা ধানের ক্ষেত ছিল। ছাই। গভর্নমেন্টকে ঠকিয়ে খাচ্ছে। ওদিকে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে খোরাকি নিচ্ছে, আবার এদিকে বাবু ভাইদের বাড়িতে কাজ নিয়ে আমাদের দানাপানি বন্ধ করছে। আর কত রকমে তোরা রোজগার করিস জানি না বুঝি? যার চোখ আছে সেই দেখছে। গা ফুটে কুষ্ঠ বেরুবে, এই বলে রাখলাম! গুলটেনের-মায়ের কথা কখনও মিথ্যা হয় না। আর এই বাড়ির মাইজীকেও বলি—নিজের দেশের লোক পেয়েছ বলে কি চোখ বুঁজে তাকে রাখতে হবে নাকি? বাঙালী হলেই বাঙালীর দিকে টানে—এ জিনিস চিরকাল দেখে আসছি। নিজের দেশের ভিখিরির দেখা পেয়েছ বলে কি এখানকার এতকালকার সব সম্বন্ধ ধুয়ে পুঁছে ফেলে দিতে হবে? মুলুকের গাধার লাদও বুঝি এখানকার গোবরের চেয়ে ভাল?'...

সে-রাত্রে প্রশান্ত তাসে দশ পয়সা জিতেছিল। সেই জন্য মনটা বেশ ভাল ছিল। রাতে খাওয়ার পর সে ঘর থেকে বেরুল আঁচাতে বাইরের বারান্দায়। রাত নিশুতি। উঠোনে জোছ্না ফুটফুট করছে। এক ঘটি জল রয়েছে বারান্দায়—শৈলর কোনও কাজে ত্রুটি

নেই। আঁচাবার সময় হঠাৎ মনে পড়ল দাড়ি মুখুজ্যের বলা কুলকুচো প্রতিযোগিতার কথা। এখন ভাবলেও হাসি পায়। কি দিনই গিয়েছে সে সব। সব জিনিসেই অভ্যাসের দরকার, এখন বোধ হয় আধফুটও 'ক্লিয়ার' করতে পারবে না। উঠোনের মাঝখানে শৈল এঁটো বাসনগুলো নামিয়ে রেখে দিয়েছে, ঝি ভোরে এসে মেজে দেবে বলে। কতদূর হবে বাসনগুলো এখান থেকে? ছ'ফুট হবে নিশ্চয়ই। এটুকু সে পারবে না কুলকুচো করে ফেলতে? নিশ্চয়ই পারবে।...ঠিক পেরেছে! অনায়াসে।...আনাড়ীরা জানবে কি করে, মাথাটা কত ডিগ্রি পিছন দিকে ঝোঁকালে কুলকুচোর বুলেট সব চেয়ে বেশি দূরে যায়; ঠোঁট দুটোকে মুড়ে তার পরিধি কতটা সংকুচিত করলে, নিশানা ঠিক করতে সব চেয়ে সুবিধা হয়। আছে, এর মধ্যে আরও অনেক রকমের সূক্ষ্ম কারিগরি আছে। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী উঁচু করে মুখখানাকে, সে বাসনগুলোর দিকে কুলকুচোর পিচকিরি ছুঁড়ল। একেবারে 'বুল্‌স্‌-আই'! ঠিক জামবাটির মধ্যে গিয়ে পড়েছে! এত নির্মল আনন্দ সে বহুকাল পায়নি। ছেলেমানুষের মতো সে উৎসাহ পাচ্ছে এ খেলায়।...ভাগ্যে শৈল এখন শুয়ে; নইলে এঁটোজল এমন করে সারা উঠোনে ছিটোতে দেখলে এখনই অনর্থ বাধাত!...ঘটির জল ফুরিয়ে গেল। আচ্ছা। আবার কাল হবে। এখান থেকে ওই বাসনগুলো কয় পা দূরে, সে হেঁটে মেপে দেখে। ন' পা! মোটে! কাল থেকে সে আবার কুলকুচো ছোঁড়া অভ্যাস করবে। প্রত্যহ সে চেষ্টা করবে আগের দিনের রেকর্ড ভাঙতে।...পঁচিশ বছর আগেকার বোর্ডিং জীবনের ছেলেমানুষ মনটিকে হঠাৎ যেন আবার খুঁজে পেয়েছে আজ।

দিনচারেক পর সন্ধ্যাবেলায় তাস খেলতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে প্রশান্ত। নজর পড়ল খোকার উপর। রান্নাঘরে একটি ছোট বালতির উপর পিঁড়ি চাপা দেওয়া আছে। সে সেই পিঁড়ির উপর মাথা কাত করে রেখে হাঁটু গেড়ে বসেছে।

'কি হচ্ছেরে খোকা?'

'মাছের টেলিগেরাপ শুনছি।'

'টেলিগ্রাফ!'

'হ্যাঁ। শিঙ্গি মাছের।'

কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। বালতির ভিতর শিঙ্গিমাছ ঢাকা আছে। শোবার ঘর থেকে প্রশান্তর কথা শুনে ছুটে এল শৈল। দু-চার ঘা পড়ল খোকার পিঠে।

'যা মানা করি তাই! আঁষ ঘাঁটা! মাছের বালতির উপর শুয়ে আছেন। কিছু আর রাখলে না এরা! হাত ধুয়ে আয় আগে! আবার গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি! দাঁড়া তো!...'

সামান্য কারণে শৈলর এত রাগ দেখে প্রশান্ত একটু আশ্চর্য হয়। মেজাজ দিনদিনই তিরিক্ষি হয়ে উঠছে। কিন্তু সে সবচেয়ে অবাক হয়েছে শিঙ্গিমাছ দেখে। প্রশান্ত নিজে বাজার করে। সে তো আনেনি। যেসব মাছে আঁশ নেই সে মাছগুলো এ বাড়িতে তো আসে না। কেউ খায় না। আপত্তি সব চেয়ে বেশি শৈলরই!

'খোকার পেটটা ঠিক যাচ্ছে না। তাই আনালাম শিঙ্গিমাছ। বাড়ির প্রত্যেকটি লোক আছেন যে যার নিজের মতো! সব ধকল এসে পড়ে আমারই ওপর!''

শৈলর চোখে জল এসে গিয়েছে। চোখের জল তার হাতধরা! এত মারধোর কান্নাকাটির কি হল বুঝতে পারে না প্রশান্ত। ঠেস দিয়ে বলা কথায় অকারণে নিজেকে দোষী দোষী মনে হয়। সত্যি! সংসারের সব ঝক্কি পোহাতে হয় বেচারি শৈলকেই! ওই

অস্থিচর্মসার শরীর নিয়ে উদয়াস্ত খাটছে! ছেলের যে শরীর খারাপ সে খবর পর্যন্ত রাখে না প্রশান্ত! নিজে থেকে বুদ্ধি করে রুগ্‌ণ ছেলের পথ্যটা পর্যন্ত কিনে আনে না! তাই বুঝি এই অভিমান, এই ব্যথা শৈলর। এসব কোনও বিষয়ে নজর নেই; তাস খেলতে বেরুচ্ছে এখন! সত্যিই সে স্বার্থপর! তাস খেলায় সে গড়ে মাসে দেড়টাকা করে হারে। যাদের সংসারে একটা দুটো পয়সার হিসেব করে চলতে হয়, তাদের পক্ষে কি নিজের ফুর্তির জন্য মাসে দেড়টাকা করে বাজে খরচ করা উচিত? না, সে আর তাস খেলতে যাবে না!

অনেককাল পর আজ প্রশান্ত সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে শুল।

কথা বলবে কি, শৈলর চোখের জল বাধা মানছে না। এত সোহাগ স্বামীর কাছে সে অনেকদিন পায়নি। তাস না খেলার জন্য, না কি জন্য যেন প্রশান্তরও সেরাত্রে ঘুম কিছুতেই আসতে চায় না। মাঝরাতে একটু তন্দ্রা এসেছিল। কপালে কি যে ঠাণ্ডা মতো লাগায় চমকে উঠল। ও শৈল! ঘুমের ঘোরেই বোঝে যে সে কপালে পয়সাটয়সা কিছু ঠেকিয়ে, সেটাকে রেখে দিয়ে এল। নিশ্চয়ই সিদ্ধেশ্বরীতলায় পুজো দেবে। তাস খেলতে না যাওয়ায় বোধ হয় ভেবেছে যে স্বামীর একটু শরীর খারাপ হয়েছে।...শৈলর হাতে একটা আঁষটে আঁষটে গন্ধ।...আবার ঘুম চোখ জুড়ে এল।

সকালে চোখেমুখে জল না দিয়েই চা খাওয়া প্রশান্তর চিরকেলে অভ্যাস। বারান্দায় এসে মোড়াটার উপর বসতেই দেখে, গুলটেনের-মা বাসন মাজছে। অবাক হবারই কথা। ছেলেমেয়েরা এসে বসেছে বারান্দায়; বাবার চা খাওয়া শেষ হলে সেই কাপে করে তারা চা খাবে। কে প্লেট কে পেয়ালা নেবে তাই নিয়ে রোজ ঝগড়া। শৈল চা নিয়ে এল। খোকা হঠাৎ হাততালি দিয়ে ওঠে।

'এ রাম! বাবার কপালে সিঁদুর। এ রাম! বাবা টিপ পরেছে।'

মনে মনে খুব লজ্জিত হল প্রশান্ত। শৈলর মুখ দেখে বোঝে যে সে অপ্রস্তুত হয়েছে আরও বেশি। হবারই কথা—মেয়ে বড় হচ্ছে।

কোঁচার খুট দিয়ে কপালের সিঁদুরের ছোপটুকু মুছে ফেলল প্রশান্ত। তার পর গুলটেনের-মায়ের দিকে চোখ ইশারা করে শৈলকে জিজ্ঞাসা করে—'একে আবার দেখছি?'

'হ্যাঁ।' বলেই শৈল রান্নাঘরে ঢুকে গেল। তার হাতে এখন অনেক কাজ; কথা বলবার সময় নেই।...চাঁপা নিশ্চয়ই ঝগড়াঝাঁটি করে থাকবে! যাক, শৈলর সংসার শৈল বুঝবে!

সেদিন শনিবার। তিনটের সময় আপিস থেকে বাড়ি ফিরল প্রশান্ত। উঠোনে প্রচণ্ড হইচই বেধে গিয়েছে। চাঁপা আর গুলটেনের-মা! কেউ কম যায় না। গুলটেনের-মায়ের হিন্দীতে গালাগালির তবু বোঝা যায়, কিন্তু চাঁপার পূর্ববঙ্গের গালাগালি ভাষা বোঝে কার সাধ্য! বারান্দায় বসে কাঁদছে শৈল। বাবুকে দেখে অন্যদিন মাথার কাপড় টেনে দিত চাঁপা; আর কোনওদিন মাথার কাপড় দেয় না গুলটেনের-মা। এখন দেখা গেল ঠিক তার উলটো। 'এই! বাবু এসেছেন!' বলে গুলটেনের-মা জিভ কেটে ঘোমটা টেনে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিল। চাঁপা তার কাপড় চেপে ধরেছে।

চাঁপার কথার যা অল্পস্বল্প বোঝা গেল তার অর্থ দাঁড়ায় যে—বাবুর কাছ থেকেই সে ব্যাপারটার সুবিচার চায়। এই জন্যই সে অপেক্ষা করছে।...ছ'টাকা মাইনের চাকরিতে ম

তাকে বহাল করে তিন দিন পরে ছাড়িয়ে দিলেন! কোন্ অপরাধে তা সে জানে না। কাল সকালে সে শুধু মাকে বলেছিল যে তাঁর মতো ঝি-চাকরের উপর দরদ আর কোনও বাড়িতে সে দেখেনি। এঁটো বাসনগুলোয় জল ঢেলে ভিজিয়ে রাখলে ঝি-চাকরের মাজতে কত সুবিধে, এ কথা কি সব বাড়িতে খেয়াল রাখে? সে শুধু দোষের মধ্যে বলেছিল—মা আপনি রোজ রাত্রে এঁটো বাসনগুলোয় জল দিয়ে রাখেন,—দিনের বেলায় রাখেন না কেন? রোদ্দুরে বাসনগুলো শুকিয়ে খরখরে হয়ে থাকে। মা শুধু জিজ্ঞাসা করলেন রাতে বাসনে জল দেওয়া থাকে না কি? তার পরেই চক্ষু রক্তবর্ণ। বললেন—আজ ওবেলা থেকে আর কাজ করতে হবে না; পাকিস্তানী মেয়েদের জানা নেই শোনা নেই; এর চেয়ে চেনাশোনা গুলটেনের-মা-ই ভাল।...বেশ কথা। রাখতে ইচ্ছা হয় রাখবে, ইচ্ছা না হলে রাখবে না। কিন্তু কি দোষ তুমি আমার পেলে মা তিন দিনের মধ্যে যে তোমার চোখে আমি বিষ হয়ে গেলাম? যাকগে! গরিবের আবার মান অপমান! ভগবানই আমাদের মেরেছে; তুমি আর আমার তার চেয়ে বেশি কি করবে! মা বলেছিল আজ এসে চারদিনের মাইনেটা নিয়ে যেতে! আজ মাইনে দেবার পর মা বললে, চারটি মাছের ঝোল ভাত খেয়ে যাও চাঁপা।...ভাত খাওয়াব পব খোকাবাবু তাকে গল্পে গল্পে জিজ্ঞাসা করেছে, সিদুঁর মাখানো শিঙ্গিমাছ খেতে তেতো, না ভাল?...সিদুঁর মাখানো শিঙ্গিমাছ? ওয়াক দিয়ে বমি আসবার যোগাড়! সিদুঁরে যে পারা থাকে! খেলে যে গা দিয়ে কুষ্ঠ বার হয়।. মায়ের কাছে চেঁচামেচি করতেই গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এল গুলটেনের-মা। সে তুকতাক জানে। নিজে শিঙ্গিমাছ এনে মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। মাইজীকে বলে সেই মন্ত্রপড়া শিঙ্গিমাছ তাকে খাইয়ে দিয়েছে। আরও কি কি করেছে সে-ই জানে। বলছে যে আর কেউ চাঁপার দিকে ফিরেও তাকাবে না, গায়ে কুষ্ঠ বেরুবে; যেমন পরের চাকরি খেতে গিয়েছিল তেমনই শাস্তি!...চাঁপার কপালে কি এও ছিল! কি করেছিল সে যে সবাই মিলে তাকে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে সিদুঁরমাখানো শিঙ্গিমাছ খাইয়ে দিল! সে এখনই গিয়ে ক্যাম্পের ডেপুটি সাহেবকে বলে গ্রেপ্তার করাবে গুলটেনের-মাকে। বাবু আপনি এর বিচার করে দিন।...

চাঁপা বাবুর পায়ে মাথা কোটে।

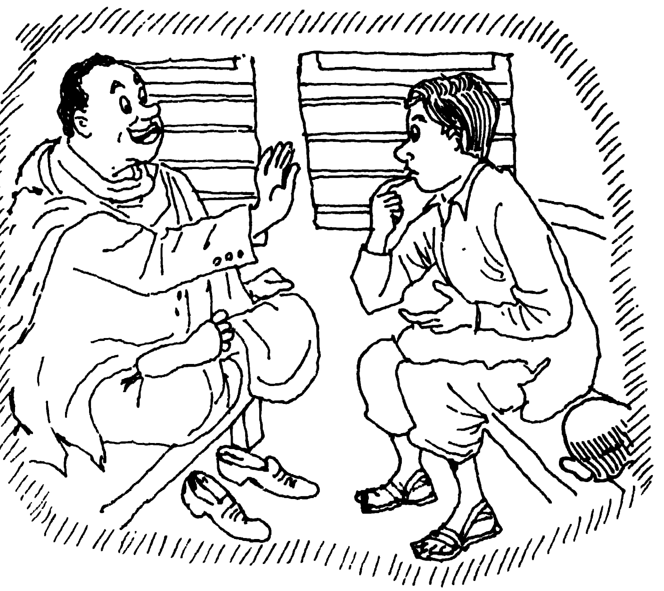
তাকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করে প্রশান্ত। দুটো টাকা আর একখানা পুরনো শাড়ি খেসারত দিয়ে তাকে অতিকষ্টে বিদায় করতে হয়। চাঁপা চলে গেলেও ভয় যায় না—সে আবার ক্যাম্পে গিয়ে এ নিয়ে হইচই না বাধায়! তাহলে কেলেঙ্কারির একশেষ!

শৈল অঝোরে কাঁদছে।

গুলটেনেব-মায়ের পরামর্শে, তার কপালে ঠেকানো শিঙ্গিমাছ চাঁপাকে খাওয়ানো, ছেলেমানুষি না? কিন্তু কি করবে প্রশান্ত শৈলকে? স্ত্রীর চেয়েও বেশি ছেলেমানুষি সে নিজে করেছে এঁটো বাসনগুলোর উপর কুলকুচো-কুলকুচো খেলা করে।

দুর্ঘটনা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র



সেভ্‌ন্ আপ দিল্লী এক্সপ্রেস্—ডাকনাম যাহার তুফান মেল—তাহারই একখানা থার্ডক্লাস কামরায় আমাদের নাটকের আরম্ভ এবং সেইখানেই যবনিকা।

গাড়িতে সেদিন কি কারণে জানি না, অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেরই কিছু কিছু লোক হরেক রকমের মোটঘাট লইয়া কামরাগুলিকে একেবারে ভরাইয়া তুলিয়াছিলেন এবং প্রবেশপথের অবস্থা চক্রব্যূহের অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অবস্থার মধ্যেও শেষ মুহূর্তে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক যখন সকলকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া সকলের তারস্বর প্রতিবাদে কর্ণপাত-মাত্র না করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, তখন যে আমরা সকলেই বিরক্ত হইয়াছিলাম তাহা বলা বাহুল্য।

সুবিধার মধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে মোটঘাট বিশেষ ছিল না, একটি স্যুটকেস মাত্র হাতে করিয়া তিনি উঠিলেন। কিন্তু বাঙ্ক বা মেঝে কোথাও ব্যাগটি রাখিবার তিলমাত্র স্থান না দেখিয়া হাতে করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং চারিদিকের মিলিত ক্রুদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া চাদরের খুঁটে ঘাম মুছিতে লাগিলেন।

ট্রেন ছাড়িবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই সহসা তাঁহার নজরে পড়িল ওধারে একটি ভদ্রলোক জানালার ওপর হাত রাখিয়া কনুইটি বাহির করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, ও মশাই! শুনছেন, ও দাদা—দয়া করে কনুইটা ভেতরে টেনে নিন, আমি হাত জোড় করছি!

কনুই-এর মালিক হাত ভিতরে টানিয়া লইলেন বটে কিন্তু অতিমাত্রায় বিস্মিত হই-

ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উপস্থিত অন্য সকলেরও প্রায় সেই অবস্থা। তাঁহার ব্যাকুলতা কিন্তু হাত টানিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছিল। তিনি অতঃপর ধীরে-সুস্থে আমাদের দিকে চাহিয়া কারণটা বিবৃত করিলেন, এখনও পাঁচটি দিন হয়নি মশাই, ওয়ালটেয়ার থেকে আসছিলুম মাদ্রাজ মেলে, এক ভদ্রলোক অমনি কনুই বার ক'রে বসে ছিলেন। দেখতে দেখতে মশাই আমার চোখের সামনে—হাতখানি তিন টুক্‌রো! কনুইটা রইল বাহিরে, বগল আর হাত ভেতরে চ'লে এল।

চারিদিক হইতে একটা বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠিল। যিনি কনুই বাহির করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারও রীতিমত মুখ শুকাইয়া গেল।

—বলেন কি মশাই!

—আজ্ঞে, তবে আর অত ব্যস্ত হলুম কেন বলুন!

ওধারের বেঞ্চ হইতে একটি মাড়োয়ারী যুবক বলিয়া উঠিল, লেকিন ক্যায়সে কাটা বাবুজী?

ভদ্রলোক একটু যেন উষ্ণভাবেই কহিলেন, এটা আর সমঝা নেহি? পাথর! পাথর! পাহাড়কা উপরসে পাথর গিরা!

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিলাম, বলেন কি মশাই!...পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর প'ড়ে বেচারার হাতটা কেটে গেল?

—যাবে না? সে কি যা তা পাথর? অন্তত আট-ন'মন ওজন হবে!

একজন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ট্রেনে জার্নি করা প্রাণ হাতে ক'রে।

—কিচ্ছু বিশ্বাস নেই মশাই, বুঝলেন? যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ বিশ্বাস নেই।...এই ত মাস-খানেকের কথা, দানাপুর স্টেশনে গাড়ি থেমেছে, আমাদের ম্যাকলীন কোম্পানীর হরেনবাবু স্টলে গেছেন চা খেতে; ফিরে আসছেন, আসতে আসতেই গাড়িটা দিয়েছে ছেড়ে। ও মশাই, সামান্য স্পীড, কিন্তু ভদ্রলোক একটুখানি পা পিছলে যেমন গ'লে পড়ে গেলেন আর অমনি দু'টুকরো।

আবারও সেই অস্ফুট গুঞ্জন। অনেকেরই মুখ শুকাইয়া উঠিল, বোধ হয় নিজেদের ইতি পূর্বেকার চলন্ত ট্রেনে উঠিবার ইতিহাস স্মরণ করিয়া। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাঁহার যুবক সঙ্গিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হাতরাস থেকে মথুরার ট্রেন ধরে কাজ নেই, বরং বাসে গেলেই হবে।

আমাদের নবাগত ভদ্রলোকটি আরও যেন তাতিয়া উঠিলেন, বাস? ও আরও ডেঞ্জারাস। শুনবেন তা'হলে বাসের কথা? আমার এক মাস্টারমশাই আসছিলেন তমলুক থেকে বাসে ক'রে—পাঁশকুড়োর ট্রেন ধরবার জন্যে। হঠাৎ মোড় ঘুরেই দেখা গেল, রাস্তার ওপর গোটাতিনেক ছাগল-ছানা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বাঁচাবার জন্য ড্রাইভার যেমন পাশ কাটাতে গেছে, একেবারে উঁচু রাস্তার ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে বাসসুদ্ধ চলে গেল নিচের জমিতে। সতেরো জন প্যাসেঞ্জারের মধ্যে তিনজন তখনই মারা গেল, আর দু'জন হাসপাতালে পৌঁছে গেল; বাকি সকলকে মাস-ছয়েক ক'রে ঝোল ভাত খেতে হ'ল। শুধু ড্রাইভার ভাল ছিল, তার কিছু হয়নি।

শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেরই এই বর্ণনায় গা-মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। আমার ত রীতিমত পেট ব্যথা করিতে শুরু করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে প্রথম ভয়ের ব্যাপারটা কাটিতে আমাদের বিরাজবাবু সেই মথুরাযাত্রী বৃদ্ধটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ও

বাসে-ফাসে কখনও চড়তে নেই মশাই, ভারি বিপজ্জনক! যদি নিজ্যের মোটর থাকে, কিম্বা ট্যাক্সি—

—তাতেই বা কি সুবিধে মশাই? সেদিন কাগজে পড়েন নি, বড়বাজারের এক মহাজনের কি দুর্গতি? উপযুক্ত ছেলে, এক ছেলে, নিজে মোটর চালিয়ে ডায়মন্ডহারবার বেড়াতে গেল আর ফিরল না। খোঁজ খোঁজ—অনেক খুঁজে দেখা গেল যে, গড়ের হাটের কাছে এক বিরাট বটগাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরখানা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে, আর তার সঙ্গে মোটরের মালিকও।...নিজের মোটরের ত ঐ হাল, আর ট্যাক্সির ত কথাই নেই, রোজ অন্তত চারটে করে অ্যাকসিডেন্ট এই কলকাতা শহরেই হচ্ছে। এই ত গত বুধবারের আগের বুধবারে আমাদের চোখের সামনে একখানা ট্যাক্সি—

ভদ্রলোকের কথায় একটা আকস্মিক বাধা পড়িল। ওধারের বেঞ্চ হইতে একটি ভদ্রমহিলা সহসা হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সেই দিকে মনোযোগ দিলাম; 'কি হ'ল—কাঁদছেন কেন'—'কি হয়েছে মশাই?' ইত্যাদিতে অন্য সব প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল।

অনেক প্রশ্ন কবিবার পর তাঁহাব সঙ্গীদের কাছে জানা গেল যে, ভদ্রমহিলার একমাত্র জামাতা ট্যাক্সি ও বাসে ধাক্কা লাগিয়া সম্প্রতি প্রাণ হারাইয়াছেন। মোটর দুর্ঘটনার এই প্রত্যক্ষ স্বরূপে আমরা সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িলাম। বিরাজবাবু নিজে অনেকখানি সরিয়া বসিয়া নবাগত ভদ্রলোককে বসিবার স্থান করিয়া দিলেন।

ওধাবের ভদ্রমহিলার কান্না কমিয়া আসিলে প্রায় সমস্ত গাড়ি জুড়িয়া শুরু হইল বিবিধ, বিচিত্র দুর্ঘটনার আলোচনা। নিজের জীবনে যিনি যত রকম দুর্ঘটনা দেখিয়াছেন, তাহাই মহা উৎসাহে বর্ণনা করিতে বসিলেন। যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহারা শোনা কথাকে অলঙ্কার দিয়া বর্ণনা করিতে বসিলেন এবং খবরের কাগজের আদ্যশ্রাদ্ধ হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আমাদের নবাগত ভদ্রলোকটির বিড়ি টানা শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে আর সকলের কথা ডুবাইয়া পুনশ্চ কহিলেন, কোন্ যানবাহনটা নিরাপদ? সাইকেল? শহরে সাইকেল চালানো ত প্রাণ হাতে ক'রে, এই বুঝি ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা লাগল, ঐ বুঝি বাস চাপা পড়লুম, সর্বদা এই ভয়। ঘোড়ার গাড়ির ত কথাই নেই, ঘোড়া ক্ষেপে উঠলেই চোখে অন্ধকার। প্রভাত মুখুজ্জে, কি অনুরূপা দেবীর গল্পের নায়ক যদি কাছাকাছি থাকে তবেই রক্ষে, রাশ টেনে ঘোড়াকে আটকাবে (যদি গাড়িতে নায়িকা হবার উপযুক্ত কেউ থাকে), নইলে সটান নিমতলার ঘাটে।

এক অর্বাচীন বালক বলিয়া ফেলিল, আগেকার হেঁটে যাওয়াই ছিল ভাল।

—ওরে বাবা! বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় ত পদচারীদের স্থানই নেই। ট্রাম-বাস মোটর-ঘোড়া এসব ত আছেই, মায় রিক্সা চাপা পড়া পর্যন্ত, আর যেখানে গাড়ি-ঘোড়া নেই সেখানে সাপ-খোপ আছে।

সম্মুখের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ফোঁস করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাইরে বেরোলেই অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা, তার চেয়ে ঘরে বসে থাকাই ভাল।

—কিছু না, কিছু না, দেখলেন ত বিহারের ভূমিকম্পের সময়? যারা বাইরে টাইরে ছিল তারা বরং এক রকম ক'রে বেঁচেছে, যারা ঘরের মধ্যে ছিল, তাদের ত আর চিহ্ন রইল না। আমাদেরই এক আলাপী ভদ্রলোকের কি হ'ল—তিনি আর তাঁর নাতনী বাইরের রাস্তায় পায়চারি করছিলেন, আর বাড়ির প্রায় সবাই ছিল ভেতরে। মশাই—সেই

একুশ জন লোকের মধ্যে একজনও বাঁচল না। শুধু বুড়ো আর সেই নাতনি! বুড়ো ত পাগল হয়ে গেছে—

মথুরাযাত্রী ভদ্রলোকটি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ভ্যাঁক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, মশাই, তাহ'লে কি আর কোন উপায় নেই?

নবাগত ভদ্রলোকটি চিন্তিত মুখে কহিলেন, নাঃ—অ্যাকসিডেন্টের হাত এড়াবার কোন উপায় নেই। তবে যদি অল্প স্বল্প কিছু হয় কিম্বা পরিবারদের কোনও ব্যবস্থা করতে চান তাহলে উপায় আছে বটে।

চারিদিক হইতে ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন আসিতে লাগিল, কি রকম, কি রকম? কি বললেন মশাই? ইত্যাদি।

ভদ্রলোক কহিলেন, আজকাল সব বিলিতি ইনসিওরেন্স কোম্পানিই অ্যাকসিডেন্ট ইন্‌সিওরেন্স করছে, সেগুলো মন্দ নয়। যদি হাত-পা ভাঙে কিম্বা একেবারে মারা যান তাহলে মোটা টাকা দেবে, আর যদি অসুখ-বিসুখ করে তাহলেও মাসোহারা দেবে—ভারি চমৎকার পলিসি। আমার কাছেও আছে একটা প্রসপেক্‌টাস, দেখবেন? স্কট্‌স্ ইউনিয়নের অ্যাকসিডেন্ট পলিসি, নামকরা পলিসি; অনেক পুরোনো কোম্পানি, প্রায় একশ বছরের—দেখবেন?

ভয়ের পরিবর্তে অনেকেরই মুখে-চোখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। একজন ত স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল, ও; আপনি এজেন্ট বুঝি? তাইতে অত ভয় দেখাচ্ছিলেন?

ভদ্রলোক এই দোষারোপে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ধীরে সুস্থে স্যুটকেস খুলিয়া কতকগুলি কাগজ-পত্র বাহির করিয়া কহিলেন, আজ্ঞে ভয় ত আর আমি মিথ্যে ক'রে দেখাইনি। কোন্ কথাটা ওর মধ্যে বাজে?...হাত-পা ভেঙে যখন বাড়িতে এসে বসবেন, তখন যদি টাকাটা পান সেটা ভাল, না ভিক্ষে করা ভাল? নাকি আপনি টাকাটা পেলে আমায় দেবেন?

তারপর প্রশান্তভাবে মথুরাযাত্রী ভদ্রলোকের হাতে একখানা প্রসপেকটাস্ দিয়া কহিলেন, দেখুন, ভাল করে পড়ে দেখুন, বুঝতে না পারলে বরং আমায় বলবেন, বুঝিয়ে দেব—

যে ভদ্রলোক কনুই টানিয়া লইয়া ছিলেন, তিনি পুনরায় জানালায় হাত বাহির করিয়া বসিলেন।

মিসেস গাঙ্গুলি ও কুকুরছানা

বুদ্ধদেব বসু

দু-জনে মিলে বাড়িটি নেওয়া গেল। বাড়িটি মন্দ নয়—দোতলার ফ্ল্যাট, পার্ক স্ট্রীটের উপরে। তিনটি বেশ বড়-বড় ঘর, স্যানিটরি বাথ-রুম—চব্বিশ ঘণ্টা গরম জল আর ঠাণ্ডা জল বইছে, রান্নাঘরে গ্যাসের উনুন। দক্ষিণ খোলা। ভাড়াও বাড়ি অনুপাতে বেশি নয়। আমাদের দুজনেরই পছন্দ হল।

মিসেস গাঙ্গুলি হচ্ছেন বাড়ির মালিক— তিনি এক মেয়ে নিয়ে নিচের ফ্ল্যাটে থাকেন। তাঁর স্বামী ছিলেন ব্যারিস্টার। স্বামীর মৃত্যুর পর অত বড় বাড়ির আর দরকার নেই বলে উপরেব তলা তিনি ভাড়া দিচ্ছেন।

আমরা হচ্ছি তাঁর প্রথম ভাড়াটে। প্রথম যেদিন আমরা গেলাম তিনি বললেন—দেখুন, অন্তত এক বছরের কনট্র্যাকট দিতে হবে কিন্তু।

শুনে আমরা একটু দমে গেলাম। রমেন বললে—সেরকম বাঁধাধরা কনট্র্যাকটের কী দরকার তা তো আমরা বুঝতে পারছি নে। One month's notice on either side–

মিসেস গাঙ্গুলি বললেন—হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু দু-চার মাস পরে আবার যদি টেন্যান্ট বদল হয়—সে ভারি bother. আমি এমন লোক খুঁজছি, যিনি বেশ কিছুকাল থাকবেন—চট করে উঠে যাবেন না।

রমেন বললে—আমরাও হয়তো বেশ কিছুকাল থেকে যেতে পারি। লোকে তো একই বাড়িতে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর কাটিয়ে দেয়।

মিসেস গাঙ্গুলি হেসে বললেন—হ্যাঁ, তা তো বটেই—এই আমরাই তো এ-বাড়ি হবার আগে হ্যারিংটন স্ট্রীটের এক বাড়িতে সতেরো বছর কাটিয়ে এসেছি।

আমি বললাম—আমাদেরও হয়ত এখানে তাই হতে পারে। সুতরাং কনট্র্যাকট না-ই বা করলাম।

—এমন হতে পারে যে দু-মাস পরই আপনাদের উঠে যাবার দরকার হল। Excuse me—কনট্র্যাকট ছাড়া বাড়ি ভাড়া দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর একটা offer-ও পেয়েছি—পেলম্যানিজমের এক ডাক্তার পাঁচ বছরের কনট্র্যাকটে আসতে চায়; কিন্তু লোকটা মাদ্রাজী বলে আমার মন খুঁত-খুঁত করছে। আপনারা যদি আসেন তাহলে আর অন্য কারো সঙ্গে কথা বলি নে।

রমেন একটু হেসে বললে—আচ্ছা বেশ, আমরাই আসব। দু-মাসের কনট্র্যাকট হয়ত আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হতে পারে—তার বেশি নয়। আমাদের শেল কোম্পানীতে আবার মাঝে-মাঝে বদলি করে কি না! অবিশ্যি আমার বদলি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

ছ-মাসের চুক্তিতে মিসেস গাঙ্গুলি রাজি হলেন। বললেন—বেশ তাই হবে, কিন্তু দেখবেন, ছ-মাসের আগে যেন—

রমেন তাড়াতাড়ি বললে—না না, সে কিছুতেই হবে না।

—এবং আশাকরি ছ-মাসের অনেক বেশিদিনই থাকবেন।

—আশা করি।

কয়েকদিন পরে রমেন গিয়ে অগ্রিম টাকা দিয়ে চুক্তিপত্র সই করে এল।

একমাস বেশ আরামে কাটল। বাড়িতে কোনরকম অসুবিধে নেই। রমেন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সেই যে বেরোয়, ফেরে সন্ধের পর। সারাদিন আমি বই পড়ে কবিতা লিখে কাটাই, আমার ও যেন কাজের তাড়া নেই—যখন যা খুশি তা-ই করতে পারি। রমেন ফিরে এলে ডিনার খাওয়া হয়—তারপর গ্রামোফোন, না হয় সাড়ে ন-টার শোতে কোনএকটা সিনেমা দেখে আসি। অনেক রাত অবধি দু-জনে গল্প করি; শুতে-শুতে একটা দুটো বেজে যায়। মিসেস গাঙ্গুলিও খুব ভদ্রতা করেছেন, একবার রবিবার আমাদেরকে চায়ে নেমন্তন্ন করলেন—মেয়ের গান শোনালেন। একটা মাস কাটল। আমি মনে করলাম—এ বাড়িতে সমস্ত জীবন থেকে গেলেই বা ক্ষতি কী?

দ্বিতীয় মাসের মাঝামাঝি হঠাৎ একদিন খবর এল, রমেন এলাহাবাদে বদলি হয়েছে। সেখানকার এক সায়েব এক-বছরের ছুটিতে বিলেত যাবে, যে-জায়গায় রমেনকে অ্যাকটিনি করতে হবে। সেখানে গেলে রমেনের মাইনেও কিছু বাড়বে। পরের মাসের পয়লা join করবার তারিখ।

আমি বললাম—বাড়িটার কী ব্যবস্থা করবে রমেন? কনট্র্যাকট তো দিয়ে বসেছ। আর তুমি চলে গেলে আমাকেও এ-বাড়ি ছাড়তে হবে। এ বাড়ি রাখবার সাধ্য আমার নেই।

রমেন চিন্তিত মুখে বললে—তাই তো, এ এক ফ্যাসাদেই পড়া গেল! একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম বলে চাকরিও বজায় রাখতে পারব না নাকি!

আমি বললাম—দেখি এ-কদিনের মধ্যে যদি আর-একজন পার্টনার জুটিয়ে নিতে পারি, তাহলে আমি না-হয় থেকেই যাই। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেই হয়।

—না না, ওসব হাঙ্গামা করে লাভ নেই, রমেন বললে—কে না কে এসে উপস্থিত হবে। যার তার সঙ্গে তুমিতো থাকতে পারবে না! আমি এ বাড়ি ছেড়ে গেলে তুমিও ছাড়বে।

—কিন্তু কনট্র্যাকট—

—সে-ই তো সমস্যা। মিসেস গাঙ্গুলি ভীষণ কড়া লোক—দরকার হলে মামলা করে তিনি ছ-মাসের ভাড়া আদায় করে নেবেন।—তুমি আবার সতের বছর থাকবার কথা বলছিলে!

—সম্ভব হলে, আমি বললাম—আমি সারা জীবন এ-বাড়িতে থেকে যেতাম।

—তুমিও যেমন! যেন এরকম একটা বাড়ি আর কলকাতা শহরে নেই! একবার এলাহাবাদ থেকে আসি—তারপর এ-পাড়ায় কোথাও একটা পুরো বাড়িই নিয়ে ফেলব—ফ্ল্যাটে থাকা আর পোষায় না।

—সে যখন হবার হবে,—সম্প্রতি এ-বাড়ি কী করে ছাড়বে?

—তা-ই তো ভাবছি। চট করে অন্য কোন ভাড়াটে যে ঠিক করে যাব—এমন লোকও দেখছি নে।

—মিসেস গাঙ্গুলির কাছে একবার কথাটা পাড়ো তো—দেখা যাক, তিনি কী বলেন।

—না না, সাবধান! ও-কাজ কখনো কোরো না! একবার তিনি টের পেলে আর রক্ষে নেই।

—কিন্তু না-জানিয়েই বা ক-দিন থাকবে? মার্স শেষ হতে তো দু-সপ্তাহও বাকি নেই।

—দাঁড়াও। এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে মিসেস গাঙ্গুলিই আমাদের নোটিশ দেন।

—মানে?

—আহা বুঝতে পারছ না? উনি তো নিচেই থাকেন, ইচ্ছে করলে ওঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে কতক্ষণ!

যে কথা সেই কাজ। পরদিনই আমরা একপাল বন্ধু জুটিয়ে এনে রাত দশটা অবধি প্রাণপণে হুড়-হাড় ধুপধাপ হাসাহাসি হৈ-চৈ করলাম। আমাদের নিজেদেরই মনে হতে লাগল, যেন ডাকাত পড়েছে। পরদিন সকালে আমরা সংগ্রহ চিত্তে মিসেস গাঙ্গুলির উত্তেজিত আবির্ভাব বা তীব্র ভাষায় লেখা চিঠির অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুই এল না। মনে হল মিসেস গাঙ্গুলি যেন কিছু লক্ষ্য করেন নি।

আমি বললাম—তাই তো হে, কী হবে?

রমেন বললে—কী আবার হবে? পরপর তিনদিন ও-রকম কর না!

করলাম। পরপর তিনদিন নয়, পাঁচদিন ক্রমাগত সন্ধেবেলায় হুল্লোড় চলতে লাগল আমাদের বসবার ঘরে। সে-ঘরের ঠিক নিচেই মিসেস গাঙ্গুলি থাকেন। পায়ের শব্দে তাঁর পাগল হয়ে যাবার কথা! একদিন সন্ধে থেকে রাত বারোটা একটানা গ্রামোফোন চালালাম। আমরাই পাগল হয়ে যাই আর-কি— অথচ মিসেস গাঙ্গুলির কিছুই যেন গায়ে লাগছে না। দেখা হলে তেমনি হাসিমুখে কথা বলেন। এত করেও কিছু ফল হল না।

মহা মুস্কিল। এদিকে দিন কেটে যাচ্ছে—সময় আর বেশি নেই। গোপনে আমরা প্যাক করতে আরম্ভ করে দিয়েছি। এখন এ-বাড়ি থেকে বেরোতে পারলেই হয়। কী করা যায়? ভেবে-ভেবে আমরা হয়রান।

একদিন দেখি, রমেন আপিস-ফেরতা এক কুকুরছানা নিয়ে এসে উপস্থিত। বললে—এটাকে আজ কিনে আনলাম।

—হঠাৎ কুকুরছানার শখ হল?

—দেখবে, এটা নিয়ে মজা হবে।

উপরে ওঠবার সিঁড়ির গোড়ায় চেন দিয়ে কুকুরটাকে বেঁধে রাখা হল। ও জায়গাটুকু আমাদের অংশে পড়ে, কিন্তু গাঙ্গুলিদেরকেও ওখান দিয়ে যাওয়া-আসা করতে হয়।

সমস্ত রাত কুকুরটা ককিয়ে-ককিয়ে, ইনিয়ে-বিনিয়ে, নানা সুরে চিৎকার করলে। সে কী চিৎকার! আমরা কোনরকমে চোখ-কান বুজে পড়ে রইলাম। তবু শব্দটা দোতলায় অতটা আসছিল না, মিসেস গাঙ্গুলির তো একেবারে ঘরের পাশে।

পরদিন সকালে রমেনকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুনে মিসেস গাঙ্গুলি বেরিয়ে এলেন—রমেন সবিনয়ে টুপি তুলল।

–What a lovely dog! মিসেস গাঙ্গুলি বললেন—নতুন কিনলেন বুঝি?

—হ্যাঁ। এ-পাড়ায় নাকি বড্ড চোরের উপদ্রব হয়েছে! একটা কুকুর থাকা ভাল।

—সে তো বটেই! কিন্তু রাত্রে কুকুরটা ভারি চেঁচায়...ওকে উপরে কোথাও রাখার সুবিধে হয় না?

—ওকে তো ইচ্ছে করেই এখানে রেখেছি—চোর ঢুকতেই পারবে না। আপনাকেও পাহারা দিতে পারবে। বলে রমেন তাড়াতাড়ি আপিসে বেরিয়ে গেল।

কুকুরটাকে চব্বিশ ঘণ্টা ঐ এক জায়গায় বেঁধে রাখা হয়েছে। ও খেতে পায় শুধু সকালবেলায় একবার। দিনটা একরকম চুপচাপ থাকে, কিন্তু সন্ধে হতেই চেঁচাতে আরম্ভ করে—সমস্ত রাত। মাঝে মাঝে যদি-বা একটু থামে, পরমুহূর্তেই আবার দ্বিগুণ বেগে

চেঁচাতে শুরু করে। তা ছাড়া ও-জায়গাটিকে কয়েকঘণ্টার মধ্যে এমন নোংরা করে তুলল যে বলা যায় না! নর্দমা বললেও চলে।

মিসেস গাঙ্গুলি একদিন—দুদিন—তিনদিন সহ্য করলেন, কিন্তু তারপর তাঁর ধৈর্যের বাঁধও ভাঙল। চতুর্থ দিন সকালে তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন। যাক, বাঁচলাম! এবার ওষুধ ধরেছে!

মিসেস গাঙ্গুলি বললেন—দেখুন, আপনাদের কুকুরটার ব্যবস্থা না করলে তো আর চলছে না।

রমেন ভালমানুষের মত জিজ্ঞাসা করলে—কী ব্যবস্থা?

—দেখুন, রাত্তিরে ওর চিৎকারে আমাদের একেবারেই ঘুম হয় না। জায়গাটাকে এমন নোংরা করেছে যে সারাক্ষণ আমার গা-বমি-বমি করছে। ওগুলো পরিষ্কার করাতে পারেন না?

—তা আর মুস্কিল কী? জমাদার তো রোজই আসে, বলে দিলেই হয়!

—কিন্তু সিঁড়ির গোড়াটা রোজ-রোজ ওরকম নোংরা হবে, সেটা কি ভাল দেখায়?

রমেন গম্ভীরভাবে বললে—আমি তো কিছু খারাপ দেখি নে।

—আপনি কি মনে করেন, এ বাড়িতে আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন?

—নিশ্চয়ই! এ-বাড়ি আমি ভাড়া নিয়েছি—এ-বাড়ি আমার।

—কুকুরটাকে আপনার উপরে রাখতে হবে—বুঝলেন?

—মাপ করবেন—সেটা আমাদের সুবিধে হবে না।

—তাহলে ও-আপদ বিদেয় করুন।

—আমরা যতদিন আছি, কুকুরও আছে। আপনার এতে আপত্তি থাকে, বলুন, আমরা অন্য বাড়ি দেখছি।

মিসেস গাঙ্গুলি এবার রীতিমত চটে গিয়ে বললেন—দেখুন, অন্য বাড়ি দেখুন—এখানে আপনাদের বা আপনাদের কুকুরের কারুরই জায়গা হবে না। এখুনি আপনারা আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

রমেন বললে—কিন্তু কনট্র্যাকটে আছে—একমাসের নোটিশ—

চুলোয় যাক কনট্র্যাকট! আমি ও-সব কোন কথা শুনতে চাই না। আপনারা এক্ষুনি যাবেন কি না বলুন! উঃ, চার রাত ধরে একটুও ঘুমোতে পারছি নে! আর, কী গন্ধ!

রমেনও খুব চটবার ভান করে বললে—আচ্ছা, যাচ্ছি—আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি!

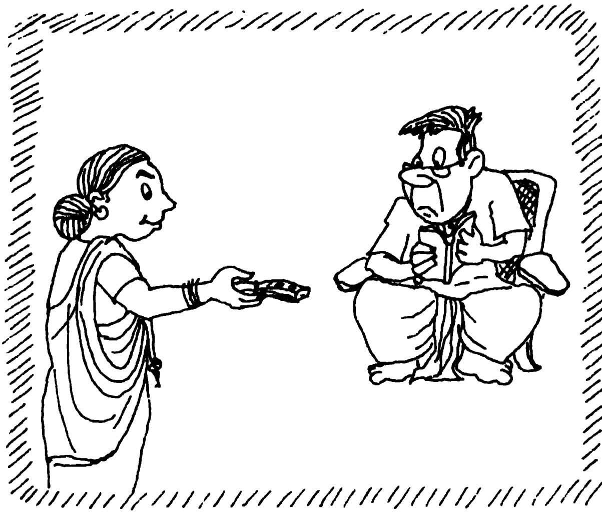
উপরে এসে রমেনের কী ফুর্তি! তখুনি একটা চেক লিখে মিসেস গাঙ্গুলিকে এক মাসের ভাড়া চুকিয়ে দিলে। তারপর একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে খুব দরকারি কয়েকটি জিনিসপত্র নিয়ে মিসেস গাঙ্গুলির চোখের উপর দিয়ে আমরা তাতে চড়ে বসলাম। চাকরকে বলা হল, পরে অন্যান্য জিনিসপত্র আমার মামার বাড়িতে পৌঁছে দিতে। ঠিক হল, আর যে-কটা দিন রমেন কলকাতায় আছে, সেও আমার মামার বাড়িতে থাকবে।

ট্যাক্সি স্টার্ট দিচ্ছে, এমন সময় মিসেস গাঙ্গুলি এগিয়ে এসে বললেন—কিন্তু আপনাদের এত সাধের কুকুরছানাকেই ভুলে যাচ্ছেন!

রমেন বললে—চুলোয় যাক কুকুরছানা!

হিসাব-নিকাশ

লীলা মজুমদার



গোপেনবাবু বিরক্ত হয়ে নভেল থেকে মুখ তুলে বললেন, "তুমি তো আমাকে মহা জ্বালালে দেখছি! টাকা নেই মানে? মাস কাবার না হতেই টাকা ফুরিয়ে যায় কি করে? ফুরিয়ে গেছে বললেই তো আর হল না! যাও, এখন পালাও দিকি নি।"

তারাসুন্দরীও ছাড়বার পাত্রী নন, "ফুরিয়ে গেছে, তাই বলছি ফুরিয়ে গেছে। এতে আমার দোষটা কি হল তাই বল। বাপের বাড়িও পাঠাই নি, গয়নাও গড়াই নি। যদিও নেপুর ছোট ছেলের ভাতে সব্বাই আমার চেয়ে ভালো জিনিস দিল। আর আমার জন্য সেই ভগদামাছের মত মুখ দেওয়া চ্যাপটা হারের কথা তো আজ দশ বছর ধরে শুধু শুনেই আসছি। যাক্গে, ওসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে গঞ্জনা দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়। যার কপালে যেটুকু আছে, তার বেশি আর সে পায় কি করে! আমি বলছিলাম টাকা ফুরিয়ে গেছে, এবং তোমার এই রাবণের গুষ্ঠি পুষতেই গেছে। এখন গয়লা এসে তাগাদা করছে, কোত্থেকে টাকা দিই বল তো?"

গোপেনবাবু একটু হেসে বললেন, "গয়লাকে দেবার টাকা নেই ও আবার একটা কথার কথা হল নাকি? মাসের গোড়ায় মাইনে পেয়েই এত ব্যবস্থা করা হল, মায় এক প্যাকেট্ খামই কিনে ফেলা হল, আলাদা আলাদা খামে আলাদা আলাদা খরচ তুলে রাখা হল—পাছে ঠিক এই কাণ্ডটিই হয়—আমার অমন ভালো চুরুটের বাক্সটা নিলে হাতখরচ রাখবে বলে—এখন কোন্ মুখে বলছ গয়লার টাকা নেই! গয়লার ১৭।০ টাকা না আলাদা খামে ভরে রাখলে?"

তারাসুন্দরীও ততক্ষণে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, "আহা! কিছুই জানো না যেন! সিস্টার্ন সারানো, সাইকেল মেরামত, এসব বিনা পয়সায় হয় কখনও?"

গোপেনবাবু বইটা মুড়ে রেখে উঠে বসে বললেন, "আহা বিনা পয়সায় হবে তা তো বলছি না। বিনা পয়সায় কি-ই বা হয় বল? আমার সঙ্গে তোমার বিয়েটা পর্যন্ত বিনা পয়সায় হয় নি! বলছিলাম কি সেই যে আরেকটা খামে "উট্কো-খরচ" লিখে, পনেরোটা টাকা তুলে রাখলে, ঐ সব জিনিস সারানো-সুরোনোর মত বাড়তি খরচ তাই থেকে দেওয়া উচিত ছিল। গয়লার টাকা থেকে দিতে গেলে কেন? আর দিয়েছ দিয়েছ, কি আর এমন হয়েছে তাতে? এবারে "উট্কো-খরচের" খাম থেকে টাকাগুলো বের করে নিয়ে, তার সঙ্গে আরও আড়াই টাকা দিয়ে, গয়লাকে দিয়ে দাও। ব্যস্ ল্যাঠা চুকে গেল। এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত ভাগো দিকি নি। আমাকে নিরিবিলি বইটা পড়তে দাও। ব্যাটা মরেই গেল না বিয়ে করল তাই নিয়ে মহা সমস্যা, এই সময় কি টাকা টাকা করতে আছে? যাও, পালাও দেখি।"

তারাসুন্দরী তবুও নড়েন না, "পালাও মানে? টাকা দাও, এক্ষুনি পালাচ্ছি! উট্কো-খরচের টাকা নাও! একটা যা-তা বলে দিলেই তো আর হল না। উট্কোর টাকা গয়লাকে দেব কেন? তাহলে উট্কো-খরচগুলো চলবে কি করে শুনি?"

গোপেনবাবু ইজিচেয়ারের হাতল থেকে পা নামিয়ে বললেন, "কি জ্বালা! আবার কি উট্কো-খরচ? ঐ তো উট্কো-খরচ। এখন যাও না। তোমার কি কোনও কাজকর্ম নেই নাকি? অবশ্য তোমার কাজ নাও থাকতে পারে—মেয়েদের আবার কি-ই বা কাজ—তবে গয়লা বেচারার কাজ আছে তো? তাকে দাঁড় করিয়ে রেখো না।"

তারাসুন্দরী চিন্তিতভাবে বললেন, "টাকা না নিয়ে সে যাবে বলে মনে হয় না। উট্কো-খরচের টাকা কোথায় পাব বল দিকি নি? সেসব তো উট্কো-খরচের জন্যই ফুরিয়ে গেছে!"

গোপেনবাবু হতাশভাবে বললেন, "আহা, সব টাকাই তো আর খরচ হয়ে যায় নি। একটা খরচের খাম থেকে নিয়ে আরেকটা খরচ করাই যদি নিয়ম করে থাক, তাহলে যাও এখন চালের টাকা থেকে দুধের দাম চুকোও গে।"

তারাসুন্দরী অবাক্ হয়ে বললেন, "তা কি করে হয়? চালের টাকা দিয়ে যে তিন-জোড়া সস্তাদরে তাঁতিনীর কাছে কাপড় কিনলাম।"

এবার গোপেনবাবু সত্যি রেগে গিয়ে বললেন, "উঃ! কার সাধ্যি মেয়েদের হিসাব শেখাবে? তাহলে এবার চালের দামও চাইবে তো?"

"মোটেই না। যা চাল আছে তাতেই এ হপ্তাটা চলে যাবে। তারপর বাকি মাসটা বাকিতে আনাবো। আসছে মাসে তুমি মাইনে পেলে দাম দেবে!"

"বা—বা—বা, কেমন চমৎকার বন্দোবস্ত! এ মাসে চাল খেয়ে তার দাম চুকোবে আসছে মাসের টাকা থেকে! তারপর আসছে মাসের চালের দাম কোত্থেকে আসবে?"

তারাসুন্দরী এবার খুশি হয়ে উঠলেন, "কেন, তার পরের মাসের মাইনে থেকে! কি সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন পটলদি। সব সই দিয়ে জিনিস আনেন। কোনও কিছুর দাম দিতে হয় না, হিসেব রাখতে হয় না। দোকানদাররা টাকা পাবে তারাই চমৎকার হিসেব লিখে রাখে। তারপর মাসের গোড়ায় যেই না সমরেশবাবু মাইনে পান, অমনি সব কোত্থেকে খবর পেয়ে, সারি সারি দাঁড়িয়ে যায়, যে যার টাকা আদায় করে নেয়। পটলদিকে আর

তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। ঐ মোট জোড় রে, বাকি কষ রে, রেজকি মেলাও রে, —কিচ্ছু করতে হয় না!"

ততক্ষণে গোপেনবাবু নভেল পড়ার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। বললেন, "হ্যাঁ, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ, দেখি তোমার হিসাব খাতা।"

তারাসুন্দরী দু-চোখ কপালে তুলে বললেন, "আমার হিসেব খাতা দিয়ে তুমি কি করবে? সে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না।"

গোপেনবাবু আবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "হিসাব বুঝতে পারব না? হিসাব বোঝাই তো আমার কাজ। তার জন্য আপিস থেকে মাস মাস আমাকে মাইনে দেয় না? সে কি শুধু আমার মুখ দেখে? যাও, বাজে বোকো না, হিসাব খাতাটা নিয়ে এসো। এদিকে যেমন সব ভুল করে রেখেছ, আবার ওদিকে কি পাকিয়েছ কে জানে!"

তারাসুন্দরী যেন একটু দমে গেলেন, "আচ্ছা, তুমি আমাকে কি ভাব বল তো? আমি আপিসে যাই না বলে কি সামান্য একটু সংসারের হিসাবও রাখতে পারি না? এই নাও খাতা, কি দেখবে দেখ।"

গোপেনবাবু খাতা খুলে বেশ খুশিই হলেন, "বাঃ, এই তো দিব্যি পরিপাটি হিসেব লিখেছ দেখছি। হুঁ-ম্-ম্-ম্। আচ্ছা, এই প্রথম পাতার মাথায় বর্মী ভাষায় এই সব ঠাকুর দেবতার নাম লিখেছ কেন বল তো? তোমার বুঝি ধারণা যে ওতে হিসেব মেলাবার কোনও সুবিধে করে দেবেন ওঁরা? সে গুড়ে বালি! বরং যদি মনাই-এর অঙ্কের বইটা নিয়ে একটু মিশ্র যোগ-বিয়োগ আর ত্রৈরাশিকটা শিখে নিতে পারতে, তাহলে—"

তারাসুন্দরী বাধা দিয়ে বললেন, "কি যে পাগলের মত বকতে পার। ঠাকুর দেবতার নাম আবার কোথায় লিখলাম? আর বর্মী ভাষা কি আমি জানি যে লিখব?"

"তবে এসব কি? এই যে পাতার মাথায় লাল পেনসিলে লিখেছ,—এক সো, সা-সু এক-জো, এক-উ এ তো একেবারে বর্মী বর্মী শোনাচ্ছে!—আরে ও কি! খাতা টেনে নিচ্ছ কেন?"

তারাসুন্দরী সে কথায় কান না দিয়ে, উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, "আরে তাই তো, এই তো মেজদির সেই তারাফুল প্যাটার্ন! এদিকে আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না কোথায় লিখে রেখেছি! আঁতি পাঁতি করে কোথায় যে না খুঁজেছি, তার ঠিক নেই। বড় উপকার করলে, সত্যি। আরে ঠাকুর দেবতার নাম আবার কি। ঠাকুর দেবতার নাম ঐ শুনতেই ভালো, তাতে কখনও প্যাটার্ন মেলে? আচ্ছা, সে না হয় হল, এ দিকে দেখছ তো প্রতিদিনের প্রতিটি পয়সার হিসাব মিলিয়ে রেখেছি। তা ছাড়াও আরও সব লিখেছি। তবু যদি তোমার মন ওঠে!"

গোপেনবাবু বাস্তবিক অবাক হয়ে বললেন, "তা ছাড়া আরও সব লিখেছি মানে? যা খরচ করেছ তাব চাইতে আরও বাড়িয়ে বাড়িয়ে লিখেছ নাকি? আমার কাছ থেকে আরও কিছু আদায় করবার তালে আছ বুঝি? সে-সব হবে-টবে না বলে রাখছি। আচ্ছা, এই যে একটু আধটু জমাতে চাই, সে কি আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব বলে? নাকি আমার অবর্তমানে যাতে তোমার আর তোমার ছেলেমেয়েদের একটু সুবিধা হয়, সেইজন্য? ব্যস্, অমনি চোখে জল এসে গেল? কি জ্বালাতন! আজকেই তো আর যাচ্ছি না। মেয়েদের সঙ্গে দেখছি কোনও কাজের কথা বলাই ঝকমারি!"

তারাসুন্দরী চোখ মুছে একটু রাগতভাবে বললেন, "বেশ, কথা নাই বললে, হিসেবটাই

দেখ। কোথাও যদি একটা ভুল পাও তো বল!"

গোপেনবাবু এইখানে হঠাৎ চমকে উঠলেন, "এ কি! এ সব আবার কি লিখেছ, বাউণ্ডুলে ৫, ঘোড়ার মাংস এক টাকা চোদ্দ আনা, এ-সবের মানে কি? বাউণ্ডুলে ৫ আবার কি? আর ঘোড়ার মাংস দিয়ে কি হল? পেলেই বা কোথায়?"

তারাসুন্দরী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "আহা, সেদিন তোমার ঐ যে বন্ধুরা এসে রাত এগারোটা পর্যন্ত গালগল্প, হৈ-হল্লা করে পাড়া জাগিয়ে, চা, ছাঁচিপান, ডালপুরী, ডিমের ডেভিল, রাব্‌ড়ি খেয়ে গেল না? তার কি পয়সা লাগে নি?"

গোপেনবাবু দুঃখিতভাবে বললেন, "আহা, সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু 'বাউণ্ডুলে' কেন? ভদ্রলোকের ছেলে, আমার ছোটবেলাকার সব বন্ধু, তারা হল গিয়ে বাউণ্ডুলে! আর তোমার বন্ধুরা যেদিন এসে আমাকে উদ্ধার করে দিয়ে যান, সেদিন কি লেখা হয়—'চেড়ীরা ৭'—ও কি?"

তারাসুন্দরী প্রসন্নমুখে বললেন, "ঠিক তো! তাই ঐ তিন টাকা বারো আনা মিলছিল না। ঐ যে লেখা আছে যোগ তিন টাকা বারো আনা—ওটা হল গিয়ে সেই যে বৃহস্পতিবার সমিতির ওঁরা সব এসে বিনি ময়ানের মাছের কচুরি খেয়ে গেলেন, তার হিসাব!"

গোপেনবাবু আঁৎকে উঠলেন, "অ্যাঁ! বিনা ময়ানের মাছের কচুরি করতেও তিন টাকা বারো আনা লাগল? তুমি দেখছি আমাকে ডোবাবে!"

তারাসুন্দরী বুঝিয়ে বললেন, "আরে দূর! বিনা ময়ানের কচুরিতে অত লাগে নাকি? তবে কি জান, কচুরিগুলো কি রকম যেন সব ভুসোভুসো হয়ে এলিয়ে গেল। সে ওঁদের দিতে আমার ভারি লজ্জা করল। তাই শেষ পর্যন্ত চুপিচুপি গুটেকে পাঠিয়ে মোড়ের ক্যান্টিন্ থেকে মাছের কচুরি আনিয়ে দিলাম। ওঁরা তা খেয়ে মহা খুশি। আসছে বৃহস্পতিবার সমিতিতে গিয়ে ঐ কচুরি শিখিয়ে দিয়ে আসতে হবে বলে গেছেন।"

গোপেনবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন : "ক্যান্টিন্ থেকে কিনে এনে আবার শিখিয়ে আসবে! ইস্, মেয়েরা কি সাংঘাতিক ঠগ্ হয়! আমাদের তো মাথায়ই আসত না। যাক গে, যা ইচ্ছা কর। এখন বল, ঘোড়ার মাংস আবার কি?"

তারাসুন্দরীও আশ্চর্য হয়ে গেলেন, "ওমা, এরই মধ্যে ভুলে গেলে? সেই যে মতি-রানীরা যেদিন এল সেদিন তিনপো মাংসের কিমা আনলে না? সে ঘোড়ার মাংস নয় তো কি? পাঁঠার মাংস ওরকম হয় না। মাগো! শুধু সাদা সাদা পাঁটা আর ছিব্‌ড়ে! ঘোড়ার মাংস লিখেছি, সে তো ভালো লিখেছি!"

গোপেনবাবু বললেন, "দেখ, নিজে যদি এক-আধবার বাজারে যেতে তো বুঝতে কেমন মজা। বাজার করে এনে, টাকা-পয়সা বুঝিয়ে ফেরত দিই, তাও কি লিখতে গিয়ে কি লিখে রাখ তার ঠিক নেই। জুড়তে গিয়েও নিশ্চয় দেখব এক শ'টা ভুল। এই তো, এই তো ধরেছি। মোট জুড়তে ভুল করেছ। যা ভেবেছি ঠিক তাই!"

তারাসুন্দরী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন : "মোট জুড়তে ভুল? হতেই পারে না!"

গোপেনবাবুই বা ছাড়বেন কেন? "ভুল কর নি? দিলাম ২০০, তার থেকে মোট খরচ করলে কি করে দুশো বাষট্টি টাকা ন-আনা? কি যোগ করতে কোথায় কি যোগ করে রেখেছ! মেয়েরা যে কি করে ক্লাস প্রমোশন পায় তাই বুঝি না!"

তারাসুন্দরী গলাটা একটু তুলে বললেন, "সে তুমি যাই বল, যোগে ভুল হতেই পারে না। যোগ তো আর আমি করি নি, খোকনদের অঙ্কের স্যারকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছি।"

গোপেনবাবু বললেন, "ছিঃ। একটু লজ্জাও করল না? সে যাক্ গে, তোমাদের সঙ্গে তো আর আমরা পেরে উঠব না। তাহলে বল টাকাটা পেলে কোথায়? অন্য খাম থেকে নিয়েছ বুঝি?"

"আবার কোন্ খাম থেকে নেব? সবই তো খালি!"

গোপেনবাবু এবার চেয়ার ছেড়ে একেবারে উঠে দাঁড়ালেন, "কি সর্বনাশ, মাইনে পাব তো সেই সাত তারিখে, এ কদিন কি করে চালাবে তাহলে? ধারটার কিন্তু করতে পারব না।"

তারাসুন্দরী ঈষৎ হেসে বললেন, "কিচ্ছু ভয় নেই। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"কি করে হয়ে যাবে? তুমি কি টাকার গাছ পুঁতেছ নাকি? নাকি তোমার ভাইরা দেবে? আহা দাতার অবতার সব!"

তারাসুন্দরী রুখে উঠলেন, "দেখ, আমার বাপের বাড়ি নিয়ে বার বার খোঁটা দিলে ভালো হবে না বলে রাখছি। আমার কি টাকা নেই নাকি ভেবেছ? এই দেখ।" বলে ঝন্‌ঝন্ করে গোপেনবাবুর সামনে একগোছা টাকা ফেলে দিলেন। গোপেনবাবু তো অবাক্!

"একি! এই এত টাকা পেলে কোত্থেকে?"

"এই দেখেই চক্ষু চড়ক গাছ! আরও কত ছিল, এদিকে ওদিকে খরচ করে ফেলেছি। হিসাব খাতাটা আরেকটু ভালো করে দেখলেই বুঝবে কোথায় পেলাম।"

"কি করে বুঝব বল? তোমার খাতায় তো জমার কথা কিছু লেখা থাকে না। শুধুই খরচের হিসাব।"

তারাসুন্দরী রেগে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, "কেন, এটা কি? এই যে 'ইত্যাদি ১০্?' চোখের মাথা খেলে নাকি?"

গোপেনবাবু বিস্মিত হলেন, "ইত্যাদি ১০? রাশিরাশি অদরকারী রাবিশ্ কিনেছ বোধ হয়? তারপর সেগুলো বুঝি যাকে তাকে অযোগ্য লোককে সব দান করা হয়েছে?"

"আরে না, না, সে তো এই যে এখানে লিখেছি, টুকিটাকি ৩্।"

"তবে আবার 'ইত্যাদি ১০্' কি?"

তারাসুন্দরী বললেন, "কি বলি না বলি, কিছুই তো আর শোন না। আর বলব কি, এটা শুনলেও রাজী হবে না। নিজে ওদিকে বাড়িতে টাকা আনবার আগেই ইনকাম ট্যাক্স, ইন্‌সিয়োরেন্স প্রিমিয়ম কাঁড়ি কাঁড়ি খরচ করে আসবে। অথচ আমি যদি বলতাম 'মিন্টুদি সমিতিকে বিনা পয়সায় সেকেন্ড হ্যান্ড সেলাই কল কিনে দেবেন বলে লটারি করছেন, কিনব টিকিট্?' তুমি দিতে টাকা?"

গোপেনবাবু আরও অবাক্ হয়ে গেলেন, "কি মুশকিল! তোমার জ্বালায় এমনিতেই খরচ কুলোয় না। তার উপর ১০্ টাকা দিয়ে লটারি টিকিট? ডার্বি খেলা নাকি? অচেনা লোকবা ছাড়া কেউ পায় কখনও লটারির টাকা? আর তাছাড়া 'বিনা পয়সায় সেলাই কল কিনবেন' মানে?"

"আরে, এই সহজ কথাটা বোঝ না, আবার বল আপিসে হিসেব কষার জন্য মাইনে দেয়। মিন্টুদি পাঁচ টাকা করে এক শ'টা টিকিট বিক্রি করবেন। হল পাঁচ শ' টাকা। লটারি হল, ফার্স্ট প্রাইজ দু'শ টাকা, সেকেন্ড প্রাইজ ত্রিশ টাকা, থার্ড প্রাইজ কুড়ি টাকা। বাকি ২৫০্ টাকা দিয়ে সেলাই কল কেনা হল, তা বিনি পয়সায় হল না? মিন্টুদির স্বামী তোমার

চাইতেও কিপ্টে! দেবেন কিনা অতগুলো টাকা! আরে আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেলাম বলে বুড়োর কি রাগ! বলেন আমার স্ত্রী এত খাটলেন, তাহলে অন্য লোক কেন ফার্স্ট প্রাইজ পাবে? শুনলে কথা—"

"আচ্ছা, টিকিটের দাম পাঁচ টাকা হলে, 'ইত্যাদি দশ টাকা' কেন?"

তারাসুন্দরীর মুখে হাসি ধরে না। "তোমার জন্যও একটা কিনলাম যে। তোমাকেও বাদ দিই নি।"

"তা আমার টিকিটেই যে ফার্স্ট প্রাইজ ওঠে নি তাই বা কি করে জানলে? টিকিটের উপর নাম লিখেছিলে? অন্ততঃ অর্ধেক দাও?"

তারাসুন্দরী বললেন, "ওমা, সেকি কথা! হিসাব মেলাতেই তো প্রায় ষাট-বাষট্টি খরচ হয়ে গেল। তারপর হার দেবে বলেছ, তার জন্য বুঝি লকেট্ গড়াতে হবে না? বাইরেটা সোনার আর ভিতরে তামা, খুব শরীর ভালো থাকে।"

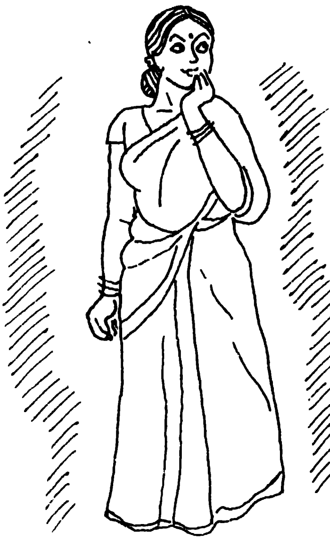
গোপেনবাবু চেয়ারে ঠেস দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, নিদেন দশ টাকাই দাও। তাই সই।"

"ওমা, দশ টাকা দিয়ে কি করবে? গয়লার পাওনা তো সাড়ে সতেরো টাকা!"

গোপেনবাবু আবার চেয়ারের হাতলে পা দুটো তুলে দিয়ে, নভেলটা খুলে বললেন, "টিকিট কিন্‌ব গো, লটারির টিকিট কিনব। তারপর প্রাইজ পেলে পর তোমার গয়লার ১৭।।০ পাওনা চুকোব। এখন ভাগো দিকি নি—ব্যাটা মরেই গেল না বিয়ে করল কে জানে!"

অভিনেত্রী

আশাপূর্ণা দেবী



দালানের মাঝখানে গালচের আসন পেতে গোটা আষ্টেক দশ বাটি আর অভব্য রকমের বড় একখানা থালা সাজিয়ে আহারের আয়োজন করা হয়েছে। জামাইয়ের নয়, বেহাইয়ের।

নতুন বৌমার বাপ এসেছেন বিদেশ থেকে।

বাড়ির গৃহিনী নাকি নিতান্তই লজ্জাশীলা, তাই অতিথির অভ্যর্থনার ভার স্বয়ং বধুমাতারই। তা অযোগ্য অধিকারীর হাতে ভার ন্যস্ত হয় নি। নতুন বৌ ছেলেমানুষ হ'লে কী হয়, তিনজনের আহার্যবস্তু একজনের জঠর গুহায় চালান করিয়ে দেবার চেষ্টার জন্যে যে অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন সেটা তার আছে।

শ্বশুরবাড়িতে— বাপ ভাই কুটুম, কাজেই বাপকে অতিভোজনের জন্যে পীড়াপীড়ি না করবে কেন অনুপমা?

বাপ হেসে বলেন—খুব যে গিন্নী হয়ে উঠেছিস দেখছি। আমার সঙ্গেও কুটুম্বিতা? এত কখনো খাই আমি?

খান না সে কি আর অনুপমাই জানে না? কিন্তু উপরোধটাই রীতি যে। তা ছাড়া— শাশুড়ি সামনা-সামনি না এলেও আনাচে-কানাচে আছেন কোথাও, পরে বৌয়ের ত্রুটি ধরবেন। তাই অনুপমা সোৎসাহে বলে—আচ্ছা, মাছটাছ না খেতে পারো থাক, পায়েস মিস্টি এগুলো তো খাবে? এ সন্দেশ এদের দেশ থেকে আনানো—ফেললে চলবে না বাবা।

—না চলে তো তুই খা বসে বসে—বলে বাপ হেসে উঠে পড়েন। 'অপচয়' সম্বন্ধে কোনো বক্তৃতা না দিয়েই ওঠেন।

সাল তারিখের হিসেবে ঘটনাটা দু'যুগ আগের। অপচয়ের ভয়ে অপ্রচুর আয়োজনটা ছিল তখনকার দিনে বিশেষ নিন্দনীয়। একজনকে খেতে বসিয়ে কেবলমাত্র একজনের উপযুক্ত দেওয়া—সে কেমন? ফেলাছড়া না হ'লে আবার আদর জানানো কি? আহার্যবস্তুর ওপর মমত্ববোধটা তো মানসিক দৈন্য।

অতিবড় কল্পনাবিলাসীও তখন 'রেশনের বাজারে'র দুঃস্বপ্ন দেখেনি। অতএব—কাক বা বেড়াল সম্বন্ধে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হয়েই অনুপমা ও বাবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে যায় এবং পাশাপাশি চলতে চলতে প্রায় অস্ফুটস্বরে বলে—আমাকে নিয়ে যাবার কথা বলবে তো বাবা?

এতক্ষণ বলতে পারে নি, জানতো খাবার সময়টা অনেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে এদিকে।

বাপও মেয়ের সঙ্গে স্বরের মিল রেখে বলেন—বলবো বলেই তো এসেছি। এবারে একলা ফিরে গেলে তোমাদের মাঠাকরুণাটি কি আর আস্ত রাখবেন আমাকে?...ভাবছি কাল সকালের গাড়িতেই নিয়ে যাবো।

আশায় আশঙ্কায় উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় কণ্টকিত কিশোরী-হৃদয়, এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে রাজি হয় না। 'কাল-সকাল'—সে যেন সুদূর ভবিষ্যৎ!

কিন্তু বৌ বলে কথা। দু'যুগ আগের বৌ। বাপের বাড়ি যাবার ইচ্ছা প্রকাশটাও অমার্জনীয় অপরাধ। তাই পাকা গিন্নির মত ফিসফিস করে বাপকে উপদেশ দেয় অনুপমা। বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে বোলো বাবা, জানোই তো আমার শ্বশুর একটু রাগী মানুষ?

—একটু? বাপ প্রায় স্পষ্ট হেসে ওঠেন—বল্ যে বিচক্ষণ। চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। যাক্ গে—এবারে যেমন করে হোক বলে কয়ে—

কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত অনুপমা বাপকে চোখ টিপে ইসারা করে চুপ করতে। কোথায় যেন পায়ের শব্দ হ'ল, বাপের কাছে নিয়ে যাবার আবেদন করছে—এ অপরাধ ধরা পড়লে রক্ষে আছে।

শাশুড়ি লজ্জাশীলা হতে পারেন, তা বলে—এতদূর সহনশীলা তো হতে পারেন না সত্যি।

ঘণ্টাখানেক পরে সেই দালানেই শতরঞ্চের আসন বিছিয়ে, আর গোটা চার পাঁচ বাটি ঘিরে থালা সাজিয়ে আহারে বসেছেন বাড়ির কর্তা। সামনে পাখা হাতে অনুপমা।

ইনি কুটুম্ব না হ'লেও—অনুরোধ উপরোধের মাত্রাটা ওঠে প্রায় কুটুম্বের পর্যায়ে। সেটাও রীতি। ছেলের বৌ যত্ন-আত্তি করবে এই তো সাধ মানুষের।...

তা সে সাধ মেটাতে জানে অনুপমা।

কর্তা বেশ খানিকক্ষণ খাওয়ার পর এক সময় মুখ তুলে যেন হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলেন—হ্যাঁ ভালো কথা—তোমার বাবা যে নিয়ে যেতে চাইছেন তোমাকে।

—বাবার কথা বাদ দিন—বলে পাখাটা জোরে জোরে চালাতে থাকে অনুপমা, হৃৎস্পন্দনের দ্রুত ছন্দটা পাছে ধরা পড়ে তাই আরো ব্যস্ততা।

—বাদ দিলে চলছে কই গো? শ্বশুর-ঠাকুর শ্লেষের ভঙ্গিতে কথা শেষ করেন—তিনি একেবারে নাছোড়বান্দা। মেয়ে নিয়ে না গেলে—তোমার মা নাকি তাঁকে বাড়ি ঢুকতে দেবেন না শুনলুম।

—ওই তো হয়েছে জ্বালা—দইয়ের ওপর চিনি দিতে দিতে অনুপমা যেন অগ্রাহ্যভরে বলে—মার যে কী বাতিক। মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে হ'লেই কান্না জুড়ে দেবেন। আচ্ছা এ

কী? বাবার কি কম মুশকিল!...সেবারে অমনি পুজোর সময় দিদির আসবার কথা ছিল—আসা হ'ল না বুঝি, ব্যাস মার সাতদিন খাওয়া বন্ধ। পুজোর সময় কোথায় নতুন কাপড়চোপড় পরবেন—তা নয়। আচ্ছা, সব সময় কি আসা বললেই আসা হয়? সংসারের সুবিধে অসুবিধে দেখতে হবে না?

শ্বশুরের মুখের মেঘ কেটে ঈষৎ কৌতুকের বিদ্যুৎছটা দেখা দেয়—আমি তাই তো তোমার বাবাকে কথা দিলাম—বলে পায়েসের বাটিটি কাছের গোড়ায় টেনে নেন।

অনুপমার মুখেও বিদ্যুৎরেখা, কিন্তু সুকৌশলে তার উপর একখানি নকল মেঘ ঢাকা দিয়ে—হাতের পাখা নামিয়ে গালে হাত রেখে বলে—সে কি বাবা! কথা দিলেন কি। মার এই শরীর খারাপ, দু'দিন বাদে ঠাকুরঝি আসবেন। বামুনঠাকুর 'দেশে যাবো' বলছে—দুশ্চিন্তায় যেন মুসড়ে পড়ে অনুপমা।

—তা' বললে কি হবে—কথার পিছনে ড্যাস টেনে—কর্তা জলের গ্লাসে দুখানা পাতিলেবু নিংড়ে তারিয়ে তারিয়ে জলটি খেতে থাকেন।

অনুপমার মা অবুঝ হ'তে পারেন তাই বলে অনুপমা তো হ'তে পারে না। সে নুনের পাত্র চিনির কৌটো গুছিয়ে তুলতে তুলতে বিচক্ষণভাবে বলে—এ সময় আমি হঠাৎ বাপের বাড়ি গিয়ে বসে থাকলে ঠাকুরঝি কি মনে করবেন বাবা? বাবাকে আপনি ঐ কথাই গিয়ে বলে দিন।

—তা হয় না বৌমা—কর্তা মাটিতে বাঁ হাতের ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বলেন—মরদকা বাত হাতীকা দাঁত। একবার যখন 'হ্যাঁ' বলেছি, তখন ত্রিভুবন উল্টে গেলেও তার নড়চড় হবে না।

তবে আর কি করতে পারে অনুপমা।

মাত্রাতিরিক্ত উজ্জ্বল ভাবটা ম্লান করে আনতে একটু বেশি সময় লাগে বলেই তৎপর হয়ে শ্বশুরের খড়ম খড়কে গামছা ইত্যাদি এগিয়ে দিয়ে তবে বলে—মুশকিল হ'ল। মাঝামাঝি হঠাৎ এখন নিয়ে যাবার জন্যে সে কী দরকার পড়লো বাবার বুঝিও না। মার শরীরটা খারাপ—

এ 'মা' অবশ্য শাশুড়ি।

তাঁর নিটোল দেহখানিতে কোনো রোগ বালাই আছে—এমন অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারবে না, কিন্তু অনুপমা দেয়। কর্তা-গিন্নী উভয়ের মনোরঞ্জনের এই এক উৎকৃষ্ট দাওয়াই।

পরবর্তী সিন্ দালানে নয়—ঘরে, দিনে নয়—রাত্রে।

তারানাথকে ছেড়ে যেতে যে কি ভয়ঙ্কর মন কেমন করছে সেই কথাই ছলছল চোখে বিশদ ভাবে বোঝাতে হচ্ছে অনুপমাকে।

দুই কর্তা মিলে পাকাপাকি করে ফেললেন, অনুপমা বেচারি করে কি? ওর তো আর এখন শুধু শুধু যাবার ইচ্ছে ছিল না? হ্যাঁ একটা উপলক্ষ থাকতো—আলাদা কথা; বড্ড অবুঝ অনুপমার মা। অথচ বেহায়ার মত বলতে পারে না অনুপমা সে কথা। কানেই বিরহ বেদনার যত রকম লক্ষণ আছে সেগুলো সব প্রকাশ করতে হয়—তারানাথের অভিমান ভাঙাতে।

চতুর্থ দৃশ্যও একটা আছে, সে অনুপমার পিতৃগৃহের পটভূমিকা।...কিন্তু সে কথা থাক। দু'যুগ পরের কথাই বলি। দু'যুগ কেন—বরং তার বেশিই।

কালের পরিবর্তন হয়েছে বটে—স্থানটা ঠিক আছে। পাত্র'টাও বলা চলে। সেই দালানে—ঠিক সেই জায়গাতেই সেই ভঙ্গিতে বসে আছেন গৃহিণী অনুপমা, পাখা একখানা হাতে।...মুখের গড়নটা কিছু বদলেছে, গায়ের রঙের জেল্লাটা গেছে কমে, তবে—চুলে যে পাক ধরেছে সেটা এক নজরে চোখে পড়ে না।

সামনে আহারে বসেছেন—বর্তমান কর্তা তারানাথ।

পঁচিশের ওপর আর পঁচিশ যোগ করলে—যে পরিবর্তনটুকু অবশ্যম্ভাবী তার বেশি কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না তারানাথের আকৃতিতে।

আসনটা আর বাসনগুলো বাপের আমলের, তার আহার—আয়োজনটা নয়। তা'তে এ যুগের শীর্ণ ছাপ। অনুরোধ-উপরোধের কাজটা ফুরিয়েছে গৃহিনীদের।...সচরাচর এ সময় ওই প্রসঙ্গেরই অবতারণা নয়। সে যুগের 'জলের দরে'র সঙ্গে এ যুগের 'অগ্নিমূল্যে'র তুলনা করে করে প্রতিদিনই নতুন করে বিস্ময় প্রকাশ করেণ অনুপমা। আবার এ উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করতে ছাড়েন না—সংসারের এই নবাবী চাল চেলে আর কতদিন চালাতে পারবেন তারানাথ।

ছেলেটি তো একেবারে লাটসাহেবেব পুষ্যি-পুত্তুর। মেয়েটি বাদশার বেগম। এতটুকু ত্রুটি হ'লেই রসাতল। ছেলে-মেয়েদের কান বাঁচিয়েই অবশ্য বলেন অনুপমা, এখনকার ছেলে-মেয়েদের তো বিশ্বাস নেই।

আজ আর বাজার দরের আলোচনা নয়—কর্তা রেগে আছেন। অনুপমা নীরব।

খানিকক্ষণ খাওয়ার পর হঠাৎ মুখ তুলে তারানাথ বলেন—কি নিয়ে এতক্ষণ বচসা হচ্ছিল বাবুর?

বলা বাহুল্য উদ্দিষ্ট 'বাবু'টি তারানাথের বয়স্ক বেকার পুত্র। এহেন অম্লরসাত্মক উষ্ণভাষা আর কার সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে—উপযুক্ত বয়সের পুত্র ছাড়া?

একটি বিক্ষোভসূচক শব্দের সঙ্গে অনুপমা উত্তর দেন—আর বলো কেন? সেই দিল্লী যাওয়া! বন্ধুরা যাচ্ছে—অতএব ওঁরও যাওয়াই চাই। 'দিল্লী দিল্লী' করে ক্ষেপে উঠেছে একেবারে।

তারানাথ বিরক্তভাবে বলেন—এখনো সেই 'খোট' ধরে বসে আছে? এককথায় বলে দিচ্ছি—যাওয়া হবে না ব্যাস।

—বলে তো আমিও দিয়েছিলাম গো—অনুপমা পাখা নামিয়ে হাত উল্টে বলেন—শুনলে তো! সেই তর্কই তো হচ্ছিল 'কেন যাবো না'—'গেলে দোষ কি'—'লোকে কি যায় না'—'যারা যাবে তারা সব মরে যাবে না কি'—'নিষেধের একটা কারণ থাকা দরকার..'এই সব পাকা পাকা কথা।

নিষেধের কারণ থাকা দরকার!

শোন আস্পর্ধার কথা। তারানাথের অনিচ্ছাটাই তো যথেষ্ট কারণ। তা ছাড়াও আবার কারণ দেখতে হবে ছেলেকে? ক্রুদ্ধ তারানাথ বলেন—আমি ওর তাঁবেদার নই যে, কারণ দেখাবো। একপাল চ্যাঙড়া ছোঁড়ার সঙ্গে হৈ চৈ করতে যেতে আমি দেব না। টাকা জোগাবার বেলায় তো আমি, ব্যাটা। তবু যদি এক পয়সা আনবার মুরোদ থাকতো। চুল ছাঁটার পয়সাটি পর্যন্ত তো হাত পেতে নিতে হয় এই হাবাতে বুড়োর কাছে, তবু কী তেজ।

কথাই কওয়া হয় না ভালো করে। আমি যেন একটা কীটস্য কীট।

অনুপমার কণ্ঠেও অনুরূপ সুর—শুধু তুমি কেন, কা'কে নয়? জগৎকেই যেন থোড়াই কেয়ার করে ওরা।...দরকারের সময় হাত পাতার কথা বলছো? তা' হ'লেও তো বাঁচতাম, মুখ ফুটে চাইলে—মানের কানা খষে যাবে না?...সেই মাথা কিনবেন।

—হুঁঃ। তারানাথ গম্ভীরভাবে বললেন—বললে—এখুনি আবার তোমার মানের কানা খসে যাবে, তবে ন্যায্য কথা বলবো—তোমার আস্কারাতেই এ রকম হয়েছে।

—আস্কারা আবার কি! অনুপমা অসন্তোষ প্রকাশ করেন—মেজাজটি তো জানো না ছেলের। একটা ন্যায়-অন্যায় কথা বলবার জো আছে?

—আছে কি না আমি দেখতাম...তারানাথ হুমকি দিয়ে ওঠেন—বলতে আমি খুবই পারতাম, শুধু পারি না তোমার ভয়ে।

হঠাৎ চল্লিশোত্তীর্ণা অনুপমার মুখে এমন একটা রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে,—সেটা ছাব্বিশ বছরে মানানসই। তবে উত্তরটা বয়সের অনুপাতেই দেন ভদ্রমহিলা—আহা মরে যাই! আমার ভয়ে তো অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছ তুমি।...ভয় কবতে হয় আজকালকার ছেলেদের। খোকাই তো সেদিন বলছিল—ওর কোন বন্ধুর ভাই নাকি বাপের কাছে বকুনি খেয়ে...কে? কে ওখানে?

তারানাথ অগ্রাহ্যভরে বললেন—কে আবার? মেধো হয় তো।

—কি জানি বাবু—অনুপমা সন্দিগ্ধভাবে বলেন—মনে হ'ল যেন খোকা উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে।...

—খোকা আবার কি? এই তো সাহেব সেজে বেরিয়ে যাওয়া হ'ল বাবুর! পোর্টফোলিও হাতে না ঝোলালে বেরোনো হয় না, যেন মস্ত এক অফিসার।

—হ্যাঁ ওই এক ফ্যাশান ছেলের।

কিন্তু—ঘুরে আবার আসেনি তো?

—কেন, ঘুরে আসবে কি জন্যে?

—কি জানি, কিছু ভুলে গিয়েছে হয়তো। পরশু অমনি—কতদূর গিয়ে ছুটতে ছুটতে এলো—ঘড়ি ভুলে গেছে বলে।

—তা আসবেন বৈকি। কব্জিতে ঘড়ি না বেঁধে বেরোলে যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। কই বলো দিকি' ছুটে গিয়ে সংসারের একটা জিনিস কিনে আন্? মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে লাটসাহেবের।

বিরক্তিতিক্ত স্বরে কথাগুলি উচ্চারণ করে ছোট্ট এক টুকরো পাতিলেবু গেলাসের জলে গুলতে থাকেন তারানাথ। তিন আনা জোড়া লেবু বড় বড় দু'খানা খাওয়া যায় না।

অনুগামিনী সতী অনুপমা পতিদেবতার এই ধারালো মন্তব্যটির পিঠো-পিঠি বেশ ঘোরালো কিছু বলবার আগে একেবার উঠে গিয়ে এদিক-ওদিক করে নিঃসন্দেহ হয়ে এসে বসেন এবং এখনকার ছেলেরা, লেখা-পড়া শিখেও যে কত মুখ্যু আর বাঁদর হয় তারই উদাহরণ দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন।...ভাগ্নে-ভাইপো, ভাসুরপো, বোনপো দেখছেন তো সবাইকে। অন্ধ-স্নেহের বশে নিজের ছেলের বিষয়ে ছেড়ে কথা কইবেন এমন মুখ্যু মা অনুপমা নন।...তিন তিনটে পাশ করে যে ছেলে নির্বিকারচিত্তে দু'বছর ধরে শুধু আড্ডা দিয়ে আর সিনেমা দেখে বেড়ায়, তার আবার পদার্থ আছে কিছু? কেন, উঠে পড়ে লেগে চেষ্টা করলে কিছু একটা জুটতো না এতদিন? তবু তো বাপের একটু আসান হত?

দামী দামী আর ভালো ভালো আরো অনেক কথাই বলেন অনুপমা। ছুটির দিন খেয়ে তাড়াতাড়ি ওঠবার তাড়া নেই তারানাথের।

ধীরে-সুস্থে খেয়ে উঠে পানের ডিবে হাতে বাইরের ঘরে চলে যান. ছুটির দুপুরে দাবার আড্ডা বসে পাড়ার হিমাংশুবাবুর সঙ্গে। আসার সময় হয়ে এলো তাঁর।

অনুপমা ঠাকুর-চাকর সকলের খাওয়ার দেখাশোনা করে সবে খেতে বসেছেন, মেয়ে শীলা নেমে এসে ব্যস্তভাবে বলে—ঠাকুর, উনুনে আগুন আছে তো? থাকে তো একটু চায়ের জল চড়িয়ে দাও চট্ করে।

চায়ের জল। বেলা দেড়টার সময়। অনুপমা অবাক হয়ে বলেন—এখন চা খাবি?

শীলা বিরক্ত স্বরে বলে—আমি কেন?

দাদার ভীষণ মাথা ধরেছে—তাই।

—দাদা? খোকা বাড়ি আছে নাকি?...বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে অনুপমার।

—আছেই তো। বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে এসে শুয়ে পড়েছে মাথা ধরেছে বলে।...কই ঠাকুর, দিয়েছো?

শীলার চিত্ত-জগতে একমাত্র সম্মানিত ব্যক্তি দাদা।

গোগ্রাসে ভাত ক'টা গিলে নিয়ে ছুটে ওপরে গিয়ে ছেলের ঘরে ঢুকে একেবারে বিছানায় বসে পড়েন অনুপমা। শঙ্কিতভাবে বলেন—কি হয়েছে রে খোকা? বেরিয়ে আবার ফিরে এসে শুয়েছিস? শরীর খারাপ হয়েছে?

বলা বাহুল্য স্নেহাতুর মাতৃকণ্ঠের এই শঙ্কিত প্রশ্নের কিছু উত্তর তিনি পান না।

অবস্থা নির্ণয়ের প্রথম পর্যায় হিসাবে গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করতে যেতেই—তৎক্ষণাৎ হাতখানা সরিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শোয় খোকা।

অনুপমা এ অপমান গায়ে না মেখে পুনঃপ্রশ্ন করেন—কখন এলি তুই?

খোকা নিরুত্তর।

অতএব নিঃসন্দেহ, তার সম্বন্ধে মা-বাপের মধ্যে যে উচ্চাঙ্গের আলোচনা চলছিল—সে আলোচনা তার কর্ণগোচর হয়েছে। তা হোক, অনুপমা তো হেরে ফিরে যাবে না, তাই সক্ষোভ বেদনায় বলেন—আজই হঠাৎ শরীর খারাপ করলি? পরশু তোদের বেরোবার কথা না?

বেরোনো?...খোকা যেভাবে ভুরু কুঁচকে তাকায়, তাতে আর যাই হোক খোকাত্ব প্রকাশ পায় না।—বেরোনো মানে। বেরোচ্ছি কোথায়?

অনুপমা যেন অবোধ, অনুপমা যেন আত্মবিস্মৃত, অনুপমার যেন এখনো শৈশবকাল কাটেনি, তাই প্রায় শিশুসুলভ সরলতাতেই বলে—কেন, তুই যে বলেছিলি মঙ্গলবারেই স্টার্ট করবে ওরা?

—ওরা করবে তার আমার কি? ওদের নিজের পয়সা আছে, ওরা যা খুশি করতে পারে।

হঠাৎ আচমকা প্রায় শীলার মত ভঙ্গিতেই খিলখিল করে হেসে ওঠেন অনুপমা। বিশ বছর আগে দুধ খেতে নারাজ ছেলেকে যে সুরে কথা বলে কায়দায় আনতেন, প্রায় তেমনি ছেলে ভোলানো সুরে বলেন—ওঃ তাই বলো—বাবুর রাগ হয়েছে। 'কে বকেছে—কে মেরেছে—কে দিয়েছে গাল?' তখন বুঝি ওঁর বাক্যবানগুলি কানে গেছে। (ওঁর কথাই শুধু উল্লেখ করেন অনুপমা, স্বচ্ছন্দেই করেন। নিজের অপরাধবোধের লেশমাত্র ধরা পড়ে

না মুখের চেহারায়) তাই ভাবছি—কি হ'ল খোকার। নে নে মন খারাপ করিস নি, টাকা তো আমি দেবো বলেছি।

—তুমি আর কোন আকাশ থেকে টাকা পেড়ে আনবে শুনি? তারানাথ রায়ের টাকাই তো।...সখ করে বেড়াতে যাবার রুচি আমার আর নেই মা, একটু ঘুমোতে দাও। বেকারের আবার সখ-সাধ।

অনুপমা যেন তুড়ি দিয়ে ওড়ান ছেলের কথা—হ্যাঃ, বড্ডো তুই বুড়ো হয়েছিস, রোজগারের বয়েস পার হয়ে গেছে একেবারে। তাই 'বেকার' বলে একেবারে দেগে দে নিজেকে। ওঁর কথায় আবার মানুষ রাগ করে। কথার কোনো মাথা আছে।..ওঁর কথা ধর্তব্য করতে হ'লে তো ভালো খেতে নেই, ভালো পরতে নেই, আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি যেতে নেই, সাধ-আহ্লাদ সব শিকেয় তুলে রেখে খালি টাকা আনা পাইয়ের হিসেব কষতে হয়।

—উচিত তাই—খোকা শ্লেষের সুরে বলে—অন্তত যতদিন ওঁর অন্ন ধ্বংসাচ্ছি।

—তাই বৈকি—আমি তো আজীবন ওঁর অন্ন ধ্বংসাচ্ছি—করছি যে তাই? ওই সামনা-সামনি দুটো মনরাখা কথা কয়ে যা তা বুঝিয়ে একটু ঠাণ্ডা রাখা—বুঝলি। গোঁয়ার্তুমি করে কাজ পণ্ড করে লাভ? তোর ঠাকুরদ্দা ছিলেন কী দুর্দান্ত রাগী, কিছুতে যদি একবার 'না' বলেছেন তো 'হ্যাঁ' করার কার সাধ্যি। আমিই শুধু ভুলিয়ে-ভালিয়ে খোসামোদ করে—

খোকা এইবার উঠে বসে, উদ্ধতভাবে বলে—কেন করেছো? অন্যায় করেছো। খোসামোদ করবে কিসের জন্যে? বাবাকে ও চিরকাল ভয় করে করে আর খোসামোদ করে করে এই অবস্থা। কিন্তু কেন? তোমার নিজের একটা সত্তা নেই? ভালোমন্দ বিচার-বিবেচনা নেই? যুক্তি তর্ক নেই?

সূক্ষ্ম একটি হাস্যরেখা ফুটে ওঠে—অনুপমার বাঁকা ঠোঁটের কোণে।

যুক্তিতর্ক? অনুপমার ভিতরে যুক্তিতর্ক নেই? এত অজস্র আছে যে, তার প্রবল স্রোত সমুদ্রস্রোতের মতো ভাসিয়ে দিতে পারে বাপ-ছেলে দু'জনকেই। কিন্তু ভাসিয়ে দিলে—চলে কই অনুপমার?...বিচার-বিবেচনা? সেটা যে আছে, তার প্রমাণ দিতে গেলেই তো সংসার করা কবে ঘুচে যেত অনুপমার।

আর সত্তা?

সে বস্তুটাও তো আমসত্ত্বের মতো জলে গুলে রোদে শুকিয়ে ভাঁড়ারজাত করা হয়েছে! খোসামোদের বিরুদ্ধে তো এত তড়পানি ছেলের তাকেই বা এতক্ষণ কি করলেন তিনি মা হয়ে? কিন্তু এ সবের কিছুটি উচ্চারণ করেন না অনুপমা, সূক্ষ্ম হাসির রেখাটা সূক্ষ্মতর হয়ে মিলিয়ে যায়। শুধু ম্লানকণ্ঠে বলেন—কেন নেই, সে আর তুই কি বুঝবি খোকা? লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হ'লেই কি সব বোঝা যায়? আমার মনে আর দুঃখ দিস্‌নে বাবা, তোর সব বন্ধুরা দিব্য বেড়াতে যাবে, আর তুই পড়ে থাকবি—এ আমি সইতে পারব না। ...উনি না হয় একটু রাগই করবেন।...নিজে কখনো কোথাও যেতে পাইনি, জগতের কিছু কখনো দেখিনি, চিরদিন বন্দী হয়ে থেকেছি, তোরা মন খুলে সব করলেও শান্তি আমার।

খোকা অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। মনে হয় যেন মায়ের দুই চোখের তারায় পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সেই চিরদিনের ক্ষোভ।...বঞ্চিত জীবনের, বন্দী জীবনের, নিরুপায় জীবনের।

অতঃপর কথার মোড় ঘোরে। চা হাতে করে এসে শীলাও যোগ দেয়। খোকার টাকা

হ'লে মাকে কোন্ কোন্ দেশে বেড়াতে নিয়ে যাবে তারই আলোচনা চলে।...খোকার যেটা পছন্দ অনুপমার হয়তো নয়, তাঁর মতে কত দুঃখে বেরোনো, তা মুসৌরি কেন? বরং পুরী ভুবনেশ্বর।...শীলার আদর্শ দাদা, অতএব সে মার পছন্দকে উপহাস করে।...খোকা আবার তখুনি মত পাল্টায়—কেন, পুরী ভুবনেশ্বরই কি যা-তা জায়গা? ভারতের স্থাপত্যশিল্পের পৌরাণিক নমুনা।...মার পছন্দকে বরং তারিফই করতে হয়।

অতএব তাই। তৎক্ষণাৎ শীলার 'কটকী শাড়ি' কেনা হয়। 'ক্ষেত্তার'র কাঁসার বাসন। আবার পরবর্তী ট্রিপটা সম্বন্ধে গবেষণা চলে।...

দেড়টা বেলা গড়িয়ে সাড়ে চারটেয়-ঠেকে।

হঠাৎ যেন দরজার কাছে বোমা ফাটে।

—বলি, আজ কি আর চা টা হবে না?

শিহরিত অনুপমা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন—চারটে চল্লিশ।...সর্বনাশ! ঠিক চারটে? বেলা হচ্ছে—তারানাথের 'টী টাইম'। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই যে তারানাথের হার্টের ট্রাবল বাড়ে।

আচমকা এই প্রশ্ন বোমাঘাতে নিজের হার্টের অবস্থা যাই হোক, মুখের চেহারাটা ঠিকই রাখেন অনুপমা। সহজ আফশোসের সুরে বলেন—ওমা এত বেলা হয়ে গেছে। দেখ কাণ্ড! শীলা, তুইওতো আচ্ছা মেয়ে? ..মেধোরই বা কী আক্কেল। বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে হয়তো।

—সত্যি—স্বরমাধুর্যে যতটা তিক্ততা ঢালা সম্ভব তা ঢেলে তারানাথ মন্তব্য করেন—মাইনে-করা চাকর-বাকরদের আক্কেলটাই বেশি হওয়া উচিত বটে।

স্বামীর কথার উত্তরে জিভের আগায় কোন্ কথাটা আসছিল অনুপমার?

'বিনি মাইনের চাকরাণী'র উচিত বোধের প্রশ্ন?

কি জানি। আসে না তো, কাজেই বোঝা যায় না। শুধু স্বাভাবিক খেদের সুরেই ধ্বনিত হয় তাঁর কণ্ঠে—এই দেখ না, ছেলেটা আবার 'শরীর খারাপ' বলে এসে শুয়েছে, কে জানে জ্বরজারি হবে কি না। যে দিনকাল!

পরবর্তী সিন্—দিনে নয়, রাত্রে। এ ঘরে নয়, ও ঘরে।..ঘরের দরজায় খিল লাগানোর পর টাইকো সোডা ট্যাবলেট দুটো আর জলের গ্লাসটা কর্তার হাতে তুলে দিয়ে পানের ডিবেটা নিয়ে বিছানার ওপর গুছিয়ে বসেন অনুপমা।...'পান মজাবার' বহুবিধ উপকরণপূর্ণ কৌটোটি খুলে একটিপ মুখে ফেলে বলেন—বুকের কষ্টটা বেশি হচ্ছে না তো? তোমার তো আবার সময়ের একটু এদিক-ওদিক হ'লেই—কি? তাকানো নেই কেন? রাগ হয়েছে বুঝি? না তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। ছেলেমানুষের মত রাগ—অভিমানটা ঠিক আছে এখনো!...ছেলেটাও হয়েছেন তেমনি। বাপের আর কোনো গুণ না পান, রাগ গুণটি পেয়েছেন ষোলো-আনা। তখন তোমায় বলল্লাম—খোকার শরীর খারাপ হয়েছে?...শরীর নয় মোটেই, মেজাজ।...ওই যে বন্ধুদের সব গোছগাছ হয়ে যাচ্ছে, তাই মেজাজ খাপ্পা। রেগেটেগে হুকুম দিয়ে দিয়েছি আমি যেতে।...শেষটায় মন গুঁজরে থেকে সত্যি রোগ করবে? সুধীর শ্যামল সবাই যাচ্ছে যখন, যাক্‌গে একবার। দিল্লী গিয়ে কী চারখানা হাত বেরোয় দেখি। হ্যাঁ একটা চাকরি জোগাড় ক'রে আসতে পারে—তবে বলি বুদ্ধি! শ্যামলের মামা না যেন খুব বড় চাকরে' ওখানকার? আচ্ছা

হ্যাঁগো—তোমাদের সুবোধবাবুও না দিল্লীতে বদলী হয়েছেন আজকাল?

—হয়েছে তার কি— তারানাথ বিদ্রূপ হাস্যে বলেন—তোমার ছেলে গিয়ে দাঁড়ালেই একটা চেয়ার এগিয়ে দেবে?

—যাঃও—হেসে ফেলেন অনুপমা। হাসিটা দশ-বিশ বছর আগের টাইপের। হেসে বালিশের ওপর এলিয়ে পড়ে বলেন—তোমার সবতাতেই ঠাট্টা। সরো দিকিন একটু, শুই ভালো করে।...ওই যাঃ, মশারিটা টাঙাবো ভাবলাম যে—রোসো টাঙিয়ে দিই।

—আর থাক—অনুপমার সদ্য বালিশে-ফেলা মাথাটার ওপর হাতের একটু চাপ দিয়ে তারানাথ বলে ওঠেন—হয়েছে খুব হয়েছে, উঠতে হবে না। আজ হঠাৎ এত কর্তব্যজ্ঞানের উদয় কেন?

—না না, তোমার শরীরটা আজ ভালো নেই—বলে ব্যস্তভাবে উঠে বসেন অনুপমা। ততক্ষণে অবশ্য তারানাথ উঠে দাঁড়িয়েছেন। গোঁফের ফাঁকে মুচকি একটু হেসে বলেন—আচ্ছা খুব পতিভক্তি হয়েছে। এই সাতাশ বছরের মধ্যে ক'দিন মশারি টাঙিয়েছ?

অম্বলের রোগী তারানাথের সহজে ঘুম আসে না, সুদীর্ঘ দিনের কর্মক্লান্ত আর অভিনয়শ্রান্ত অনুপমা ঘুমিয়ে পড়েন মুহূর্তেই...হয়তো অভিনয়টা নিখুঁত উৎরেছে বলেই এত স্বস্তি।..

অভিনয়?

তা ছাড়া আর কি? সুন্দর নিখুঁত অভিনয়। এত নিখুঁত যে, অভিনয় বলে বোঝা অসম্ভব। বোঝা অসম্ভব কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা কৃত্রিম।

কিন্তু একা অনুপমাই বা কেন? নারী মাত্রেই কি অভিনেত্রী নয়? অভিনয় ক্ষমতাই তো তার জীবনের মূলধন। জন্মগত সেই মূলধনটুকু সম্বল করেই তো তার যত কিছু কাজ-কারবার।

সে মূলধন যার যত বেশি, তার-ই তো সংসারে তত বেশি প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, সুনাম, সুখ্যাতি।

নদীর মতো আপন বেগে প্রবাহিত হ'তে চাইলে চলবে কেন তার?...একদিক ভরাট করে তুলতে অপরদিকে ভাঙন ধরাবার মতো বোকামি তার নেই। দুই কূল সযত্নে রক্ষা করে চলতে হয় তাকে।...রক্ষা করতে হয় সংসার, রক্ষা করতে হয় দাঁড়াবার ঠাঁই।

অনাদরকে তার বড় ভয়, বড় ভয়—অবহেলাকে।

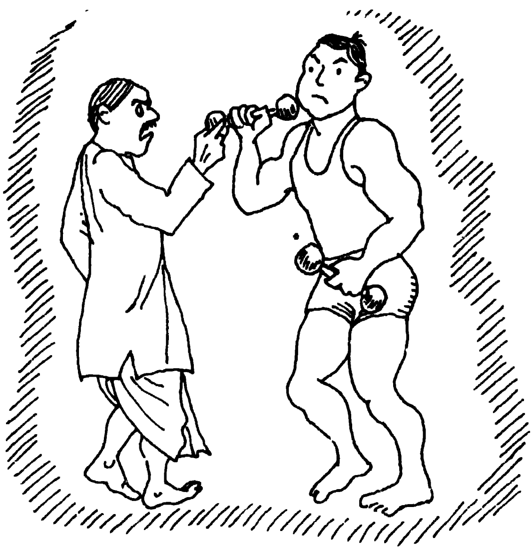
না কি এ তথ্যের সবটাই ভুল?

কোনোটাই তার অভিনয় নয়? চিরন্তনী নারীপ্রকৃতির মধ্যে পাশাপাশি বাস করছে সম্পূর্ণ আলাদা দু'টি সত্তা, জননী আর প্রিয়া। নিজের ক্ষেত্রে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মমতাময়ী নারী তার এই বিভিন্ন দু'টি সত্তার বিশাল পক্ষপুটের আড়ালে সযত্নে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে চিরশিশু অবোধ পুরুষজাতিকে।

ছলনাটা তার ছলনা নয়, করুণা।...এই করুণার আওতা ছাড়িয়ে ছলনা লেসহীন উন্মত্ত পৃথিবীতে বে-পরোয়া শিশু ভোলানাথের দলকে যদি মুখোমুখি দাঁড়াতে হত—ক'দিন লাগত পৃথিবীটা ধ্বংস হ'তে?

অব্যায়ামেষু

সুবোধ ঘোষ



ঘুম থেকে উঠে একবার, আর স্কুল থেকে ফিরে এসে একবার, রোজই দিনে দু'বার ব্যায়াম চর্চা করে হাবুল। ডন আর বৈঠক, বৈঠক আর ডন।

পরেশবাবু নিজেই ছেলেকে উৎসাহিত করেছিলেন—এ ছাড়া পার্কের চারিদিকে অন্তত দু-চক্কর দৌড়ে আসবি হাবুল। দৌড় প্র্যাকটিস করলে শরীরে খুব উপকার হয়। দম বাড়ে, ক্ষিদেও বাড়ে, হজম হয় ভাল।

শুধু ডন আর বৈঠকের কৃপাতেই হাবুলের শরীরের অনেক উপকার হয়েছে। যেমন ক্ষিদে, তেমনি হজম। গত বছরের তুলনায় এই বছরে প্রতিমাসে দশ সের বেশি আটা আনতে হয়েছে। আগে ছোলা আনা হত মাসে এক সের। এখন আনতে হয়—ছ'সের।

হাবুলের মা বলেন—শুধু পিণ্ডি পিণ্ডি, রুটি আর ছোলা খাবে, এই জন্যেই কি কসরৎ?

পরেশবাবু বলেন—খাক না, ছেলেটার স্বাস্থ্যটা তো দিন দিন ভাল হয়ে উঠছে।

সেই পরেশবাবুই সেদিন অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের ভিতর চুপ করে বসে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—বারান্দার ওদিকে ওরকম বিশ্রী ভোঁস ভোঁস করছিস কে রে?

হাবুল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—আমি, আমি এক্সারসাইজ করছি বাবা।

—তা এতক্ষণ ধরে কেন?

—তুমিই যে বলেছিলে বাবা। আজকাল ডন পঞ্চাশটা আর বৈঠক এক'শোটা বাড়িয়েছি।

—না না, আর বাড়াতে হবে না। বরং একটু কম কর।

—আচ্ছা বাবা।

—তা ছাড়া, পার্কে গিয়ে আর দৌড়াদৌড়ি করিস না।

হাবুলের মা শুনতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যান। আর এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন —কি হলো? আজ হঠাৎ ছেলেটার কসরৎ দেখ রাগ করছো যে?

খেঁকিয়ে ওঠেন পরেশবাবু।—পনর টাকা মাইনে কমেছে যে। অফিসের প্রত্যেকের মাইনে শতকরা বিশ কাট্ হয়েছে।

হাবুলও পরেশবাবুর কথামত ডন-বৈঠক কমিয়ে দেয় ঠিকই। সারাদিনের মধ্যে মোট ত্রিশটা ডন আর পঞ্চাশটা বৈঠক। পরেশবাবু বলেন—বাস্, এই ঢের। এর চেয়ে বেশি দরকার নেই।

কিন্তু তবু দেখা যায়, হাবুলের খোরাক এক ছটাকও কমে না। রুটির স্তূপের দিকে তাকিয়ে হাবুল বলে—আরও অন্তত চার-পাঁচটা বেশি না হলে পেটে পোষাচ্ছে না মা।

পরেশবাবু বলেন—কেন রে? ডন-বৈঠক তো কমিয়ে দিয়েছিস, তবু তোর খোরাক যে বেড়েই চলেছে।

হাবুল—ডন-বৈঠক কমিয়েছি। কিন্তু মুগুর আর ডাম্বেল ধরেছি যে।

—অ্যাঁ? চমকে ওঠেন পরেশবাবু। তারপরই গম্ভীর হয়ে বলেন, মুগুর আর ডাম্বেল পেলি কোত্থেকে?

—মানিকদা এক মাসের জন্য ধার দিয়েছেন।

কিন্তু এক মাসও পার হয় নি! সেদিন অফিস থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের ভিতরে মেজের উপর অসাড় হয়ে শুয়ে রইলেন পরেশবাবু।

বারান্দার ওদিকে ভোঁস ভোঁস শব্দ শুনেই এক লাফ দিয়ে উঠলেন। তারপর ছুটে গিয়ে হাবুলের হাত থেকে একটা মুগুর কেড়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—আজ তোরই দফা রফা করে দেব।

হাবুল আশ্চর্য হয়ে তাকায়। ভয় পেয়ে ছুটে আসেন হাবুলের মা।—কি হলো?

পরেশবাবু বলেন—ওকে তুমিই একটু বুঝিয়ে দাও।

হাবুলের মা—কি বুঝিয়ে দিতে বলছো?

পরেশবাবু—এক্সারসাইজ করতে নেই। শরীরের হাড়মাস গুলো কে অসভ্য করে তুলে কোন লাভ নেই। এক্সারসাইজ করলে মানুষ রাক্ষস হয়ে যায়।

আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেলেন, আবার ঘরের ভিতরে গিয়ে বসলেন পরেশবাবু। হাবুলের মা বলেন—এইবার আসল কথাটি বল তো, কি হয়েছে?

- -ছাঁটাই-এর লিস্টে নাম চড়েছে। পরেশবাবু করুণ স্বরে বিড়বিড় করেন।

পার্টনার

সুমথনাথ ঘোষ

পার্টনার চাই, পার্টনার!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন অতীশবাবু। বাজারের থলেটা হাত থেকে নিয়ে বগলে চেপে ধরতে গেলে তাঁর বুকের মধ্যেটা সহসা ধক্ করে ওঠে। মনে হয় যেন অনেক দিনের পরে, পুরনো ব্যথার জায়গাটা কে আচমকা একটা খোঁচা মেরে দিলে।

'পার্টনার' কথাটা ইংরিজী। ওর অর্থ যাই হোক্ বা যেভাবে যেখানেই ব্যবহৃত হোক না কেন, অতীশবাবুর মনে হয়, ওঁর সবচেয়ে প্রথম এবং প্রধান অর্থ হলো অংশীদার, কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের।

হ্যাঁ, একদিন তিনি মনে মনে কত না স্বপ্ন দেখেছিলেন এমনি এক পার্টনার হবার! দামী স্যুট পরে, গলায় 'টাই' এঁটে, হাতে পোর্টফোলিও ব্যাগ ঝুলিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ ঝকঝকে মোটরগাড়ী থেকে যেমন নামবেন, অফিসের দরজা থেকে দারোয়ানটা ছুটে এসে সেলাম দিয়ে তাঁর হাতের ব্যাগটা নিজে নিয়ে ওঁর পিছনে পিছনে যাবে। ওঁর জুতোর শব্দ ধ্বনিত হতে থাকবে সারা হলঘরটাতে যতক্ষণ না তিনি কর্মরত নিঃশব্দ কেরানীবৃন্দের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে নিজের কামরায় ঝোলানো স্প্রিংয়ের দরজা ঠেলে পুরু গদিমোড়া চেয়ারটায় বসে পড়ছেন। তারপর গায়ের কোটটা খুলে চেয়ারের পিছনে রেখে, বাঁ হাতে গলার টাইটা একটু আল্‌গা করে দিতে না দিতেই মাথার ওপরের পাখাটা ঘুবে উঠবে। বসার আগেই বেয়ারা সুইচটা টিপে দিয়ে, তারপর সাহেবের মুখের কাছে এনে ধরবে চকচকে কাঁচের গ্লাসভর্তি ঠাণ্ডা জল। এক চুমুকে সবটুকু পান করে তিনি একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে গা'টা এমনিভাবে এলিয়ে দেবেন সেই নরম গদির পিঠে, যেন মোটরে চেপে বালিগঞ্জ থেকে এই পথটুকু আসতে কত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

তারপর কোটের পকেটে হাতটা চালিয়ে দিয়ে, ঝকঝকে সিগারেটের কেস্ থেকে বিলিতী 'রথ ম্যান' সিগারেট একটা বার করে, খুচ্ করে লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চকচকে পিতলের ঘণ্টাটা বাঁ হাতে একবার বাজিয়ে দেবেন। ঢং ঢং।

সঙ্গে সঙ্গে রঙীন শাড়ির সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কাটা-ব্লাউজ পরা দেহটা নিয়ে ছিপছিপে তরুণী এক বাঙালী স্টেনো, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েদের অনুকরণে ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল, ঠোঁটে লিপস্টিক্, চোখে কাজল, হাল্‌কা রঙ্ মাখানো মুখ নিয়ে, তাঁর সামনে এসে বসলে তিনি টেবিলের ওপর থেকে ফাইল-টা টেনে পাতা উল্টে যা মুখে আউড়িয়ে যাবেন, আর ঠিক হুবহু তাঁর মুখের কথাগুলো শুধু দ্রুত লিখে নেবে তরুণীটি। সিগারেট মুখে চেপে রাখার দরুন যদি তাঁর কোন ইংরিজী কথার অস্পষ্ট উচ্চারণ তার বোধগম্য না হয় তখন 'এস্‌কিউজ মি' বলে মিষ্টি সুরে হাতের পেন্সিল থামিয়ে সে আর একবার সেই কথাটি তাঁকে মুখে বলতে অনুরোধ করবে। তেমনি কোন ইংরিজী শব্দের বানান আটকে গেলে হঠাৎ তাঁর মুখের ওপর কাজল-টানা চোখ দুটো রেখে মেয়েটি স্পেলিং প্লিজ্ বলে জিজ্ঞেস

করলে তিনি বলে দেবেন সেই কথাটির বানান, ছোট ছেলেদের যেমন করে মাস্টার স্কুলে বলে দেন।

ঘাড় নীচু করে সে যখন দ্রুত পেন্সিল চালিয়ে ডিক্টেশন নেবে তখন হয়ত তার সেই বব্ করা চুলের নীচে, ঘাড়ের শুভ্র নিটোল কোন অংশে তাঁর দৃষ্টিটা হঠাৎ আটকিয়ে যাবে। তাঁকে নীরব দেখে খপ্ করে মুখটা উঁচু করতে গেলেই, মেয়েটির সঙ্গে চার চোখে মিলন হলে, ঈষৎ সলজ্জ হাসির সঙ্গে 'সরি' বলে তিনি আবার ফিরে যাবেন তাঁর চিঠির খসড়ায়। এমনি অন্যমনস্ক হয়ে তিনি কখনও হয়তো তার নগ্ন বাহুমূলের দিকে তাকিয়ে থাকবেন, কখনও বা তার ফর্সা সরু সরু লম্বা আঙুলের মধ্যে সেই ছোট্ট সাদা পাথরের আংটিটার দিকে। যেন তাঁর দৃষ্টিকে চুম্বকের মত টেনে নেয় সেই পাথরের জ্যোতি! আবার হয়তো কখনও, তার গালের ওপর ঠিক ঠোঁটের কাছেই যে কালো রঙের তিলটা, তার দিকে বিস্মিত নয়নে চেয়ে থাকবেন।

চিঠি লেখা শেষ হলে, টাইপ করতে যাবার জন্যে যেই সে পিছন ফিরে উঠে দাঁড়াবে অমনি পাউডার ও এসেন্স মিশ্রিত তার গায়ের গন্ধ যেন একঝলক তাঁর মুখের ওপর এসে আছড়ে পড়ে। ঝোলানো স্প্রিংয়ের দরজাটা ঠেলে বেরিয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ সেটা দুলে দুলে থেমে না যাওয়া পর্যন্ত নতুন একটা সিগারেট মুখে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ভুলে গিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন সেই দিকে। একসময় তাঁর মনে হয়, বুঝি দরজাটার দোলানি থেমে গেছে কিন্তু তাঁর বুকের ভেতরে কি যেন তখনও দুলছে!

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে অতীশবাবুর।

হায় রে অলীক স্বপ্ন! নিমিষে সব যেন ছায়াবাজির মত কোথায় মিলিয়ে যায়!

পার্টনার হওয়া দূরে থাক্, উলটে কত পার্টনারের দোরে হেঁটে হেঁটে জুতোর গোড়ালি ক্ষয়ে গেছে, তবু একটা চাকরি যোগাড় করতে পারেন নি। বি. এ. পাস করে তিনটে বছর দুঃসহ বেকার জীবন যাপন করার পর শেষে ছোট মামার খুড়শ্বশুরের বাল্যবন্ধু এক এম. পি.কে ধরে এক মার্চেন্ট অফিসে ঢুকতে পেরেছিলেন। নইলে আজ কি হতো, ভাবতে গেলে বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ি পেটাতে থাকে।

তারপর থেকে বারোটা বছর গেছে কেটে। একটি যুগ পার হয়েছে।

পার্টনার চাই—পার্টনার—এই যে বাবু মিস্ করলে হতাশ হবেন! আর পাবেন না! হঠাৎ সে চীৎকার ধ্বনিতে স্বপ্নভঙ্গ হয় অতীশবাবুর!

তখন 'পার্টনার' কথাটা অন্য যে অর্থে ইংরেজরা ব্যবহার করে সেটা যেন সুপ্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে তাঁর কাছে। বুকের অভ্যন্তরে ঠিক যেখানটায় অন্তঃকরণের ধুক ধুক শব্দ দিবারাত্র ঘড়ির পেণ্ডুলাম-এর মত ঘোষণা করছে যে তিনি জীবিত আছেন! বেঁচে আছেন। মরেননি। সহসা তাঁর মনে হয় যেন কে সেই পেণ্ডুলামটা হাত দিয়ে চেপে রেখেছিল, হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছে তাই বুকের দুলুনিটাকে সংযত করতে পারছেন না...

হ্যাঁ, সব যুবকের মতই বি. এ. পড়ার সময় জীবনসঙ্গিনীর স্বপ্ন তিনিও দেখতেন। 'পার্টনার' বা অর্ধাঙ্গিনী কেমন হবে, তাই নিয়ে একদিন নয়—কত বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। কেবল রূপসী বা তন্বাঙ্গী নয় বা ইউনিভারসিটির ছাপ মারা মেয়েও নয়, শিক্ষায়দীক্ষায়, সঙ্গীতে, শিল্পকলায় সে হবে একেবারে অদ্বিতীয়া, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে যেতে পারবেন তিনি এমনি কোন সুপরিচিতা, পূর্বরাগের মধ্যে দিয়ে যার মনে আগেই তাঁর সকল স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখে মুগ্ধ হবেন—কেবল

তাকেই অর্ধাঙ্গিনীর আসনে বসিয়ে মাল্যবরণ করে ঘরে আনবেন।

কিন্তু এখানেও ঈশ্বর বাদ সাধলেন। চরম আঘাত হেনে অতীশবাবুর সকল স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিলেন। পূর্বরাগ দূরে থাক, নিজের পছন্দ বা স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হলেন। শুধু চাকরির খাতিরে, বড়বাবুর বিধবা বড় শালীর ম্যাট্রিক ফেল করা অতি সাধারণ-রূপিণী, সেজ মেয়েটিকে গৃহিণীর আসনে বসাতে বাধ্য হন।

ফলে জীবনসঙ্গিনী হয়ে রইলেন কল্পবাসিনী।

এমনি করে কত বছর গড়িয়ে গেছে।

এখন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অবিবাহিতা ভগ্নীকে নিয়ে মুখটি বুজিয়ে সংসারের জোয়াল টেনে চলেছেন। ট্রামে বাসে, পায়ে হেঁটে ভিড় ঠেলে যেমন চলে পথেঘাটে হাজারে হাজারে কেরানী প্রতিদিন, তাদের সঙ্গে এখন অতীশবাবুর কোন তফাৎ নেই। তাদের সকলের মত তিনিও একজন জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সৈনিক।

আবার চীৎকার!

পার্টনার চাই—পার্টনার—এই যে চলে গেল— ইলিশের হাফ শেয়ার...আর পাবেন না বাবু, গঙ্গার ইলিশ।

এবার মাছের বাজারেব দিক থেকে মুখটা ঘৃণায় ফিরিয়ে নেন, অতীশবাবু। না, না, না—এখানেও পার্টনার হবার ভাগ্য নিয়ে তিনি পৃথিবীতে আসেননি। ধিক্কার দেন নিজেকে। ব্যবসায়ের অংশীদার নয়, জীবনসঙ্গিনীও নয়, এমনি কি একটা গোটা ইলিশের অর্ধাংশের ভাগীদার হবার যোগ্যতাও তাঁর নেই। সেখানেও তিনি ভাগ্যবিড়ম্বিত।

মনে পড়ে যায় সেদিন আপিসে কি একটা জরুরী কাজ ছিল। তাড়াতাড়ি খেতে বসেছিলেন অতীশবাবু। গরম ফুটন্ত ডাল হাতা করে তুলে এনে তাঁর ভাতের ওপর ঢেলে দিতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, হ্যাঁগো, আজকাল প্রায়ই আশেপাশের বাড়ি থেকে ইলিশ মাছেব গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে, বাজারে কি খুব ইলিশ উঠেছে! কই তুমি তো এ বছরে একদিনও আনোনি!

আনবো কি, যা আকাশ-ছোঁয়া দাম! বাবা! ষোলো আঠারোর কম কথা কয় না।

কিন্তু এত যদি দাম, তাহলে লোক খাচ্ছে কি করে বুঝি না!

বুঝি এতে অতীশবাবুর আত্মসম্মানে ঘা লাগে। তিনি বলেন, জানো কাল আমি ঢুকেছিলুম ইলিশ মাছের বাজারে, ভাবলুম মরুক গে, কেটে তো বিক্রী হচ্ছে, না হয় তার জন্যে কিছু বেশী দাম নেবে, অন্তত আমাদের পাঁচজনের মত পাঁচটুকরো হলেই চলে যাবে।

এই বলে তাড়াতাড়ি গরম গরম ডাল-মাখা ভাত মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে তারপর বলেন, বিশ্বাস করবে না, আমার সামনে একজন তিনশো মাছ নিয়ে বললে, 'পিস করে দে।'

মেছোটা কচকচ করে মাছটাকে টুকরো করে দিলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ক'খানা হলো রে? মেছো উত্তর দিল, আজ্ঞে ছখানা।

যেন চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন তার মানে আশি পয়সা করে পড়লো একটা পিস! মেছোটা তখন বলে উঠলো, আজ তো তবু ষোলো টাকায় পেলেন, কাল কেটে বেচেছি আঠারো টাকা করে!

অতীশবাবুর স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, বেশ করেছো, এত দাম দিয়ে মাছ খাবার কোন দরকার নেই। এমন তো নয় যে জীবনে কখনও খাইনি! সবে তো উঠছে, তাই দাম বেশী। আবার আমদানি বেশী হলেই আপনি দাম কমবে। মনে নেই সে বছর ভাদ্র মাসের শেষে মাছ সস্তা হলে তুমি কতদিন এনেছিলে!

এই বলে একটু থেমে তাঁর স্ত্রী বলেন, তুমি যাই বলো না বাপু, ইলিশ মাছ একখানা খেয়ে তৃপ্তি হয় না। তার চেয়ে না খাওয়া ভাল। অন্তত একখানা গরম ভাজার সঙ্গে আর একখানা সরষে-বাটা দিয়ে কাঁচা ইলিশের রসা, না হলে কি মন ভরে!

এ সম্বন্ধে অতীশবাবু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একেবারে একমত। বলা বাহুল্য, ইলিশ মাছ বিশেষ করে গঙ্গার টাটকা ইলিশের প্রতি লোভ কারুর চেয়ে অতীশবাবুর কম নয়, বরং বেশী। তবে তাঁর স্ত্রীর মত নয়। তাঁর ইলিশপ্রীতি বেড়ালের কথা মনে করিয়ে দেয়। কাঁটাপোঁটাটি পর্যন্ত বাদ দেন না তিনি। চুষে কামড়ে চিবিয়ে, থালাটাতে যতক্ষণ মাছের গন্ধ থাকে চেটে ঝকঝকে করে দেন।

আবার চীৎকার! তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়ে আবার। এই যে সস্তা চলে গেল—পার্টনার চাই—পার্টনার—হাফ্ শেয়ার, টাটকা গঙ্গার ইলিশ।

হয়ত আজ মাছ সস্তা হয়েছে, স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়। ভয়ে ভয়ে ঢুকে পড়েন অতীশবাবু বাজারের মধ্যে। নইলে অন্যদিন ওটাকে নিষিদ্ধ এলাকা বলে এড়িয়ে চলেন তিনি। তাঁর মত লোকদের জন্যে ওই বাঁধানো মাছের স্টলগুলো নয়। কে যেন অলিখিত অক্ষরে সেখানে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে, সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ! কেবল বড়লোক, দশ বারো কি চোদ্দ টাকা মাছের কিলো শুনেও যাদের মুখের একটি রেখারও পরিবর্তন ঘটে না সেই সব ভাগ্যবান ক্রেতাদের এলাকা ওটা, তারা ওখানের প্রাত্যহিক খরিদ্দার!

অতীশবাবু অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছিলেন ওই বড়লোকদের বাজারে ঢোকা। বোধহয় আজ ইলিশের আমদানি বেশি তাই এত হাঁকাহাঁকি এই মনে করে অগ্রসর হলেন। সস্তা হলেও হতে পারে। যদি কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করে একটা মাছ নিতে পারেন তো মন্দ কি! তাহলে হয়তো, হঠাৎ স্ত্রীর কথাটা কানের কাছে বেজে ওঠে, এক পিস ভাজা ও তার সঙ্গে এক পিস রসা ভাগ্যে জুটতে পারে!

দামটা অন্যদের কাছে সস্তা হতে পারে, কিন্তু অতীশবাবুর কাছে অনেক। সত্যি আজ দশ টাকা কিলো। ওই রকম চকচকে চওড়া পেটিওলা, ডিমছাড়া গঙ্গার ইলিশের তুলনায় দাম আজকের দিনে কমই বটে।

হাফ্ শেয়ার নেবেন নাকি বাবু? অতীশবাবুকে দেখে মেছোটা চেঁচিয়ে ওঠে।

কত লাগবে?

আজ্ঞে এক কিলো সাড়ে আটশো ওজন আছে। ন'টাকা চার আনার মত লাগবে।

অতীশবাবু একটু থমকে প্রশ্ন করেন, ছোট নেই?

আছে। সেগুলো কেটে বেচি না। গোটা নিতে হবে। এই এক কিলোর মত কি তার চেয়ে একটু বেশী।

হতাশ হয়ে অতীশবাবু অন্য দোকানে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু সর্বত্র ওই এক কথা। বড় ইলিশের শেয়ার ছাড়া কেউ বেচবে না।

অবশেষে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যখন ভাবছেন কি করবেন, তখন মেছোটা

ছোট মত ইলিশ পাল্লাতে চাপিয়ে বলে, বাবু, এটা পুরো এক কিলো ওজন আছে। গোটা নিয়ে যান। বেশী আপনার পড়ছে না, মাত্র দশ টাকা। একেবারে টাটকা ইলিশ, এই দেখুন কানটা, লাল টকটক করছে। আহা-হা-হা! সারাদেহে থেকে যেন রুপো ঝরছে। বাজারের সেরা মাছ। একবার হাতে করে দেখুন। এই যে রুপো নিয়ে যান, রুপো দশ টাকা কিলো! বলে রসিকতা করে ওঠে। মেছোরা এমন অনেক রকমের রসিকতা করে মাছ নিয়ে তা সকলেই জানে।

তবে মেছোটা যে এখন মিথ্যে বলেনি মাছ হাতে করে না দেখলেও, তার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন অতীশবাবু। মাছটা লোভনীয়; তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, মাত্র দশ টাকা নিয়ে বাজারে এসেছিলেন। ছেলের স্কুলের টিফিনের জন্যে পাঁউরুটি, মাখন ও একটু মিষ্টি নিতে হবে। তার ওপর আজ বৃহস্পতিবার, লক্ষ্মীর পুজোর ফুল ও ফল কিছু কিনে নিয়ে যাবার কথাও বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন গৃহিণী। আলু-বেগুন না হয় আজ নাই কিনবেন, তবু ওগুলো তো চাইই-চাই।

ভাবছেন, এমন সময় দৈব্যপ্রেরিতের মত একটি সুশ্রী সুন্দরী তরুণী, একেবারে যাকে বলে আধুনিকা, তাঁর সামনে এসে বললে, আপনি বুঝি পার্টনার খুঁজছেন?

তার দিকে তাকিয়ে চোখ দুটোকে যেন ফিরিয়ে আনতে পারেন না অতীশবাবু। পাতলা ফিনফিনে একরঙা শাড়ি—তার মধ্যে দিয়ে দেহের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে বুকের দিকে যতখানি উন্মুক্ত নিরাবরণ, কোমর থেকে নীচেটা প্রায় ততখানি। বয়স একটু কম হলেও যেন আরও বেশি কমনীয়, বেশী সুন্দর। তেমনি লতানে, ছিপছিপে একহারা গড়ন। হঠাৎ তাকে দেখে অতীশবাবুর মনে হয় যেন অজন্তার গুহাচিত্রের এক বাস্তব প্রতিমূর্তি।

আপনার পার্টনার চাই?'কথাটা তাঁর কানের কাছে তখনও যেন মধুবর্ষণ করছিল। মুহূর্তের সেই বিহ্বলতা ভুলে অতীশবাবু বলেন, হ্যাঁ।

আচ্ছা মাছটা ভাল তো? আমি মাছ চিনি না। দুদিন জ্যান্ত গঙ্গার ইলিশ বলে কিনে নিয়ে গিয়ে ঠকেছি। তাই আপনাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলুম।

মেছোটো বঁটিতে মাছটা কেটে কেটে সমান দুভাগে রাখলে। তারপরে এক একটা ভাগ ওদের দুজনের ব্যাগে ভরে দিলে।

মেয়েটি তখন বললে, একটা ছোট মাথা দিতে পারো?

মেছোটা উত্তর দিলে, কোথায় পাব দিদিমণি মাথা! আপনার ওতে তো আধখানা দিয়েছি।

সেইজন্যেই তো আরও একটু চাইছি!

অতীশবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, নিন না আমারটা, আপনার যখন দরকার বলছেন! সঙ্কোচ ভুলে হঠাৎ যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন তিনি।

না, না, সে কি হয়! সলজ্জ কণ্ঠে মেয়েটি বলে ওঠে, আপনার থেকে কেন নেবো?

তাতে কি! ওই তো সামান্য একটুকরো মাথা—একটা মুড়োর আধখানা—কি হবে ওতে আমার!

মেয়েটি বলে, তাহলে আমার থেকে একটু মাছ অন্তত আপনাকে নিতে হবে।—যেন কতদিনের চেনাজানা, এমনিভাবে অনুরোধ করে।

বেশ! যদি তাতে আপনি খুশি হন তাই দিন। তবে আমার কাঠের বদলে আপনার এই মাছে কিন্তু লাভটা হলো আমার, মনে রাখবেন।

এবার হেসে ফেললে মেয়েটি। তার ঝকঝকে মুক্তোর মত দাঁতগুলি পাতলা গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে যেন ঝিলিক দিয়ে উঠলো। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে টাকা বার করে অতীশবাবুর হাতে দিতে দিতে বললে, লাভ আমারও কম হলো না। আপনাকে পার্টনার না পেলে দুটাকা বেশি জরিমানা দিয়ে কাটা ইলিশের টুকরো কিনতে হতো। আর সে ইলিশ এমন টাট্‌কা ফ্রেশ্‌ কিছুতেই হ'তো না। ওই বললুম, দুদিন আমাকে ঠকিয়েছে, কি করবো বলুন, মাছ তো আমি চিনি না। ভাগ্যিস আপনাকে আজ পেলুম! আচ্ছা তাহলে আসি। বলেই মেয়েটি দুহাত কপালে ঠেকিয়ে চলে গেল তাঁর সামনে থেকে। কোথা থেকে এসেছিল যেমন জানেন না, কোথায় চলে গেল তাও তাঁর অজ্ঞাত। তবু নিমেষে যেন বুকের মধ্যে কিসের শূন্যতা জাগে। হঠাৎ পেয়ে হারানো ব্যথা, না বিচ্ছেদ-বেদনা—কে জানে?

বাড়ি ফেরার পথে বারে বারে সেই পার্টনারের মুখটি যেন মনে পড়ে অতীশবাবুর। জীবনে এই প্রথম তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল পার্টনার। তাও সে নিজে যেচে এসেছিল বলে। বাস্তবিক কি ভদ্র সভ্য মেয়েটি, যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি মিষ্টি আচরণ। বাড়ির দরজায় পা দিয়ে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তিনি বুকের মধ্যে চেপে নিলেন।

খেতে বসে মাছের কাঁটা চুষতে চুষতে অতীশবাবুকে তাঁর স্ত্রী প্রশ্ন করে বসলেন, হ্যাঁগো মাছের আধকানা মাথাটা তোমায় তো দেয়নি, সেটা কোথায় গেল?

বার বার ঢোঁক গিলে অতীশবাবু বললেন, কি হবে ওই কাঠটায়! তার বদলে আমি একটুকরো মাছ নিয়েছি।

ওমা, কি বোকা তুমি! মাথাটাকে কাঠ বলছো? যত চিবুবে তত রস ওর রন্ধ্রে! আহা-হা, এমন টাটকা গঙ্গার ইলিশের মাথা! শোকে যেন কণ্ঠ বুজে আসে তাঁর স্ত্রীর। বলেন, মেছোটা তো ভারি বদমাইশ, তোমাকে ওই বলে যে কতখানি ঠকালো তুমি বুঝতে পারলে না!

অতীশবাবু কোন জবাব না দিয়ে তেমনি নিঃশব্দে মাছের কাঁটা ছাড়াচ্ছিলেন। তাঁর চোখের সামনে একখানি সুন্দর মুখ যেন সেই মাথাটা চিবোচ্ছিল তার সুন্দর মুক্তোর মত দাঁতগুলি দিয়ে। তাঁর কানের কাছে তখনও গুঞ্জন করছিল,—ওঁর স্ত্রীর সেই কথাটা, যত চিবুবে তত রস ওর রন্ধ্রে রন্ধ্রে! আহা-হা, এমন টাটকা গঙ্গার ইলিশের মাথা! তোমাকে বোকা পেয়ে ঠকিয়েছে সেই মেছোটা।

স্ত্রীর এ কথাটার কিন্তু কোন প্রতিবাদ করেন নি মুখে। বলতে পারেননি, যদি কেউ ঠকিয়ে থাকে তো সেই পার্টনার মেয়েটি! সেই অপরিচিতা সুন্দরী! সহসা যেন তাঁর বুকের মধ্যেটায় কি ঝিলিক মেরে ওঠে। আচ্ছা মাছের মাথাটা চিবুতে চিবুতে একবারও কি তার মনে পড়বে না তাঁর কথা? এই অজানা অচেনা পার্টনারের কথা? না—না—তাঁকে সে ঠকায়নি তো! বোধহয় মাথা খেতে খুব ভালবাসে। তাঁর স্ত্রীর চেয়ে আরও বেশি, তাই চেয়ে নিয়েছিল ওটা। আর শুধু চেয়ে নেয়নি, বদল করে নিয়েছিল। সেই কাঠের বদলে দিয়েছে তাঁকে নরম সুস্বাদু মাছ। তিনি যেমন তার কাছে ঠকেননি, তেমনি তাকেও ঠকাননি, তিনি যথার্থ পার্টনারের ধর্ম যা, তাই পালন করেছেন!

অতীশবাবু ব্যবসায়ের পার্টনার হতে পারেননি, মনের মত অর্ধাঙ্গিনী পাননি, কিন্তু ইলিশের অর্ধভাগিনী পার্টনার পেয়েছেন সত্যিই!

নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে

অবধূত



চিঠি পেলাম।

বন্ধু লিখেছেন, বিয়েয় না গেলে তিনি আর কখনও আমার মুখ দর্শন করবেন না।

শেষ রাত থেকে বৃষ্টি নেমেছে। যাকে বলে অঝোর-ঝরা। অনেক সাধ্য-সাধনার বৃষ্টি। আকাশ বাতাস আলো, মন মেজাজ ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। এমন দিনে ঘরের কোণ ছেড়ে বেরুতে কার প্রাণ চায়! কিন্তু উপায় কি? নিশ্চয়ই আর একবার বন্ধু বিয়ে করতে সাহস করবে না। যা দিনকাল পড়েছে, লোকে একবারই ও কর্মটি করবার সাহস পায় না। সুতরাং রওনা হলাম।

এক কাঁড়ি টাকা দণ্ড দিতে হল। স্ব-শ্রেণীতে ঠাঁই নেই। দেশসুদ্ধ সবাই আজিমগঞ্জ চলেছে। ইন্টার ক্লাস নেই এ ট্রেনে। মরীয়া হয়ে টাকা গুনে দিয়ে টিকিট পাল্‌টাতে হল। বেলা সাড়ে বারটায় গাড়ি ছাড়ল।

মাত্র সাড়ে চারজন এই কামরায়। ওপাশের আসনে বসেছেন রাজস্থানের এক দম্পতি আর তাঁদের চার বছরের কন্যা। গাড়িতে উঠেই ওঁরা চর্বণ করতে আরম্ভ করেছেন। মস্ত বড় বেতের টুকরি ভরে এনেছেন তার রসদ। এপাশের আসনে আমার সঙ্গে যিনি বসেছেন, তাঁর কোলের ওপর খোলা একখানি আড়াই-সেরি কেতাব। ভদ্রলোক ডুবে গেছেন তার পাতায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ নিশ্চয়ই। উঁকি দিয়ে দেখলাম, কি নাম বইটির। ট্রেনে পড়বার মত বই-ই বটে। কিছুতেই ফুরবে না জীবনভোর গাড়ি চললেও। বইখানি চেম্বার্স ডিক্সনারি।

আমার সম্বল এক টিন সিগারেট। না যায় চিবানো, না যায় পড়া। পোড়ান যায়। তাই করতে করতে অভিনিবেশ সহকারে ডিক্সনারি পাঠক ভদ্রলোকটিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম।

নেহাত গোবেচারা গোছের রোগা মানুষটি। কনুই-কাটা সাদা শার্ট আর ধুতি পরে আছেন। বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। সাধারণ বাঙালীর মত গায়ের রং, দাড়ি চাঁচা, মাথার মাঝখানে সিঁথি। বেশ একটু লম্বা ছাঁদের নির্বিকার মুখ। বই থেকে চোখ তুলে দু-একবার আমার দিকে চাইলেন। মুখের অনুপাতে বেশ বড় আর ভাসা চোখ। চোখের দৃষ্টি কিন্তু বোবা নয় বরং বলা চলে খুব বেশি ইঙ্গিতময় আর মুখর সেই চাহনি। আধঘণ্টা সমানে ছুটে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল শ্রীরামপুর স্টেশনে। দাঁড়াল তো দাঁড়ালই। নড়বার আর নামটিই নেই। নামবার যারা, তারা নেমে গেল—যারা ওঠবার, তারা উঠে এল। চা গরম আর গরম চা দুই মিলিয়ে গেল। পাঞ্জাবের হাতকাটা বাসন্তী ভাস্কর, রামপ্রসাদী গান বার পাঁচ ছয় জানালার সামনে চেঁচিয়ে গেল। ওপাশের কর্তা লোটা হাতে নেমে গিয়ে পানি নিয়ে ফিরলেন। এপাশের ইনি একটি বিড়ি ধরালেন। গাড়ি কিন্তু ঘুমিয়েই রইল। বাইরে একটা গোলমাল উঠল। জানালার কাঁচে কপালে ঠেকিয়ে দেখি ভিড় জমেছে সিঁড়ির নিচে। বাঁ হাতের চেটোয় মাটির গ্লাস বোঝাই এলুমিনিয়মের থালা মাথার ওপর উঁচু করে ধরে, ডান হাতে সাদা কেটলি ঝুলিয়ে খাকী কোর্তা পরা 'চা গরম' ভেইয়ারা ঘিরে রয়েছে জায়গাটা। অশ্রাব্য গালাগালি আর পটাপট মারের আওয়াজ আসছে সেখান থেকে।

আড়াই সেরি কেতাবখানি ফেলে আমার সহযাত্রী দবজা খুলে নেমে গেলেন। তিন লাফে সেই জটলার কাছে পৌঁছে অদ্ভুত কায়দায় সকলকে গুঁতিয়ে ঢুকে গেলেন ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েও এলেন একটা মেয়েকে নিয়ে। টানতে টানতে এনে তুলে ফেল্লেন আমাদের কামরায়। তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে গলার শিরা ফুলিয়ে বিকট অঙ্গভঙ্গি করে গালাগাল। সে ভাষা শুনে চোখ বুজে কানে আঙুল দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওধারে হাসির রোল উঠেছে। ভিড় করে যারা মজা দেখছিল, তারা বাঙালী বাবুর কাণ্ড দেখে হেসে অস্থির। তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে একটি চোয়াড় ছোকড়া, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে গাড়ির দিকে। তার হাতে একপাটি শৌখিন স্যান্ডেল। আর এগোতে সাহস হচ্ছে না তার। ছোকরার পোশাক আর চুলের বাহার যথেষ্ট। গোলাপী রঙের শার্ট, সবুজ রঙের পাজামা, গলায় একখানি রামধনু রঙের রুমাল বাঁধা। দু-চোখের কোলে কালি পড়েছে। গলার হাড় ঠেলে বেরিয়ে আছে। বেশ বোঝা গেল ছোকরার প্রাণে স্ফূর্তি আছে, বর্ষার দিনে সে একটু উড়ছে।

সেই হট্টগোলের জন্যেই বোধ হয় গাড়ির নিদ্রা ভঙ্গ হল। ট্রেনখানা প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলে, মুখ চালানো বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে এসে বসলেন নিজের জায়গায় আমার সহযাত্রী। তাঁকে দেখে তখন কে বলবে এই মানুষটি এইমাত্র নেহাত বেলেল্লার ভাষায় মুখ ছোটাচ্ছিলেন। দু-হাতে মুখ ঢেকে গাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। পোশাকের বাহার তারও কম নয়। লাল সবুজ কালো গোলাপী সব রকম রঙের কাপড় জামা পরেছে সে। সবুজ রঙের জামা, তার নিচে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লাল রঙের কাঁচুলি। কালো রঙের কাপড়ের ভেতর গোলাপী সায়া। এত পাতলা কাপড়খানা, মনে হয় শুধু যেন সায়া পরেই আছে। রোগা হতে দুটিতে অনেকগুলো করে কাঁচের চুড়ি। কানে ঝুলছে কাঁধ পর্যন্ত ঠেকানো দুল। দুটি হাতের দশটি আঙুলের নখে লাল রঙ মাখানো।

সেওড়াফুলি থেকে গাড়ি ছাড়ল। পকেট থেকে দুটি টাকা আর একখানি টিকিট বার করে সহযাত্রী সদয় কণ্ঠে ডাক দিলেন মেয়েটিকে।

"শোন—কোথায় পালাচ্ছিলে তুমি?"

মুখ থেকে হাত নামালে সে। বাঁ দিকের চোখ আর গলাটা ফুলে উঠেছে। ঐখানেই পড়েছে নিশ্চয়ই জুতোর বাড়ি। চোখের জলের সঙ্গে কাজল আর গালের রঙ মিশে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে মুখখানা মেয়েটার। ভীতিবিহ্বল চোখে সে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তিনি টিকিটখানা আর টাকা দুটো ছুঁড়ে দিলেন ওর পায়ের কাছে। বললেন—"ব্যান্ডেল পর্যন্ত যেতে পারবে এই টিকিটে। পরের ট্রেনে সে ছোঁড়া আসতে পারে। আবার যেন তার হাতে ধরা পোড়ো না।"

গাড়ি দাঁড়াল চন্দননগর স্টেশনে। ডিক্সনারি বগলে চেপে নেমে গেলেন তিনি। মেয়েটি সেইখানেই মেঝের উপর বসে পড়ল।

ব্যান্ডেলে গাড়ি থামতে সে নেমে গেল। বাঁচা গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বসলাম। ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দিতে চাইলাম এই নোংরা ব্যাপারটা মন থেকে। কিন্তু যিনি চন্দননগরে নেমে গেলেন তাঁর নির্বিকার মুখখানা মন থেকে মুছে যেতে চাইলে না অত সহজে।

মাস তিনেক পরে।

বিজয়া সম্মিলনী হচ্ছে আমাদের ক্লাবে। নামকরা গাইয়ে বাজিয়ে যোগাড় করা হয়েছে। ভিড়ও হয়েছে তেমনি। প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক পরাশর বোস আসছেন। আমি কখনও দেখিনি তাঁর ক্যারিকেচার। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বিনা নিমন্ত্রণে এসে ভিড় করেছেন। বাইরে দাঁড়াবার স্থান নেই। স্টেজে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি। পরাশর বোসকে নিয়ে সেক্রেটারি ভাস্কর রায় ঢুকলেন। আমার পাশেই একখানা টিনের চেয়ার দিয়ে বললেন—"এখানেই বসুন পরাশরবাবু। কি খাবেন? চা না শরবৎ?"

চমকে উঠলাম। কখনও ভুল হবে না এ মুখ। সামলাতে পারলাম না, বলে ফেললাম—"নমস্কার, চিনতে পারছেন?"

হেসে জবাব দিলেন—"খুব পারছি। সে মেয়েটা নেমে গিয়েছিল তো ব্যান্ডেলে?"

বললাম—"গেল বৈকি।" বলে বোকার মত প্রশ্ন করে ফেললাম—"ও কি আপনার চেনা লোক নাকি?"

"চেনা! চেনা হবে কি করে?"

"তবে যে ওকে ধরে এনে গাড়িতে তুললেন হঠাৎ?"

"তা না হলে আরও জুতো খেয়ে মরত যে। ছোঁড়ার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মারটা থেকে তো বাঁচিয়ে দিলাম, ব্যাস্।"

এমন হালকা ভাবে কথাটা বললেন যেন ওরকম কাজ করাটা একেবারে কিছুই নয়। এক গাড়ি লোকের চোখের ওপর সেই রকম একটা মেয়ের হাত ধরে টেনে গাড়িতে তুলতে যে সে পারে! তারপর সেই মুখখিস্তি আর দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা ছোঁড়াটাকে—"আয় না দেখি শালা—দে আর একবার হাত ওর গায়ে, তাহলে—" তাহলে যে তার কি দশা করে ছাড়বেন, তার জলজ্যান্ত কাঁচা কাঁচা ফিরিস্তি দেওয়া এ সমস্ত কর্ম সকলের পক্ষেই জলের মত সহজ আর সোজা! কে কি ভাবছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার

বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। হাঁ করে চেয়ে রইলাম ভদ্রলোকের মুখের দিকে। তিনি তখন আরামে শরবতে চুমুক চালাচ্ছেন।

*   *   *

তারপর তিন বছর কেটে গেল। যেখানে পরাশর সেইখানে আমি। কবে আমাদের সম্বন্ধটা তুই পর্যন্ত নেমে গেল তা টেরও পেলাম না। হাজার হাজার জোড়া চোখের সামনে দাঁড়িয়ে নিতান্ত গোবেচারা পরাশর যখন মানুষের ন্যাকামি আর হামবড়াপনার হুবহু নকল করে উদ্ভট বক্তৃতা দিতে থাকে শ্রোতাদের—তখন হাসির চোটে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। আর নেপথ্যে বসে হাজার হাজার জোড়া হাততালির তালে আমিও ফুলে উঠি বন্ধুগর্বে। সিনেমার স্টুডিও, স্টেজ, রেডিও, আর এখানে ওখানে জলসা, সর্বত্র ঘুরছি ওর সঙ্গে। চপ কাটলেট লুচি পোলাও খাচ্ছি। এক পয়সা খরচা নেই। কেউ না কেউ খাওয়াচ্ছেই। বাড়ির খাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছি। পরাশরের বাড়ি ঘর আত্মীয়স্বজনের হাঙ্গামা নেই। থাকলে এতদিনে জানতে পারতাম। একটা নামজাদা হোটেলের একখানা সাজানো ঘরে সে থাকে। তারও ভাড়া লাগে না। হোটেলের মালিক বিজ্ঞাপন দেন কাগজে—এই হোটেলের রুচি এতই উচ্চস্তরের যে বিখ্যাত পরাশর বোস এখানে স্থায়ীভাবে বাস করেন।

ভাবি এত খেটে ওর লাভ কি! কে খাবে ওর টাকা। বিয়ে-থা করেনি, করবে না কখনও। বলে, লোক হাসিয়ে পেট চালাই। কার এমন গরম পড়েছে এই হতচ্ছাড়াকে বিয়ে করবে? নেশার মধ্যে নিজে কিনে খায় বিড়ি। পরের পয়সায় ফোঁকে সিগারেট। অন্য কিছু পরের নিজের কারও পয়সাতেই ছোঁয় না। তবে আছে বটে আর একটি নেশা। সেটি হচ্ছে খামকা পরের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া। তখন অনর্থক বহু টাকা বেরিয়ে যায়। সেবার একটা কুকুরের জন্যে কি কাণ্ড করে বসল।

খুব ভোরে দুজনে ফিরছি স্টুডিও থেকে। টালিগঞ্জের রাস্তায় তখনও লোক চলাচল শুরু হয়নি। ট্রাম ডিপো পর্যন্ত গেলে ট্যাকশি রিকশা যাহোক একটা পাব এই আশায় হাঁটছি। আমাদের উলটো দিক থেকে সাক্ষাৎ যমদূত-সদৃশ সাড়ে তিনমণ ওজনের এক দেশী সাহেব আসছেন কাঁধে দোনলা বন্দুক ঝুলিয়ে। আরও কাছাকাছি হতে দেখা গেল একটি বড় লোমওলা বিলিতী কুকুরের গলায় দড়ি বেঁধে তিনি টেনে নিয়ে আসছেন। কুকুরটার জিভ বেরিয়ে গেছে আধ হাত, প্রাণপণে চেষ্টা করছে দড়ির ফাঁস থেকে গলাটা খোলবার জন্যে। সাহেবও প্রাণপণে টানছেন দড়ি ধরে। কুকুরটা শুয়ে পড়ল। তাতে কি, সেই অবস্থায় তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললেন সাহেব।

পরাশর সামনে গিয়ে বিনীত ভাবে জানতে চাইলে—"কি হয়েছে? অমন করছে কেন কুকুর? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন তিনি কুকুরটাকে?"

দাঁতে পাইপ কামড়ানো সেই দুশমন-মুখ থেকে গোঁ গোঁ করে জবাব এল—"ওটা খেপেছে। ফাঁকা মাঠে গুলি করে মারতে নিয়ে যাচ্ছি।" জবাব দিয়েই এক লাফে কুকুরটার পিছনে এসে সজোরে দিলেন এক সবুট লাথি কুকুরের পাঁজরায়। মর্মন্তুদ আর্তনাদ করে কুকুরটা নিথর হয়ে গেল। তার দুটো চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পরাশর কুকুরের ওপর।

সাহেব তেড়ে এসে পরাশরের কাঁধ খামছে ধরলেন। "বেল্লিক বেয়াদব, ছাড় আমার কুকুর। যা খুশি করব আমার কুকুরকে। তুই বাধা দেবার কে?"

পরাশর উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই লাগালে এক ঘুষি সাহেবের থ্যাবড়া নাকে। তিনি ঘুরে পড়লেন, বন্দুকটা ছিটকে পড়ল এক ধারে। চক্ষের নিমেষে সেটার নল ধরে তুলে নিয়ে মাথার ওপর ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে পরাশর। রাস্তার বাঁ পাশে একটা পুকুরের মধ্যে পড়ল সেটা ঝপাং করে। ততক্ষণে কুকুরের গলার দড়িটা আমি খুলে দিয়েছি।

তারপর দৌড়। খানিক পরে দেখি কুকুরও ছুটে আসে আমাদের সঙ্গে। পাওয়া গেল একখানা খালি রিকশা। কুকুরকে রিকশায় চাপিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম আমরা।

পরামর্শ দিলাম পরাশরকে—"কুকুরটাকে সরিয়ে ফেলি। নিশ্চয়ই পুলিশ আসবে কুকুরের খোঁজে।"

ও গ্রাহ্যই করল না। হোটেলের মালিকের ওপর হুকুম হয়ে গেল, রোজ আধ সের মাংস আর আধ সের দুধ চাই কুকুরের জন্যে। কুকুর শুয়ে রইল খাটের তলায়।

যথাসময়ে দুজন গ্রেপ্তার হলাম। লাইসেন্স করা বন্দুক ছিনিয়ে এনেছি আমরা। পুলিশের বড় কর্তারা পরাশরকে চিনতেন। সব ব্যাপারে তাঁদের বলা হল। তখন টাকার শ্রাদ্ধ করে অত বড় পুকুরটা ছেঁচে ফেলা হল। পুকুরের মালিকও বেশ কিছু টাকা নিলেন তাঁর মাছের জন্যে। পাঁকের ভেতর পাওয়া গেল বন্দুক। গেল তাই রক্ষে। নয়ত সে-যাত্রা নির্ঘাত শ্রীঘর বাস করতে হত।

কিছুতেই কুকুর দেওয়া হল না সাহেবকে। পুলিশ সাহেবের সামনে এক গোছা নোট তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলে পরাশর। জানতে পারা গেল লোকটারই মাথা খারাপ, কুকুরের নয়। সে ভাল ভাল বিলিতী কুকুর পোষে আর কিছুদিন পরে গুলি করে মেরে ফেলে।

হাসি ঠাট্টা নিয়ে যার কারবার সেই লোক সামান্য ব্যাপার নিয়ে এমন মেতে ওঠে তখন ওকে ফেরায় কার সাধ্য। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করে কিছুতেই ছাড়বে না পরাশর বোস।

মফঃস্বল থেকে একটা বহু টাকার ডাক এল। মহামহোৎসব লাগিয়েছেন এক কুমার বাহাদুর। তাঁর মা মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন গুরুদেবের নামে, সারা দেশের গুণী লোক জমা হচ্ছেন সেখানে, এক পক্ষ ধরে উৎসব চলবে। এক সপ্তাহ ওঁরা রাখতে চেয়েছিলেন পরাশরকে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। সিনেমার ছবি তোলা বন্ধ করা যায় না। দিন ছয়েক পরে রেডিওর প্রোগ্রাম রয়েছে। তিন দিনের জন্যে বায়না নেওয়া হল।

তল্পিতল্পা বেঁধে সেখানে পৌঁছে দেখা গেল সে এক ইলাহী কাণ্ড। যাত্রা থিয়েটার কবিগান ম্যাজিক। বড় বড় ওস্তাদ এসেছেন কাশী লখনউ বোম্বাই থেকে। নাম করা আধুনিক আধুনিকারা তো আছেনই। বিরাট এক মেলা বসে গেছে। লোকও জমেছে তেমনি। ছই-বাঁধা গরুর গাড়িতে সংসার চাপিয়ে এসেছে দূর গ্রাম থেকে। আর এসেছেন কয়েক হাজার সাধু-সন্ন্যাসী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী। রোজ কত হাজার লোককে এরা খাওয়াচ্ছেন কে তার হিসেব দেয়!

বহু টাকার খরচা করে হাজার পাঁচেক লোক বসতে পারে এতবড় প্যান্ডেল বানানো হয়েছে। সাজানোও হয়েছে তেমনি ভাবে, চোখ ধাঁধিয়ে যায় আলো আর রঙের খেলায়। প্রথম রাতেই পরাশর একেবারে পাগল করে তুললে লোককে। তার পরদিন আর প্যান্ডেলের ভেতর পরাশরের স্থান হল না। খোলা জায়গায় হাজার হাজার লোকের সামনে উঁচু মাচার ওপর দাঁড়িয়ে সে চালালে তার বক্তৃতা। অর্ধেক কথা কানেই ঢুকল না

এমন উৎকট হাসির রোল উঠল। খোদ মালিক আর তাঁর অন্তঃপুরবাসিনীরা মেতে উঠলেন। আমাকে পর্যন্ত খোশামোদ, যত টাকা লাগে লাগুক, আরও কয়েকটা দিন পরাশরকে আটকে রাখতে হবে!

পরদিন খুব সকালে বাইরে থেকে খবর এল এক বৈষ্ণব বাবাজী পরাশরের দর্শন-প্রার্থী। পরাশরের হুকুম নিয়ে বাবাজীকে ভেতরে আনা হল। সাধারণ লোকের চেয়ে লোকটি বেশ লম্বা। চুল দাড়ি সমস্ত সাদা, দুধের মত সাদা। মাথার মাঝখানে চুড়ো বাঁধা। পা পর্যন্ত লম্বা সাদা আলখাল্লা। দুটি চোখে যেন প্রসন্নতা উপচে পড়ছে। পরাশরের সামনে এসে তিনি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন মিলিয়ে নিলেন মনে মনে। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললেন—"তোমার নাম প্রহ্লাদ নয়? বিলোনিয়ার প্রহ্লাদ বোস তুমি, কেমন কি না?"

পরাশর ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সেও একদৃষ্টে চেয়ে আছে বাবাজীর দিকে। কোনও কথা বেরুল না তার মুখ দিয়ে। শুধু একবার মাথা দোলালে। বাবাজী কাঁধের ঝোলার ভেতর থেকে একটি ছোট পোঁটলা বার করে পরাশরের দিকে এগিয়ে ধরলেন। মুখে শুধু বললেন—"ধর তোমার জিনিস।" পরাশর হাত বাড়িয়ে ধরলে জিনিসটা। তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে একরকম ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বাবাজী।

অনেকক্ষণ আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল পরাশর কাপড়ে জড়ানো পোঁটলাটার দিকে। আমিও। তারপর খুলতে আরম্ভ করা হল পোঁটলাটা। সেও বড় সহজ ব্যাপার নয়। সাতপুরু কাপড় জড়ানো। খুলছি আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছি কি বেরুবে এর ভেতর থেকে। পরাশর নিচু হয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখছে। বেরুল একটা বার্লির কৌটো, কৌটোর ঢাকনা খুলে টেবিলের ওপর উপুড় করে ঝাঁকানি দিলাম। লাল কাপড়ের বাঁধা ছোট্ট একটি পুঁটলি ঠক্ করে উঠল। সেটা খুলে ফেললাম। কয়েকটা ছোট বড় সিন্দুর মাখানো কড়ি, কিছু শুকনো ফুল আর ছোট্ট দু-গাছি সোনার বালা। বালা দু-খানি হাতে তুলে নিয়ে পরাশর কি দেখলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। তারপর একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি, মুখে এক বিন্দু রক্ত নেই, আর সে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল চারিদিকে। স্বয়ং কুমার বাহাদুর ছুটে এলেন। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল সমস্ত মেলা। কোথাও বাবাজীর চিহ্নমাত্র নেই। তখন কুমার বাহাদুর আমাদের তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে ছুটলেন স্টেশনে। এখনই একখানা ট্রেন ছাড়বে।

স্টেশনে পৌঁছালাম যখন আমরা, তখন ট্রেন এসে গেছে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটল পরাশর প্ল্যাটফর্মের দিকে। তাড়াতাড়ি আমরাও এলাম। কুমার বাহাদুরকে দেখে স্টেশনমাস্টারও ছুটে এলেন। একটা কামরার সামনে ভিড় জমে গেছে। সেখান থেকে মারমার আওয়াজ উঠছে। সহজ ব্যাপার নয়, প্রকাশ্য দিনের বেলা এক গুণ্ডা একটা আট ন' বছরের মেয়েকে গাড়ি থেকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ স্টেশনমাস্টার গার্ড জোর করে লোক সরিয়ে কামরার সামনে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁদের পেছনে পেছনে আমরাও।

পরাশর দু'হাতে একটা আট ন' বছরের মেয়েকে আঁকড়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। গাড়ির দরজার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন সেই বাবাজী। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধা মাতাজীও হাউমাউ করে কাঁদছেন।

পুলিশ স্টেশনমাস্টার গার্ডকে দেখে গোলমালটা একটু থামল। তখন শোনা গেল

বাবাজীর ধীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। "তোমার মেয়ে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে প্রহ্লাদ। আট বছর আমরা ওকে বুকে করে রক্ষা করেছি, ওর মায়ের শেষ কথাটিও রাখতে পেরেছি আমি। তোমাদের বিয়ের কড়ি আর ফুল তোমার হাতে দিতে পেরেছি। কিন্তু ঐ মেয়ে তুমি বাঁচাতে পারবে না। ও কিছুতেই তোমায় সহ্য করতে পারবে না। লোক হাসিয়ে পেট চালাও তুমি। ও মেয়ে আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে মাধুকরী করে আর কৃষ্ণনাম গায়। ওকে আপনার করে পেতে হলে তোমাকেও লোক হাসানো ছেড়ে মেয়ের সঙ্গে এই পথে আসতে হবে। নয়ত ওকে নিয়ে শান্তি পাবে না।"

মাথায় চূড়া বাঁধা, নাকে তিলক কাটা, গলায় কণ্ঠি পরা, বৃন্দাবনী ঢঙে ছাপান শাড়িখানা গলায় গিঁট দিয়া বাঁধা ফুটফুটে মেয়েটি পরাশরের হাত ছাড়াবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চেঁচাতে লাগল। পরাশর আরও জোরে তাকে বুক আঁকড়ে ধরে রইল।

হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে গার্ড সাহেব হুইসিল মুখে পুরলেন। কুমার বাহাদুরের সঙ্গে স্টেশনমাস্টারের ইশারায় কি কথা হল। স্টেশনমাস্টার গার্ডসাহেবের দিকে চেয়ে হাত নাড়লেন। সবুজ নিশান দুলে উঠল গার্ড সাহেবের মাথার ওপর।

ওধারে চেয়ে দেখি, দু-হাতে গাড়ির দরজা ধরে বাবাজী রুখছেন মাতাজীকে। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেনই গাড়ি থেকে। ইঞ্জিনের বাঁশি ককিয়ে উঠল লম্বা টানে। নিচে মেয়েটি পরাশয়ের হাত থেকে, ওপারে মাতাজী বাবাজীর হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

পরাশর আর কিছুতে ফিরলে না স্টেশন থেকে। কুমার বাহাদুর সমস্তই বুঝলেন। বাস্তবিকই এখন পরাশরের পক্ষে ক্যারিকেচার করা সম্ভব নয়। তিনি গিয়ে আমাদের জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন। এক ঘণ্টা পরে আমরা কলকাতার গাড়িতে চাপলাম। পরাশরের মেয়ের কান্না থেমেছে বটে। কিন্তু সে একভাবে জানালার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইল। কিছুতেই মুখও ফেরাল না, একটি কথাও বললে না আমাদের সঙ্গে। এমন কি একবিন্দু জলও খাওয়ান গেল না অতটুকু মেয়েকে।

গাড়িতেই দু-কথায় বললে পরাশর ব্যাপারটা। আট বছর আগে মস্ত বড় অভিনেতা হবার আশা বুকে নিয়ে যেদিন সে গ্রাম ছাড়ে, তখন এই মেয়ে তার সাত আট মাসের ছিল। ঐ বালা দু-গাছা মেয়ের অন্নপ্রাশনে গড়ান হয়। তারপর দেড় বছর পরে আবার যেদিন সে গাঁয়ে ফিরে গেল সেদিন পেল শুধু ছাই। বাড়িঘর যেখানে ছিল সেখানে পড়ে আছে ভস্ম। একটি লোকও গ্রামে নেই। মেয়ে বউয়ের সন্ধান দেবে কে?

আবার কলকাতায় ফিরে এল পরাশর। এবার সে অন্য মানুষ। নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেবার দুর্জয় সঙ্কল্প তার বুকের মধ্যে। প্রতিশোধ নেবে সেই দেবতাটির ওপর, যিনি নেপথ্যে বসে অজস্র কান্না ঢেলে দিচ্ছেন এই দুনিয়ার ওপর। হাসি, শুধু হাসি বিলোবে সে। হাসি বিলিয়ে ক্ষণেকের জন্যে হলেও লোকের চোখের জল শুকিয়ে ফেলবে। তাহলেই সেই নিষ্ঠুর দেবতা জব্দ হবেন—যিনি শুধু কান্না ঢেলে দিয়ে আনন্দ পান!

সে প্রতিশোধ সার্থক ভাবে নিচ্ছিল পরাশর। কিন্তু মেয়ে ফিরে পেয়ে সে শক্তিটুকু সে খোয়ালে। দিবারাত্র এক চিন্তা এক ভাবনা, কি করে মেয়ের মুখে হাসি ফোটান যায়। সাজ পোশাক জিনিসপত্র দোকান উজাড় করে কিনতে লাগল। অষ্টপ্রহর মেয়ের কাছছাড়া হয় না। সিনেমা থিয়েটার চিড়িয়াখানা সর্বত্র নিয়ে ঘুরতে লাগল মেয়েকে। আলাদা বাড়ি ভাড়া করলে। সারা দিনরাতের জন্যে শিক্ষয়িত্রী রাখলে। কিছুতেই কিছু হল না।

বিশ্বসংসারকে যে হাসিয়ে বেড়ায়, সে একটা আট ন' বছরের মেয়ের মুখে একটি বাবের জন্যেও হাসি ফোটাতে পারলে না। মেয়ে দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল।

আমিও পরাশরের কাছে যাওয়া কমিয়ে দিলাম। গিয়ে কি করব? স্টুডিও স্টেজ জলসা সব ছেড়েছে পরাশর। একটি সন্ধ্যায়ও সে জলসায় যায় না। শুধু মেয়ে, মেয়ে আর মেয়ে।

শেষে একদিন তার চিঠি পেলাম। বেলা দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হাওড়া থেকে তুফান এক্সপ্রেস ছাড়বে। আমি যেন সেই গাড়িতে তার সঙ্গে শেষ দেখা করি—এই তার অনুরোধ।

চিঠি পেলাম সাড়ে নয়টার সময়। তৎক্ষণাৎ ছুটলাম।

খুঁজেই পাই না পরাশরকে। গাড়ি ছাড়বার সময় হয়েছে। শেষে তার নাম ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটতে লাগলাম গাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা।

একখানা থার্ড ক্লাস কামরা থেকে পরাশর নেমে এল। মাথা কামানো, গলা থেকে পা পর্যন্ত সাদা আলখাল্লা পরা। গলায় কণ্ঠি, নাকে তিলক। সহজ এক ফালি হাসি তাঁর মুখে। আমার দু-হাত ধরে বল্লে—"এতদিনে শান্তির পথ খুঁজে পেলাম ভাই। মেয়ের মুখে এতদিনে হাসি ফোটাতে পেরেছি। এবার বৃন্দাবন যাচ্ছি, সেখানে মেয়ের সঙ্গে মাধুকরী করে জীবনটা কাটাবো। আর আমারও লোক হাসিয়ে পেট চালাতে হবে না।"

ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কেন ভিক্ষে করবি পরাশর? অত টাকা তোর কি হোল?"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলে—"তার পাই পয়সা পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছি যক্ষ্মা হাসপাতালে। ও টাকায় আমার কোনও উপকার হবে না। যদি একটা মৃত্যু-পথযাত্রীর মুখেও হাসি ফোটে, তবেই ও টাকা সার্থক। লোক হাসিয়ে টাকা জমিয়েছি, ও দিয়ে লোকের মুখে হাসি ফুটুক।"

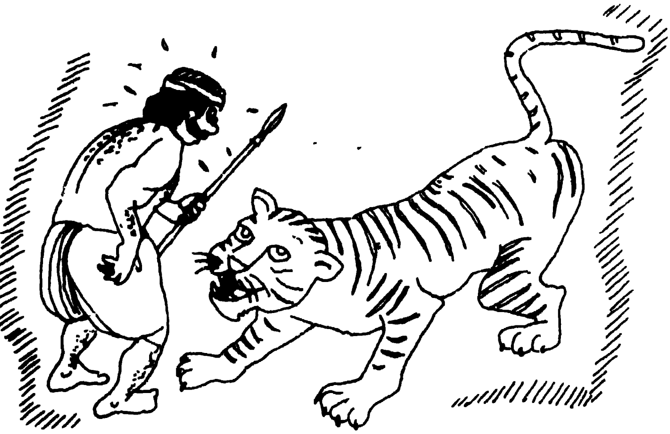
আর একটি কথাও হয়নি তার সঙ্গে। কার সঙ্গে কথা কইব? এ তো পরাশর বোস নয়। এ হচ্ছে বাবাজী প্রহ্লাদ দাস। জ্বলন্ত চোখে চেয়ে রইলাম গাড়ির ভেতর ওর মেয়ের দিকে। চুড়ো বেঁধে তিলক কণ্ঠি পরে গাড়ির ভেতর হাসি মুখে বসে আছে প্রহ্লাদ দাসের মেয়ে।

কয়েকদিন পরে রেডিওর প্রোগ্রামে দেখি রাত সাড়ে আটটায় পরাশর বোস হাসির নকশা শোনাবেন। হাজার হাজার মেয়েপুরুষ নিশ্চয়ই সেদিন রাত সাড়ে আটটায় রেডিও খুলে কান পেতে বসেছিল পরাশরের গলার আওয়াজ শোনবার জন্যে। আমিও বসেছিলাম রেডিওর সামনে। সাড়ে আটটা বাজল।

"আকাশবাণী, কলিকাতা। নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে এখন"—খট করে চাবি ঘুরিয়ে দিলাম।

বাঘের থাবা

সম্বুদ্ধ



কান্তি চৌধুরী বললেন :

তখন সোঁদরবন ছিল বাঘের আড্ডা। ঝোপে ঝাড়ে বাঘ গিসগিস করত। স্টীমার চলবার সময় নদীর দু পাড়ে বাঘ এসে গজরে লাফিয়ে পড়ত। এখন সে বাঘ আর নেই, মরে হেজে গেছে। যা দু-একটা এখনও দেখা যায়, সে না-খেয়ে আধমরা। পূর্বপুরুষের সে তেজ আর নেই।

একবার হল কি, তখন সবেমাত্র ওদিকে স্টীমার-লাইন খুলছে। বাঘের উপদ্রবে লাইন চলে না। লোকজন তো প্রাণ হাতে করেই চলে। সেজন্যে নয়, তাদের অভ্যেস আছে। কিন্তু স্টেশন-ঘর অবধি বাঘের দৌরাত্ম্যে থাকে না। রাতারাতি হানা দিয়ে সব ভেঙেচুরে সারা করে দেয়।

আমি তখন ছুটিতে, সায়েবের টেলিগ্রাম পেলাম, চৌধুরী, শিগগির এস। যমের ডাকে দেরি সয়, সায়েবের ডাকে সয় না। টেলিগ্রাম পেয়েই রেলে চড়লাম। সোজা কলকাতায়।

সায়েবের বাড়ি পৌঁছে দেখি, সায়েব বসে আছে, আর তার সঙ্গে আর একটি সায়েব, ভুঁড়ি দেখলেই বোঝা যায়, বড় চাকরি করে। আমার সায়েব তো আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, বাঁচালে চৌধুরী, তোমার জন্যেই বসে আছি। বন্দুক এনেছ তো?

বন্দুক ছাড়া আমি এক পা চলতাম না। বললাম, এনেছি। কেন বল তো?

সায়েব বললে, বলছি। অন্য সায়েবটাকে চিনিয়ে দিয়ে বললে, ইনি হচ্ছেন মিঃ ক্র্যাম্প, সোঁদরবনের মধ্য দিয়ে যে নতুন স্টীমার-লাইন হয়েছে, তার এজেন্ট। তোমার কাছে ইনি সাহায্য চান।

বললাম, কিসের?

ক্র্যাম্প সায়েব বললে, বাঘে আমার সর্বনাশ করলে। পরশু খবর পেলাম, মীরপুর বলে একটা স্টেশনকে স্টেশনই বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

আমি বললাম, মীরপুর আমি চিনি। বাঘে কি খেয়েছে?

ক্র্যাম্প সায়েব বললে, সব। স্টেশনমাস্টার, সিগন্যালের লালবাতি, টিকিটের বাক্স, মায় চেয়ার টেবিল সুদ্ধু।

আমার সায়েব বললে, তাই তোমাকে ডেকেছি। বাঘ মারতে হবে। তুমি ছাড়া আর কারও কম্ম নয়।

ক্র্যাম্প সায়েব বললে, আমার লোকজনও গেছে সেখানে, তবু তোমার ওপরই আমার ভরসা। যদি পারো চৌধুরী, আজন্ম তোমার কেনা হয়ে থাকব।

তথাস্তু।—বন্দুক ঘাড়ে করে গিয়ে স্টীমারে উঠলাম।

মীরপুরে গিয়ে দেখি, অবস্থা ভয়ানক। লোকজন ভয়ে ঘরের বার হয় না। চাষ-আবাদ, বনের গাছকাটা সব একদম বন্ধ।

আমার নাম শুনে সেখানকার শিকারীরা দেখা করতে এল। তাদের সর্দার ছিল কেতুলাল। লোকে বলত কালকেতু। কালকেতুই বটে। বিরাম জোয়ান। সাড়ে চার হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া কাঁধ, দেহের প্রত্যেকটি সূতো লোহা দিয়ে তৈরি। না জানে ভয়ডর, না জানে বিশ্রাম। একা হাতে বনের মধ্যে ঢুকে সে বাঘের সঙ্গে লড়াই করত। খেজুরগাছ কাটা হেঁসো দিয়ে বাঘ মারত।

কালকেতুকে আমি আগেও অনেক দেখেছি। তার সঙ্গে শিকারেও গেছি। তাকে ভয় পেতে কখনও দেখি নি। এবার দেখলাম, সেই কালকেতুও ভয় পেয়েছে। আমাকে বললে, দুঃসাহস করবেন না, এ বাঘ নিয়ে খেলা নয়। স্টেশনের বাইরে নরম মাটিতে বাঘের থাবার দাগ পাওয়া গিয়েছিল। কালকেতু আমাকে নিয়ে গিয়ে দাগ দেখালে। মেপে দেখলাম, সোজাসুজি পাঞ্জা এগারো ইঞ্চি হল। বাঘের থাবা এত বড় হতে পারে, এ কথা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। বললাম, কেতু, এ হয়তো সত্যি বাঘ নয়, কোন দুষ্টুলোকে দাগ বানিয়ে রেখেছে। বাঘের থাবা এত বড় হতে পারে না। থাবাই যার এতখানি, সে বাঘ কত বড়?

কেতু বললে, বাঘ মিথ্যে নয়, আরও লোকে তাকে দেখেছে। কিন্তু এ বনের বাঘ নয়, ডাইনি বাঘ। আমাদের সাঁই গুনে বলেছে, একে ঘাঁটাতে গেলে আমার মাথা থাকবে না।

আমি বললাম, সেকি হে, তুমিও শেষে ভয় পেলে নাকি? তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ কেতু।

কেতু বললে, বুড়ো হই নি কত্তা, আমি সেই কালকেতুই আছি। কিন্তু দেবতার সঙ্গে তো গা-জোরি চলে না।

আমার তখন রোখ চড়ে গেছে। বললাম, দেবতা-টেবতা শুনতে চাই না, ও বাঘ আমার চাই। বড় বাঘ না হলে আর মেরে মজা কি, বল? বন্দুক কিনেছি কি বনবেরাল মারব বলে?

কেতু কম কথার মানুষ। বললে, যা বোঝেন। আমি কিন্তু ভাল বুঝছি না।

আমি বললাম, তোমার কিচ্ছু বুঝতে হবে না, বাড়ি গিয়ে টাঙ্গি বল্লম নিয়ে এস। মাথাই থাকবে না বলেছে সাঁই, প্রাণ থাকবে না তো বলে নি।

কেতু বললে, বল্লম টাঙ্গি সঙ্গেই আছে। তবে বাড়িতে খবরটা দিয়ে যাই।

পাশের একজনকে ডেকে কেতু তার বাড়িতে পাঠালে। বললে, মহেশ, বউকে বলবি, চাল যেন নেয় না হাঁড়িতে, বাঘের হাতে ধর যদি মারাই পড়ি! বেঁচে জীয়ে ফিরি তো তখন রাঁধলেই হবে। আমাকে বুঝিয়ে বললে, পুবদেশী মেয়ে কিনা, ওইটেই ভাল বোঝে।

আমি বললাম, আর দেরি নয়, চল, 'দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়া যাক।

বেরিয়ে তো পড়লাম। আমি, কেতু, স্টীমার-কোম্পানির দুই সায়েব, আর শ-খানেক বীটার। পায়ের দাগ ধরে ধরে বনের মধ্যে ভাঙা গাছপালার চিহ্ন দেখে ঘুরে ঘুরে বাঘের খোঁজ করতে লাগলাম, বাঘ আর পাই না। সকালবেলা বেরিয়েছি, দুপুর হেলে যায়, তবু বাঘ বেরোয় না। সায়েবরা বললে, চৌধুরী, বাঘ নেই, তোমার নাম শুনেই পালিয়েছে। চল, এবার ফেরা যাক। আসল কথা, ব্যাটাদের ক্ষিদে পেয়েছে।

আমি বললাম, সায়েব, ফিরতে হয় তোমরা ফেরো, আমি বাঘ না মেরে ফিরব না। কেতুও আমার কথাতে সায় দিলে। অগত্যা সায়েবরা মুখ চুন করে রইল, ফেরার নাম আর করলে না।

ঘুরতে ঘুরতে আর বন ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে বেলা যখন প্রায় চারটে হবে, তখন বাঘের দেখা পেলাম।

কেতু সক্কলের আগে আগে যাচ্ছিল, তার হাতে বল্লম। তার একটু পেছনে ছিলাম আমি আর সায়েব দুটো। আর একটু পেছনে একদল শিকারী। সামনে একটা ছোট্ট ঝোপ, উঁচু নয়, কিন্তু পাতায় লতায় ঠাসা। অতটুকু ঝোপের মধ্যে বাঘ বসে আছে, কেউ ভাবে নি। কেতুও না। তায় আবার হাওয়া বইছিল আমাদের পেছন থেকে, বাঘের গায়ের গন্ধও আমরা পাই নি। ঝোপটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে কেতুর হঠাৎ কি খেয়াল হল, হাতের বল্লম দিয়ে দিলে ঝোপের মধ্যে এক খোঁচা। বাস্, আর যায় কোথা! ঘাঁক করে বাঘ লাফিয়ে উঠে দু হাতে তাকে একবারে জড়িয়ে ধরলে। কেতু প্রথমটা ভড়কে গেল, বল্লম হাত থেকে পড়ে গেল। কিন্তু ধন্য সাহস, সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে এক হাঁক দিলে, খবরদার!

মনে হল, বাঘের গর্জনের চাইতেও আকাশ-ফাটা গর্জন কেতুর। তারপরই দেখলাম দুজনে জড়াজড়ি করে মাটিতে গড়াচ্ছে। কেতু দু হাতে বাঘকে জড়িয়ে ধরেছে।

আমার পেছনে সায়েব দুটো ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। আমি বন্দুক তুললাম। কিন্তু গুলি ছুঁড়লে কেতুকে লাগবার ভয়।

কেতু চেঁচিয়ে বললে, হুজুর, গুলি করুন, দেরি করবেন না, ব্যাটার গায়ে বেজায় জোর, ধরে রাখতে পারছি না।

আমি বললাম, তোমার গায়ে লাগবে। তুমি এক কাজ কর, আমরা চট করে খানিকটা পিছিয়ে যাই, তারপর তুমি বাঘকে ছেড়ে দাও। আমাদের তাড়া করে খোলা জায়গায় এলেই গুলি করব।

কেতু বললে, অত সময় নেই, আপনি গুলি করুন। আমার জন্যে ভাববেন না, আমার প্রাণ এমনিই গেছে। মাথাটাকে সাবড়ে দিয়েছে একেবারে।

বলতে বলতেই হঠাৎ ধস্তাধস্তি থেমে গেল। লম্বা ঘাসের মধ্যে দুজনে গড়াচ্ছিল বলে আমরা স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। এইবার হঠাৎ ঘাসবনের ওপরে বাঘের মাথাটা জেগে উঠল। কেতু নীচেয় পড়েছে, বাঘ তার ওপর চেপে বসে আমাদের দিকে দেখছে। আর দেরি নয়। বন্দুক তুলে বসালাম মাথা সই করে এক গুলি। গুলি খেয়ে বাঘ ভয়ানক

গর্জন করে লাফ দিলে, আমি সেই লাফের ওপরই আর এক গুলি বসালাম। সায়েবরাও গুলি ছুঁড়ল।

বাঘ মাটিতে পড়ল, কেতু আর আমাদের মাঝখানটায় খোলা জমিতে। পড়ে আর উঠতে পারলে না, শুয়েই ছটফট করতে লাগল। তখন আরও গোটা দুই গুলি বসিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে দিলাম।

বাঘটাকে মেপে দেখেছিলাম, ল্যাজসুদ্ধু চোদ্দ হাত। এতবড় বাঘ আমি আর কখনও দেখি নি।

আমরা বললাম, আর কেতুর কি হল?

কান্তি চৌধুরী বললেন, বলছি সবই। কেতু ভেবেছিলাম মরেই গেছে। তারপর কাছে গিয়ে দেখলাম, সে মরে নি, অজ্ঞান হয়ে আছে।

কিন্তু সে মরারই দাখিল। আমাকে বলেছিল, মাথাটা সাবড়ে দিয়েছে; দেখলাম, একটুও মিথ্যে বলে নি। ধস্তাধস্তির মধ্যে কোন্ ফাঁকে বাঘ তাকে এক মোক্ষম থাবা বসিয়েছে, থাবার চোটে তার মাথার খুলি দুই কানের বরাবর ফেটে চৌচির হয়ে গিয়ে মাথার ওপরদিককার খাবরাটা একেবারে উড়ে চলে গেছে।

সায়েবেদের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডির বোতল ছিল। তাই খাইয়ে তাকে একটু তাজা করলাম। তারপর সেই অবস্থায়ই তাকে নিয়ে স্টেশনে ফিরে এলাম।

তখন আমাদের যা অবস্থা, বুঝতেই পার। বনের মধ্যে না আছে ডাক্তার, না আছে ওষুধপত্তর, সম্বলের মধ্যে ক শিশি টিংচার আইডিন, আর সায়েবদের বোতলে ব্র্যাণ্ডি। তাই একটি একটু দিয়ে তাকে জীইয়ে রাখতে লাগলাম। মাথার খাবরা উড়ে গেলেও, কি ভাগ্যস্ ঘিলুটায় চোট লাগে নি। ঘিলুর ওপরে এক টুকরো কচি কলাপাতা বিছিয়ে রুমাল দিয়ে বেঁধে দিলাম।

সায়েবরা স্টোভ জেলে চা আর হালুয়া করতে বসল।

ঘণ্টাখানেক পরে কেতুর জ্ঞান হল। কাঠপ্রাণ একেই বলে, চোখ চেয়ে প্রথম কথাই বললে, বাঘ মরেছে?

বললাম, মরেছে। উঠো না, শুয়ে থাক।

কেতু বললে, মাথাটার দশা কি? আছে, না গেছে?

বললাম, ভেতরটা আছে। বাইরেটা নেই।

কেতু যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললে, সাঁই তখুনি বলেছিল!—বলে খানিকক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে আবার চোখ খুলে বললে, মহেশ কই? বউকে বলে এসেছে?

আমি বললাম, মহেশ তো যায় নি।

কেতু চমকে উঠে বললে, সর্বনাশ!—বলে উঠে বসতে গেল। আমরা ধরে রাখলাম। কিন্তু রাখা কি যায়! কেতু আমার দিকে চেয়ে বললে, মাথায় একটা পাগড়ি বেঁধে দিন তো ঠেসে। টনটন করছে। দিন, তারপর বাড়ি যাই।

আমরা বললাম, এখন বাড়ি যায় না। মাথার খুলি নেই, যাবে কি করে? রোদের ঝাঁজে ঘিলু গলে যাবে।

কেতু বললে, যায় যাবে। ওদিকে কোন্ কেলেঙ্কারি বেধে বসে আছে, তার ঠিক নেই। একে এই বেলা, তায় ভাত রেঁধে রেখেছে। এখন কি ঘিলু সামলাবার সময়?

সে এক যুদ্ধ! আমরাও তাকে উঠতে দোব না, সেও যাবেই। শেষ পর্যন্ত সে ক্ষেপে গেল। বললে, খুলি নেই খুলি নেই তো সেই থেকেই শুনছি। তার করেছেন কে কি? খুলি তো আর চামড়া নয় যে, ফের গজাবে!

আমি দেখলাম, বিপদ। এই অবস্থায় যদি মেজাজ গরম করে মাথায় রক্ত চড়িয়ে বসে, তবে আর রক্ষে নেই। বললাম, দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি।

আমার মাথাটার এই একটা মজা দেখেছি, বিপাকে পড়লেই আমার চমৎকার বুদ্ধি গজায়। কি উপায় করি, ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বারান্দায় এলাম। বারান্দায় বেরুতে চোখে পড়ল, ঘরের পাশে কটা নারকোলের গাছ। বাস্, আর আমাকে পায় কে! একটা বাঁটারকে বললাম, গাছে ওঠ্। বেশ কচি আর বড় দেখে ডাব পাড়বি এক ছড়া।

ডাব পাড়া হল। একটা ডাব কেটে তার মালার আধখানাকে চেঁছে ঠিক করে কেতুর মাথায় বসিয়ে দিলাম, দিব্যি কাপেকাপ বসে গেল। সায়েবদের সঙ্গে সুজি ছিল, ভিজিয়ে বোলাম করে কেতুর নতুন খুলি জুড়ে দিলাম, মাথা বেমালুম আস্ত হয়ে গেল। বুনো জাত কিনা, ওদের একটুখানি ওষুধপত্তর পড়লেই অদ্ভুত রকম কাজ দেয়।

কেতু উঠে বসল। তারপর দাঁড়াল। তাবপর বললে, এবার বাড়ি যাই।

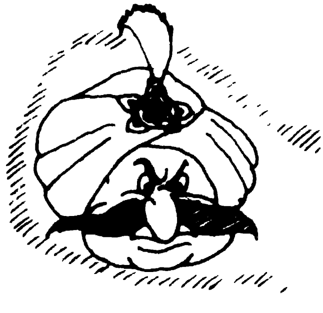
তার সঙ্গে দুজন লোক দিয়ে দিলাম, বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে। তাকে বলে দিলাম, এখন কিছুদিন মাথা গরম করবি না। বউ ঝগড়া করলেও সয়ে যাবি। রোদে বেরোবি না। আর রোজ বেশ করে সরষের তেল মাথায় মাখাবি। তেলে পেকে খোলা পোক্ত হয়ে যাবে।

ঠিক তাই হল।

এর বছর দুই পরে কেতুর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়। দেখলাম, তেল-চুকচুকে টাকটি গামছা ঢাকা দিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'কেমন আছ?' শুধোতে হেসে বললে, বেশ আছি। টাক হয়ে বরং ভালই হয়েছে, উকুনে খায় না। তেলও কম লাগে। ওঃ, সে যা তার টাক, যদি দেখতিস! আমার টাক কোথায় লাগে তার কাছে! যেন তাজমহলের গম্বুজ, অবিশ্যি কালো রঙের।

আমরা বললাম, কিন্তু টাক হয়ে রইল বেচারীর, কেশরঞ্জন মাখিয়ে দেখলে হত না?

কান্তি চৌধুরী বললেন, বলেছিলাম। মেখেওছিল দিনকতক। তা গজাল গুচ্ছের নারকোলের আঁশ। তাই শেষটা কেতু আর মাখে নি। বলেছে থাক্, আমার টাকই ভাল।



ভেজাল

বিমল মিত্র

এতদিন সরষের তেলে ভেজাল চলছিল, ঘি-এ ভেজাল চলছিল, ওষুধে ভেজাল চলছিল। কোর্টে, কাছারিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সর্বত্র ভেজালে ভেজালে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার যা দেখলাম তারপর আমার বাক্‌রোধ না হয়ে আর কোনও উপায় রইল না।

ছোটগল্প ছোটও হতে হবে আবার নাকি গল্পও হতে হবে। গল্পটা ছোট হল কি না সেটা তবু মেপে বলা সম্ভব, কিন্তু গল্প হল কিনা সেটা বিচার সাপেক্ষ। বিজ্ঞান যেমন অঙ্কঘটিত, গল্প তেমনি রসঘটিত। অবশ্য অঙ্কেরও রস আছে। আমার এক অঙ্ক-রসিক বন্ধু আছে সে যখন কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন বিশ্রাম করবার জন্যে অঙ্ক করতে বসে।

রস যে পায় সে পায়। মানে নিতে জানলে পাথর থেকেও রস নেওয়া যায়। যেমন অশ্বত্থ গাছ। সঞ্জীবচন্দ্র পাহাড়ের ফাটলে সেই রকম একটা অশ্বত্থগাছকে জন্মাতে দেখে গাছটাকে খুব রসিক বলে ঠাউরেছিলেন। কিন্তু আমি জানি আর একটা অশ্বত্থ গাছকে। গাছটা আমাদের কার্নিসে জন্মেছিল। গাছটাকে দেখে সঞ্জীবচন্দ্রের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল স্বভাবতই। সত্যিই মনে হয়েছিল বাহাদুর গাছ বটে। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলাম গাছটা শুকিয়ে গেছে। সিমেন্ট-কংক্রিটের মধ্যে রস খুঁজতে গিয়ে বেচারি বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে।

বৈজ্ঞানিককে গালাগালি দেওয়া শক্ত। কারণ বিজ্ঞান বুঝতে গেলে বোদ্ধাকে মোটামুটি বৈজ্ঞানিক হতে হয়। কিম্বা অন্য বৈজ্ঞানিকের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু সাহিত্য বুঝতে গেলে বোদ্ধা না হলেও চলে। কারণ রস-বোদ্ধা নিরঙ্কুশ! তিনি বলবেন—আমি রস পেলাম না মশাই, সুতরাং এটা নিরস বস্তু।

অর্থাৎ অশ্বত্থ গাছটা যে সিমেন্ট-কংক্রিটের ফাটলের মধ্যে বাঁচতে পারল না সেটা যেন অশ্বত্থ গাছের রসগ্রহণের অক্ষমতায় নয়, সিমেন্ট-কংক্রিটের নিরসতার দোষে!

ব্যাপারটা ঠিক এই রকম ঘটেছিল!

আমার বন্ধু বিশ্বনাথ প্যাটেল তখন বোম্বাই-এর পুলিশের বড়কর্তা। বোম্বের মদ-চোলাই কারবার ধরার কাজের অফিসের হেড।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—মদ খাওয়া বন্ধ করতে পেরেছ-টেরেছ কিছু?

বন্ধু বললে—পারব কি করে? পাবলিক-এর ভালর জন্যেই প্রোহিবিশনটা হয়েছে, অথচ পিপ্‌লই সাপোর্ট করছে না প্রোহিবিশন! এতে কখনও মদ-খাওয়া বন্ধ করা যায়?

বললাম—তুমি নিশ্চয়ই মদ খাও না?

প্যাটেল বললে—না ভাই, অতটা হিপোক্রিট এখনও হতে পারিনি—

—কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে তোমার বাবা মদ খেতেন। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মদ খেয়ে গেছেন।

প্যাটেল বললে—এ তো ভারি আশ্চর্য। বাবা মদ খেয়েছেন বলে আমি মদের বিরুদ্ধে বলতে পারব না?

—আলবৎ পারবে। তোমার বাবা মদ খেতেন বলেই আরও জোর করে প্রতিবাদ করবে। হিটলারের বাবা মদ খেত বলেই হিটলার ছিল টিটোটেলার।

—তাহলে কী বলতে চাও?

বললাম—আমি বলতে চাই এই যে, তোমার চেয়ে আর বেশি ভাল করে কেউ জানে না যে মদের নেশা ছাড়া কত শক্ত!

প্যাটেল বললে—সেইজন্যেই তো আমরা পারমিটের ব্যবস্থা করেছি। যারা পুরোনো নেশাখোর, তাদের আমরা পারমিট দিই, সেই পারমিট দেখালে তারা একটা লিমিটেড কোয়ানটিটি লিকার পায়—

—তাতে কি তাদের চলে?

প্যাটেল বললে—চলে না তো বটেই। তবু নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল। একেবারে না খেতে পেলে তারা মারা যাবে, তাই এই ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা চাই দেশ থেকে মদ খাওয়া উঠে যাক। এতে অনেক টাকা রেভিনিউ বন্ধ হচ্ছে বটে কিন্তু মানুষের মর‍্যাল ভাল হচ্ছে।

বিশ্বনাথ প্যাটেলের বাবাকে আমরা দেখেছি। নাগপুরে বিশ্বনাথদের বহু পুরুষের বাস। গণেশপুজোর দিন বিরাট হৈ-চৈ হত! সেদিন নাগপুরের গণ্যমান্য লোকদের নেমন্তন্ন হত তাদের বাড়িতে। বড়লোক মানুষ। বিশ্বনাথের বাবার ছিল ফরেস্ট। ফরেস্ট থেকে প্রচুর টাকা আমদানি হত। সেকালে সেই টাকায় সব রকম বাবুয়ানি করেও অপব্যয় করবার মত অনেক টাকা বাড়তি থাকত।

আমরা দেখেছি সেইসব মাতলামি। গণেশপুজোর দিন সকাল থেকেই আসর বসতো গানের। এদিকে গানও চলছে, ওদিকে মদও চলছে। শেষকালের দিকে জ্ঞান থাকত না বিশ্বনাথ প্যাটেলের বাবার। তখন তিনি বাড়ির উঠোনেই নাচতে আরম্ভ করতেন। বিরাট ভুঁড়িওয়ালা চেহারা। ধপ্ ধপ্ করছে গায়ের রং। গায়ের জামা তখন মাতলামির চোটে ছিঁড়ে গেছে। সেই ছেঁড়া জামা, পরনের ধুতি খসে খসে যাচ্ছে, আর তিনি ধেই ধেই করে নেচে চলেছেন।

আমরা ছোটরা সবাই বারান্দার ভেতরে আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়োদের মাতলামি দেখে মজা পাচ্ছি আর হাসছি। বিশ্বনাথের মাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন। কিন্তু কিছু করবার উপায়ও নেই।

চাকরটা উঠোনের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলেছিল কর্তাবাবুর কাণ্ড দেখে। বিশ্বনাথের মা আর থাকতে পারলেন না।

বললেন—এ্যাই ধনিয়া, দাঁত বার করে হাসছিস যে বড়? খুব মজা পেয়েছিস, না! মজা দেখবার জন্যে তোমাকে রাখা হয়েছে? দেখছিস না কর্তাবাবু মাতলামি করছে? কর্তাবাবুদের কোমরে কাপড়ের কষি খুলে যাচ্ছে, সেদিকে নজর নেই?

হঠাৎ কি যে হল, কর্তাবাবুরও নেশা চটে গেল।

ডাকলেন—এই ধনিয়া, দাঁত বার করে হাসছিস যে বড়? খুব মজা পেয়েছিস, না? মজা দেখবার জন্যে তোমাকে রাখা হয়েছে? দেখছিস্ না আমি মাতলামি করছি? আমার কাপড়ের কষি খুলে গেছে, নজরে পড়ছে না তোর?

ধনিয়া বহুদিন ধরে কর্তাবাবুকে সেবা করে আসছে। বাবুর কথায় লজ্জায় পড়ে গেল।

কর্তাবাবু বললে—আমার মাথায় জল ঢাল বেটা, বালতি আন্—যা—

বিশ্বনাথের বাবার এ-সব কাণ্ড দেখে আমরা সবাই হাসাহাসি করেছি বহুদিন। যে এ গল্প শুনেছে সে-ই হেসেছে।

এবার সেই কর্তাবাবুর ছেলেকেই বোম্বেতে এসে মদ-খাওয়া বন্ধ করবার চাকরি করতে দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

তা বিশ্বনাথ প্যাটেল সত্যিই ভাল ছেলে। আমাদের পাড়ার যতগুলো ছেলে এক ক্লাসে পড়তাম, তাদের সকলের চেয়ে ভাল।

বিশ্বনাথ বললে—আসলে ভাই মদ কেউ খায় না, মদই সকলকে খায়।

বললাম—তা আমি জানি। জানি বলেই তো অবাক হয়ে যাচ্ছি। তুমি শেষকালে এই চাকরিতে ঢুকলে। এখানে কি তুমি কিছু কাজ দেখাতে পারবে?

বোধ হয় বিশ্বনাথের নিজের মনেও সন্দেহ ছিল। আর তা ছাড়া চাকরি মানেই চাকরি। চাকরিতে তো বাছ-বিচার করার উপায় থাকে না সব সময়ে। বিশ্বনাথকেও নিজের অনিচ্ছাতে এই চাকরি নিতে হয়েছিল। কিন্তু বোম্বেতে এসে যে বিশ্বনাথের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে, আর বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা হবার ফলে যে এমন একটা ছোটগল্প জুটে যাবে তা কল্পনাই করতে পারিনি।

বোম্বেতে আমার এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠাইমা থাকতেন। দূর সম্পর্কের হলেও এককালে জ্যাঠাইমার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমাকে নিজের ছেলের মত স্নেহ করতেন। আমাদের বিপদ-আপদের দিনে সাহায্য করেছেন। এখন অনেক বয়স হয়েছে। প্রায় আশি। কিন্তু তবু স্বাস্থ্য ভাঙেনি। জ্যাঠাইমা এখনও ছোলা ভাজা মটর ভাজা খেতে পারতেন চিবিয়ে চিবিয়ে। বোম্বেতে জ্যাঠাইমার জামাই বিরাট বড়লোক ব্যবসায়ী। ভদ্রলোক মহারাষ্ট্রী। কীভাবে আমার জ্যাঠতুতো বোনের সঙ্গে কলেজে পড়তে পড়তে ভদ্রলোকের বিয়ে হয়ে যায়। তখন অবস্থা তত ভাল ছিল না তাদের। কিন্তু পরে আস্তে আস্তে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হতে শুরু করে। তখন একটার পর একটা প্রপার্টি করতে আরম্ভ করে। আমার ভগ্নিপতি শেষকালে এত টাকার মালিক হয়ে পড়ে যে, টাকার আর শেষ থাকে না। বোম্বের সমস্ত লোক তার নাম বললেই চিনতে পারে।

আমি এমনিতে হোটেলেই উঠেছিলাম। জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা করিনি।

টেলিফোন করতেই জ্যাঠাইমা বললেন—তুই হোটেলে উঠতে গেলি কেন? আমার এখানে চলে আয়।

জ্যাঠাইমা যে-রকম করে হুকুম করলে তার পর আর আমার হোটেলে থাকা চলল না।

সেইদিনই আমার ভগ্নিপতি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে নিজের বাড়িতে তুললো। দিদি যদিও অবাঙালিকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু ভগ্নীপতিকে পুরো বাঙালী করতে ভোলেনি। নামেই শুধু মিস্টার দেশপাণ্ডে, আসলে ভেতো বাঙালী। চেহারা দেখে কে বলবে যে, এই মানুষটাই হাজার হাজার লোক খাটিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে। বোম্বের কাপড়ের মিল আর শেয়ার-মার্কেটটাই যেন মিস্টার দেশপাণ্ডে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলেছে। সকাল থেকেই যে-সব লোক তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কিউ দেয়, তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

আর ওদিকে আমার দিদি বেশ স্বচ্ছন্দে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত দিন রান্নাঘরের ভেতরে কি অমানুষিক পরিশ্রম করে কেবল ভাল ভাল রান্না করে যায়।

মিস্টার দেশপাণ্ডে বললে—তোমার দিদির ওই কেমন শখ দ্যাখ না, কেবল রান্না, রান্না আর রান্না—

দিদির বোধ হয় রান্নার বাতিক ছিল।

বাড়িতে যে আসবে তাকে দিদি না খাইয়ে ছাড়বে না। শুধু খাওয়ানো নয়, খেতে হবে, রান্না কেমন হয়েছে বলতে হবে। আর একবার রান্নার প্রশংসা করলে তো আর কথাই নেই, বার বার খাইয়ে তার পেটে গ্যাসট্রিক-আল্‌সার না ধরিয়ে দিয়ে আর তাকে ছাড়বে না।

আমি আমার জামাইবাবুর দিকে চেয়ে বললাম— আপনি? আপনার তো পেট ভাল রয়েছে! আপনার তো আল্‌সার হয়নি?

দিদি বললে—ওঁর কথা ছেড়ে দাও—উনি কি এসব খান নাকি? এসব ছুঁয়েই দেখবে না—

—কেন? আল্‌সারের ভয়ে?

জামাইবাবু হাসতে লাগল। কিছু কথা বললে না।

দিদি হাসতে হাসতে বললে—ওঁর পেটে কি আর খাবার জায়গা থাকে? সন্ধে থেকেই তো চলে কিনা!

তা সত্যিই তাই। সন্ধে থেকেই জামাইবাবুর বোতল আসে। সোডা আসে। যারা জামাইবাবুর বন্ধুবান্ধব তারাও খায়। দিদি তখন রান্নাঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত। যারা অতিথি তারাও খাবে। আর খাওয়াও সামান্য কিছু নয়। একেবারে পুরো ডিনার। টাকা পয়সার অভাব নেই সংসারে। সুতরাং অঢেল খাওয়া। যে যত পারো খাও। দিদি যেমন খাওয়াতে ভালবাসে, অতিথিরও তেমনি কামাই নেই। ব্রেকফাস্টের সময় কেউ এলে সে ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাবে। লাঞ্চের সময়ে লাঞ্চ, ডিনারের সময় ডিনার।

আর আমার জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা থাকত দোতলায়। দোতলায় শাশুড়ির জন্যে জামাইবাবু, এলাহি পুজোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেখানে ছিল শাশুড়ির ঠাকুরঘর, গঙ্গাজলের জালা। কোষাকুষি। হরিণের চামড়ার আসন। শাঁখ, ধূপ-ধুনোর বন্দোবস্ত। সকাল থেকে উঠেই জ্যাঠাইমা তার পুজোর জোগাড় নিয়ে ব্যস্ত। বেলা তিনটের সময় একমুঠো ভাত খেত। তাও নিরামিষ। আর রাত্তিরটা উপোস।

জ্যাঠাইমার ব্রহ্মচর্য ছিল বড় কঠোর। ওই এক মেয়ে নিয়ে জ্যাঠাইমা বিধবা হয়েছিল। ছোটবেলা থেকে নাগপুরে দেখেছি জ্যাঠাইমা ঠিক ওই রকম করেই দিন কাটিয়েছে। জ্যাঠামশাই টাকা রেখে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া বাড়ি-ভাড়ারও আয় ছিল। সেই টাকাতেই মেয়ে কলেজের হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছে, এম. এ. পাশ করেছে। আর জ্যাঠাইমা তার গুরুদের নিয়ে মেতে দিন কাটিয়েছে।

জ্যাঠাইমা বললে—আমি বাবা ওদের কাছে খাইনে—

—কেন? খাওনা কেন তুমি?

জ্যাঠাইমা বললে—ওখেনে বড় নোংরা ওরা, কেবল মুরগী-টুরগী রাঁধে, ও-সব আমার ভাল লাগে না। গেলে আবার কাপড় কাচতে হবে তো—

ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিকটা দেখলাম সেই রকমই রয়েছে জ্যাঠাইমার।

জ্যাঠাইমা জিজ্ঞেস করলে—কদিন থাকবি বোম্বেতে?

বললাম—কাজ শেষ হয়ে গেলেই চলে যাব—

—জন্মাষ্টমীর দিন থাকবি?

—কবে জন্মাষ্টমী?

—এই তো রবিবার। খুব ভাল করে 'ঝুলন' পুজো করি জন্মাষ্টমীর দিন। অনেক লোকজন আসবে, এবার অনেককে নেমন্তন্ন করেছি কিনা, সবাই খাবে এখানে!

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি এখানে এসেও সেই তখনকার মত পুজো-আচ্চা নিয়েই মেতে আছ জ্যাঠাইমা? তোমার দেখছি কিছুই বদলায়নি!

সত্যিই বয়স বাড়লেও চেহারা সেই আগেকার মতই আছে।

অদ্ভুত সত্যবাদী ছিল জ্যাঠাইমা, একবার একটা সত্যি কথা বলার জন্যে একটা চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তি জ্যাঠাইমার হাতছাড়া হয়ে যায়।

উকিল বলেছিল—আপনার কিছু বলবার দরকার নেই, আপনি শুধু বলবেন যে আমি এই সাক্ষীকে চিনি—আর কিছু বলতে হবে না।

জ্যাঠাইমা বলেছিল—কিন্তু আমি যে ওকে চিনি না।

—তা না চিনলেই বা, চিনি বলতে দোষ কী! আপনার চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তিটা যে বেঁচে যাবে, সেটা ভাবছেন না?

জ্যাঠাইমা বলেছিল—না বাবা, সে আমি বলতে পারব না, মিথ্যে কথা আমার আসে না—

—কিন্তু ভেবে দেখুন, চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তিটা যে আপনার হাতছাড়া হয়ে যাবে!

জ্যাঠাইমা বলেছিল—তা হোক বাবা পরলোকে গিয়ে কি আমি মিথ্যে বলে নরকে যাব?

তা সে-সব কথা যাক্, দেখলাম জামাই-এর বাড়িতে এসেও জ্যাঠাইমার সেই স্বভাব যায়নি। এখানেও সেই ধর্ম-কর্ম, এখানেও সেই বাছ-বিচার, এখানেও সেই ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যের মাপকাঠি নিয়ে মাথা উঁচু করে দিন কাটাচ্ছে।

বললে—টাকাই থাকুক তোর আর যা-ই থাকুক, আসলে তো সেই পাপ-পুণ্য নিয়ে পরকালে বিচার হবে তোর!

তা এর পরদিনই প্যাটেলের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। আমাদের নাগপুরের বিশ্বনাথ প্যাটেল!

আর অনেক দিন পরে দেখা। সুতরাং ছাড়লে না। অফিসে টেনে নিয়ে গিয়ে অনেক গল্প করলে। বন্ধু-বান্ধব কে কী করছে জিজ্ঞেস করলে।

তারপর জিজ্ঞেস করলে—কোথায় উঠেছিস তুই?

বললুম সব। মিস্টার দেশপাণ্ডের নাম শোনেননি এমন লোক বোম্বেতে নেই তাও জানলাম।

বললাম—এত তো তোদের প্রোহিবিশন, এত তো তোরা চেষ্টা করছিস, আমার ভগ্নিপতি তো মদ খায়, তার মদ খাওয়া তো বন্ধ করতে পারিসনি। তার মদ খাওয়া বন্ধ করতে পারলে বুঝতুম তোর কেরামতি!

বিশ্বনাথ বললে—আমি তো ভাই নতুন এখানে এসেছি, একবার দেখি চেষ্টা করে

কিছু করতে পারি কিনা!

তারপর একটু থেমে বললে—আসলে কী হয়েছে জানিস, কারোর কোনও কো-অপারেশন পাচ্ছি না, গভর্নমেন্টও কোনও সাহায্য করছে না, পাবলিকও না।

—কেন? গভর্নমেন্ট কেন সাহায্য করছে না?

—গভর্নমেন্ট অফিসাররাও যে প্রায় সব মাতাল। সবাই মদ খায়। আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রায় সব পুলিশ অফিসারই যে খায়—কাকে বারণ করি! তা ছাড়া, বেশি চেষ্টা করতে গেলে আমিই হয়ত কোন্‌দিন খুন হয়ে যাব—

—কেন?

—পুলিশ যে বহু টাকা ঘুষ পায়! আমি বেশ বাড়াবাড়ি করলে তাদের অনেক টাকা আয় কমে যাবে।

বললাম—কিন্তু পাবলিক? পাবলিকের তো সাহায্য করা উচিত; তারা কেন কো-অপারেট করছে না?

বিশ্বনাথ বললে—সে অনেক-কথা আছে ভাই; তোকে সে-সব কথা বলা যাবে না।

—কেন?

বিশ্বনাথ বললে—তবে দ্যাখ্, তোকে দেখাচ্ছি—

বলে বিশ্বনাথ একজন কনস্টেবলকে একটা ফাইল আনতে বললে। ফাইলটা দিয়ে কনস্টেবলটা চলে যেতেই বিশ্বনাথ আমাকে ফাইলটা দেখালে।

বললে—এই দ্যাখ্—কত লোকের মদের পারমিট দেওয়া হয়েছে, তুই নিজেই দ্যাখ্—।

—আমি নামগুলো পড়তে লাগলাম। অসংখ্য নামের লিস্ট। কাউকেই চিনি না। তার মধ্যে আবার অনেক মেয়ের নাম রয়েছে। ডাক্তাররা যাদের সার্টিফিকেট দিয়েছে, তাদের মদের পারমিট দেওয়া হয়েছে। আমার ভগ্নিপতি মিস্টার দেশপাণ্ডের নামও রয়েছে তার মধ্যে।

বিশ্বনাথ বললে—এই মেয়েদের লিস্টটা দ্যাখ্, এই দ্যাখ্ এক আশি বছরের বুড়ি, সেও মদ খায়—কার কথা আর বলব? কার নামেই বা দোষ দেব?

জিজ্ঞেস করলাম—কে?

বিশ্বনাথ বললে—এই যে মিসেস ভট্টাচার্য, বয়েস আশি,—

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। দেখলাম আমার জ্যাঠাইমার নাম। শ্রীমতী আরতিবালা ভট্টাচার্য, এজ্ এইট্টি, মাসে পনেরো বোতল—

আমি বললাম—এ তো আমার জ্যাঠাইমা—একে যে আমি ভাল করে জানি—

বিশ্বনাথ বললে—তা জানিস, বেশ করিস, আমি নিজে গিয়ে এর এন্‌কোয়ারি করেছি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম — আপনি মদ খান? তিনি বললেন—হ্যাঁ বাবা, আমি মদ খাই—

প্যাটেলের কথা শুনে আমি রেগে গেলাম। রেগে চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। বললাম—আর যার সম্বন্ধেই তুই বলিস আমার জ্যাঠাইমার সম্বন্ধে ওকথা বলিসনি, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না—জানিস জ্যাঠাইমা চল্লিশ হাজার টাকার প্রপার্টি ছেড়ে দিয়েছে শুধু একটা সামান্য মিথ্যে না বলার জন্যে!

বলে আর দাঁড়ালাম না। সেখান থেকে উঠে সোজা চলে এলাম জ্যাঠাইমার বাড়িতে।

জ্যাঠাইমা তখন পুজো করছিল। জন্মাষ্টমীর পুজো। জ্যাঠাইমার ঘরে তখন অনেক ভিড়। বোম্বের বিধবা মহিলাদের ভিড়। ব্রাহ্মণ পুরুত পুজো করছে। থরে-থরে নৈবেদ্য সাজানো।

আমার কেমন জ্যাঠাইমাকে ভণ্ড মনে হল। মনে হল, এতদিন যা কিছু করে এসেছে জ্যাঠাইমা সব যেন লোক-দেখানো।

আমি কিছু না-বলে তেতলায় চলে এলাম। কিন্তু মনটা ছট্‌ফট্ করতে লাগল। জ্যাঠাইমা কিনা মদ খায়! বাইরের এই পুজো, উপোস, একাদশী, বার-ব্রত সমস্ত কিছু তাহলে জ্যাঠাইমার ভণ্ডামি!

বেশিক্ষণ কিন্তু থাকতে পারলাম না। রাত হলে যখন সবাই বাড়ি চলে গেছে, তখন আবার দোতলায় নামলাম। দেখলাম, জ্যাঠাইমা গুরুদেবের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তখন প্রণাম করছে।

আমাকে দেখেই বলল—কীরে, প্রসাদ খাবি?

বললাম—জ্যাঠাইমা, একটা কথা বলব, তুমি মদ খাও?

জ্যাঠাইমা হতবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বললে—আমি মদ খাই? কে বললে তোকে?

—বলবে আবার কে? আমি পুলিশের খাতায় তোমার নাম দেখে এলুম। পনেরো বোতল মদ তোমার মাসে বরাদ্দ—ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে।

—ও, তাই বল্! বলে জ্যাঠাইমা হাসল।

—হাসছ কেন? খাও না তুমি?

জ্যাঠাইমা বললে—হ্যাঁ খাই—

বলে জ্যাঠাইমা একটু থামল! তারপর বললে—তা সে তো সবাই খায়—

—সবাই খায়? সবাই মানে?

—মানে সুরমাও খায়। বাড়িতে যে-যে আছে চাকর-বাকর-ঝি সবাই-ই খায়। সবাই পনেরো বোতল খায়।

—তার মানে?

—জামাই পায় মাত্তোর পনেরো বোতল। পনেরো বোতলে কী চলে? তাই আমাদের সকলের নামেই পারমিট আছে। পুলিশ এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি মদ খান? আমি বলেছিলুম—হ্যাঁ—এই পর্যন্ত! পনেরো বোতলে যে জামাই-এর চলে না রে! তাই তো ওই মিথ্যে কথা বলতে হল আমাকে! চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তির জন্যে একদিন মিথ্যে কথা বলতে পারিনি, কিন্তু জামাই-এর জন্যে মিথ্যে কথাটা বেমালুম বলে ফেললুম। কী করবো বল্ বাবা! নইলে যে জামাই-এর আমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে! ও কি বাঁচবে?

জ্যাঠাইমার কথা শুনে বড় কষ্ট হল। ভাবলাম এ কী হল ইন্ডিয়ার। একজন খাঁটি মানুষও রইল না আর। জ্যাঠাইমার মত মানুষকেও শেষকালে মিথ্যেবাদী বানিয়ে ছাড়লে! আশি বছরের বুড়ো জ্যাঠাইমাও ভেজাল হয়ে গেল। এর চেয়ে যদি জ্যাঠাইমা সত্যি-সত্যিই পনেরো বোতল মদ খেত, সে-ও যে ভাল ছিল।

খেলার বিচার

কমলকুমার মজুমদার

মাধবায় নমঃ তারা ব্রহ্মময়ী মাগো, জয় রামকৃষ্ণ। ঠাকুর করুন, যাহাতে আমরা অতীব গ্রাম্য—আমাদের নিজস্ব জীবনের ঘটনা সরলভাবে লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি; ইহা ১৯৩০ এর আগেকার সময়ের কথা। ইহার স্থান, কলিকাতার দক্ষিণে ২৪ পরগণা অঞ্চলে, ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ের দক্ষিণভাগের যে তিনটি শাখা বিস্তৃত, তাহারই একটির, সর্বশেষ ইস্টিশানের কিছু মাইল দূরে অবস্থিত।

বালকটি অটল রহিয়াছিল; এই সময়তে সে গাত্রস্থিত সার্টটিকে আপন দেহেতে যথাযথ ভাবে বসাইয়া লইতে বিবিধ অঙ্গভঙ্গি দ্বারা চেষ্টা করিতে আছিল; তৎসহ সে দেখিতেছিল, ঐ সুবিশাল ফাঁকা জমি, কোথাও গ্রাম, পথ, বৃক্ষ, উড়ন্ত পাখীসকল, এ সমস্ত কিছু তাহার দেহ মধ্যে ছিল আর সে বিশেষ উত্যক্ত হওয়াতে ঐ সবকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে—কোথাও তাহার ঘাম, কোথাও তাহার গাত্রগন্ধ এখনও লাগিয়া আছে—অধুনা সে এই চরাচরের সহিত কোন সম্পর্ক আর রাখে নাই।

ঐ লোকটি দুই হাতে লম্বাটে দুইটি কাপড়ের থলি লইয়া, বেসামাল পদক্ষেপে, কখনও হাঁপাইতে থাকিয়া, থপথপ করিয়া আসিতেছে। সঙ্গে ঐ মেয়েটি এখন উহার ডাহিনে পরক্ষণেই বামে ছোটাছুটি করিতেছিল। বালকটির এতটুকু মায়া হয় নাই বরং ঐ দৃশ্যকে মহা তামাসার বলি বোধ হয়! আশ্চর্য ইহার কারণে সে নিজেরে ধিক্কার পর্যন্ত দেয় নাই। একবারও মনে করে নাই ঐ লোকটি কে? এরূপ বিজাতীয় ঘৃণায় তদীয় স্বাভাবিক বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে!

বরং মা যদি যাহা সে দেখিতেছে তাহা প্রত্যক্ষিত তাহা হইলে, কুরুক্ষেত্র বাধাইতো, যদি মা ইহা শোনে, তবে নিশ্চয় বলিত, তুই উহাদের ফেলিয়া চলিয়া আসিলি না কেন? এখন মা যেটুকু শুনিয়াছে তাহাতে এখনও শেলসম নিষ্ঠুর বচন সকল উচ্চারিতেছিল, তোমাকে কি ঠাকুর গরু ভেড়ার বুদ্ধিও দেন নাই, ফাঁসির আসামীও রয়ে বসে খায়, নোলা তোমার সুক্‌সুক্‌ করিতেছিল, হঠাৎ ইহার পরেই তিরিক্ষি কর্কশস্বরে—কেন না বাবা কি যেন বলিল—ঝাঁঝিয়া জবাব দিল, মরে যাই! তিনি তোমায় সাতজন্ম পেটে ধরিয়াছিলেন, ছাড়! উহারা বলিল আর তুমি গিলিতে বসিলে, তোমার লজ্জা করিল না, তুমি না বল, গীতায় ভগবান বলিয়াছেন পরিমিত আহার! তোমার গীতা পড়ার মুখে ঝাড়ু। মনে পড়িল না যে আমার একটা মান মর্যাদা আছে! ছাঁদা বহিলে।

বাবা স্নান করিবার পর এখন একটু ভাল, গম্ভীরভাবে তক্তাপোষে বসিয়া আছে; বোন শুইয়া ছিল। বালক মায়ের গঞ্জনা শুনিতেছিল। এই সময়ে বাবা মৃদু স্বরে কহিল, নে শুইয়া পড় তুই! হঠাৎ মেয়েটি কহিল, মা ঢের হইয়াছে এইবার উঠ! উঠ!

ক্রমাগত মায়ের খেদোক্তি ঝিঁঝি রবের সহিত মিলিত হইয়া এক বড় করুণ ধ্বনি সূচিত হইতে আছে। একটি শব্দ বারংবার শ্রুত হয় যে আমরা গরীব! এবং বালক প্রতিজ্ঞা করিল, বড়লোক হইতেই হইবে, এবং সে অঙ্গুলি মটকাইল। প্রতিজ্ঞা করিল; কিন্তু সেই সাবরেজিস্ট্রী অফিসের কর্মচারী পুত্র বলিয়াছিল, তোমার ব্যারিস্টার হওয়া ঠিক

নয়, আমাদের ডাক্তার হওয়া উচিত ইহাতে দেশের উপকার! ইহাতে ধন্ধ লাগিল। অবশ্য ডাক্তারীতে পয়সা আছে। মাকে টায়রা সে কিনিয়া দিবে তৎসহ বোম্বাই বেঁকি চুড়ি—ইহাই চমৎকার। এবং সে সর্বসময় দিনের আতঙ্কদায়ী ঘটনা ঠেকাইতে বহু কিছু ভাবিতে চাহিল।

লোকটি গায়ে আর কোট পর্যন্ত রাখিতে অস্থির হইল, ইতঃপূর্বে সে উড়নি লইয়া ঠিক এমনই আতান্তরে পড়িয়াছিল, উড়নি লইয়া কি যে করিবে তাহা বুদ্ধিতে কুলায় নাই; অবশেষে অল্পবয়সী কন্যা যাহার মুখে শ্রী হাস্যকর কিম্ভূত—চোখের কাজল এখানে সেখানে, পানের দাগ দুই কষময়, পিক্ বেসামালে ফ্রকে, কহিল, আমারে দাও:

লোকটি তৎক্ষণাৎ নালিশের ছাঁদে স্বীয় মনঃক্ষোভ প্রকাশিল, দেখ হতচ্ছাড়া দেখ, ছোট বোনকে দেখিয়া শিক্ষা কর। নির্লজ্জ বেহায়া! ভাবিয়াছে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি ত আর কি, আমার দায় দায়িত্বে আর নাই, সব ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিলাম! এই পর্যন্ত বেচারী মহা শ্বাসকষ্টের সহিত ভাঙা শব্দক্রমে উচ্চারিল।

ও বাবা তুমি কেমন করিতেছ...ছাঁদাটা...এই দাদা! মরণ দশা! ধরনা।

না না, তোমার দাদা কেন লইবে। তিনি লইলে তাঁহার মান যাইবেক। এই পর্যন্ত কোন রকমে অভিনেতার ভঙ্গিতে বলিয়া লোকটি, বেশ বুঝাইল যে, শ্বাস কষ্টে চলিবার শক্তি হারাইল, ইহারই মধ্যে একবার কাতর দৃষ্টিতে আপন পুত্রকে দেখিতে কালে কন্যাকে বিশেষ আর্ত কণ্ঠে কহিল, একটু জল আনিতে পারিবি, মুখে চোখে দিব। কিসে করিয়া আনিবি মা!

কেন কচু পাতায়। বাবা তুমি কথা বলিও না। এই দাদা লজ্জা করিতেছে না তোর! ছোট লোক।

বালকটি রাগে অপমানে পুড়িতেছিল, পিতার কষ্টে সে ঈষৎ মাত্র নরম হইল না, বরং ইতরের মত ভগিনীকে উত্তর দিল, দেখ বেশী বাড়াবাড়ি করিবি না! এবং ইহার সহিত নিজ ছোট দেহ কম্পিত করত মহাদুঃখের এক শ্বাস ফেলিয়াছে। মনে তাহার ইস! শব্দটি কেবলই বারংবার ধোঁয়াইয়া উঠিতে আছিল; সমস্ত নিমন্ত্রিতরা যদিও দেখিল লোকটিকে মহা আদরে গৃহিণীগণ খাওয়াইয়াছেন, তবু কত যে বিদ্রূপ করিল তাহা বলা যায় না, কেহ বলিল পোস্ট বক্স! (যাহাতে কখনও চিঠিতে পূর্ণ হয় না) সকলেই তাহার দিকে তর্জনী সঙ্কেতে ব্যক্ত করিল, এই ছেলেটি নিম্ন প্রাইমারীতে প্রথম হইয়াছে—ঐ ভদ্রলোক ইহারই পিতা! ঐ বুদ্ধিদীপ্ত বালকই উহার পুত্র। কেহ চিন্তার ভানে টিট্টিকার দিল, দেখ এখন তো খাইতেছে পরে কি ঘটে।

নিশ্চয় আমার জামা কাপড়ের কোথাও ছেঁড়া, এবং সে সপ্রতিভ হওয়ত খুঁজিল।

কেহ বিস্ময় প্রকাশিল, মাইরী এত সব কোন গহ্বরে যাইতেছে। লোকটি কি মরিবে?

বালক মাটিতে যেমন মিশিয়া যাইতে চাহিল; কখনও মনে ভাবিল আমার মূর্খ হওয়া লাস্টবয় হওয়া উচিত।

গৃহিণী কহিলেন, দিদি তখনই বলিয়াছিলাম, পাঁচ চোখের সমক্ষে ইহারে, মহাশয়কে খাইতে বসাইও না। দেখ গোমস্তা মহাশয় আর খাইতে নারাজ! পাতা বদলাইতে দিবেন না, ও 'অমুকের মা', তুমি হাঁ করিয়া বাছা দাঁড়াইয়া রহিলে কেন! দিদিকে ডাক দেখি।

এখন কেহ এই কথা বলিতেছে, এ সময় ব্রাহ্মণ এত খাইল যে, সে পঙ্‌ক্তির পাশেই শুইয়া পড়িল। লোকে, ঐ অবস্থা দর্শনে, মহা চিন্তিত হইল; ভাবিল. ব্রাহ্মণ বুঝি মারা

যায়। পুণ্যাত্মা গৃহস্থ তখনই—এই পর্যন্ত বিশদিয়া বক্তা থামিলেন, কেন না পরিবেশনকারী মাছের কালিয়া হাঁকিতে আছে, সে প্রস্থান করিতেই—খেই ধরিলেন, গৃহস্থরা ডাক্তারকে খবর দিল; ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া দুটি বড়ি খাইতে দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই বড়ি কোন মতে চোখ চাহিয়া দর্শনে কহিল, রে মূঢ় ডাক্তার ঐ দুটি বড়ির মধ্যে একটিও যদি খাইবার জায়গা পেটে থাকিত ত আমি দুইটি লাড্ডু খাইয়া ফেলিতাম।

গৃহিণী চারিদিকে বিশেষ উদ্‌গ্রীব হওয়ত নেত্রপাতে স্বীয় স্বামীকে খুঁজিলেন, অথচ এক মুহূর্ত আগে তিনি, অবলোকনিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী জোড়হস্তে প্রতি নিমন্ত্রিতকে আদর আপ্যায়ন করিতে কালে নিবেদিতেছিলেন যে, লজ্জা করিয়া খাইও না—এইসব প্রায়ই পাঁচ বাড়ির গৃহিণী,—যাঁহারা আমার বড় শ্রদ্ধার পাত্রী, যাঁহারা আমার এ দায় স্বেচ্ছায় উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়াছেন।

এত আয়োজন! খাওয়া কি সোজা কথা! ইহা শুধু আমাদের শাস্তি দিতে! আমরা ত দ্বারকার দশ সেরী বিশ সেরী বামুন নহি! এত রকম মাছ! কোনটি ফেলিয়া কোনটি খাই!

নিম্ন কণ্ঠে পার্শ্ববর্তীকে একজন কহিল, উপরোধে ঢেঁকি গিলিতে হইবে! লোক কি করিতেছে!

মা গো তুমি শোন, সবই ঠাকুরের ইচ্ছা—উচ্চারিয়া বৃদ্ধ গায়ের উড়ানিতে চোখ মুছিলেন, পুনরায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রকাশিলেন, আমার মা যাইবার আগের দিন, হিক্কা উঠে নাই—ঐ যাহা ভোর রাত্রিতে একবারই উঠে!—যাইবার আগের দিন কি কি রান্না হইবে, কাৎলার মুড়া আর রুই মুড়া মিশ্রিত যেন ডালে দেওয়া না হয়; মাছ ছয় হইতে বড় জোর সাত সেরই! এমনই কত কথা! কে কহিবে তাঁহার ছিয়ানব্বই বছর বয়স হইয়াছিল, যাইবার সময় হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ রাম নাম, কি তোমার পাত যে খালি! পেট ভরিয়া খাও!

এমত ক্ষণে দিদি আসিলেন, গৃহিণীর নালিশ শুনিয়া ধমকিয়া উঠিলেন, দেখ, খেলা করিও না, আমার মা প্রায়ই বলিতেন, তুমি নিজ কানে শুনিয়াছ, যে তুমি পেট ভরিয়া খাইলে তিনি শান্তি পাইবেন। ধ্যান্‌পানা করিয়া আবার কোটের বোতাম দেওয়া হইয়াছে —খোল বোতাম! পেটের উপর অমনধারা আঁট রাখিলে মানুষে খাইতে পারে!

দিদি আপনার পা ছুঁইয়া শপথ করি! আর জায়গা নাই!

অথচ মাছ এখনও স্পর্শ করে নাই, ডাল পর্যন্ততেই হাত গুটাইতেছ!

দিদি, বল কি আমি ঐ দিকে ব্যস্ত, সর্বনাশ! ডাল খাইবে না কেন, যেমন বলিয়াছিলে মা'কে—দালচিনিগুলি না বাঁটিয়া টুকরা করিয়া দিতে—ঠিক তেমনই হইয়াছে! তাই তুমি খাইলে! তুমি মরিতে ঐ দিয়াই অত ভাত খাইলে কেন! না দাদা ও বলিলে চলিবে না।

বৃদ্ধাকর্তা ভোজনের পূর্বাহ্ণে জানাইয়াছিলেন, যে আমরা পোলোয়া (পোলাও) করি নাই, কারণ ইতিপূর্বে আমাদের বাবুর কন্যার বিবাহতে যে ভিয়ানের বামুন আসিয়াছিল সে বাবুকে বলিতেছে, বলিতেছেই বা বলি কেন, বলা ভাল বুদ্ধি দিতেছে, পোলোয়া করুন উহাতে নিমন্ত্রিতদের মুখ মারিয়া দিবে, আর যাহা সব পদ হইবে তাহা খাইতে রুচি চলিয়া যাইবে—নেবু খাক্ আর যাই খাক্।

আপনারা জানেন, আমার বাবু যিনি আমার অন্নদাতা, তাঁহারা মুঘোল আমল হইতে জমিদার, দশশালা ব্যবস্থার কোম্পানীর তৈয়ারী উট্‌কো জমিদার নয়। ভিয়ানের বামুনের কথা শুনিয়া রাগে অপমানে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, এত বড় আস্পর্ধা আমাকে ঐ উঞ্ছ বুদ্ধি দেওয়া, বেটা ভাবিয়াছে কি!

ভিয়ানের বামুন আপন প্রমাদ বুঝিল, কহিল বাবু মহাশয়, কলিকাতায় সবাই জজ ব্যারিস্টারদের...।

তৎশ্রবণে বাবু আরও রাগিয়া উত্তর করিলেন, সেই হারামজাদাগণকে চাপকাইয়া সোজা করিতে হয়। যাহারা জ্ঞাতি আত্মীয়র প্রভেদ কি জানে না—দায় বিদায়ে সাহেব নিমন্ত্রণ করে, যাহারা নিজ সর্বস্ব ভাবে, শালারা স্বার্থপর—! সেই বেটাদের সঙ্গে আমাকে এক করা—দারওয়ান এই বেটাকে পাঁচ জুতি মারিয়া ফটকের বাহির কর!

পরে একটু ঠাণ্ডা হইতে আমাদের বাবু কহিলেন, ঐ হারামজাদাগণ শুনিয়াছি তোমাকে এক রেকাব খাবার দিল, তুমি কিছু ফেলিয়া রাখিলে; অমনই সেই রেকাবের খাদ্য অন্য আগতকে দেয়। ছি ছি। আর আমাদের।...তোমরা দেখিলে, জ্ঞাতি কুটুম্ব খাইবে, তাহাদের মুখ মারিয়া দিতে হইবে। কি কথার ছিরি। কলিকাতা নষ্ট হইয়া গেল। লোকে যদি টের পায় আমার সামনে ভিয়ানের পাচক বেটা ইহা বলিয়াছে, ছি ছি। অথচ দেখিয়াছে, যেক্ষেত্রে শুনিতেছে যে, লুচি দুধ-জলের বদলে দুধ দিয়া মাখা হইবে—যাহাকে লুচি বলিত তেমনই হইবে। কোথায় পাবনা হইতে গব্য ঘৃত আনাইতেছি—যশোহর খাটাল তেমন নহে। বলিয়া—পুনঃ রাগত প্রকাশিলেন বেটাকে কয়েদ করা উচিত ছিল! 'মুখ মারিয়া দিব' শুনিয়া আমার গা কাঁটা দিযা উঠিল। বাবুর নিকটে আমরা বিভিন্ন মহালেব নায়েবরা মনুষ্য চরিত্রের বিকৃতি ঘটিয়াছে জানিয়া—তাহাও উচ্চশিক্ষিত ধনীদেব মধ্যে জানিয়া স্নান করিলাম।

বৃদ্ধকর্তা, নিজ জমিদারবাবুর মানসিকতা চমৎকারভাবে বিবৃতিয়া যোগ দিলেন, আমাকে ঠাকুর! বাবুর কথা স্মরণ করাইয়া বাঁচাইয়াছেন, ইহা আমার মা'র কাজ, পিতৃদায়ের পর এইটি একটি পরম নিষ্ঠায় সম্পন্ন করিবার ক্রিয়াকর্ম—তাহার মধ্যে কপটতা করিব এ যেন আমার অধস্তন কোন পুরুষের কেহ না ভাবে!

পঙ্‌ক্তির সকলে ধন্য ধন্য করিলেন, বলিলেন, আপনি অতীব সততা ও সাধুতাব পরিচয় অদ্যই নহে চিরকাল দিতেছেন, এই পরগণায় আপনার মত সজ্জন নায়েব কেহ কখনও দেখে নাই, অতি বেয়াড়া প্রজাও স্বীকার করে— মানুষ ত ঐ একটি। অতএব আপনার পোলোয়া না করার কৈফিয়ৎ দিবার কোন অপেক্ষা রাখে না!

এখন তাহা হইলে বসিতে আজ্ঞা হউক। বৃদ্ধকর্তা বলিলেন, আমি সর্বোত্তম টেবিল রাইস যাহা বড়লাট ছোটলাট আদি গণ্যমান্য ইংরাজ রাজপুরুষগণের, শুধু এখানেই নয় ইংলণ্ডে পর্যন্ত, অতীব প্রিয় সেই চাউল আমি সংগ্রহ করিলাম, যাহাতে আমার মায়ের নিয়মভঙ্গের কাজে ব্যবহার করিতে পারি! ইহা, এই চাউল, আরব আগত, বা পেশোয়ারী হইতে যারপরনাই উপাদেয়। তৎসহ লুচিও করা হইয়াছে—তবে ময়দা এতৎদেশীয়—রুলের (এন্‌ড্রুইয়ুল। লোক মুখে, রুল), ইংলণ্ডের ময়দার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপনারা জানেন এখন স্বদেশীর হাঙ্গামা! গতকল্য ব্রাহ্মণগণ প্রীত হইয়াছেন অদ্য আপনারা হইলে আমার মা শান্তি লাভ করিবেন।

বালক তেমনই দাঁড়াইয়া গাছের পাতা ছিঁড়িতেছিল, এখন অসম্ভব রোদ, চারিদিক জনমানব শূন্য, সে দেখিল ছোট বোন কচু পাতা ছিঁড়িয়া রাস্তার ঢালুর নীচে খাল হইতে, যেখানে কিছু শালুক আছে তন্নিকটে জল আনিতে যাইতেছে, মেয়েটি ভয়ে আড়ষ্ট, হঠাৎ একবার মুখ ফিরাইয়া কহিল, দাঁড়াওনা বাড়ি চল আমি সব মাকে বলিয়া দিব! ছোট লোক।

বেশ দিবি ত দিবি। এবং ইহার সহিত আরও কতকগুলি অভব্য পদ সে উচ্চারণ করে যাহা তাহার নিজের কানে তুলিতে অর্থাৎ শুনিতে লজ্জা হয়। বেচারাতে হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান, মান্য গুরুজন, শ্রদ্ধেয় আদি উচ্চবর্ণ উচিত মর্যাদা বোধ আর ছিল না—তাহা অপহৃত হইয়াছে, দেহ বিষাইয়া উঠিয়াছে, লাঞ্ছনাতে তাহার বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডলকে লাল করিয়াছে, কেন না খাওয়ার পর পুকুরে মুখ ধুইবার সময়ে, কয়েকটি অসভ্য বালকরা যখন মুখ প্রক্ষালনের জল লইয়া ইতর আমোদের একসা করিতে আছিল, তখন সে বেচারী ঘাটের উপরে বয়সীদের মধ্যে ছিল, এইবার ঐ খেলা শেষ হইল তখন একজনেতে কহিল, ঐ সব লোককে কিছুমিছু খাইতে দিতে হয়, তাহা হইলে টের পাইত। এহেন রসিকতা করিয়া সকলের মুখের প্রতি তাকাইল।

তোর বিবাহতে উহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া কিছুমিছু খাওয়াইবি ত!

কিছুমিছু গল্পটি ভারি মজার, ইহা বহুদিনের, ইহার চরিত্রগুলির মধ্যে বিক্রেতা বাদে কোথাও মা শাশুড়ি, কোথাও দিদি ইত্যাদি এবং কোথাও জামাই বা পুত্র বা ভাই রূপে বদল হইয়াছে। মা পুত্রকে একটি টাকা দিয়া কহিল, বাছা শ্বশুর বাড়ি যাইতেছ, পথ অনেক, যাইতে কালে যদি ক্ষুধা পায়, এই টাকা দিয়া কিছুমিছু কিনিয়া খাইও। পুত্র অনেক পথ অতিক্রম করিবার পর এক হাটে পৌঁছাইল। প্রায় প্রতি দোকানে খুঁজিল কিছুমিছু পাওয়া যায় কি না। কিন্তু কোথাও কিছুমিছু পাওয়া গেল না, ইহা হাট দূর হইতে নূতন পসরা আসিতেছে—সে পুনরায় নূতন পসরাতে খুঁজিল, এক হাটুরে পসারী একটি বুনো ওল দেখাইয়া কহিল, এই তো কিছুমিছু কতটা চাই! পুত্র কহিল, এক টাকার। হাটুরে পসারী তাকে বুনো ওলটি দিল। এবং সে ঐ ওল লইয়া এক বৃক্ষের তলে বসিয়া খানিক খাইতে বাপরে মারে করিয়া উঠিল। ওলটিতে গলা বিষাইয়া উঠিল।

বিবাহের ঢের দেরি গোমস্তাবাবু ততদিন থাকে কি না...তাহা হইতে তোর ঠাকুরদাদার অবস্থা ত এখন তখন নাভিশ্বাস!

উহার ঠাকুরদাদার অবস্থা বছরে একবার করিয়া ঐরূপ হয়...মরিলেই হইল?

যাহার ঠাকুরদাদা সে সত্বর কহিল, তোমাকে বলিয়াছে, বলিয়া আর তর্কে না গিয়া তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিল।

অন্যান্যরা হাসিল একজনে জ্ঞাত করিল, আমি সব জানি, উহার বাবা এক পয়সা খরচ করে না, বলে, বাবার অসুখ সারিবার নয়, টোটকাতে তবু ভাল কাজ করে। ডাক্তারের কর্ম নহে! উহার বাপ ডবল কঞ্জুষ!

অথচ দেখিবি শ্রাদ্ধে খুব ঘটা করিতেছে, 'বাঁচলে দিবে না দানা পানি। মরলে দেবে ছানা চিনি॥'

বলে না, 'জীয়লে দেবে না তুণ্ডে, মলে দেবে—বেনা গাছের মুণ্ডে॥'

উহার বাপ সে পুত্র নহে--বরং সকলকেই কিছুমিছু খাওয়াইবে।

যে লোকটি খাইতেছে তাহাকে গিয়া বল না—উঠিবেন না কিছুমিছু আছে।

তাহাও হয়ত হজম করিবে!

বালকের মধ্যে, যে এখনও গাছের নিকটে আছিল, কি ভাবে যে মান চেতনা, সাধারণের তুলনায় একটু বেশি যাহা, গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ঠাকুরই জানেন! শ্রাদ্ধ বাড়ির নিয়মভঙ্গের নিমন্ত্রিতদের বাক্যের শ্লেষ তাহারে কণ্টকিত করিয়াছিল। ইহা সত্য তাহার মায়ের শাসন ও মর্যাদা জ্ঞান তাহাকে প্রভাবিয়াছে; যদি কখনও খাওয়ার দেরীতে

সে ক্ষুণ্ণমনা হইল, তখনই তাহার মা বলিয়াছে, সব যেন বালুর ঘাট হইতে এখানে আসিয়াছে (বালুরঘাটে ১৯২৫/৩০-র মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয়) আবার খাদ্য অপছন্দ তাহার হইলে মা কখনও কটাক্ষিয়াছে, এখানে সব মরিতে আসিলে কেন? বড়লোকের ঘরে জন্মাইতে পারিলে না। গরীবের ঘরে যখন জন্মাইয়াছ, তখন সব সহিতে হইবে, ইহা ভাল লাগিতেছে না উহা মন্দ, ইহা বাসি, এইসব ভিরকুটি করিলে ভগবান রাগ করেন।

এই নিমন্ত্রণে আসিবার সময়ে মা পৈ পৈ করিয়া পড়াইয়াছিলেন, দেখ, এমন খাইবে না যাহাতে লোকে হাঘর হইতে আসিয়াছে বলিতে সাহস করে, যাহা দিবে তাহা খাইবে নষ্ট করিবে না, নষ্ট করিলে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হন, মা লক্ষ্মী তাহাকে ছাড়িয়া যান— কখনও যত ভালই লাগুক দ্বিতীয়বার চাহিবে না, পান একটা খাইতে পার তবে দেখিও পিক না জামাতে পড়ে! ভুলিও না তোমরা গরীব মানুষের ছেলেপিলে, এতটুকুতেই বদনাম হইবে। প্রথমই হও আর যাহাই হও।

বালকটির মনে এই সব কথা নিশ্চয়ই রেখাপাত করিতেছিল, ইহাও মন্তব্যিয়াছিল, কৈ বাবাকে ত একটা কথাও বলিল না! নিজেই উত্তর করিতে, এইটুকু ভাবিয়া থামিয়া কহিল আমি একবার বাড়ি যাই না, বলিব আমাদের ত সাত সতেরো লেকচার দিলে, বাবাকে ত একটি কথাও বলিলে না, বরং বলিয়াছিল যে, এইটা খাইব না, উহা নহে; দেখ যেন উঁহারা খুশি হয়েন, দুর্গা দুর্গা। আর আমার জন্য কিছু দিতে চাহিলে কিছুতেই লইবে না। আমার দিব্যি রহিল, এমন কি সন্দেশ ইত্যাদি পর্যন্ত নহে, উহাদের আত্মীয় জ্ঞাতি কুটম্ব বাড়ি পূর্ণ, আমি না যাইলে যে খাদ্যদ্রব্য সকল ফেলা যাইবে এমন নহে! ছাঁদা লইয়া আসিলে মঙ্গল হয় না! লোকেই বা কি বলিবে, হাভাতের ঘর হইতে আসিয়াছে, না হইলে ছাঁদা বাঁধে!

ঐ ঢালু সবুজ ঘাসের প্রসারে বাবা পা ছড়াইয়া পশ্চাতের দিকে দুই হাতে ঠেস দিয়াছে এবং ঊর্ধ্বে মুখ তুলিয়া আঃ আঃ শব্দ করিতে আছে। আর ছোট বোন কাতর দৃষ্টিতে ঐ দশা দেখে।

ঐ পর্যন্ত মননের শেষে, মর্মে নিপীড়িত বালক সুবিস্তৃত দিক চরাচরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, সর্ব স্থান তাহারই গাত্রদাহের উত্তাপে ঝলসাইয়া গিয়াছে, এমন যে পাখীর ডাকগুলি অবধি নিস্তার পায় নাই, মধুর গান সকল পুড়িয়া ফর্‌ফর করিয়া ফিরিতে আছে; সে চোয়াল শক্ত করিয়া পুনঃ এইদিকে অর্থ রাস্তার দিকে নজর করিল, দেখিল, কোথা হইতে এক গোবর-কুড়নী বুড়ি আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তদ্দর্শনে তাহার, বালকের, দেহে অদ্ভুত সিঞ্চিড়া লাগিল, ইহারই মধ্যে সে বিশেষভাবে তাহারে নিরখিল!

ঐ বৃদ্ধার চেহারা হাড়সার, পরণে মলিন ছিন্ন অপটু সেলাই করা কাপড়, যাহার আঁচল ভাগ, দড়ির মত ডান কোমরের আঁটন হইতে বাম স্কন্ধ পার হইয়াছে, বাম হস্তের কব্জি একটি বেশ বড় চ্যাঙারী-ঝুড়ি কাঁকে চাপিয়া আছে; বৃদ্ধা প্রস্তরীভূত; উহার দৃষ্টি ছিল, ঢালুর উপরে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকা লোকটির দিকে, লোকটি দুই হস্ত পিছনে অনেকখানি প্রসারিত করিয়া জমি ঠেস দিয়া, মাথা যতদূর সম্ভব পশ্চাতের দিকে হেলান এবং সমস্ত মুখ উন্মোচিত আছে, যে এবং মহা যন্ত্রণার এক প্রকার শব্দ উহা হইতে নির্গত হইয়া থাকে!

লোকটির গাত্রস্থিত নকল আলপাকা-র (আলপাকা একরূপ জন্তু—উহার লোমের) কোট—তাহার সমস্ত বোতাম খোলা। একটি কচি মেয়ে কচু পাতা দিয়া পাগলের ন্যায়

হাওয়া করিবার সময় কি যেন বলিতে আছিল এবং কান্দিতেছে। সে বলিতেছিল, বাবা তুমি এইরূপ কেন করিতেছ? তোমার কি হইল।

গোবর-কুড়নী বৃদ্ধা নিজের পিঙ্গল বর্ণের জটিল চুল খামচাইল, কত রকমারি ভাবভঙ্গি নিজ দেহে ঘটাইয়া জিজ্ঞাসিল, এই ছেলে, ঐটি তোমার বাবা! কি হইয়াছে? বালক অতিমাত্রায় বিদ্বেষ বিরক্তি অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। এই ইচ্ছাকৃত অস্বীকারের অভিব্যক্তি তাহার নিজেরই বড়ই চোরা প্রীতির কারণ হয়; তাহার মতি এইরূপ যে তাহাকে যেন মুখ আর ফিরাইতে না হয়! অবশ্য তখনই নিজের ঐ মতিচ্ছন্নতা বোধের ব্যাপারে উত্তর দিয়াছিল, আমি মোটেই ইচ্ছা করিয়া মুখ ফিরাই নাই, বা কোন কথাই ভাবি নাই! এবং এই সময়েতে সে আড়চোখে দেখিল গোবর-কুড়নী আপন ঝুড়িটি এখানকার একস্থানে রাখিয়া, কহিল, ও ছেলে ঝুড়িটা দেখিও ত। বলিয়া তখনই ঐ লোকটির নিকট যাইল, এবং সস্নেহে মেয়েটিকে প্রশ্ন কবিল, কি হইয়াছে। এই মানুষটি তোমার কে? মেয়েটি উত্তরিল, আমার বাবা কি হইয়াছে জানি না। এই দাদা ছোটলোক!

ঐটি তোমার দাদা?

হুঁ দাদা।

আপন মায়ের পেটের ভাই?

হুঁ হুঁ।

ইহার ছেলে

হ্যাঁগো

তুমি ঐ ছেলেটির বোন,

মরণ দশা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

বল কি তুমি, অবাক কাণ্ড আর আমি ছোঁড়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উনি তোমার বাবা। আমাকে (গোবর কুড়নী) আর কিছু বলিতে হয় নাই যে তুমি (মেয়েটি) উহার দিকে লক্ষ্য করত দাদা বলিয়া সম্বোধনিতে ছিলে। কিন্তু ছোঁড়া ফ্যারাক দিল!

বালক ঐ বৃদ্ধার, গোবর-কুড়নীর, বাক্যতে ঝটিতি ছেদ টানিল, নিশ্চয়ই তাহাতে আশঙ্কা উপজয়ে যে যদি ঐ বৃদ্ধা ঐখানে বসিয়াই কহে যে তাহার 'বাবা কি না' জানিতে চাওয়াতে, সে বালক ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল, অর্থই অস্বীকার করিয়াছে যে 'তাহা নহে'।

তাহা হইলে? তবে কি? কে যেমন ধিক্কার তাহারে দিয়া উঠিল। সে আর এক নিমেষও থাকে নাই। এখানে সে আসিয়া দাঁড়াইয়া কি করিবে তৎবিষয়ে ইতস্তত আছে!

মেয়েটি ব্যক্ত করিল, এই যে বাবু আসিয়াছে লজ্জা করে না তোর! তুই নরকে যাইবি তোর গাত্রে কি মানুষের চামড়া ছি ছি! গ্রাম্য অল্প বয়সী মেয়েরা এইরূপ বয়সীদের ন্যায় কথা বলিতে অতীব পটু! এখানেই সে থামে নাই, তিক্ত কণ্ঠে টিট্‌কারিল, তোকে না মা ঐ শ্লোক পড়িতে রোজ বলে, যে পিতা স্বর্গ! ঝাঁটা মারি! ঐ শ্লোকের উদ্দেশ্য মেয়েটির হৃদয়ে গ্রথিত হইয়াছে।

ইহাদের মাতা যেহেতু যে কিভাবে 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' শ্লোকটি বালকের মনে যাহাতে বিশেষ সাঁধ করে তাহার জন্য নিশ্চয়ই বহুভাবে ব্যাখ্যা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছিল।

বাবা বলিয়াছে, তোমার যেমন খাইয়া দাইয়া কোন কর্ম নাই ঐ শ্লোক শিখাইতেছ—বরং না শিখান ভাল তাহাতে আপশোষ থাকিবে না. ঐ ত আর দুইজনকে

ত শিখাইয়া-ছিলে। কি হইল নায়েব মশাইকে ধরিয়া বাবুর বাড়ি একজনকে, বাবুর বন্ধু পুণ্যশ্লোক জমিদার...বাহাদুরের বাড়ি রাখিয়া পড়িতে পাঠাইলাম। দেশমাতৃকা তাহাদের বড় হইল, বেশ হইয়াছে একজন যাবজ্জীবন, অন্যকে কে জানে কতদিন মেয়াদ খাটিবে বৃথা পরিশ্রম! আমরা দুঃখ পাইব না ত পাইবে কে! জানকরী ত ছেলেপিলে আমরা—রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হনুমান দুঃখের পর দুঃখ পাইয়া কথং জীবতি জানকী। আমার জানকী কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছেন। ঐ ব্যক্তি এমন ভাবে জানকী বলিয়া উঠিত যে সকলের বক্ষদেশ নিঙড়াইতে থাকিত।

বৃদ্ধা নিকটে উবু হইয়া বসিয়া কহিল, জুতা জোড়া খুলিয়া দাও না! এই বৃদ্ধার উপস্থিতি মেয়েটিতে এক অধিক বয়সী, জ্ঞানসম্পন্ন গৃহিণীর ভাব আনিয়াছিল এখন এই কথা নিজে যেন বুঝিয়া বলিল, এই দাদা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছিস, জুতা জোড়া খুলিয়া দে না। নির্দয়!

এই ধমকানিতে বালক থতমত হইয়া তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা মানা করত জুতা জোড়া খুলিয়া দিল।

বৃদ্ধা মন্তব্যিল, পা একেবারে লাল, জল ছিটে দাও বেশ করিয়া, দাও দাও।

অল্প বয়সী মেয়েটি বাবার পায়ের দিকে তাকাইযা পোড় খাওয়া গিন্নীপনাতে খেদ উক্তি করিল, জানি না কপালে কি আছে, কাহার মুখ দেখিয়া যে উঠিয়াছিলাম। ওকি অমন হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে, যাও না নিজের কোঁচার খুঁটটা সত্বর জলে ভিজাইয়া আনয়ন কর না কেন হাঁদা এবং হৃদয় মোচড়াইয়া ডাকিল, বাবা তোমার কি হইতেছে! এই শেষোক্তটিতে মেয়েটি তদীয় অসহায় বযসে ফিরিয়াছিল, যে তির্যকে বৃদ্ধাকে নিরখিয়া যাহা সে হারাইল না। পুনঃ বুক ছাঁচা দরদে মায়ের মত শিশু যেমন, পিতাকে ঐতিহাসিক উদ্বিগ্নতাতে জানিতে চাহিল, বাবা তোমার কি কষ্ট হইতেছে। অমন অত্রাহি করিতেছ কেন, কি হইতে আছে এই ত আমি। ঐ ত দাদা জল আনিতেছে, তোমার পায়ে দিবে! আমার হইবে!

বালক জলের কাছে আসিয়া কোঁচা খুলিয়া উহার খানিক অংশ জলে ডুবাইতে কালে, ইহা মনন করিল, যে যদি সত্যিই আমার কোন কিছু দোষ ত্রুটি অপরাধ হইয়া থাকিত ঠাকুর আমাকে বাবার পায়ে সর্বপ্রথম হাত দিতে দিতেন! এখানে সে থামিল, এ তাবৎ নিজ ব্যবহারকে কোন রকমেই সে বিচার করে না। এই সময় সহসা ঠাণ্ডা জলের স্পর্শতে তাহার ছোট দেহ তাজ্জব হইল, একদিকে শালুক ও পার্শ্বেই কমলীর আঁকাবাঁকা রেখা তাহাকে আকর্ষিয়াছে—ঐ রেখা সকল কিছু উজিয়া উঠিতে ছিল। আঃ সেই বৌটি যে গরুগাড়ি হইতে নামিল প্রায় সেখানে, ইহা খিড়কীর নিকট যেখানে পাঁঠা ছাড়ান হইতে আসিল।

আঃ সেইখানেতে ঐ বউটি আপন কাপড় জামাতে যত্ন দিতে আছিল, কপালে টায়রাতে (অলঙ্কার) গেলে মুখখানি ভারি খাসা দেখিতে হইয়াছিল, টায়রাটি কি চমৎকার দুই পাশে দুই পানের মতন টিকলি (চাক্‌তি) মধ্যে সীঁথির সামনে আর একটি পাথর বসান তারা; পানের মতন টিকলির প্রতিটি অক্ষর উৎকীর্ণ; ও পাথর বসান বালক পড়িল, গোবর্ধন। পাথর বসান অক্ষর ঝলকিত এবং তখনই বধূটির পানে নেহারিল, গোবর্ধন লেখা টায়রা পরা গর্বিত মুখখানি তাহার বড় ভাল লাগিল গোবর্ধন নির্ঘাৎ ঐ মেয়েটির বর। মন্তব্যিল—ঐ টায়রা, টায়রার জন্যেই উহা ঐ বৌটি এত আকর্ষণীয়!

কেন যে লোকে আজকাল টায়রা পছন্দ করে না! বেশ ত! আমি মাকে অমন একটা টায়রা গড়াইয়া দিব. যখন বড় হইব! ঐরূপ টায়রা উহাতে বাবার নাম লেখা থাকিবে! কত টাকা লাগে। উচ্চ প্রাইমারীতে আমার সর্ব উচ্চ স্থান অধিকার করিতেই হইবে! ছয় টাকা বৃত্তি পাইব! ইস আমরা কি গরীব! শুধু টায়রা না মাকে চার গাছ করিয়া বোম্বাই বেঁকী প্যাটার্নের চুড়িও গড়াইয়া দিব যেমন এ টায়রা পরা বৌটির হাতে আছে। ম্যালেরিয়া মাকে খাইয়াছে, ডি গুপ্ত বেহালার পাচন কিনিতে জেরবার না হইলে কি মা সুন্দর বাবার মত ফর্সা না হইলেও, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের কিন্তু মুখখানি এত ভোগেও কি সুন্দর।

না বোম্বাই বেঁকী নহে, কারণ যে বৌটির ঐ প্যাটার্নের চুড়ি ছিল সে কি অসভ্য। বাবার (ভদ্র কথায় বালক ভাবিল) দেখিয়া একটি চপলমতি বধূ বছর পাঁচ ছয়ের ছেলেকে শিখাইতে আছিল যা ঐ লোকটা গাণ্ডেপিণ্ডে গিলছে তাহার সামনে গিয়া ডাক বাতাপি! বাতাপি, বলিয়া! দেখিবি পেট ফাটিয়া যাইবে! হিহি করিয়া হাসিল। বালকের সামনে সর্বত্রে ঐ হা ইতর হাস্য খেলিয়া বেড়াইতেছিল। ঐ ঐ ইম্বলের স্বরে বায়ু ঘূর্ণায়মানা হইল, তাহার চোখে জল আসিল; ইহা ব্যতীত তাহার আর কোন ক্ষমতা ছিল না, আর একটু বড় হইলে অর্থ, আর একটু অভিজ্ঞতা থাকিলে নিশ্চয়ই সে এমত বচনে ক্ষোভ প্রকাশিত যে হায় পৃথিবী কত নিষ্ঠুর।

বৃদ্ধা হাঁটুর উপর দুই কনুই স্থাপিয়া বিস্তীর্ণ হস্তদ্বয় দ্বারা একটি ত্রিকোণের দুই দিক যেমন, নির্মাণ করত করজোড় করি রাখিয়াছে, সে বন্ধুর মতন জিজ্ঞাসিল---মানুষটির কি হইয়াছে গা।

কি করিয়া জানিব বল সুস্থ মানুষটি...।

তবে হঠাৎ। নিশ্চয়ই বোধহয় হাওয়া লাগিয়াছে।

তোমার মুণ্ডু। যত অলক্ষণে কথা—। তুমি উঠত, গোবর তুলিতেছ তোল গিয়া! যে এবং একই রুক্ষ কণ্ঠে ঝাঁঝিয়া উঠিল, আমার মরণ হয় না! দাদা, বলি মরিয়াছ না কি, তোমার যে দেখি ভাব লাগিয়া গেল!

বৃদ্ধা মেয়েটির তাড়না গায়ে মাখে নাই বরং মন্তব্যিল, কি যে বল, বাবা বলিয়া কথা তাই আলা-ভোলা লাগিয়াছে এবার সস্নেহে, উচ্চারিল, আস্তে আস্তে আইস। এবং বালক আসিতে উপদেশিল, হ্যাঁ দাও গোঁড়ালি ভিজাইয়া, হাঁ বাপ দাও আঙুলের ফাঁকে, নখে, বাঃ বেশ, বেশ সেবা জানে এইবার গোঁড়ালি আর গাঁটের পিছনে বাঃ এবং ইহার পরে ছেলেমানুষের মত উঞ্চাপনিল, উঃ তখন যে বড় স্বীকার করিলে না যে এই মানুষটি তোমার বাবা হুঁ।

এইরূপ প্রশ্ন নির্ঘাৎ সে আশা করিয়াছিল, কিন্তু উত্তর তৈয়ারী সম্ভব হয় নাই, সে প্রথমত মহা আতান্তরে থাকে, কোনক্রমে সে বৃদ্ধার প্রতি নেহারিল, এই সেই বুড়ি যে জলাতে থাকে, এবং রাতে আলেয়া রূপ ধরে নিশ্চয়ই! অবশ্য ইহাতে আতঙ্ক আসে নাই। ইস এতক্ষণ বাদে অর্থাৎ নিমন্ত্রণ বাড়ি হইতে এত খানিক পথ অতিক্রমের পরে যখন সে বাবা বোন, অনুপস্থিত মা ঘরের দাওয়ার নিকটের লাউ গাছ, পুকুর ঘাটের খেজুর গাছের গুঁড়ি প্রভৃতির সহিত এক অভিন্ন হইয়াছিল। তথাপি তাহার নিজের মুখখানি নাড়ানোর ভঙ্গিতে ইহা আঁচ পাওয়া যায় যে সে কিছু সত্য লুকাইতে সচেষ্ট আছে। এক নিমেষ বাবার দিকে অসহায় (!) দৃষ্টিতে তাকাইল। দেখিল বিরাট একটি হাঁ যাহা হইতে ক্রমান্বয়ে যন্ত্রণার আওয়াজ নির্গত হয়, তৎ পশ্চাতে নাশা গহ্বর এবং দূরে নিমীলিত চক্ষুদ্বয়!

আঃ সোনার টায়রার টিকলিতে, যাহা কপালে ধনুর আকারে সাজান, সেই টিকলির এক একটিতে তাহার বাবার নামের অক্ষর প্রতি অক্ষর মহামূল্যবান পাথর বসান! এরূপ পাথর কেহ দেখে নাই। তখন আলোতে নাম ঝলমল করিতে আছে।

বৃদ্ধার কথায় অথবা বাবার কষ্টে বালকের মধ্যেও নাকানি চুবানির ভাবান্তর উপস্থিত হইল, কিন্তু সে বুদ্ধি হারায় নাই, উত্তর করিল, তুমি কি পাগল নাকি! যে এবং সে তির্যকে বোনকে দেখিল বটে যে সে ঈর্ষান্বিত হয় যে বোন বাবার কত কাছে।

বৃদ্ধা এরূপ থাকিয়া সমগ্র দেহকে কিছুটা বাঁকাইয়া, পূর্ব স্থান নির্দেশে করজোড় দ্বারা ইঙ্গিতে জবাব দিল, উঃ ঐ ত এখানেতে! তোমার বাবা তখন কাতরাইতেছে! হুঁ! স্বীকার করিল না, মুখটা ঝটকা দিলে, আমি ত ভয়ে কেঁচো! বলি, একি!

হেৎ

হেৎ! হেৎ! মিথ্যুক!

ইহাতে, ঐরূপ অসহ্য প্রাণান্ত শ্বাস-রোধ কষ্ট হইতে লোকটি বড় মায়াযুক্ত স্বরে, ক্রমে ভাঙিয়া আপত্তি করিল, না না তাহা কখনও হয়, তোমার বুঝিবার ভুল, পাগল!

বাবা তুমি আর কথা বলিও না ত, উঃ কি কষ্ট! দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়, চুপ কর!

না, এই বোঝাটা উহারে লইতে দিই নাই বলিয়া উহার রাগ, পারিবে কেন বল ত!

বৃদ্ধা এবার হাসিয়া কহিল, আমারে বুঝ্ দিতে গিয়া শেষে কি হিত বিপরীত হইবে। ছাড়! আমারে তুমি যাই বল না কেন, আমি যা জানি তাহা জানি!

মহা বেআক্কেলে তুমি ত, তিন কাল গিয়া এক কালে ঠেকিয়াছে, উঠ এখান থেকে। মেয়েটি প্রকাশিল।

বাঃ উঠিব কেন, আমার কি জ্ঞানগম্যি নাই লোকে শুনিলে কি বলিবে...হাড়ি-র মা ছি ছি ঐ মানুষটির এমন অবস্থা, দুটি দুধের বাচ্চার উপর ছাড়িয়া চলিয়া অসিলে বলিহারি যাই, তোমার কি ধর্ম! চেঁচাইয়া লোক জড় করিবার লোকও মানুষের দরকার হয় না কি বল।

বটেই ত অন্যমনস্ক মেয়েটি সায় দিল—ইহা আশ্চর্য।

বাবা আমার ঘটে সে বুদ্ধি আছে আমি উচ্চ জাতির গা ছুঁইব না, ছুঁইয়াছি কি মরিল, ব্রহ্মহত্যা হইল ত! তবে সেই ঠাকুর মাঝে মাঝে আমায় দেখা দিয়া থাকে বলে, ওরে হাড়ি-র মা আমায় খুব বাঁচিয়েছিস, গরীব হয়ে বাঁচার মত পাপ আর নাই মহাপাপ। আমি অমুকহাড়ি-র নাতনীর অমুক হাড়ি-র কন্যে, আমি সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না।

গরীব শব্দে ভ্রাতা ভগিনীর কেমন যেন বাপের জন্য টান বাড়িয়া গেল, আশ্চর্য মেয়েটি হঠাৎ অন্য কথা পাড়িল, এতক্ষণ কোনকালে আমরা ঘরকে পৌঁছাইয়া যাইতাম।

আস্তে হাঁটলে দেরি হইবে না—তাহার পর নেবুর পাতা পাড়াতেই ঘণ্টা খানেক,

তোর মুণ্ড! ভেড়ির পাশ বরাবর যাইলে—কতক্ষণ পৌঁছাইয়া যাই!

বালক পিতার করুণায় অনেক চোখের জল কব্জি দিয়া মুছিয়াছে আপনকার মতিচ্ছন্নতার জন্য সে সত্যিই ডুকরাইয়াছে; সে এখন অন্য মানুষ, কর্তব্য বোধ তাহাকে এতক্ষণ বাদে এখন অত্রাহি করিল, নিশ্চয় গরীব শব্দটি কান হইতে সরাইতেও বটে, কহিল, 'তুমি আমায় রাস্তা চিনাইও না' এই উক্তিতে কর্তব্যের 'ক' ছিল না বরং নিজের দোষকে ঢাকিবার কথা ছিল—যাহা কর্তব্যপরায়ণের বাচনভঙ্গিতে উক্ত হইল। এবম্প্রকার

তবে মেয়েটির মান মর্যাদাতে আঘাতিল, তখনই বলিল, ঐ বুড়ি মানুষটাকে জিজ্ঞাসা কর না। ঐত খবর দিল!

হ্যাঁ বাপ এই বাস্তা বড় ঘুর, আমি যে এখানে সেখানে হাট কুড়াইতে, গোবব কুড়াইতে যাই!

বালক কহিল, বাবাও ত...

বাবা আবার কি বলিবে, তুই যা ইয়ে করিলি!

বালক ইহার কোন জবাব দিতে পারিল না, শুধু নিজ পক্ষ সমর্থনে মনেতে গুমরাইতে আছিল ইহা যে, হ্যাঁ ঐ পথে যাই, আর দুনিয়ার লোক এই ব্যাপার দর্শনে কৌতুক করুক। আমাদের বড় মান তাহাতে বাড়িত! আর তখন ত বাবার ইত্যাকার শোচনীয় অবস্থা হয় নাই! কেন যে, ভাবিয়াই থামিল আর কিছু এই অসম্পূর্ণ পদে যোগ দিতে, তাহাতে পীড়া হইল, আপশোষ হৃদয়ে ধোঁয়াইতে থাকিল, এবং খেদ করিল, অথচ মা! কত কথা আমদেরই শুধু বলিল।

মা তুমি আবার উঠিয়া আসিলে কেন, কাঁথাটা গায় দাও, ইস এখনও বেশ জ্বর, এই সময় সে মাযেব কপালে হাত দিয়া বলিল, যে জ্বর, না বাবা আব ইয়ে যাক আমি যাইব না। তোমার কাছে থাকি।

থাম, যে কথা বলিতে উঠিয়া আসিলাম, হ্যাঁ মন দিয়া শুন, ধীরে সুস্থে খাইবে, হাঁক-পাক করত কোন কিছু গোগ্রাসে গিলিবে না, যেন কেহ না ভাবে হাঘর হইতে হাভাতে গরীব কাঙালের ঘর হইতে আসিযাছে, এমন ভাবে আহার করিবে যেন লোকে নিমেষেই বুঝে মানী লোকের ছেলেপিলে, গরীব হইতে পারে তবে আত্মমর্যাদা আছে; মন দিয়া শুনিতেছ, আর তুমি (বালককে) আগে আগেই বলিও না, 'আর দিবেন না' বা 'থাক থাক'; ও! শুধু আঙুল দিয়া খাইবে—তিন চার আঙুলের, প্রথম কড় (মানে আঙুলেব দাগ) পার যতটা না হয মানে কড়ের নীচে না যায়—তাহা, দ্বারা খাইবে, কোন ক্রমেই হাতে তালুতে খাদ্যের দাগ না লাগে—যেন লোকে বুঝে ইহারা উচ্চ বংশের ভদ্র ঘরের, তোমাদের বাবার খাওয়া দেখিয়াছ ত কি পরিষ্কার, তিন আঙুলের কড়া পার হয় না।

বড়লোকদের মতন!

হাঁ মাছের কাঁটা ধীরে বাছিবে, লোভের জ্বালায় কাঁটা না ফুটে—জানিও লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। যদি অসাবধানতা বশতঃ একান্তই কাঁটা গলায় ফুটে তবে..

জানি মা! ভাত দলা পাকাইয়া গিলিব

লুচি হইলে তেমন দলা পাকাইয়া গিলিবে; কাটা ফুটিতেই অসহিষ্ণু হইযা 'ওয়াক' শব্দ তুলিবে না, উহাতে অন্যের আহারের ব্যাঘাত ঘটে, 'ওয়াক' শব্দ নিম্ন শ্রেণীর লোকেতে করে—যতটা সম্ভব কাহারেও জানিতে দিবে না। কোন সূত্রেই হাত চাটিবে না, আঙুল চুষিবে না, কোন কিছু চটকাইবে না। দধি আদি খাইতে 'সুপ' শব্দ করিবে না। কেহ যেন না বলে, কোথাকার ভিখারী। মনে রাখিও আমরা গরীব হইতে পারি কিন্তু খুব উচ্চবংশ! আমাদের বংশ মর্যাদা কাক পক্ষী পর্যন্ত জানিত। ও ভাল কথা, খাওয়ার পর লবণ দ্বারা আঙুল মার্জনা করিও এবং যখন শুনিবে, 'উঠিতে আজ্ঞা হউক' তখন উঠিবে।

বাবা কি কোন মর্যাদা রাখিল।

বাপ পা ছাড়িয়া এক কাজ কর, কাপড়ের কষিটা খুলিয়া দাও, তাহাতে খুব আরাম হইবে, ঐ উপদেশ বৃদ্ধা দিতে মাত্র, বালক এমত তড়বড় করিয়া উঠিতে গেল যে

বেকায়দাতে, নিজ কাপড়ের উপর পা পড়িয়া, সমস্ত কাপড় খুলিয়া পড়িল, ভাগ্যিস সার্ট ছিল!

গোবর-কুড়নী হাসিয়া যেমন ভাঙিয়া পড়িল, মন্তব্যিল, ওমাঃ কি কাণ্ড! গিঁট দিয়া কাপড় পর না কেন, তুমি ছেলেমানুষ। কষির এলা বাঁধন রাখিতে কি পার!

দাদা কি যে করিতেছিস্ এইবার ন্যাংটো হইয়া নাচ।

চুপকর পোড়ার মুখী। যে এবং কোনরূপে নিজেরে সামাল দিয়া অতঃপর বাপের কাপড়ের কষি খুলিতে এখন প্রস্তুত হইল এবং তজ্জন্য যেক্ষণে তাঁহার পিতার, সার্টটি পেটের উপর হইতে তুলিল, এবং বাবার ঢাউস পেট ওতপ্রোত হয় তন্মুহূর্তে তাহার মাথা চক্র দিয়া উঠিল, সমগ্র দেহ চমকাইয়াছে; যে এবং বিশ্বাস হইল, ফাঁকা মাঠের সেই ঘূর্ণায়মান বায়ু তদীয় দেহ মধ্যে সাঁধ করত 'বাতাপি বাতাপি' ডাকে যারপরনাই ঘোর রব তুলিয়া তাহারে প্ররোচিত করিতেছে, যাহাতে সে যেন বা ইল্বল্—সেও অমনই ডাক দেয়—হায় সে এ পর্যন্ত জ্ঞানহীন যে, প্রায় নিষ্ঠুর ইল্বলের মতই 'বাতাপি' বলিয়া ডাকিতে উদ্যত হইল। আঃ ভগবান দয়াময় তিনি রক্ষা করিলেন।

কি হইল দাদা তোরে কি ভূতে পাইল নাকি!

এবং মেয়েটির সঙ্গেই বৃদ্ধা মহা তাজ্জবিয়া প্রকাশিল, বাপরে! পেটটা কি বা ফুলিয়াছে! এতক্ষণ গায়ের কোর্তা ইত্যাদিতে এতটা ত বুঝায় নাই! ব্যাপার কি! রহ! রহ! নাড়ী দেখি! অথচ তদীয় হস্তদ্বয় তেমনই আছে,—নাড়ী দেখার কথায় ভ্রাতা ভগ্নী আতঙ্কিত মা যদি শুনিতে পায়! সে উহাদিগেব প্রতি ইতঃমধ্যে নেত্র পাতিয়া ভারি খুন খারাবী আমোদে তাহার স্বভাব মত ছেলেমানুষী হাস্যে লতাইতে ছিল এবং এই কালে, শতছিন্ন আঁচলেব কিছুটা এক হাতে লইয়া মুখে রাখে, এখন এই বস্ত্রখণ্ড মুখ হইতে সরাইতে থাকিয়া বিবৃতিল, তোমাদের ইসকুরুপ (স্ক্রু) ঢিলে তোমাদের! আমি অমুক হাড়ির নাতনী, আমার বাবার নাম অমুক হাড়ি, আমার জ্ঞানগম্য নেই। তোমাদের মতন আমি আলুকে আলু বলি পানাকে পানা, সব! তবে সে বার কি হইয়াছিল, সেই যে উপোসী বামুন, তাড়ি-খোলার কাছে পড়িয়া, হাতের কালোঠাকুর (শালগ্রাম) একদিকে, জিনিসপত্র রাস্তায়, ভাবিলাম মরিয়াছে, কোন রকমে ডোঙায় তুলিয়া বাড়ি পোঁছাইয়া দিলাম, বাড়ির লোক বলিল, করিলি কি! তুই হাড়ি! সর্বনাশ! নূতন হিমের দিন, বামুনকে তিনবার স্নান করাইয়া ঘরে তুলিল। জ্বর দেখে কে! ব্যাস রাত না পোহাইতে শেষ—বৈকুণ্ঠে চলে গেল! সেই হইতে পণ দেবদ্বিজ উঁচু জাতি স্পর্শ করিব না! সেই থেকে পণ আর পাপ করিব না।

এ পর্যন্ত কহিয়া বৃদ্ধা এখন পূর্বকার আসন ভঙ্গিতে বসিয়া বলিল, নাড়ী! আমার হাতের নাড়ী উহার নাড়ী দেখা নহে, এবং করজোড় বিমুক্তিয়া স্বীয় অতীব শীর্ণ কব্জির শিরা দর্শাইয়া ঘোষিল, আমার নাড়ী দেখিলেই, উহারটিও দেখা হইল সব নাড়ীর ভাল মন্দ এই নাড়ীতে যদি না রহিবে তাহার মনুষ্যজন্ম না ছাই, নাড়ী তোমার কি হইয়াছে, এতেক তরাস কিসের! পেট ফুলিয়াছে কেন বল।

অতীব সম্ভ্রান্ত ভদ্র নিমন্ত্রিতরা মহা সঙ্কোচে সবিনয়ে লোকটির নিকট উঠিবার আজ্ঞা চাহিলেন, লোকটি অনুমতি দিল।

এখন উঠিতে আজ্ঞা দেওয়া হউক।

মহোদয়গণ আমারে অপরাধী করিবেন না, আপনাদের যদি পেট ভরিয়া থাকে সে

মনা কথা; জানিনা অজ্ঞান বশত কত না দোষের ভাগী হইলাম। আমার মা যিনি স্বর্গবীক্ষে আছেন তিনি আমাব হট্টকারিতায় অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন।

মহাশয় আপনার কথাব উত্তরে দেখুন পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। এই যজ্ঞী বাড়ি সার্থক।

মহোদয়গণ আপনারা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আহার্য সকল যদি আপনাদের মর্যাদা অনুযায়ী হইয়া থাকে, তৃপ্তিদায়ক রুচিকর হইয়া থাকে, তবে সত্যই যে আপনাদের সেবা করিতে পারিয়া আমার মায়ের কৃপা যাহা—আমি ধন্য মনে করি।

সেই বাচাল লোকটি বলিয়া উঠিল, তবে এইটুকু নিন্দার আছে, যে সত্যই বাঙালী সে বলিবে, দইটি আর একদিন থাকিলে বাসি হইয়া যাইত। তাহার এই বাঙলা তামাসাতে সকলেই সভয়ে হাস্য করিল! কেন না লোকটি কিছুক্ষণ আগে মাত্র লঙ্ঘনের পরিচয় দেন; বলিল শাস্ত্রকাররা এবং অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষরা, শ্রাদ্ধে অন্ন খাইতে নিষেধ করেন কন্তু বা আমি ভাই খাইতেছি। (অবশ্য ইহা নিয়মভঙ্গ অনুষ্ঠান। শ্রাদ্ধের অন্ন নিষেধের কারণ এই যে, পরলোকগত-র স্বভাব চরিত্র গ্রহীতাকে প্রভাবিত করে। এখানে প্রকাশ থাক, যিনি আজ ইহজগতে নাই তাঁহার ন্যায় পূজনীয়া মহীয়সী নিষ্ঠাবতী মহিলা দুর্লভ!) আশ্চর্য তখন উহাব ব্যঙ্গ উক্তি ভোজন স্থান অতি মাত্রাতে নির্জন হইল।

সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণ পুনঃ ঐ লোকটিকে, যে খাইতেছিল, তাহার উদ্দেশে প্রায় জোড় হস্তে (এক হাত এঁটো) নিবেদন করিলেন, মহাশয যদিও জানি আমাদের...

পায়ে ঝিঁঝি ধরিয়াছে

জানি আপনকার নিকট উঠিবার আজ্ঞা চাহিয়া আমরা ভারী কাণ্ডজ্ঞান রহিত বিবেকহীনের ন্যায় লোকাচার বিরুদ্ধ কাজ করিলাম, মহাশয় আপনি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

লোকটির নিকটস্থ মহিলা দুইজন তাহারা সস্নেহে কহিলেন, কোন কিন্তু নাই আপনারা উঠুন!

মহিলাগণ লোকটিকে অপরিমেয় মাতৃবৎ যত্নে খাওয়াইতেছিলেন। দিদি যিনি, মধুর কণ্ঠে শাসাইলেন, মা তোমাকে যা ভালবাসিতেন, তিনি ছাড়িয়া যাইবার দিন তিনেক পূর্বে অদ্যও মনে আছে, '—' দিদি আলুশাক রাঁধিয়া পাঠাইলেন তখন বেলা প্রায় দুইটা এমনইতে যাহা ভাল বুঝিত রান্না নামাইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের পাঠাইত—শুনি খুলনার লোক উহাদের সম্পর্কে ছড়া আছে নাতি খাতি বেলা গেল। শুতি পারলাম না। এই ছড়া কাটিয়া মৃদু হাসিলেন, আহা '—' দিদি ভারি ভালমানুষ, বেচারীর জন্য বড় কষ্ট হয়, উঁহার ছোট ছেলেটি টাইফয়েডে ভুগিতেছিল জানলা দিয়া আম গাছে পাকা আম দেখা যাইত, রুগ্ন ছেলেটি বায়না করিত আম খাইব '—' দিদি প্রত্যহ তাহারে প্রবোধ দিতেন, ভাল হইয়া উঠ! ঐ গাছের আম সব তোমার কেউ হাত অবধি দিবে না। ছেলেটি উহাদের মায়া ত্যাগ করত চলিয়া গেল, আর '—' দিদিও আম আর স্পর্শ করিলেন না! ও মা কি বলিতে কি বলিলাম মন না মতি হ্যাঁ সেই আলুশাক রান্না দেখিয়া মা বলিল, আমার—রে পাঠাইয়া দাও, শেষে দাদার সেরেস্তায় কে ছিল তাহারে সাইকেল করিয়া তোমার বাড়ি লইয়া যাইতে হুকুম! তুমি না খাইলে মা বড় কষ্ট পাইবেন না বলিও না! খাও।

বালক দেখিল ছায়া, সে মুখ তুলিয়াছে, প্রত্যক্ষ করে জনা তিনেক কাহারা যেন—ইহারাও যেন ধুঁকিতে আছে গায়ে জামা ইহাদের অধস্তন পাঁচদশ পুরুষ পারিতে পাইবে না ইহাদের মুখ সহানুভূতিতে আরও বদমাইশের মত হইয়াছে।

মাছ আনিয়াছি ভেটকী রুই।

রাখিয়া দাও। মা বলিতেন, কি কষ্ট করিয়াই না রোজ ভগবৎ পাঠ করিতে আসে। জাতে বামুন হইলে উহাতেই অনেক পয়সা পাইত। মজিলপুরের লোকেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছে এমন পাঠ তাহারা শুনে নাই।

ধীরে ধীরে খাও ইস তোমার বৌ বেচারী সে আসিলে কি আনন্দই না হইত।

ঘাটে যাহারা মুখ ধুইতেছিল, তাহারা আলোচনা করিতে থাকে, কি ভাবে চালাইতেছে এত খাওয়া!

মনই খায়। মন যদি না খাইয়া থাকে তবে সে কিছু বোধ করে না...শ্রুতি আছে ব্যাসদেবকে গোপিনীরা যমুনা পার করাইয়া দিবার জন্য ধরিল ব্যাসদেব উহাদের নিকট কিছু খাদ্য চাহিলেন, বলিলেন, আমি ক্ষুধার্ত্ত। গোপিনীরা ক্ষীর ননী দিল ব্যাস তাহা খাইয়া যমুনার নিকট যাইয়া দেখিলেন একটি নৌকা পর্যন্ত নাই, কহিলেন, হে যমুনে আমি যদি কিছু না খাইয়া থাকি তবে দুই ভাগ হইয়া যাও। যমুনা দুভাগ হইল। গোপিনীরা পার হইতে থাকিয়া ভাবিল বুড়ো বলে কি। কিছু না খাইয়া থাকি! (ইহা ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন)

আছে হটযোগের খেলা।

কিরূপে, কোন পন্থায় কযি আলগা করা যায় এমত কিছু যে সে ভাবিতে আছে, ইহা অন্তত বালকের মুখের চেহারাতে বুঝায়। গোবর-কুড়নী তাড়া দিল, অমন বসিয়া থাকিলে রাত পোহাইয়া যাইবে! হাত লাগাও!

বালক আপন আড়ষ্টতা কাটাইয়া গোবর-কুড়নীর প্রতি নিরখিতে আছে, এখন নিশ্চয় করে যে বৃদ্ধা নাড়ী না ধরিয়া থাকিলেও, মুখেও কোন ভাবান্তর নাই; ইস! যখন সে নাড়ী আপন শিকরের তুল্য অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শিল, তখন বৃদ্ধার চক্ষু শিব নেত্র (অর্ধ নিমীলিত যাহা) হইয়া আছে; তখন বালকের বক্ষঃদেশ সিঁটাইয়া উঠিল, নিঙড়াইল! তখন তাহার দৃষ্টি তীর বেগে ছুটিতে আছে, হঠাৎ থমকাইল, তদীয় বুদ্ধি অদ্ভুত সংস্কার লভিয়াছে, বিশ্বাস যাহাতে করিল সমস্ত ত্রিভুবনের নাড়ীর খবর তাহাতে কিছু সে বিহিত জানে! এই কি সেই অনেক জন্মের সুকৃতির পুণ্যে বাবা বলিয়াছে যাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—ইহারা সত্যযুগের মানুষ ইহারা শালতমাল বৃক্ষ এবং কাক পক্ষীর ন্যায় (আর বিষ্ণু ব্যাস আদি নয় জন, আবার অন্য মতে, শুধু সাত জন) বহুকাল এই পৃথিবীতে আছেন!

নিশ্চয় কৈ আমি ত আমার মায়ের জ্বর আমার নাড়ীতে টের পাইনা—অবশ্য এমন যে করা যায় ইহা আমি জানিতাম না! কি দারুণ ঐ বৃদ্ধা! গরীব ছেঁড়াছুটা উহার ছলনা—আমি উহার নিকট এই চমৎকার ম্যাজিক শিখিব।

তুমি জজ ব্যারিস্টার হইবে, সি আর দাস হইবে পাঁচ মোহর তোমার ফি! (সি আর দাস অর্থে চিত্তরঞ্জন দাস; ইহা কি লজ্জার কথা, মাথা হেঁট হয়, যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আমাদের মত লোককে পাঠকের নিকট পরিচয় দিতে হইতেছে। আমরা শুনিয়াছি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে জানিনা ইহা সত্য কিনা! এতদ্ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ ও স্বাধীন হওয়া অনেক প্রভেদ! তাই ওই নামটি ভুলিয়াছি!) বেচারী বালক জানে, ঐ আকাঙ্ক্ষায় সে নিজেকে ভবিষ্যতে শয়তান তৈয়ারী করিবে। অবশ্য ঠাকুর যদি উহাকে দয়া করেন—তবেই রক্ষা!

বৃদ্ধা নিশ্চয় বাবার কোন একটা বিহিত করিতে পারে। বাবা কেন মরিতে গৃহিণীদের

কথা শুনিতে গেল! আঃ সেই ছেলেটি, যাহার একটি দাঁত পোকা খাওয়া—কি অসভ্য ছোটলোক বলিল, এই সব লোক (তাহার বাবার উদ্দেশ্যে) পরের পয়সাতে টিনচারাইটিন খায়। (টিনচার আইওডিন) এখানেই সে থামে নাই; মন্তব্যাল, জাত ভিখারীরা এমন হয় না এবং সহানুভূতির ভান করত প্রকাশিল, বেচারা খাইয়া লউক, গরীব মানুষ এত ভাল আর কোথায় পাইবে। ইহাতে তাহার নিকটস্থ বালকগণ মহা চাপল্যে হাস্য করে।

বালকের চোখ ফাটিয়া জল আসিল, সাবরেজিস্ট্রী অফিসের কর্মচারীর পুত্র তাহারে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল; বালকের বিবৃতিতে সে সত্বর কুলকুচির জন্য এক মুখ জল লইয়া সেই ব্যাদরা বালকের মুখে কুলকুচি ছিটাইয়া কহিল, তোর মত ছোটলোকেরে হাত দিয়া মারিতে লজ্জা হয় শালা ছোটলোক, এক নম্বর চোর তোর বাপ! (ইহার বাপ কোন প্রতিবেশীকে সোনার বোতাম বলিয়া ধার দেয়— প্রতিবেশী দুর্ভাগ্যবশত উহা হারাইয়া ফেলিল, ইহার বাপ শুনিয়া বলিল, উহা নিরেট সোনার ছিল, এবং দাম আদায় করিল, কিছুদিন পর ঐ বোতাম পাওয়া গেল, স্যাকরা কহিল, ইহা সোনার জল করা রূপার বোতাম) জালিয়াত! হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ডেভিডএজরা তোমাদের পত্তনিদার—গড়ের মাঠের জমিদার!

ব্যাদরা বালক ইত্যাকার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাহার নিকটস্থ বালকরা পালাইয়া গেল এই ব্যাপার নিমিত্ত বটে উপরন্তু বয়সীরা এই সময় ঘাটে মুখ ধুইতে উপস্থিত হইলেন, একজন খড়তে দাঁতে দিতে থাকিয়া বলিলেন, তবে, এই মনে হয় আহার্য সব বড়ই গুরুপাক যেমন গরম মশলার ব্যবহার তেমনই সরিষা লঙ্কা ইত্যাদির তাহার পর তৈল ঘৃতের ছড়াছড়ি! পাঁচ/ছ রকম মাছ। হজম হওয়া দুষ্কর, এত উহার ঐ ব্যক্তির খাওয়া ঠিক নহে।

গুরুপাক মানিলাম; তবে গল্প আছে, এক একজনের সহ্য ক্ষমতা অবিশ্বাস্য; লর্ড ক্লাইব নবাব সিরাজদ্দৌলা যাহা খাইয়া থাকেন তাহাই খাইতে চাহিলেন; বাবুর্চি কহিল, মহাশয়, যেভাবে মাংস তৈয়ারী হয় শ্রবণ করুন, (জানি না কতদূর সত্য) গোখর সাপ একটি মুরগীকে ছোবল মারিয়া মারিল, ঐ মৃত মুরগী খণ্ড খণ্ড করিয়া অন্য একটি খাওয়ান হইল সেইটি মরল, এইভাবে পরপর কয়েকটি; সর্বশেষ যে মুরগীটি বেশ চলাফেরা করিবে, সেই মুরগীর মাংস নবাব খাইতেন। ক্লাইব তেমনই পাক করা মুরগী খাইলেন, খাওয়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে লাফালাফি, গরম। কোট সার্ট অন্তর্বাস খুলিয়া ক্লাইব পুকুরে পড়িলেন। যাঁহার পেটে যাহা সহে! নিশ্চয় ঐ ব্যক্তিরও অভ্যাস আছে।

গোবর-কুড়নী বুড়ি কহিল, ও বাপ কষিটা খুলিয়া ফেল।

বালক পুনঃ সার্ট উঠাইল, পুনঃ সেই উদর বিপুলত্ব ঢাউস স্ফীতি। একদা বালক বিচারিল, তবে বাবা খাওয়া দাওয়ার পর মুখ প্রক্ষালনাদি কর্ম কিরূপে সম্পাদন করিল! কেননা করিতে সম্মুখের দিকে দেহ অন্তত এক আধবার বাঁকাইতে হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইতে একাগ্র হওয়া মাত্র শুনিল বাতাপি।

ইহাতে এক যুবতী রমণী যাঁহার কানে উহা আসিল, যিনি ঐ টায়রা পরিহিতা বৌটির অসভ্য কাণ্ড দেখিলেন, তিনি বিশেষ মর্মাহত হইলেন, আঃ কি মহীয়সী কি পর্যন্ত শ্রদ্ধার ইহার ভাব গাম্ভীর্য, তিনি তৎক্ষণাৎ নিদারুণ চাবুক কণ্ঠে নিন্দিলেন, ছি ছি বউ তুমি কি চিমটি কাটিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় তোমাকে রক্ত মাংসের শরীর কিনা, এই সব অসভ্যরা শিখাইতেছ, লোকে তোমার বাপ শ্বশুরকে কি বলিবে! ইতরের ঘর! ছি ছি তুমি না আজ

বাদে কাল বিয়াইবে। লজ্জা নাই। এবম্প্রকার ভর্ৎসনা কালে, তাঁহার রূপ কি অবশ্
সম্ভ্রান্ত শত শত লোক তাঁহারে কুর্নিশ করিতে আছে, যেন সম্রাজ্ঞী। নিশ্চয় গত জন্মে
রাণীভবানী উনি ছিলেন, আঃ উহার হাতের টালি প্যাটার্ন-এর চুড়ি কি সুন্দর! আমি
জলপানির টাকা জমাইব মাকে গড়াইয়া দিব। মাগো আমরা এত গরীব কেন?

মা সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, কখনও বলিতে নাই, ভগবান অসন্তুষ্ট হন

তুমি বাবা সবাই ত বল!

বলি, কিন্তু কখনও কেন জিজ্ঞাসা করি না। জিজ্ঞাসার মত পাপ নাই! আর জানিস
নিশ্চয় গতজন্মে কোন পাপ হয়!

এই লোকটি কে! নিশ্চয় ভিখারি, কাঁধে থলি, বাম হাতের অর্ধেক নাই, একটি প
ছোট শীর্ণ বাঁকাচোরা-শরীর ক্রাচে ভর দেওয়া লোকটি উচ্চিংড়ির মতন, ছোট লাফে
তাহাদের পরিক্রমণ করিতেছিল।

আ খেলে যা! অমন করিয়া চক্র দিতে আছিস কেন! বৃদ্ধা ধমকাইল।

দেখিতেছি বেচারার বাবুর কি হইল। এই এক রত্তি ছেলে, উহার দ্বারা কষি খোল
কি সম্ভব। ওহে তোমরা এস না, বৃদ্ধা ঐ যাহারা তিনজনা রাস্তার উপরে বসিয়াছিল
তাহাদের কহিল। এবং পরক্ষণেই চোপ বেটা ভিখারী, ভিক্ষা চাইবার সময় বাবুমহাশয়
এখন একেবারে মাথায় বাঃ।

ঘাট হইয়াছে।

ঐ তিনজন কহিল, আমরা উহাতে নাই, উঁচু জাত, যাই তাহার পর নালিশ ঠুকিয়া
আমার গেঁজে (লম্বা কাপড়ের থলি বেল্টের মত কোমরে বাঁধা হয়) বা ট্যাঁকে এক কুড়ি
টাকা ছিল নাই;

বৃদ্ধা কহিল, তুমি চেষ্টা কর।

ক্রাচের ভিখারী, উপদেশ দিল, বাবু আপনি পেটটা একটু যদি টানিতে পারেন ত
গয়রা হয় (গভীর) অনায়াসে কষি খুলিয়া ফেলা যায়।

তোর কি কোন জ্ঞানগম্য নাই। গয়রা করিতে পারিলে, এইকাণ্ড হয়। সর্। লও ব
তুমি হাঁ করিয়া রহিলে যে, কোঁচার পরত আস্তে করে খুলে, একটির পর একটি। হ্যাঁ কা
জাঁকিয়া বসিয়াছে তাই ত মানুষটির প্রাণ ওষ্ঠাগত।

বালক বৃদ্ধার কথামত কোঁচা খুলিতেছিল, সে বেশ আড়ষ্ট কেন না ক্রাচের ভিখারী
অনবরত সাবধানিতেছে, খুব ধীরে, খুব আস্তে। যেহেতু বাবা বেচারী এতটুকুতেই অর্থ
কোঁচা যাহা চাপিয়া বসিয়াছে, তাহা শিথিল কারণে যন্ত্রণাদায়ক যদি হইল তখ
মহাবেদনাতে ডাক ছাড়িয়াছে। ক্রাচের ভিখারী একবার এইপাশে মুহূর্তে অন্য পার্শ্বে য
আর মন্তব্য করিতে আছে।

আ খেলে যা! মা আতান্তরে পড়িলাম ত। কেন ঘাবড়াইয়া দিতেছ, যাও একস্থানে চু
করিয়া বসিয়া থাক। এবং পরক্ষণেই লোকটিকে সস্নেহে বিরক্তি ভানে কহিল, একটু স
করিতে হইবে, বটে ছোট ছেলে সহায় সম্বল নাই। তুমি হাওয়া কর থামিও না, মেয়েটি
আদেশিল। এখন কোঁচার দিকে তাকাইয়া বলিল, বাঃ আর কয়েকটা পরত! বুঝিলে স
খুলিবার পর কাজ আছে বুঝিলে, তেল আর কোথায় পাইবে শুধু জল মালিশ করি
হইবে। পেট ঢাউস।

লোভী!

ইনি আমার বাবা।

নোলা সর্বস্ব!

ইনি আমার বাবা।

পেটুক।

ইনি আমার বাবা।

বৃদ্ধা হাত তালি দিল লুঠেরা গলাতে ঘোষিল, যাক্ একটা গাঁট পার হইয়াছে ও বাবু কিছু আরাম পাইতেছ। এবং সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বালককে নির্দেশিল, এবার কাছোর কাপড়টা খুলিতে পারিলে কেল্লা ফতে। তখন জল মালিশ!

এ নিশ্চয় অনিয়মে অমন ধারা হইয়াছে, বেটাইমে অবেলাতে খাওয়াতে যাহাদের গ্যাসের রোগ আছে। ইহা অদূরে যে কয়জন বসিয়াছিল তাহাদের একটি প্রকাশিল। তাহাদের এরূপ হয়। একটু নেবু দিয়া সোডা। শুধু সোডা থাকিলেও...

সোডার অভাব কি আমার কাছেই আছে—আমার যে অম্বল সোডা ব্যতিরেকে দুই পা চলিতে পারি না। সোডার অভাব নাই।

তাহা সেই গল্পটি কত চমৎকার, যাহা এইরূপ, একজনা ব্যক্তি অতিমাত্রায় ভোজন করিল প্রাণ যায়। এমন সময় লোকে হাকিম ডাকিল। হাকিম হজমের দাওয়াই দিলেন। সকালবেলা লোকে উঠিয়া দেখিল, যে, যে ব্যক্তি দাওয়াই খাইয়া ছিল, সে বেমালুম সশরীরে হজম হইয়া গিয়াছে— পরণের জামা কাপড় তক্তাপোষে পড়িয়া আছে।

বৃদ্ধা ধমকাইল, মহা বেআক্কালে দেখি। সোডা ইহার উপর, কোথাকার হাতুড়ে, সোডা দিলে বায়ু ঠেলিবে না! দেখিতেছ পেটটা উদরী রোগী (ড্রপসী) সমান হইয়াছে, তোমাদেব কি মায়া দয়া নাই! এখন তেল জল, অভাবে শুধু জল! মালিশ। এই পোড়ার মুখো ঐখানে কেন—এই গঞ্জনা সে ক্রাচের ভিখারীকে দিল, পুনঃ অন্য কণ্ঠে লোকটিকে কহিল, একটু সিধা হইয়া বাবু বসিতে হইবে।

বাবার বড় কষ্ট হইবে। তুমি থাম ত। হ্যাঁ আর একটু, সার্টটা আস্তে করিয়া টান, বাবু তুমি সার্টটা ছাড় দাও। টান। আবার তুমি অমন করিতেছ।

ইহা শ্রবণে ক্রাচের ভিখারী থতমত হইল, নিশ্চয় বেচারীর একটু উপকারে লাগিবার সাধ ছিল, তাই সে ঈষৎ অস্থির। এমত সময় বৃদ্ধা কহিল, কিছু যদি কাজে লাগারই মন ত একটা বড় কচু পাতা লইয়া রৌদ্রে আড়াল করিয়া মরণ দাঁড়াও না এবং বালককে জিজ্ঞাসিল, তুমি কাছাটা সব খুলিয়াছ। ব্যাস এবার দেখ দেখি কষিটা শিথিল করিতে পার কি না। এবং উদ্‌গ্রীব হওয়ত দেহ ও ঘাড় বাঁকাইয়া বৃদ্ধা তাকাইয়া রহিল; কয়েক মুহূর্তে বাদেই লোকটি হঠাৎ মরিয়া হইয়া যা থাকে কপালে সঙ্কল্পে, কোন উপায়ে আপন কষির একটি দিক খুলিয়া দিল, তদ্দর্শনে বৃদ্ধা জয় মা দুর্গা! কাঙালের মা-গো দুখীজনের মাগো। ফুকারিয়াছিল এবং বিশেষ গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশিল, লও খুব সন্তর্পণে আল্গা টান দিতে থাকিয়া ডান দিকেরটা খুল; দেখিতেছ ত মানুষটা কেমন কাতরাইতে আছে, যে জ্বালায় কোমর জ্বলিতেছে। খুব সাবধান। বাঃ ও মেয়ে তুমি বাপের কষির এখানে হাওয়া দাও কিম্বা ফুঁ দাও দেখি।

এইভাবে যখন কিছুটা সময় অতিবাহিত হইবার পর, লোকটি চীৎকারিল ওরে মা ওরে মা আমার কোমর জ্বলিয়া গেল! আমিও গেলাম।

বালক বালিকা ক্রাচের ভিখারী কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না, বৃদ্ধা নির্বিকার এবার

দারুণ রুক্ষ গলাতে উচ্চারিল, মরণ, হা দাও, ফুঁ দাও, যমের সঙ্গে লড়াই এমনই হইবে। ভিজাকাপড় এখানে দিয়া ফুঁ দাও; দেখ কেমন আরাম পাইতে আছে; লও বাপ তুমি একটা কিছুতে করিয়া জল আনিতে পারিলে ভাল হইত।

বালক ভগিনীকে অতীব নিম্ন স্বরে প্রশ্ন করিল, ছাঁদাগুলির মধ্যে সরা আছে না।

লোকটি ঐ অর্ধমৃত অবস্থা হইতে ধাবাইয়া নিষেধিল না না উহাতে হাত দিবে না, সরা লসবে না, মরি সেও ভাল।

তাহা হইলে কচু পাতায় কতটা আব হইবে।

ক্রাচের ভিখারী সভয়ে কহিল—আমার নিকট একটা কৌট আছে। আনকোর আমাকে পণ্ডনিদার দিযাছে।

লোকটি বলিল, উহাতে দোষ নাই। জলের ছিটা দিয়া লও।

দেখ এঁটো হাত ফাৎ লাগাস্ নাই ত। তুমি বাপ এটা একটা পাতা দ্বারা ধরিয়া লইয়া যাও বেটাব পাপ না হয়।

মাইরী না। হাতফাৎ. আমার পাপের ভয় নাই।

আনিয়াছ, বেশ পেটে জল আছড়া দিয়া মালিশ কর। দেখ এখনই আরাম পাইবে কর! কর! তুই—ক্রাচের ভিখারীকে আজ্ঞা দিল, মাথার কাছে হাওয়া কর। ওগো তোমরা ঐ গাঁয়ের কাউকে ডাকিয়া পাও কি না। জিজ্ঞাসা কর সালতি কার।

উত্তর দিকের মাঠের মধ্যে ছোট একটি গ্রাম এই খাল হইতে সরু এক জল পথ ঐ দিকে গিয়াছে। ঐ লোকগুলি তারস্বরে চীৎকার করিয়া প্রথমে সাড়া লইল এবং পরে জিজ্ঞাসিল সালতি কার এইধার আইস।

বৃদ্ধা কহিল, ঘরে পৌঁছাইয়া অবগাহন! বুঝিলে ভুলিও না।

সালতি উঠিয়া ভ্রাতা ভগনী বড় ছলছল চোখে গোবর- কুড়নী ও ক্রাচের ভিখারীর দিকে. ভগনী ভ্রাতাকে, সে মস্তকে দুই হাত স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল. ঈষৎ ঠেলা দিয়া বলিল. দাদা আইস উহাদের আমাদিগের বাটি যাইতে কহি। আশ্চর্য বালক ইহাতে নিমেষের জন্য উহাদের প্রত্যক্ষিল, একটি গোবর কুড়নী অন্যটি ভিখারী তৎক্ষণাৎ নিজেকে ধিক্কার দিবার বিবেক তাহার ছিল। এবং অন্যমনস্ক আছে, কাহারে সে ভাবিয়া ছিল, জলাতে থাকে, আলেয়া হয়। তখন নিমন্ত্রণ করিল এ যাবৎ তাহারা তেমনই দাঁড়াইয়া ছিল।

এমত সময় লোকটি মেয়েকে বলিল, মা রে ছাঁদাগুলি ধরিয়া থাক, উল্টাইয়া না পড়ে. কোটটা, উড়ানি বিঁড়ে করিয়া দাও। এক ছিট্রে উহার যদি পড়িয়া যায় আমাব বড় কষ্ট হইবে।

বালকের মনে রওনা হইবার প্রথম পর্ব আভাসিত হইল। বাবার দুই হাতে লম্বাটে পাশ বালিশের ওয়াড়ের মত দুইটি পুরাতন কাপড়ের থলি; ঐ থলিতে যে হাঁড়ি সকল আছে তাহা কাপড়ের উপর হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, বালক অসম্মানে লজ্জায় লোক সমাজের টিট্টিকার বিদ্রূপ—পুড়িতে আছিল; এখানে ঈষৎ নির্জনতায় সে বিলম্বিত সর্পের ন্যায় বাবাকে আক্রমণ করিল। লঘুগুরু জ্ঞান তাহাতে ছিল না। উন্মাদ হওয়ত, প্রকাশিত লজ্জা করে না, সকল ব্যক্তি হাস্য করিতেছিল। গাণ্ডেপিণ্ডে সাত জনম যেন..., এখানে তোতলাইতে লাগিল, এ সময় কানে আসিল 'দাদা কি হইতেছে' কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করিল না পুনঃ কণ্ঠস্বর শানাইয়া ব্যক্ত করিল, লোকে হাততালি দিতে বাকি রাখিযাছে, তাহার

উপর এত লইয়া ছি ছি আমাদের ভিখারী বলিবে না ত কাহাকে বলিবে ছি ছি।

আমি কি চাহিয়াছি? তুই কি আমাকে কি ভাবিস? বলত মা...। আমি না তোর বাপ।

মেয়েটি বাপের কাতর উক্তিতে বড় পীড়িত হওয়ত কহিল, ও ছোট লোককে কি বলিবে!

আব অনেক নিন্দনীয় কথাই বালক মহাদণ্ডে তাহার বাবাকে শুনাইল, যাহাতে লোকটির চোখ দিয়া জল ঝবিতে লাগিল এবং সেখানে বসিয়া কান্দিতে থাকিয়া আক্ষেপিল, তুই আমাকে শেষে এই বললি, তোর কি মনে হইল না আমরা এত ভালমন্দ খাইয়া যাইতেছি, তোর মা বেচাবী একা পড়িয়াছে একটু যদি লইয়া থাকি তাহাতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়। আর আমি চাহি নাই তাহারা আহ্লাদ করিয়া দিয়াছে।

বালক দমিবার পাত্র নহে কিন্তু বাবাব চোখে জল তাহাকে একটু ভ্রমে ফেলিয়াছে কি বলিবে, ছেলেমানুষের বুদ্ধিতে কুলাইল না উত্তর দিল চাও নাই আবার ঐ পকেট ভর্তি নেবু নেবুব পাতা। ঝাড়া এক ঘণ্টা যাহার জন্য দেরী।

বাপ ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল। *

মেয়েটি এতেক ক্ষিপ্ত যে দৌড়াইয়া গিয়া বালককে এক ঠেলা মারিয়া গাল দিল, ছোটলোক শালা।

ইহা কি। হ্যাঁ! ছিঃ! ক্রন্দিতে চোখে লোকটি কোনক্রমে সংস্কার বশত ব্যক্ত কবে, ইহার সহিত যার পব নাই মাসিক স্বরে জানাইল, ঐ দুটি নেবুর পাতা তোর মায়ের জন্য, একটিই ত জিনিস ভালবাসে, কোন কিছুত জ্বরের জন্য মুখে পর্যন্ত দেয় না জ্বরে কালাইয়াছে মুখে তাহার তিক্ত লাগাইয়া থাকে—তুমি জান না। তাই নেবুর পাতা তেঁতুল দিয়া একমাত্র খাইতে ভালবাসে তাই চাহিয়াছি তাহাতে কি আমার মান গেল! এখানে তাহার বুক মহা অভিমানে ক্ষোভে আলোড়িতেছিল, সেই কারণে ইহার পরে উক্ত শব্দ বেশ জড়াইয়াছে যাহা এই, নেবুর পাতার জন্য ভিক্ষা করিতে হয় দূর ছাই শুনতে হয় তাহাও স্বীকার।

বাবা কান্দিতেছিল।

মা কোন মতে বিছানা ছাড়িয়া দুই হাতের ঐ বোঝা দেখিয়া অত্যধিক হেয় হইল, তদীয় চোখ ছিঁড়িয়া জল আসিল এবং দাওয়ার খুঁটিতে আপনকার কপাল নিদারুণ অবমাননা বোধে ঠুকিতে লাগিল; মেয়েটি অদ্ভুত স্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া মা মা বলিয়া উহার হস্ত ধারণের চেষ্টা করিলে মা তখন তাহার স্বীয় হাত দিয়া দূরে সরাইতে অযুতে কোপে উচ্চারিল, খবর্দার আমায় মা বলবি না, আমার কপালে এত...আমার মরণ হয় না, ঠাকুর আমি কি এমন পাপ করিলাম যে আমাকে জন্মান্তরের শত্রুর হাতে তুলিয়া দিল,...পাত কুড়নীরাও এমন করে না! ছাঁদা বাঁধিয়া আনিলে—লক্ষ্মী আর কখনও এখানে আসিবেন।

মেয়েটি দাওয়াতে পা ছড়াইয়া ভয়ঙ্কর কাঁদে, ল্যাম্পোর আলো পিতা পুত্রের মুখে কম্পিত হইতেছিল, দুইজনে দুই জনকে নেহারিবার জন্য প্রয়াসিল। বালকের মুখ বাপের মত শুকাইয়াছে এবং সে বাপের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। কেননা বাপের মমত্ব বোধ যে কি তাহা কে জানে।

বাপ কহিল, মাগো, তোর মাকে বলিবি না যেন, তোর দাদার আমাদের কোন কথা! তোর মা বড় দুঃখু পাইবে।

না বাবা! হ্যারে দাদা কৈ মাছের পরেই ত রুই তারপর?

না মা কৈ এর পর চিঙড়ীর মালাইকারী।

হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা তোর সব মনে আছে আয় মিলাইয়া লই। যদি ভুল হয় মা'র যে কি। সব বলিতে হইবে।

এখন ল্যাম্পোর আলোয় বাবার পেটের প্রতি দৃষ্টি পাতিয়া বালকের জিহ্বা শুকাইয়াছিল। তবু বিভ্রান্তিতে মায়ের খেদকে প্রশমিত করনে সহসা বলিয়া ছিল, বাবা যে ফিরিয়া আসিয়াছে ইহা ঢের। (ইহা গোবর-কুড়নীর কথা)

ইহা মা'র কপাল ঠুকিতে থাকা ঈষৎ ধীরে হইতে আসিল। তদ্দর্শনে বালক মনোবল লভিয়া, যতখানি না বলিলে নয় তত অবধি বিশদিল।

ইহাতে মা স্থির মেয়েটি মাকে বুঝিয়া লইয়া কহিল সব দোষ তোমাব তোর, তুই ত যাহা করিলি, এই অবধি বিস্তারিয়া শেষে যথেষ্ট বুক ফাটা অভিমানের গলা করিয়া প্রকাশিল, তোর খুরে খুরে দণ্ডবৎ বাব্বাঃ যাহা নীলা (লীলা) দেখাইলি।

বাপ তৎক্ষণাৎ যোগ দিয়াছে, তোর মাকে আর কষ্ট দিসনি মা।

মা গোবর-কুড়নী পৈ পৈ করিয়া বলিয়াছে, অষ্টপ্রহর পরে হইবে তবে দুটি জলভাত নেবু দিয়া দিবে মা আমাদের এখানে কাঁজি কেউ করে!

থাম থাম তোর দাদা কি করিয়াছিল বল?

উহাকে ছাড়া, আমিই বলিতেছি, আমার ভীমরতি তোমার বড় পুত্র রাগিয়া ছিল'

মা নেবুর পাতা,

আঃ

আমার খাওয়াব বহর দর্শনে লোকে

ইস আমার আমার...

নেবুর পাতাগুলি

ঝাঁটা মারি নেবুর পাতায়, আবাব সোহাগ দেখাইবার জন্য দুইটা নেবুর পাতা, মরে যাই লোকে বলিবে, আহা অমুক বাবুর মতন মাগ পেরান, মাগ অন্ত পেরান লোক আর দুচারটি থাকিলে রামরাজ্য হইত। ছি ছি কোন লজ্জায় তুমি খাইলে, সারা যজ্ঞী বাড়ি তোমারে লইয়া রঙ্গ তামাসা করিল। মাগো আমায় আঁতুড়ে নুন দাও নাই কেন...উঃ। মার কণ্ঠ নিদারুণ অপমানে রুদ্ধ হইয়া আসিল, একে জ্বর তদুপরি এই মন যন্ত্রণা মা প্রায় উন্মাদ। অনবরত এক কথা আমার মরণ হয় না। এবং ভূমিতে শুইয়া কাঁদিতে লাগিল।

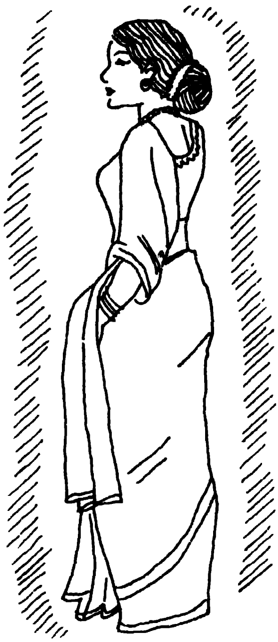
বাপের নিমিত্ত ব্যথিত কন্যা কহিল ঢের হইয়াছে উঠ কি যে কর।

ইহার পর বালক নিশ্চয়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ এখন ঘুম ভাঙিয়াছে এবং ছতরিতে বিরাট একটা হাতের ছায়া সে দেখিল শুনিল মা বাবাকে বলিতেছে, আর একটা খাও পারিবে না। তোমার কতটা খাইলে পেট ভরে আমি জানি না, উহাদের দিয়াছি, এ সন্দেশ থাকিবে না, কাঁচা পাকের ত কাল খারাপ হইয়া যাইবে। লহ আর একটি।



তৃতীয় পক্ষ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়



বিয়ের পরের মাসেই স্ত্রী মারা গেল। ভুবনমোহনের তখন জোয়ান বয়স, তার উপর মা বেঁচে। মাস চারেকের মধ্যে আবার নতুন বৌ ঘরে এল।

কিন্তু বরাত ভুবনমোহনের। বছর ছয়েক, তার বেশী নয়। একটি মেয়ে ভুবনমোহনের কোলে তুলে দিয়ে এ-বৌও চোখ বুজল। তিন দিন, তিন রাত ভুবনমোহন বিছানা ছাড়ল না। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল। মা আর ছিলেন না। দূর সম্পর্কের এক পিসি সান্ত্বনা দিতে এসে কেঁদেই আকুল। অনেক বোঝাবার পর ভুবনমোহন বিছানা ছেড়ে ডিসপেনসারিতে এসে বসল, কিন্তু ওই বসাই সার। রোগীদের ভাল করে দেখলও না, ওষুধপত্রও হাতের কাছে যা পেল, তাই বিলিয়ে কাজ সারল।

দিনকয়েক পরে তাল বুঝে পিসি একবার চেষ্টা করল।

তোর আর এমন কী বয়স ভুবন। এ-বয়সে অনেকের বিয়েই হয় না। আর একটা বিয়ে কর। মেয়েটাকে দেখবার একটা লোক দরকার, তা ছাড়া তোকেও ত এভাবে অযত্নে অবহেলায় ফেলে রাখা যায় না।

কম্বলের উপর বসে ভুবনমোহন গীতাপাঠ করছিল। একমুখ গোঁফদাড়ি। শীর্ণ দুটি চোখ।

মুখ তুলে পিসির দিকে চেয়ে বলল, বিয়ে করব পিসি, আপত্তি করব না। খাটিয়ার চার ধারে ফুল সাজিয়ে ভাল লগ্ন দেখে যাত্রা শুরু করব। সঙ্গে নাম-সংকীর্তন, খই ছড়ান, সব হবে।

বালাই ষাট, অলুক্ষুণে কথা শোন ছেলের। ভুবনমোহনের কথা শেষ হবার আগেই চোখে আঁচল চাপা দিয়ে পিসি উঠে গিয়েছিল। ভুবনমোহনের পেশা ডাক্তারি। অ্যালোপ্যাথি নয়, হোমিওপ্যাথি। শুধু বাপের রোগীগুলোই নয়, তাঁর নাড়ীজ্ঞানও পেয়েছিল। আশেপাশের গোটাচারেক গাঁয়েতে আর কেউ পাত্তা পায় না। সর্দি থেকে সান্নিপাতিক, হাঁপানি থেকে হার্নিয়া, সব ব্যাপারে ভুবনমোহনের ডাক পড়ে। ইদানীং অবশ্য হাসপাতালের কোট-প্যান্ট পরা দু'একজন ছোকরা ডাক্তার ঘোরাফেরা করে। শিরা ফুঁড়ে ওষুধ দেয়, দাঁত ভাঙা সব দাওয়াইয়ের নাম বলে, কিন্তু এত করেও জমাতে পারেনি। ভুবনমোহনের প্র্যাকটিসের শক্ত বনিয়াদে একটু ফাটল ধরেনি।

ভুবনমোহনের অবস্থা দেখে রোগীরা প্রমাদ গুনল। সর্বনাশ, স্বয়ং ধন্বন্তরি হাত গুটিয়ে থাকলে পৃথিবীতে মড়ক লাগবে যে। বাড়ি বাড়ি কান্নার রোল উঠবে।

গাঁয়ের দু'একজন মাতব্বর ধর্না দিল।

ভুবনমোহন কিন্তু অটল। হাত জোড় করে বলল, আমাকে মাপ করুন আপনারা। ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। উঠে দাঁড়াবার কোন জোর পাচ্ছি না। নিজের ওপরই বিশ্বাস হারিয়েছি, কাজেই আপনাদের চিকিৎসা করব কোন ভরসায়।

লোকেরাও ছাড়বে না। তা কি হয়। উঠে বসতে হবে ভুবনমোহনকে। এর চেয়ে কত শোক পায় মানুষ, কত বড় আঘাত। এই সব বিপদের মধ্য দিয়েই ত মানুষের পরীক্ষা মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। পুরুষ-মানুষের এত অল্পে কাহিল হলে কি চলে।

দু'একজন মোহমুদগর আওড়াল, কেউ কেউ গীতার মোক্ষম অংশ।

একটু বুঝি টলল ভুবনমোহন। কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, আমি দিনকতকের জন্য বাইরে যেতে চাই। তীর্থে তীর্থে ঘুরে যদি মনটা ঠিক করতে পারি। গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন।

দিনকয়েক নয়, ভুবনমোহন ফিরল মাসদুয়েক পর। গোঁফদাড়ির চিহ্ন নেই, বপু কিঞ্চিৎ স্ফীত, মুখে সলজ্জ হাসি। পেছনে অবগুণ্ঠনবতী তরুণী।

দ্বিতীয় পক্ষের মেয়েটি পিসির কাছে ছিল। খবর পেয়ে পিসি এসে দাঁড়াল মেয়ে কোলে নিয়ে।

নতুন বৌ মালতী। ঘোমটা টেনে এগিয়ে গিয়ে পিসিকে প্রণাম করেই ছোট মেয়েটাকে কোলে তুলে নিল।

পড়শীরা অবাক। পাড়ার দু'একজন জিজ্ঞাসাও করে ফেলল।

ডিসপেনসারির টেবিল-চেয়ার মুছতে মুছতে ভুবনমোহন মুখে অমায়িক হাসি ফোটাল।

মিছেই আমরা লাফালাফি করে মরি। আমরা কেউ নই ভাই, অন্তরাল থেকে আর-একজন সুতো টেনে চলেছেন। তিনি নাচাচ্ছেন, আমরা নাচছি।

অবশ্য এই নাচানাচির ব্যাপারটা ভুবনমোহন এক সময়ে পরিষ্কার করেও বলল।

প্রয়াগ ছাড়বার মুখে। সাত কুলে কেউ কোথাও নেই। বুড়ো রুগ্ন বাপ সম্বল। তাকে নিয়েই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলাপ ধর্মশালায়। বাপ হাঁপানিতে কাত।

মালতী ভুবনমোহনের কামরায় ঢুকেছিল সাহায্যের আশায়। বিদেশ, বিভূঁই, একলা মেয়েছেলে। যদি দয়া করে একটা ডাক্তার ডেকে দেয় ভুবনমোহন।

ওষুধের বাক্সটা ভুবনমোহনের কাছেই ছিল। নিজের যদি চিকিৎসার দরকার হয়, সেই ভেবেই সঙ্গে নিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই মালতীর বাপ অনেকটা সামলে নিল। আলাপ পবিচয় ত হলই, সেই সঙ্গে বিগত জীবনের টুকরো টুকরো কথারও লেনদেন।

তীর্থ ভ্রমণে বাপ আর মেয়ের সঙ্গে ভুবনমোহনও জুটে গেল। মালতীর বাপের চিকিৎসার ভার নিল ভুবনমোহন, আর ভুবনমোহনের দেখাশোনার ভার নিল মালতী। মালতীব বাপের শরীর খুব না সারলেও যত্ন-আত্তিতে ভুবনমোহনের চেহারা ফিরে গেল। দাড়িগোঁফেব ঝোপ নির্মূল হল। ময়লা কাপড়চোপড়ের বদলে ফর্সা পরিচ্ছদ অঙ্গে উঠল। মুখে বিষাদের আমেজ কেটে গিয়ে হাসির আভাস।

বিয়ের কথাটা মালতীর বাপ পাড়ল বৃন্দাবনে। ভুবনমোহনের অবস্থা তখন ভিজে ভিজে। যত্ন তোয়াজে কাদাকাদা ভাব। জোর গলায় আপত্তি করতে পারল না। কেবল নিজের বয়সের উল্লেখ করে মৃদু প্রতিবাদ করল।

আপত্তি টিকল না। মালতীব বাপ উমা-মহেশ্বরের বয়সের ব্যবধানেব নজির বাতলে ভুবনমোহনকে আর হ্যাঁ করতে দিল না। বিয়ে হয়ে গেল।

আমিও ভাবলাম পিসিরও বযস হয়েছে, মেয়েটাকে দেখবার একটা লোকও ত দরকার, তাই—

কোন রকমে ঢোঁক গিলে, ভুবনমোহন কথাটা শেষ করল।

ভুবনমোহনের হালচাল বদলাল। এমনিতেই মাথায় চুল কম। পসারের সঙ্গে সঙ্গে টাকেরও পসার, কিন্তু পাড়ার নাপিত গদাধরকে ডেকে বিরল কেশের যত্ন নিতে শুরু করল। রোগীরা ওষুধের মৃদু গন্ধ ছাড়া আরও একটা গন্ধ পেতে লাগল। আতরেব গন্ধ।

পথে-ঘাটে ভুবনমোহন ধরাও পড়ে গেল। হাট-ফেরত একেবারে লোকের মুখোমুখি।

হাটে এসেছিলেন বুঝি? হাতে কী ওটা? কী কিনলেন?

বিব্রত ভুবনমোহন হাতের মোড়কটা পিছনে সরাতে সরাতে বলে, ও একটা ইয়ে।

লোকেরাও নাছোড়বান্দা। বলতেই হয় ভুবনমোহনকে। রঙিন তাঁতের শাড়ি। ব্লাউজের ছিটও খানিকটে।

শুধু শাড়ি নয়, মাঝে মাঝে বিপিনের দোকান থেকে স্নো, পাউডার, কাঁচের চুড়িও কেনে ভুবনমোহন।

বন্ধুবান্ধব দু'একজন হালকা ঠাট্টাও করে।

এও একটা রোগ ভুবন। ক্যালেণ্ডুলা থার্টি কিংবা ইপিকাক খেয়ে একবার দেখ না।

বেশির ভাগ লোকে অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। নতুন আর কী করছে ভুবনমোহন। বৃদ্ধস্য না হোক প্রৌঢ়স্য তরুণী ভার্যা হলে এই রকমই হয়।

রোগীরা কিন্তু মুশকিলে পড়ল।

আগে ভুবনমোহনের কোন গোলমাল ছিল না। দিনে রাতে যখন রোগী এসে দাঁড়িয়েছে, ভুবনমোহন এক পায়ে খাড়া। শুধু হাতের মুঠোয় দর্শনী পেলেই হল। বাক্স বগলদাবা করে, স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ত। আজকাল কিন্তু সন্ধ্যার পরে তাকে বাড়ির বার করাই মুশকিল। নানা ওজর আপত্তি তুলে পাশ কাটাবার চেষ্টা। রাত্রে

ভাল চোখে দেখতে পাই না, কিংবা বাড়িতে ওর শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। আর একেবারে পা জড়িয়ে ধরলে সাকরেদ বিশ্বনাথকে এগিয়ে দিয়েছে।

বেশ, বিশুই না হয় যাচ্ছে। ও দেখে আসুক, দরকার হলে কাল সকালে আমি না হয় যাব।

বিশ্বনাথ পাড়ার ছেলে। বি-এ পর্যন্ত পড়েছে, তারপর বছর চারেক অফিসের চৌকাটে মাথা ঠুকে ঠুকে ক্লান্ত হয়ে ভুবনমোহনের কাছে এসে দাঁড়াল।

শুধু পাড়ার ছেলেই নয়, দূর সম্পর্কে লতায় পাতায় কী একটা আত্মীয়তাও ছিল।

প্রথমে ভুবনমোহন তেমন গা করেনি। এ-সব ছেলের মতিগতি তার খুব জানা। এখন চাকরি জুটছে না, তাই হোমিওপ্যাথি করার শখ হয়েছে। আবার কোথাও চাকরির সন্ধান পেলেই সব ছেড়ে ছুটবে। তা ছাড়া হোমিওপ্যাথি শেখা এ-সব চঞ্চলমতি ছেলেছোকরার কাজ নয়। শুধু পড়াশোনাই নয়, রোগীর আকৃতি প্রকৃতি ভাল করে বোঝা চাই। শুধু রোগের নয়, রোগীরও ইতিহাস। সিরিঞ্জে লাল-নীল রং নিয়ে শরীরে ফুঁড়লেই হয় না।

বিশ্বনাথ কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড করল। তাক থেকে ধুলো ঝেড়ে মোটা মোটা বই পেড়ে নিয়ে পড়তে বসে গেল। প্রায় খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে কোথা থেকে হোমিওপ্যাথির আনকোরা পত্রিকা জোটাল। নতুন নতুন কেসের বিবরণ, পুরোনো ওষুধের বিস্ময়কর আরোগ্যের কাহিনী। এ-নিয়ে সময়-অসময়ে আলোচনাও চালাল ভুবনমোহনের সঙ্গে।

প্রথম দিকে বিশ্বনাথ শুধু কম্পাউন্ডার। বুড়ো দীননাথ মারা যেতে তার জায়গায় বহাল হল। তারপর ছোট ছোট কেসে ভুবনমোহন তাকে পাঠাতে লাগল। চিকিৎসা বিশ্বনাথ ভালই করত, কিন্তু রোগীর আত্মীয়রা তেমন সন্তুষ্ট নয়। একটি চুল পাকেনি মাথার, চামড়া কোঁচকায়নি, এত ছোকরা ডাক্তারে কখন অসুখ সারে। যমদূতকে আটকাতে হলে বয়সের ওজন চাই, আর চাই ভারিক্কী চেহারা। টানাটানি করে যাতে রোগীকে ছিনিয়ে আনতে পারে কালের কবল থেকে।

ক্রমে ক্রমে রোগীর আত্মীয়রাও মেনে নিল, কিন্তু বেঁকে দাঁড়াল মালতী।

কী ব্যাপার বল দেখি তোমার? নিজের কবর যে নিজে খুঁড়ছ।

সর্বনাশ, ভুবনমোহন চোখমুখে একটা আতঙ্কের ভাব ফুটিয়েছে, আমাকে কি তুমি মকবুল আমেদ পেয়েছ নাকি। কবর খুঁড়ব কিসের জন্য।

রসিকতা রাখ মালতী মুখঝামটা দিয়েছে, নিজের রোগী এমন করে পরের মুঠোয় তুলে দেয় কেউ। এমনিতেই আজকাল সদরে হাসপাতাল হয়ে অবধি রোগীর ভিড় বেশ কম। তারপর দেখবে রোগীগুলোকে হাত ধরে তোমার নাকের সামনে বিশ্বনাথ আর একটা ডাক্তারখানা খুলে বসবে।

ভুবনমোহন মালতীর কাছে সরে এসে থুতনি ধরে একটু আদরের চেষ্টা করল। মুচকি হেসে বলল, কী যে বল গিন্নী, তেমন জাঁদরেল রোগীদের বাড়ি কি আর পাঠাই। ছুট্‌কো-ছাট্‌কা রোগী, পয়সার জোর নেই, বিনা ভিজিটে ডাক্তার খোঁজে, সেখানেই দেখিয়ে দিই বিশ্বনাথকে। ছোকরা এমনিতে ভাল। শেখবার চেষ্টা আছে, কিন্তু শুধু কি আব বই-পড়া বিদ্যেয় ডাক্তারি করা চলে, বিশেষ করে হোমিওপ্যাথি। হুঁ-হুঁ, রোগীর নিশ্বাস নেবার ধরন দেখে ঠিক বুঝতে পারি এ কীসের কেস। এ সব শিখতে, বিশ্বনাথের এক জন্ম।

কথা বাড়ায় না মালতী। কেমন গোঁজ হয়ে থাকে। প্রয়োজনে দু-একটা কথা বিশ্বনাথের সঙ্গে বলতে হয়, কিন্তু কেমন আড়ো-আড়ো ভাব। খিঁচিয়ে ছাড়া মিষ্টি কথা

মালতীর মুখ দিয়ে বার হয় না। বিশ্বনাথও কাঁচুমাচু। পারতপক্ষে মালতীর ছায়া মাড়ায় না।

রাত্রির কলে ভিজিট বেশী। ভুবনমোহন ইদানীং রাত্রির ডাকে বেরোয় না বাড়ি থেকে। বিশ্বনাথকে ঠেকিয়ে দেয়।

এ-নিয়েও মালতীর অভিযোগের অন্ত নেই।

এই ত কাছেপিঠে রাজপুর। কতক্ষণেরই বা মামলা। গেলে না যে বড়।

প্রথম প্রথম ভুবনমোহন অন্য কথা বলত। এ-সব ছোটখাটো কেস আর হাতে নেব না। তা ছাড়া সারা রাত জাগিয়ে রাখবে। রোগী চোখ না খুললে ডাক্তারকেও চোখ বুজতে দেবে না। ভারী হাঙ্গামা।

কিন্তু মালতীকে বোঝান অত সোজা নয়। ভ্রূ বাঁকা করে মালতী জিজ্ঞাসা করেছে, ও সব বাজে ওজর রাখ। আসল কথাটা কী বল ত?

একটু ইতস্তত করে ভুবনমোহন আসল কথাটাই বলেছে, কথাটা কী জান গিন্নী, রাত্রে তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। দিনের বেলা কোনরকমে কাটাতে পারি, কিন্তু রাত্রে তোমাকে ছেড়ে থাকবার কথা মনে হলেই কেমন বুক ধড়ফড় করে।

মুখ-চোখেব অপূর্ব ভঙ্গী করে মালতী সরে গিয়েছে সেখান থেকে। আঁচল চাপা দিয়েও হাসি লুকোতে পারেনি। কেবল বলেছে ঢং।

সেদিন বিকেল হতেই ভুবনমোহনের দরজায় লোক এসে দাঁড়াল।

কুমিরখালির মেজবাবুর অবস্থা খারাপ। সকাল বেলা গড়গড়ায় টান দিতে দিতে হঠাৎ ছিটকে পড়লেন মাটিতে। মাঝখানে মিনিট পনেরোর জন্য একটু জ্ঞান ফিরেছিল, আবার একটানা বেহুঁশ। সঙ্গে পাল্কি আছে। ডাক্তারবাবুকে এখনি রওনা হতে হবে।

ভুবনমোহন চোখে অন্ধকার দেখল। এখন কুমিরখালি যেতে হলেই ত সর্বনাশ। মাঝপথে একটা খাল, সেটা পেরিয়ে আরও মাইল চারেক। মানে বিকেলে রওনা হলে রাত্রে ফিরে আসা সম্ভব নয়। একবার মনে ভাবল বিশ্বনাথকেই পাঠিয়ে দেবে নিজের শরীর খারাপের অজুহাতে, কিন্তু সাহস হল না। কুমিরখালির বাবুদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। লাঠিয়ালের বংশ। লাঠির জোরে জমিদারের পত্তন করেছিল। তাছাড়া অসুখে-বিসুখে বারকয়েক ভুবনমোহন গিয়েছিল। মোটা দর্শনী আর যত্ন-আত্তির পরিসীমা নেই।

মালতীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে দুর্গানাম স্মরণ করে ভুবন- মোহন রওনা হয়ে পড়ল। মন ভার, মেজাজও তিরিক্ষে। মালতী আসার পর বাইরে বিশেষ রাত কাটাতে হয়নি।

ভুবনমোহনের ভাগ্য ভাল। হারানগঞ্জের মাঝামাঝি গিয়েই খবর মিলল। জনকয়েক পাইক রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছিল, পাল্কি আটক করল।

আর যাবার দরকার নেই! মেজকর্তা অনেকটা ভাল। তাঁর ছেলে খবর পেয়ে শহর থেকে সাহেব ডাক্তার নিয়ে এসেছে, সেজন্যই তারা ছুটতে ছুটতে আসছে। কষ্ট করে ডাক্তারবাবুকে মিছিমিছি আর এতটা পথ যেতে হবে না।

লোক ভাল। শুধু খবরই পাঠায়নি, পাইকের হাতে মোটা দর্শনীও পাঠিয়েছে।

ভুবনমোহনের ইচ্ছা হল পাল্কি থেকে নেমে একটু নেচে নেয়। পয়মন্ত বৌ বটে মালতী। রোগীকে ছুঁতে হল না, বাইরে রাত কাটাতে হল না, অথচ পুরো টাকা পকেটে এল।

পালকি ফিরল। বাড়ির কাছ বরাবর এসে মতলবটা ভুবনমোহনের মাথায় এল। ঠিক

আছে। মালতীকে অবাক করে দিতে হবে। বেহারাদের বলে পালকি নামাল। কাছাকাছি একটা রোগী আছে, তাকে দেখে বাড়ি যাবে। পালকির দরকার নেই। পালকি ফিরে যাক। কুমিরখালির বাবুদের হাজার নমস্কার।

পেটকাপড়ে টাকা ক'টা বেঁধে ভুবনমোহন বাড়ির দিকে রওনা হল।

এ-দিকটা অন্ধকার। খিড়কীর দরজা খোলা। ঝি বোধহয় বাসন নিয়ে পুকুরঘাটে গিয়েছে। পা টিপে টিপে ভুবনমোহন উপরে উঠে এল।

কেউ কোথাও নেই। চুপি চুপি ভুবনমোহন শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। আলমারির উপর ওষুধের বাক্স রেখে সাবধানে জামা ছেড়ে সোজা বিছানায় শুয়ে পড়ল।

মেয়েটা পাশের ছোট খাটে শোয়। মালতী পান খেয়ে রান্নাঘর তদারক করে তবে শুতে আসবে। হঠাৎ চুড়ির শব্দ হতেই ভুবনমোহন আপাদমস্তক চাদর চাপা দিল। আজ মালতী একটু তাড়াতাড়িই শুতে আসছে। বোধহয় বাড়ির কর্তা নেই বলেই।

ভুবনমোহন নিশ্বাস রোধ করে শুয়ে রইল। আওয়াজে বুঝল মালতী চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কখন চোখে ধুলো দিয়ে ওপরে উঠে এসেছ বল ত? মালতীর মিহি গলা শোনা গেল।

ভুবনমোহন অবাক। অন্ধকারে পা টিপে টিপে এসে কোনও লাভ হল না। মালতীর নজর চারদিকে। চৌকস মেয়ে।

তবু ভুবনমোহন কোন উত্তর দিল না। দেখাই যাক না কী করে মালতী।

মালতী বাইরের কমান হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিয়ে খাটের বাজু ধরে দাঁড়াল। মশলা দেওয়া পানের মিষ্টি গন্ধ, চুলের সুবাস, তা ছাড়াও মালতীর সান্নিধ্যের একটা মৃদু গন্ধ ভুবনমোহনের নাকে এল।

থোক টাকা কটা মালতীর হাতে তুলে দেবার সময়ে আনন্দে মুখচোখের চেহারা কেমন হবে, ভাবতে ভাবতেই ভুবনমোহন চমকে উঠল।

ঝুঁকে পড়ে মালতী মোলায়েম গলায় বলল, জান বিশুদা, বুড়ো যেন মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। আবার সোহাগ জানানোর কী ঢং, আমায় ছেড়ে থাকতে ওঁর নাকি কষ্ট হয়। মরণ আর কি!

কথা শেষ হবার আগেই খিলখিল করে মালতী হেসে উঠল। বাঁধভাঙ্গা স্রোতের উচ্ছ্বাস সেই হাসিতে।



যযাতি

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

শনিবার বিকেলে কোর্ট থেকে সকাল সকালই ফিরে এলেন পঞ্চানন দত্ত। চাকর গোবিন্দ এসে দোর খুলে দিল। পঞ্চানন বললেন, 'তোর মা কইরে।'

'মা উনুনে আঁচ দিচ্ছেন বাবু।'

'কেবল উনুন আর উনুন, রান্নাঘর আর রান্নাঘর। সংসারে আর কিছু চিনল না। তুই কী করছিলি। হাত পা গুটিয়ে তুই কি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়েছিস। সময়মত আঁচটাও দিতে পারিস নে?'

গোবিন্দ বলল, 'পারব না কেন বাবু। আমার কাজ যে মার পছন্দ হয় না।'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'হতভাগা, যা এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয় চট করে।'

গোবিন্দ বেরিয়ে গেল। পনের মিনিটের মধ্যে ও আর ফিরবে না। আর যদি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে আধঘণ্টাও কাটিয়ে দিয়ে আসতে পারে।

ভিতরে ঢুকবার আগে ছোট চিঠির বাক্সটা একবার খুলে দেখলেন পঞ্চাননবাবু। ইলেকট্রিকের বিল, প্রিমিয়ামের নোটিশ, একখানা মাত্র চিঠি আছে পুত্রবধূ অর্চনা দত্তের নামে। পঞ্চাননবাবু একটু হাসলেন। নীলাভ রঙের খাম। ওজনে বেশ ভারি। না, বেয়ারিং হয়নি। ডাকটিকেট হিসেব করেই আঁটা আছে। বাবাজীর মূলে ভুল নেই।

চিঠিগুলি হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পঞ্চাননবাবু উদাত্তকণ্ঠে ডাক দিলেন, 'বাসন্তী, বাসন্তী।'

ছাইমাখা হাতে মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে একটি প্রৌঢ়া স্থূলাঙ্গী মহিলা স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'ছি-ছি-ছি! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'তাতে কী হয়েছে। আমি তো আর বে-আইনী কিছু করি নি। নিজের স্ত্রীর নাম ধরেই ডেকেছি। এর মধ্যে পরস্ত্রীর নামগন্ধও নেই।'

বাসন্তী বললেন, 'কী যে বল, কেউ যদি শুনতে পায়।'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'কে শুনবে বল। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি, ছেলের বউ বাপের বাড়ি, ছেলে দামোদর ভ্যালির বাঁধ বাঁধতে ব্যস্ত। চাকরটাকে সিগারেটের অছিলায় বাইরে পাঠিয়েছি। এখন চেঁচিয়ে ডাকা, আর কানে কানে ডাকা সমান। আমরা দুজন আর ঘরের চার দেওয়াল ছাড়া আর কেউ নেই। আমরা কী বলছি না বলছি, কে শুনবে। আমরা কী করছি না করছি, কে দেখবে।'

পঞ্চাননবাবু স্ত্রীর দিকে একটু এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাসন্তী সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলেন।

'ছি-ছি-ছি, তোমার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে। খোলা বারান্দা, সামনের ফ্ল্যাট থেকে সব দেখা যায়।'

পঞ্চাননবাবু হেসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। কেউ দেখলে লজ্জায় তাঁকে জিভ কাটতে

হবে কি চোখ বুজে আঁধারের কালো পর্দা টেনে দিতে হবে এমন কাণ্ড অবশ্যই তিনি করতেন না। শুধু স্ত্রীকে একটু ভয় দেখালেন। আদর না, আদরের ভয়, আদরের ভান। চিঠিগুলি টেবিলের ওপর রেখে কোর্টের ধরাচুড়া খুলতে লাগলেন পঞ্চাননবাবু।

এই ষাট বছর বয়সেও তিনি যতখানি সজীব আর সচল বাসন্তী তা নেই। বাসন্তী যেন অনেক আগেই বুড়িয়ে গেছে। কুড়িতে না হলেও চল্লিশে তো বটেই। চল্লিশের পর থেকে বাসন্তী শুধু গৃহিণী আর সচিব। সখী নয়। ললিতকলায় শিষ্যত্ব গ্রহণেরও কোন আগ্রহ নেই। ওর একমাত্র শিল্প গৃহশিল্প। একমাত্র বিজ্ঞান গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। তাতে অবশ্য দুঃখ নেই পঞ্চাননের। বাসন্তীর মত স্ত্রী হয় না। আজই না হয় তিনি সচ্ছল অবস্থায় এসেছেন। কিন্তু প্রথম যৌবনে, মধ্য যৌবনে অনেক দুঃখ দুর্দিনের সঙ্গে যখন যুঝতে হয়েছে বাসন্তী ছিল সেই দুঃসাধ্য সাধনের সঙ্গিনী। প্রতিবাদ করে নি, অভিযোগ করেনি, পরম ধৈর্য নিয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে তুলেছে। স্ত্রীর ওপর খুবই কৃতজ্ঞ পঞ্চাননবাবু। আরও পাঁচজন বন্ধুর বিশেষ করে একালের ছেলেদের অশান্ত জটিল দাম্পত্য জীবনের কথা তাঁর অজানা নেই। কত বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা তিনি নিজের হাতেই করেছেন। অসুখী স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে বিচ্ছিন্ন হবার যুক্তিপাল বিস্তার করেছেন হাকিমের কাছে। কিন্তু নিজের দাম্পত্য জীবনের ধারায় কোনদিন ছেদ পড়েনি, বড় রকমের কোন ঝগড়াঝাঁটি পর্যন্ত হয়নি কোনদিন।

বাসন্তী এবার হাতটাত ধুয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'কী ভাবছ?'

পঞ্চানন বললেন, 'তোমার কথা।'

বাসন্তী বললেন, 'আহাহা, যত মন রাখা কথা তোমার। আমার কথা ভাবতে যাবে কেন। আমি তো তোমার সামনেই আছি। নিশ্চয়ই মক্কেলদের কথা ভাবছিলে।'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'না গো না। মক্কেল আর এখন আমার মাথায় নেই। কাল কিসের তারিখ বল তো? মনে আছে না ভুলে গেছ?'

বাসন্তী হেসে বললেন, 'ভুলে যাব কেন, ঠিকই মনে আছে। বিয়ের তারিখ।'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, কাল বিয়ে। আজ অধিবাস। কালকের দিনটা কী ভাবে কাটানো যাবে বল তো।'

বাসন্তী বললেন, 'কী ভাবে আর কাটানো যাবে। জামাই মেয়েদের বলেছি ওরা আসবে। বালিগঞ্জ থেকে অর্চনাকেও আনিয়ে দেব। ওর বাবা-মাকেও বলেছি, বুঝলে? নতুন কুটুম্ব। মাঝে মাঝে বলতে হয়।'

পঞ্চাননবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বেশ করেছ। মানে আবার একটি হাট মেলাবে।'

বাসন্তী বললেন, 'ও-মা, ও আবার কী কথা। হাট মিললে তো ভালোই। তোমার চাঁদের হাট। ওরা কেউ না থাকলে ঘরগুলি যে খাঁ-খাঁ করে, তাই না?'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'হুঁ।'

স্ত্রীর ব্যবস্থায় তাঁর মন খুব প্রসন্ন হল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল এই উপলক্ষে তরুণ-তরুণীর মত শুধু দুজনে কোথায় বেরোবেন, লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াবেন, অবশ্য পায়ে হেঁটে না, বাসে ট্রামেই, কি একটা ট্যাক্সিও ইচ্ছে করলে নিতে পারেন। তারপর হয় তো কোন মিষ্টির দোকানে গিয়ে খাবেন, পঞ্চাননবাবু মাংসের চেয়ে মিষ্টিই ভালোবাসেন। তারপর যদি ইচ্ছে হয় কোন একটা থিয়েটার কি সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরবেন। একদিন

জন্য স্ত্রী হবে বান্ধবী, তাঁর তো আলাদা কোন বান্ধবী নেই, আজকালকার ছেলেদের যেমন থাকে।

একটি দিন নতুন স্বাদে ভরে উঠবে।

কিন্তু 'Man proposes woman disposes' : বাসন্তী দিনটিকে পুরোপুরি একটি সামাজিক দিন হিসাবেই বেছে নিয়েছে। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ তো অন্য কোন উপলক্ষেও চলত, চলেও।

বাসন্তী বললেন, 'তাই বলে আমাদের বিয়ের তারিখের কথা যেন বেয়াই বেয়ানকে বোলো না। মেয়েরা জানসে জানুক। কিন্তু বাইরের আর কেউ যেন না জানতে পারেন। আমার ভারি লজ্জা করে।'

গোবিন্দ সিগারেট নিয়ে এসে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। চা আর খাবার খেয়ে পঞ্চাননবাবু বললেন, 'কাল তো আর বেরোনো হবে না, চল আজই বেরোই। চল, তোমার জন্যে একখানা শাড়ি কিনে নিয়ে আসি।'

বাসন্তী হেসে বললেন, 'শাড়ি আমার আছে। তার জন্যে এখনই বাইরে বেরোবার দরকার নেই।'

পঞ্চানন বললেন, 'তাহলে কি চাই বল। আংটি না হার?'

বাসন্তী বললেন, 'ওগো, না গো না। তুমি আমাকে সব দিয়েছ। মেয়েদের ছাড়া যদি মার্কেটিং করি, ওরা আমাকে রক্ষে রাখবে না। যা করতে হয় কাল করা যাবে।'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। চল, এমনিই না হয় একটু ঘুরে আসি।'

বাসন্তী একটু যেন আতঙ্কের সুরে বললেন, 'এই শীতের মধ্যে বেরোবে? কদিন ধরে বাতটা বড় কষ্ট দিচ্ছে। শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। আচ্ছা চল।'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'তাহলে থাক।'

'থাকবে কেন, চল।'

'আমি এত অবিবেচক নই, তোমার কষ্ট হবে তবু তোমাকে টেনে নিয়ে যাব? তার চেয়ে এসো বসে বসে গল্প করি।' বাসন্তী খুশি হয়ে বললেন, 'সেই ভালো।'

তিনি স্বামীর পাশে ঘেঁষে বসলেন।

পঞ্চানন বললেন, 'তুমি নাম ধরে ডাকাডাকির কথা বলছিলে, জানো আজকাল স্বামী তো সবাইর সামনে স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকেই, স্ত্রীও ডাকে।'

বাসন্তী হেসে বললেন, 'তোমার মেয়েরাই তো ডাকে। অবশ্য আমাদের সামনে না, আড়ালে। তবু অতটা বাড়াবাড়ি আমার পছন্দ নয়। ভালোবেসে বিয়ে করলেই বা কি। নাম ছাড়া কি ডাকা যায় না?'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'কেন, নাম ধরে ডাকাই তো ভালো। তুমিও ডাক না আমার নাম ধরে।'

বাসন্তী কিশোরীর মত লজ্জায় আরক্ত হয়ে বললেন, 'না বাপু। আমি তা পারব না। এ জন্মে আর হবে না, পরজন্মে এসে ডাকব।'

পঞ্চানন স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'উঁহু, এই জন্মেই ডাকতে হবে। আজ তুমি আমার কোন অনুরোধই রাখবে না, তা হতে পারে না। নাম ধরতে তো আর বাতে আটকায় না।'

বাসন্তী বললেন, 'ছাড়ো ছাড়ো, গোবিন্দ এসে পড়বে। বলছি ডাকব, কথা দিচ্ছি

ডাকব। কিন্তু আমারও একটি সর্ত আছে।'

'কী সর্ত?'

'তুমি আগের মত সুন্দর করে আমাকে একখানা চিঠি লিখবে। সেই তখনকার মত, সেদিনকার ভাষায়। জানো, লক্ষ্মীছাড়া চোর সেবার আমার সবগুলি চিঠিসুদ্ধু ট্রাঙ্কটা চুরি করে নিয়ে গেল। একটা চিঠিও আমার নেই। দেবে আমাকে একটা চিঠি? আজই লিখে দাও।'

পঞ্চাননবাবু বললেন, 'দেব।'

বাসন্তী বললেন, 'এখনকার বুড়ো-বুড়ির চিঠি না। কোন সংসারী কথা তাতে থাকবে না। শুধু—বুঝেছ?'

পঞ্চাননবাবু হেসে বললেন, 'বুঝেছি। তুমি জবাব দেবে?'

'নিশ্চয়ই দেব।'

'তাহলে বায়নাটা আগে দিয়ে যাও। যাতে লিখতে বসতে পারি।'

বাসন্তী স্বামীব কানের কাছে মুখ নিয়ে অস্ফুটস্বরে নামটা উচ্চারণ করে হেসে ফেললেন, তাবপব লজ্জায় পালিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কোথায় বাত, কোথায় স্থূলত্ব। সেই ষোড়শী তন্বী যেন ফিবে এসেছেন।

এবার পঞ্চাননের পালা। দোর ভেজিয়ে দিয়ে তিনি চিঠি লিখতে বসলেন।

কিন্তু মহামুশকিল। কিছুতেই পছন্দমত সম্বোধনটা আসে না। আর ভাষা তো নেই-ই। একটু নরম করে লিখতে গেলে নিজেরই হাসি পায়। প্রবীণ আক্কেল বুদ্ধি যেন হাত বাড়িয়ে তাঁকে চড় মারে।

অনেকদিন ব্যক্তিগত কোন চিঠিপত্র লেখেননি পঞ্চানন। যা লিখেছেন সব ইংরেজীতে, যা লিখেছেন সব উকিলের চিঠি। ছেলে-মেয়েদের কাছে তাঁর হয়ে তাঁর জবানীতে তাদের মা-ই চিঠি লিখেছে। স্ত্রীর কাছে চিঠি লেখার উপলক্ষ হয়নি আজ বিশ বছর।

মহা বিপদেই পড়লেন পঞ্চানন। পুরো একটা প্যাড ছিঁড়ে ছিঁড়ে স্তূপাকার করলেন। তাঁর ব্যর্থ চেষ্টা ঘর ভরে ছড়াতে লাগল। তিনি কি শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে তারুণ্যের প্রতিযোগিতায় হেরে যাবেন? তা-তো কিছুতেই হতে পারে না।

অসহায়ভাবে উপায় খুঁজতে লাগলেন পঞ্চানন। ঘরভরা সব আইনের বই দর্শনের বই। ধারেকাছে কোন নাটক নভেল চোখে পড়ল না।

হঠাৎ টেবিলের ওপর চোখ পড়ল পঞ্চাননের। দুটি চোখ অপলক হয়ে রইলো।

একটু ইতস্তত করলেন। তারপর উঠে গিয়ে খিল দিলেন দরজায়, দেরাজ টেনে বের করলেন পেনসিলকাটা ছুরিখানা। তারপর কম্পিত হাতে নীলাভ রঙের পুরু খামটি নিজের দিকে টেনে নিলেন।



একটি কৌতুকনাট্য

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তিন মেয়ের পর আমার মামাতো ভাই টোকনদার প্রথম পুত্রলাভ ঘটেছে। তারই অন্নপ্রাশনে আমাকে যেতে হয়েছিল।

উৎসবের পালা মিটে গেলেও দিন তিনেক থেকে যেতে হল। আর বিশ্রী কাণ্ডটা ঘটল সেই সময়। মামা যে মোটা হারছড়া দিয়ে খোকাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, হঠাৎ সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিপর্যয় কাণ্ড শুরু হল বাড়িতে।

বৌদি বললেন, কাল সন্ধ্যেবেলাতেও খোকার গলায় হারটা ছিল। রাত্রে যখন খোকাকে তিনি দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়ান, তখন গলায় লাগছে দেখে খুলে রেখেছিলেন। কোথায় যে রেখেছিলেন এখন আর তা মনে করতে পারছেন না। হয়তো ড্রেসিং টেবিলের ওপরে, হয়তো তার টানার ভেতরে—কাজের ঝঞ্ঝাটে ভালো করে তাঁর খেয়ালও ছিল না।

কিন্তু কে নিয়েছে? কাকেই বা সন্দেহ করা? বাড়িভর্তি আত্মীয়স্বজন—অধিকাংশই বাইরে থেকে এসেছেন। কথাটা ছড়িয়ে পড়বামাত্র তাঁদের কারও কারও মুখে ছায়া নামল। চাকর কুড়ি বছরের, পুরোনো—ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, তুলে আনে—তাকে সন্দেহ করার কথা কল্পনা করা যায় না। কাজকর্ম উপলক্ষে কিছু লোক মজুর খেটেছে বটে, কিন্তু পরশু থেকে তাদেরও ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাহলে—

তাহলে ভেতব থেকেই কেউ নিয়েছে।

কাউকেই সন্দেহ করা যায় না অথচ কাউকে সন্দেহ না করেও উপায় নেই—এমনি একটা বিষাক্ত আবহাওয়ায় থমথম করতে লাগল বাড়িটা। যাঁরা কয়েকদিন আত্মীয়বাড়িতে কাটিয়ে যাবার কথা ভাবছিলেন—এঁদের কারো জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেল, কেউ বা হঠাৎ টের পেলেন তাঁর ছুটি ফুরিয়ে গেছে। এস ডি ও-র স্ত্রী ছোট মাসীমা স্পষ্টই বললেন—আমি বাপু কাল সকালের গাড়িতেই চলে যাব বহরমপুরে। আর যাবার আগে সকলের সামনে বাক্স বিছানা খুলে দেখিয়ে দিয়ে যাব।

সমস্ত দিন কাটল একটা কুৎসিত অস্বস্তির ভেতর। বাচ্চারা চেঁচামেচি করতে গিয়ে চড়-চাপড় খেলো, বড়রা সারাদিন গুম হয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত গুমোট কাটাবার জন্যে সন্ধ্যেবেলায় তিন-চারটি কিশোরী মেয়ে যখন হার্মোনিয়াম নিয়ে গানের আসর বসিয়েছে, সেই সময় ধরা পড়ল চোরটা।

ধরল আমার তিন নম্বর মামাতো ভাই পোকন। বার তিনেক আই এস-সি ফেল করে এখন সে শহরের ড্রামাটিক ক্লাব আর ফুটবল টিমের উৎসাহী সদস্য। মধ্যে মধ্যে স্বাধীন স্বাধীন ব্যবসার কথা ভাবছে। স্পোর্টসম্যান শৌখিন ছেলে— স্নানের সময় রোজ তার একখানা করে সাবান দরকার হয়।

প্রথম থেকে সে-ই বলেছিল, তোমরা যা-ই বলো বৌদি, এ বাইরের চোরের কীর্তি। খোলা জানলা দিয়ে আঁকশি বাড়িয়ে হার টেনে নিয়েছে।

—কিন্তু বাইরের জানলা তো আমি বন্ধ করে রাখি।

—গণ্ডগোলে ভুলে গিয়েছিলে। আমি বলছি, এ ছিঁচকে চোরের কাজ না হয়েই যায় না।

পোকনের কথা কেউ বিশ্বাস করেনি—কিন্তু প্রতিবাদ করা আরও বেশী বিপজ্জনক। তবু সকলের মন ঘুরে-ফিরে সেই তিন-চারটি আত্মীয়ের কথাই ভেবেছে—যাদের মেয়েদের হাতে কাচ আর ব্রোঞ্জের চুড়ি, যাদের বাচ্চাদের জামা-ফ্রক কলকাতার ফুটপাত থেকে কেনা, যাদের কর্তারা টিনের কৌটো থেকে বিড়ি বের করে ধরায়। পোকন যেন এক মুহূর্তে একটা বন্ধ জেলখানার দরজা খুলে দিলে।

—ধরেছি ব্যাটাকে। আজও সন্ধ্যের পর খিড়কির ওদিকে আস্তাকুঁড়ের আশপাশে ঘুরঘুর করছিল। বারে বারে ঘুঘু ধান খেয়ে পালাও—আজ—

কথাটা আর শেষ করল না। স্পোর্টসম্যানের হাতের ঘুষি পড়ল পেটে, লম্বা কালো লোকটা 'কঁক' করে একটা আওয়াজ তুলেই দু ভাঁজ হয়ে বসে পড়ল উঠোনে।

মাসীমা বললেন,—আহা-আহা—

—আহা—আহা? তিন ভরির হার, তুমি সিম্প্যাথি করছ?—পোকন একটা প্রকাণ্ড লাথি লাগালো লোকটার পিঠে : চেহারা দেখছ না? আসল জেলখানার আসামী।

চেহারা দেখে যদি চোর সাব্যস্ত করতে হয়—তা হলে লোকটাকে ফাঁসির আসামী বলে মনে করতেও দোষ নেই। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা, ভুষো কালির মতো মরা কালো রং, মাথায় পাকধরা ছাঁটা ছাঁটা চুল, বুকের পাঁজরা গোনা যায়, পরনে নেংটির মতো এক টুকরো কাপড় ছাড়া আর কোনও আবরণ নেই। দুটো সাদা চোখ যন্ত্রণায় কুঁচকে এসেছে, কদাকার মুখটা ফাঁক করে হাঁপাচ্ছে একটু-একটু।

কৌটা থেকে বিড়ি বের করেন, এমন একজন আত্মীয় এগিয়ে এলেন। লোকটার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিলেন একটা।

—এই, কী নাম তোর?

—কা-কালীচরণ।—লোকটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল : আমি কিছু করি নাই বাবু—আমারে ছাইড়্যা দেন।

—তবে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরছিলি কেন?

—অনেক কলাপাতা পইড়্যা আছে, খাওনের কিছু পাই নাকি খুঁজতে আছিলাম। পাকিস্তান থিকা আসছি—আমার কেউ নেই। আমি চোর না বাবু—মিথ্যা আমারে—

সারাদিনের অপমানের জ্বালাটা ফেটে পড়ল। আত্মীয়টা ঠাস করে চড় বসালেন একটা : চুপ কর হারামজাদা। বিপাকে পড়লে সবাই অমন পাকিস্তান কপচায়। বল্—হারছড়া কোথায় রেখেছিস?

আমি এতক্ষণ দর্শকের ভূমিকাতেই চুপ করে দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু মারধোরের ব্যাপারটা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। বললুম, মেরে আর কী হবে? তার চাইতে বরং থানায় দিন।

—থানায়?—পোকন তাচ্ছিল্যভরে বললে, ব্যাটা পাকা চোর—থানাতেও কি কবুল করবে নাকি? হার তো গেছেই সুকুমারদা—বরং যতটা পারা যায় হাতের সুখ করে নেওয়া যাক।

—হ্যাঁ, মারই হচ্ছে ওষুধ—আত্মীয়টি যোগান দিলেন।

তারপরে মিনিট কয়েক ধরে যা চলল তা অবর্ণনীয়। কলকাতার রাস্তায় পকেটমার ধরা পড়বার পর যা ঘটে থাকে, তা-ই চলতে লাগল লোকটার ওপর। আর তার সঙ্গে পোকনের হুঙ্কার : এখনও বল্, হার কোথায় বিক্রি করেছিস, নইলে খুন করে ফেলব!

আমি বারান্দার একটা থাম ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, মেয়েরা বাচ্চাদের টেনে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। টোকনদা বলতে লাগলেন, থাক্ থাক্—মরে যাবে—এই সময় সাইকেলের আওয়াজ পাওয়া গেল। মামা ডিস্‌পেন্সারিতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসেছেন।

—কী হয়েছে?

সমস্বরে উত্তর এল : চোরটা ধরা পড়েছে।

—ধরা পড়েছে? তাই নাকি?—সাইকেল রেখে মামা এগিয়ে এলেন : একি—এমনিভাবে মেরেছিস! মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে যে!

টোকনদা বললেন, তবু কবুল করছে না বাবা। পাকা চোর।

—নিশ্চয় পাকা চোর।—মামা একবার গোঁফজোড়ায় হাত বুলিয়ে নিলেন : তা ধরা পড়ল কী করে?

আবার সমস্বর উঠল আর পোকনই বুক ঠুকে এগিয়ে এল সামনে।

—আমি ধরেছি বাবা। সন্ধ্যের পর খিড়কির পেছনে ঘুর ঘুর করছিল। আমি একেবারে ক্যাঁক্ করে—

লোকটার রক্তমাখা মুখ থেকে আবার কান্নামেশানো জান্তব সুর বেরুল : আমি চোর না বাবু—প্যাটের জ্বালায় পাতা-কুড়ানি—

—শাট্ আপ!—পোকন আর একটা লাথি বসাতে যাচ্ছিল, মামা তাকে থামিয়ে দিলেন।

—খিদে পেয়েছে তো দরজায় এসে চাইলি না কেন? বাড়ির পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি কি জন্যে?

—চাইলে খ্যাদাইয়া দেয় বাবু। অনেক কলাপাতা পইড়া আছে দেখলাম—দোহাই বাবু, আমি চোর না—কিছু জানি না—খামাখা আমারে মাইরা—

মামা মোটা গলায় ধমক দিলেন : চোপ। হারটা নিয়ে কী করেছিস তাই বল্।

—কিসের হার বাবু? আমি কিছু জানি না।

পোকন আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, মামা হাত বাড়িয়ে তাকে ঠেকালেন। তারপর বললেন, আচ্ছা—হারের কথা পরে হবে। তোর খিদে পেয়েছে? খাবি কিছু?

—খাইতে চাই না বাবু। আমাকে ছাইড়া দেন।

—তা কি হয়?—মামার মুখে একটুকরো হাসি ফুটে উঠল : এতক্ষণ মার খেলি, এবার একটু মিষ্টি না খাইয়ে তোকে ছাড়ব কেন? যা তো পোকন—ভাঁড়ার থেকে সেরখানেক সন্দেশ নিয়ে আয়। ভাঁড়ারে না থাকে, দোকান থেকে আন।

—এক সের সন্দেশ!—যেন বাজ পড়ল। প্রায় চিৎকার করে উঠল পোকন : আপনি কী বলছেন বাবা! চোরকে একসের সন্দেশ খাওয়াবেন?

মামার মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। শক্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ, যা বলছি তাই করো। আর এক ঘটি জল আনো কেউ—লোকটা মুখটুখগুলো ধুয়ে ফেলুক।

গোঁজ হয়ে বেরিয়ে গেল পোকন। আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিড় বিড়

করে বলে গেল, বাবার মাথাই খারাপ হয়ে গেছে।

আসল নাটকটা জমল এর পরে।

চোরকে জামাই আদরে সন্দেশ খাওয়ানোর দৃশ্য দেখবার জন্য সারা বাড়ি ভেঙে পড়ল এবারে। একটা প্রকাণ্ড থালায় এক সের নয়—প্রায় দেড় সের সন্দেশ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকটা প্রথমে আপত্তি করেছিল, কিন্তু মামার একটা নিদারুণ ধমকে ধীরে ধীরে খেতে আরম্ভ করল।

প্রথমে আস্তে সুস্থে, তারপরে রাক্ষসের মতো। মনে হল, কতদিন সে খায়নি। ক্ষুধা আর লোভের এমন মূর্তি এর আগে আমি কোনদিন দেখিনি। তাকানো যায় না—সমস্ত শরীর শিউরে উঠতে থাকে। মুখের দু-কষে তখনও রক্ত লেগে আছে, কপালের ওপরটা ফুলে রয়েছে অনেকখানি— গায়ে জলকাদা, উঠোনের ল্যাম্পে ইলেকট্রিকের আলোয় নিজের চারপাশে একটা কদাকার ছায়া রচনা করে লোকটা গোগ্রাসে সন্দেশ গিলছে—সমস্ত ব্যাপারটা যেন অশ্লীল বীভৎসতা—যেন কল্পনাই করা যায় না!

সন্দেশের থালা শেষ করে লোকটা অবরুদ্ধ স্বরে বললে, বাবু, জল!

মামা লোকটার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। নিষ্ঠুর শীতল স্বরে বললেন, হারটা কোথায়?

—হার আমি জানি না বাবু। একটু জল দ্যান।

—বল্, হার কোথায়?

—হার নিই নাই বাবু।—লোকটা বোবা-ধরার মতো গলায় বললে, জল দ্যান বাবু। সন্দেশ বুকে আটকাইয়া গেছে—মইর‍্যা গেলাম—জল দ্যান।

—হার কোথায় আছে না বললে জল দেওয়া হবে না।

একসের সন্দেশের রহস্য বোঝা গেল এতক্ষণে। লোকটার সারা মুখে তখন মরণান্তিক যন্ত্রণা—সাদা সাদা চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করছে। এর চাইতে মারাত্মক শাস্তি পোকনও বোধ হয় ভাবতে পারত না।

বুকে হাত চেপে লোকটা ঝুঁকে পড়ল : বাবু—জল— মইরা গেলাম—জল—

আমি বললুম, মামা—দম আটকে মরে যাবে যে!

—না, মরবে না—মামা কঠোর গলায় বললেন, আমি ডাক্তার, আমি জানি। বল্ হার নিয়েছিস কিনা?

উদ্‌ভ্রান্ত পাগলের মতো তাকালো লোকটা। বললে, নিছি—নিছি—হার নিছি। এখন একটু জল দ্যান—

চারদিকে উল্লাসের ধ্বনি উঠল।

মামা গর্জন করলেন, চুপ—সব চুপ। বল্—হার কী করেছিস?

—বাজারে একজনরে বেইচ্যা দিছি। তারে চিনি না। একশো টাকা পাইছিলাম—হারাইয়া গেছে!—লোকটা গোঙানির মতো সুর তুলে বলে যেতে লাগল : হইল তো? এ্যাখন আমারে থানা পুলিস যেখানে খুশি দ্যান- -তার আগে এট্টু জল দ্যান।

জলের ঘটিটা মামাই এগিয়ে দিলেন। এক ঘটি জল শেষ করে ঝিম মেরে বসে রইল লোকটা।

মামা বললেন, বাড়ি কোথায়?

—বাড়ি নাই।

—তবে বেরো এখান থেকে। এখুনি।

শুধু পোকন নয়—সবাই কোলাহল করে উঠল একসঙ্গে : ছেড়ে দিচ্ছেন?

মামা বললেন, হ্যাঁ, ছেড়েই দিচ্ছি। এই—ওঠ্—বেরো—

লোকটা উঠল, মাতালের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। আর ক্ষুধার্ত বাঘের মতো চোখ দুটো জ্বলতে লাগল পোকনের। ক্রোধে, বিরক্তিতে।

—এটা কী করলেন বাবা? চোরটাকে এভাবে—

মামা স্থির দৃষ্টিতে পোকনের দিকে তাকালেন।

—কবুল করেছে, হারটা বাজারে যার কাছে বেচেছিল—সে আমার চেনা স্যাঁকরা—তারই গড়ানো—সে-ই আমাকে ডিস্‌পেন্সারিতে এটা দিয়ে গেছে। আর ওকে থানায় দিয়ে কী হবে পোকন?—মামা কোটের পকেট থেকে হাত বের করে মুঠো খুলে ধরলেন, সোনার হারটা ঝলমল করে উঠল।

মাথা নামিয়ে পোকন সরে গেল হঠাৎ—ভিড়ের মধ্যে আর তাকে চোখে পড়ল না।

মামা আমাকে ডাকলেন ছাতে। রাত এগারোটার সময়। রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, বিষণ্ণ চাঁদের আলো চোখে মুখে চিকচিক করছে তাঁর। এই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলুম, মামা অনেক—অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন।

গম্ভীর মৃদুস্বরে মামা বললেন, পোকন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। হারটা সে-ই বিক্রি করে এসেছিল। চেনা স্যাঁকরা আমাকে ডিস্‌পেন্সারিতে ফেরৎ দিয়ে গেল।

আমার মাথা ঘুরে গেল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। খোলা ছাত হলে আমি সোজা একতলায় পড়ে যেতুম।

—সত্যি বলছেন মামা?

—নিজের ছেলের নামে মিথ্যে কথা বলব সুকুমার?—মামার চোখের জল চিক-চিক করতে লাগল : পোকন একেবারে অধঃপাতে গেছে—ফ্ল্যাশ খেলে, মদও ধরেছে।

কিন্তু তার চাইতেও বড়ো বিস্ময়ের চাবুকে চমকে উঠলুম আমি।

—লোকটা যে নিজের মুখে কবুল করল মামা!

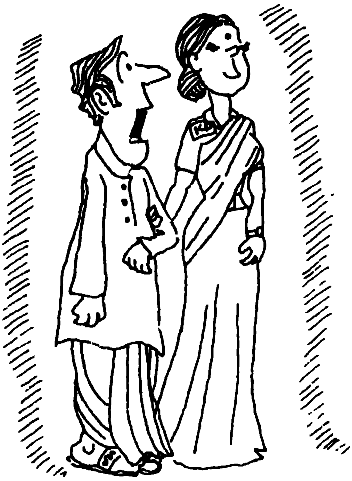
—যে দুদিন খেতে পায় না, তাকে এক থালা সন্দেশ খাইয়ে জল না দিলে চুরি তো চুরি—তিনটে খুনও সে কবুল করত সুকুমার।

—কিন্তু সব জেনেশুনে—

—বাড়িভর্তি আত্মীয়ের সামনে ঘরের কেলেঙ্কারি ফাঁস করব? এই তো ভালো হল সবচাইতে। অনেক মার খেয়েছে, পেট ভরে সন্দেশ খাইয়ে বিদেয় করে দিলুম। বলো, ভালো করিনি?

মামা বোধ হয় হাসতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু আওয়াজটা আমার কানে কান্নার মতোই ঠেকল।





মস্ত বাড়িটার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা ফেটে পড়ছিল। শুধু এই বাড়িতে কেন. আশপাশের বাড়িগুলোতেও।

ওই বড় বাড়ির দোরগোড়ায় দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। তার পিছনে কোমরে রিভলবার গোঁজা সার্জেন্ট। সামনের ঝকঝকে বড় গাড়িটা ডি-এম অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের। পরের গাড়িটা তার অনুচর এবং বডি-গার্ডদের। যে দিন-কাল পড়েছে, যথেষ্ট সতর্কতা ভিন্ন সরকারী শাসনযন্ত্রের প্রধানরা নড়া-চড়া করতে পারেন না। অথচ আসল জায়গায় এসে কিনা ওই ডি-এম সক্কলকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে খোদ গোলমেলে লোকটার সঙ্গেই একেবারে অন্দরমহলে চলে গেল।

এই বাড়িটাকে কেন্দ্র করে একটা বড় রকমের অশান্তির কারণ ঘটে গেছে শহরে। এর মালিক সোমেন কত নামী লোক। নামী বলতে পয়সা-অলা পদস্থ কেউ নয়। স্থানীয় শত শত তরুণের কাছে সে নায়কসদৃশ একজন। বয়েস মাত্র একত্রিশ এখন। বাংলাদেশের নামজাদা ফুটবল আর হকি প্লেয়ার ছিল। শুধু এই এক লোকের জন্য কলকাতার অনেক বড় বড় ক্লাবের হোমরা-চোমরারা এসে মফঃস্বল শহরের বাড়িতে ধর্না দিত। খেলার রাজ্যে এখনও সে একজন বিশিষ্ট পরামর্শদাতা।

কৃতিত্বের সঙ্গে এম-এ পাস করেছিল। এখানকার ছাত্র, তাই এখানকার কলেজে মাস্টারিও পেয়েছিল। সেই সরকারী চাকরি পাকা হবার আগেই সেটা গেছল। তার গায়ে কিছুটা রাজনীতির গন্ধ ছিল। চাকরি পাকা হবার আগে পুলিশের তৎপরতায় সেটা উৎকট হয়ে উঠল। চাকরি গেল। ফলে সোমেন কর প্রকাশ্যে এমন সব উক্তি করল আর

এমন দলের সঙ্গে গাঁট-ছড়া বাঁধল যে দু'দফায় প্রায় বছর দেড়েক জেল। ততদিনে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর সে বীতশ্রদ্ধ। আবার তার ঘোষণা শোনা গেল, এই সরকার অপদার্থ—যে যার নিজের বাগান করো, কেউ তোমাকে দেখবে না, কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না।

সেই থেকে নিজের বাগান করার দিকে মন দিয়েছে সোমেন কর। বাগান অর্থাৎ মস্ত পৈতৃক বাড়ির একতলাটায় টিউটোরিয়্যাল হোম বসিয়েছে। কলেজের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা। এটা ব্যবসা বটে, কিন্তু এ ব্যবসায় এতটুকু ফাঁকি ছিল না। তাই পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে টিউটোরিয়্যাল হোম জাঁকিয়ে উঠেছে।

এটাকে এখন ছোটখাট কলেজই বলা যেতে পারে একটা। তিন শিফট-এ কোচিং দেওয়া হয়। এখানকার এবং আশপাশ কলেজের নামী প্রোফেসাররা এখানকার শিক্ষক। এমন কি কলকাতা থেকে পর্যন্ত বে-সরকারী কলেজের কয়েকজন নামী প্রোফেসার ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে এখানে পড়াতে আসে।

প্রতি বছর য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষা হয়ে গেলে এই টিউটোরিয়াল হোমের ছেলেমেয়েদের ফল নিয়ে আলাদা করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সেটাও দেখার মতোই, তাই ছাত্রছাত্রীদের ভিড় এখানে লেগেই আছে।

মাথা পিছু চল্লিশ টাকা হিসেবে মাস গেলে তিনশ' ষাটটি ছেলেমেয়ের কাছ থেকে মাইনে সংগ্রহ হয় চোদ্দ হাজার চারশ টাকা। সোমেন কর নিজেও সকাল-বিকেল তিন শিফটে এই ক্লাস নেন। প্রোফেসরদের কারও পাঁচশ টাকার নীচে মাইনে নেই। সোমেন কর নিজে নেয় হাজার টাকা। তার অর্ধেক টাকা নিজের গড়া ছেলেদের ক্লাবে ঢালে। তাই আগের মতই ছেলেদের প্রিয় সে। যাবতীয় খরচখরচা বাদ দিয়েও মাসে তার বাড়তি থাকে তিন হাজার টাকার মতো। সেটা সে ব্যাঙ্কে সরিয়ে রাখে। তার সুদও ছোঁয় না। তার পরিকল্পনা, একদিন ভাইদের অংশও কিনে নিয়ে আর বাড়িটাকে সংসার করে তিনতলা তুলে সত্যিকারের একটা খুব ছোট আকারের ভালো কলেজ করবে।

বাড়ির লাগোয়া এক পুরনো পুলিশ অফিসারের বাস। যে দিন-কাল, পুরনো আমলের পুলিস অফিসারের চোখে কলেজের ছাত্র মাত্রই আধা-অপরাধী। সাহেবের এই কু-নজরের খবর তার বাড়ির প্রহরারত সিপাইরাও জানে। পাশের বাড়ির সামনে ছেলেদের জটলা দেখলে তারা মৃদু-গম্ভীর হুমকি ছাড়ে। সেদিন গালি-গালাজ করে বসল। ফলে বচসা। ক্রুদ্ধ সেপাই দুটো কয়েকটা ছেলের পিঠে ডাণ্ডা হাঁকিয়ে বসল। হৈ-চৈ, চেঁচামেচি—ওপর থেকে পুলিশ অফিসার নেমে এলো, এদিক থেকে সোমেন কর। সিপাইদের মিথ্যে অভিযোগ শুনে পুলিস অফিসারের রক্তচক্ষু। থানায় টেলিফোন করে সে পুলিশের গাড়ি আনালো, আর তার নির্দেশে সোমেন কর আর গোটাকতক ছেলেকে গলা-ধাক্কা দিয়ে ভ্যানে তোলা হল।

লঘু ব্যাপারটা যে এমন গুরু আকার নেবে পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক ভাবে নি। ছেলেদের ক্রুদ্ধ অসন্তোষে গোটা শহর সরগরম, সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ। ছেলের দঙ্গল ডি-এম-এর কাছে অভিযোগ নিয়ে হাজির। গভীর মনোযোগে ডি-এম সব শুনে নিজে তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিতে তারা সাময়িকভাবে ঠাণ্ডা।

প্রধান আসামী অর্থাৎ সোমেন করকে জামিনে খালাস দেওয়া হয়েছে। ডি-এম তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে। বলাবাহুল্য তার সবটাই আসামীর অনুকূলে।

ডি-এম সেটাই আশা করেছিল। এই দিন সকালে নিজেই ঘটনাস্থলে এসে হাজির।

এই ডি-এম সম্পর্কেও শহরের সর্বজনের কৌতূহল এবং আগ্রহ। তার সব কারণের মধ্যে একটি হ'ল উনি এখানকার মেয়ে।

তার নাম হেনা বোস। মহিলা। বয়স উনত্রিশ। বাংলা দেশের প্রথম মহিলা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সাত বছর আগে খবরের কাগজে আই. এ. এস্ পরীক্ষার ফলে প্রথম সারিতে তার নাম এবং ছবি দেখা গেছে। মাস কয়েক হল ডিস্ট্রিক্ট চার্জ নিয়ে এখানে এসেছে. অনেকেই তাকে এই শহরেই ফ্রক-পরা অবস্থায় দেখেছে, সাঁতারের কমপিটিশনে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপাঝাঁপি করতে দেখেছে। সাইকেল ছেড়ে খুব ভোরে ঘোড়ায় চড়তেও দেখেছে।

তার নামের আগে-পরে তখন এমন সব পুং-বাচক বিশেষণ জোড়া হত, শুনলে কান লাল হবার কথা। কিন্তু হেনা বোসের মুখ লাল হত না। তার প্রথম কারণ, গায়ের রং কালো, আর দ্বিতীয় কারণ, পুরুষ-বাচক বিশেষণই তার সব থেকে বেশি কাম্য ছিল।

স্কুল থেকে শুরু করে কলেজের পাঠ পর্যন্ত এই শহরেই কেটেছে তার। মেয়েদের নিয়ে তখন কত দল পাকিয়েছে, পুরুষের সঙ্গে কতভাবে রেষারেষি করেছে ঠিক নেই।

ছেলেবেলা থেকেই পুরুষালি স্বভাব তার, পুরুষের মেজাজ, পুরুষের গোঁ! ব্যাধির মতো মানসিক একটা কারণও ছিল। চার বছরের বড় ওর এক অসুখে-ভোগা রুগ্ন দাদা ছিল। বেজায় খিটখিটে মেজাজ ছিল তার। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া-মারামারি বেধে যেত। স্কুলে একবার ওইরকম ঝগড়া-বিবাদের সময় কয়েকটা ছেলে তাকে ধরে মারে খুব, আর রাগের মাথায় একটা ছেলে এমন ধাক্কা দিয়ে বসে যে দাওয়া থেকে সে নিচের বাঁধানো চত্বরে পড়ে যায়। সেই থেকেই জ্বর আর মাথায় যন্ত্রণা, চৌদ্দ বছরের সেই রুগ্ন দাদাকে আর বাঁচানোই গেল না। সেই থেকে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার নেশা। আর একটু বেশি বয়সে স্কুলে পড়ার সময় ইয়ারকি করতে গিয়ে অনেক ছেলে ওর হাতে মারধোর পর্যন্ত খেয়েছে।

আরও একটু বেশি বয়স হতে সব থেকে রেষারেষির সূত্রপাত এই সোমেন করের সঙ্গে। বয়েসে দু'বছরের বড় হলেও সোমেন কর পড়ত মাত্র এক ক্লাস ওপরে। স্কুলের গণ্ডি পেরুবার পর একই কলেজে এক ক্লাস ওপর-নিচে পড়েছে দু'জনে।

সোমেন কর তখন ছেলেদের মাথার মণি। কলকাতার নামী ক্লাব তখন তাকে জামাই-আদরে ফুটবল আর হকি খেলতে নিয়ে যায়। গঙ্গা পারাপারের সাঁতার কমপিটিশন হয় প্রতি বছর। শহর ভেঙে পড়ে সেই প্রতিযোগিতা দেখতে। কিন্তু প্রতিবারের মস্ত কাপটি সোমেন করের বরাদ্দ। হেনা বোস কোনোবার পরাস্ত করতে পারল না, প্রত্যেক বারই দ্বিতীয় পুরস্কার মেডেলটি নিয়ে রাগে জ্বলতে জ্বলতে তাকে ঘরে ফিরতে হয়েছে। একজনকে বাদে আর সকলকে পরাস্ত করেও এতটুকু আনন্দ নেই।

হেসে হেসে সোমেন কর সেবারে ওকে বলেছিল, গোড়া থেকে ভাল করে প্র্যাকটিস করো, সামনের বারে তুমি ঠিক প্রথম হবে।

ঠাট্টার জবাব দেবার জন্য সে অনেক আগে থেকে অনুশীলন শুরু করেছিল বটে। পরের বারের প্রতিযোগিতায় স্টার্টিং পয়েন্টে এসে দেখে সোমেন কর জামা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে। জলে নামছে না। শুনল সে তার নাম তুলে নিয়েছে, আর বলেছে নাকি, বার বার চার বার প্রথম হয়েছে, এবারে অন্যকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

লোকটা ওর দিকে চেয়ে হেসেছিল। আর হেনার গা যেন জ্বলে গেছল তাতে। সামনে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি জলে নামবেন কি নামবেন না?

সোমেন কর হেসেই মাথা নেড়েছিল, নামবো না।

—বেশ, আমিও উইথ-ড্র করলাম তাহলে, ভেবেছিলাম এবার গেলবারের ঠাট্টার জবাব দিতে পারব, আপনি ঘাবড়ে গেছেন যখন, থাক।

সোমেন কর ভুরু কুঁচকে খানিক নিরীক্ষণ করেছিল তাকে। তারপর তার সাগরেদকে বলেছে সুইমিং কস্টিউম নিয়ে আসতে।

সেবারের প্রতিযোগিতায় অন্তত বিশ গজ আগে লক্ষ্যে পৌঁছেছিল সোমেন কর।

খেলার মাঠে হেনা বোস নিয়মিত হাজিরা দিত। খেলা দেখতে গিয়ে মনে মনে সর্বদাই ও সোমেন করের বিপক্ষ দলের সমর্থক। সোমেন করকে যখন কেউ রুখতে পারত না তখন ওরই হাত পা নিশপিশ করত।

কলেজের থিয়েটার নিয়েও একবার জোর রেষারেষি বেধেছিল। সোমেন করই ওর কাছে এসে ঠাট্টা করেছিল, মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েদের নামতে হবে। হেনা বোস সুমচিত জবাব দিল। সে রাজি। আরো দু'একটি মেয়েকেও সে রাজি করালো। কিন্তু বাধ সাধল কলেজের প্রিন্সিপাল আর মাস্টারমশাইরা। তারা রাজি নয়। হেনা বোস তখন রেগে গিয়ে সমস্ত মেয়েদের নিয়ে বয়কট করল। আর সোমেন করকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করল, রাজি হবেন কি করে, মস্ত মস্ত পুরুষমানুষ যে সব—যান এখন ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে অভিনয় করুন গে।

ভাল মুখ করে সোমেন কর জবাব দিয়েছিল, শুধু তোমার বেলায় কেউ আপত্তি নাও করতে পারে, তোমাকে তো মোটামুটি ছেলেই ভাবে সকালে।

হেনা বোস হেসে উঠেছিল।

বাবা মা ওর বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। সময়-সময় হেনা বোসেরও যে ফাঁকা-ফাঁকা লাগে না এমন সময়। রূপ তার অতি সাদামাটা, গায়ের রংও কালোর দিকে। স্বাস্থ্যটাই শুধু নিটোল। তাছাড়া বড় চাকরির তোয়াজে চেহারায় এখন বেশ একটু লালিত্য এসেছে। কিন্তু বিয়ের কথা তার ভাবার অবকাশ কম। এই কড়া মেজাজের ডি. এমকে দেখে অধস্তনেরা তটস্থ। মেয়ে বলে কেউ আর এখন এতটুকু সুবিধে পাবে আশা করে না। আড়ালে জাঁদরেল পুরুষ ডি. এম-এর দাদামশাই বলে তাকে।

সোমেন কর যোগ্য মর্যাদায় অভ্যর্থনা জানাল তাকে। তার জন্য চায়ের ব্যবস্থার উদ্যোগ হচ্ছে বুঝতে পেরে হাসি মুখেই জানিয়ে দিল, তদন্তে এলে সে বাড়িতে চা খাওয়া চলে না। মেয়েরা চুপ।

—আচ্ছা, এবারে কাজটা সেরে নিই, কেমন?

মেয়েরা ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল। চেয়ার টেনে বসে হেনা বোস বলল, আপনার স্বভাব আজও বদলায় নি তাহলে?

ওকে দেখে আর এত বড় হতে দেখে সোমেন কর মনে মনে কত যে খুশি হয়েছে সেই জানে। সেই আবেগে হাসি মুখেই জবাব দিয়ে বসল, তোমারও বদলেছে মনে হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ চাপা তীক্ষ্ণ গলায় হেনা বোস বলল, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন?

সোমেন কর থমকে গেল—আই অ্যাম সরি। বলুন—

হেনা বোস শোনা ব্যাপারটাই আর একবার তার মুখ থেকে শুনতে চাইল। সোমেন

কর একটুও না বাড়িয়ে সত্যি কথাই বলে গেল। হেনা বোস চুপচাপ তার মুখের দিকে চেয়ে শুনল।

তারপর খানিক ভেবে বলল, আপনার ওই টিউটোরিয়াল হোম সম্পর্কে আমি সমস্ত খোঁজখবর নিয়েছি। অ্যাডভার্স কোন রিপোর্ট নেই। যাক্, আপনার ছেলেদের বলে দেবেন, পুলিশ অফিসারের জন্য শীগগিরই আলাদা কোয়ার্টার্স-এর ব্যবস্থা হচ্ছে। তারাও যেন আর গণ্ডগোল না করে, আর একটু ভদ্র হয়ে থাকে।

সোমেন কর জবাব দিল, তারা বরাবরই ভদ্র। কিন্তু আপনার পুলিশ অফিসার যে আমাদের গলায় হাত দিয়েছেন তার কি হবে?

এবারের 'আপনি' কথাটা নিজেরই কেমন যেন কানে লাগল হেনা বোসের। জবাব দিল, সেই স্টেপই তো নেওয়া হল।

—সেটা আমি যথেষ্ট মনে করি না, আমি তার নামে কেস করব।

হেনা বোস সেই আগের মতই জোরালো হাব-ভাব দেখছে লোকটার। হেসে বলল, নাহলে কিছুই হবে না, আপনি আপোস করলে তাঁর ক্ষমা চাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি।

—তাই করুন।

হেনা বোস উঠে দাঁড়াল। তারপর হেনাই জিজ্ঞাসা করল, আপনার স্ত্রীকে দেখলাম না?

—স্ত্রী নেই।

ঈষৎ কৌতুকে মুখের দিকে তাকাল, নেই বলতে?

—নেই বলতে কোনদিনই নেই।

—ও! হাসল, কি একটু ঠাট্টা করতে গিয়েও করল না—আচ্ছা চলি। আমি এখানে আসছি শুনে মা আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। যাবেন একদিন।

এককালে এদের বাড়ি গিয়ে এর মায়ের কাছ থেকে খাবার চেয়েও খেয়েছে সোমেন কর। বিদ্রূপের সুরে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, বলেন কি, ছা-পোষা মাস্টার, ডি. এম-এর বাড়ি যাব! আপনার অসুবিধে হবে না?

'আপনি' কথাটা এবারও কানে লাগল। নিজেই এ নিয়ে গোড়ায় দুর্ব্যবহার করেছে, কি আর করা যাবে। জবাব দিল, অসুবিধে হবার কথা নয়, কারণ ডি. এম-রাও সমাজের বাইবের জীব নয় বোধ হয়।

হাসি মুখেই বেরিয়ে এলো। হাসি মুখে গাড়িতে উঠল।

দিনকয়েক বাদে হঠাৎ দেখা আবার। বিকেলের দিকে সোমেন কর গঙ্গার ধার ধরে হাঁটছিল। ঝকঝকে গাড়িটা পাশে দাঁড়িয়ে গেল। ভিতর থেকে হেনা বোস গলা বাড়াল।

—হাওয়া খাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।...আপনিও?

আজও 'আপনি' শব্দটা কানে লাগল। বলল, না, আমি কাজে বেরিয়েছিলাম, আমাদের হাওয়া খাওয়ার সময় হয় না।

সোমেন হেসেই বলল, সময় আমারও বেশি হয় না, তবে সস্তার জিনিসে লোভ বলে অভ্যেসটা ছাড়তে পারি না।

হেনা বোসের মনে হল, কথাবার্তার ধরন-ধারণ সেই আগের মতই আছে। বলল, সেদিন আপনার ওখান থেকে ফেরার পরেও মা আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

—একদিন এলেন না তো?

জবাব দিল, খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু আগের দিন তো আর নেই, তাই ভয় করে।

হেনা বোস গাড়ির দরজা খুলে দিল, চলে আসুন ভয় ভাঙিয়ে দিচ্ছি—হাতে সময় আছে তো?

বিব্রত মুখে সোমেন কর গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি ছুটল আবার। গাড়িতে উঠে জিজ্ঞাসা করল, ইচ্ছে করে, অথচ ভয় করে কেন?

—পুরনো দিনের কথা মনে পড়লে যেতে ইচ্ছে করে, আর বর্তমানের কথা মনে হলে ভয় করে। পুরনো দিনের মনের আবেগে 'তুমি' বলে ফেলে যে দাবড়ানি খেলাম!

সুযোগ পেয়েই হেনা বোস সেই অপ্রিয় ব্যাপারটার সংস্কারে মন দিল। হেসে উঠে বলল, আচ্ছা অনুমতি দিলাম, আগের মত তুমিই বলুন।

কিন্তু লক্ষ্য করল, সে তুমি না বলে আপনি করেই কথা বলে চলল।

হেনা বোসের মা আগের মতই আছেন। শুধু বয়েস বেড়েছে আর আগের থেকেও বেশি স্নেহশীল হয়েছেন। ওকে দেখে খুব খুশি। খানিক গল্প করার পর নিজের হাতে খাবার নিয়ে এলেন দু'জনারই। সোমেন কর গম্ভীর মুখে বলল, খেতে তো পারব না মাসিমা—।

—কেন? মহিলা অবাক একটু!

হেনাকে দেখিয়ে বলল, সেদিন আমার বাড়িতে ওনার এক পেয়ালা চা খেতেও অসুবিধে হয়েছিল।

হেনা বলল, আমি তদন্তে গেছিলাম বলে অসুবিধে হয়েছিল, আপনার কি অসুবিধে?

—লোকে ভাবতে পারে, ডি. এম-এর খুব আপনার জন, আমার থেকে আপনারই তাতে বেশি অসুবিধে।

হেনার মা বললেন, তুমি খাও তো, আপনার জন না তো কি, ওর ওই রকম স্বভাব, কাজে বেরুলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

ওঠার সময় হেনার মা বললেন, বড় ভাল লাগল, আবার এসো কিন্তু।

সোমেন আবারও হেসে বলল, তাতেও তো অসুবিধে মাসিমা, লোকে ভাববে ডি. এম-কে তেল দেবার ফিকিরে ঘোরা-ফেরা করছি।

হেনা বোস টিপ্পনী কাটল, লোকে ডি. এম-কে একটু-আধটু তেল দিয়েই থাকে।

—তাদের স্বার্থ থাকে, আমি আপনাকে তেল দিতে যাব কোন স্বার্থে!

জবাব না দিয়েই হেনা হাসছিল।

মুখে যা-ই বলুক সোমেন কর, এরপর মাঝে মাঝে আসা শুরু করল। আর একটা ব্যাপারও লক্ষ্য করেছে সোমেন, তাকে দেখলে হেনার সেই গম্ভীর মুখেও হাসির ফাটল ধরে একটু।

মেয়ের সামনেই মা একদিন জিজ্ঞাসা করলেন সোমেনকে, চাকরি-বাকরি আর করলেই না, যা করছ তাতে বেশ ভালই রোজগার হয় বুঝি?

সোমেন কর হাসি মুখে জবাব দিল, খুব একটা ভাল নয়, তবে আপনার হাকিম মেয়ের থেকে ঢের ভাল।

মহিলা সেকেলে মানুষ, অনেকটা সাদাসিধে গোছের। মেয়ের থেকেও বেশি রোজগার হতে পারে ভাবেন নি। জিজ্ঞাসা করে বসলেন, তাই নাকি, কত পাও?

সোমেন জবাব দিল, মাস গেলে চাড়-সাড়ে হাজার টাকা নিজের থাকে—মাইনেই তো শুনতে হয় মাসে হাজার দশেকের ওপর।

এই গোছের অঙ্ক মহিলার কল্পনার বাইরে, তাই যথার্থই অবাক তিনি। মেয়ে সেদিকে চেয়ে টিপ্পনী কাটল, একেবারে হাঁ হয়ে গেলে যে, অনেক তেলওলাও তো এর থেকে ঢের বেশি রোজগার করে।

মা অপ্রস্তুত।—কি যে মুখ হয়েছে তোর, ও তো ছেলে পড়ায়।

মেয়ে জবাব দিল, তা না হলে এই রকম ছেলে-মেয়ে আজকালকার!

সোমেন কর হাসতে লাগল। মেয়েব কথায় কান না দিয়ে মহিলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, তা এত ভাল রোজগারপতি করো, এখনও বিয়ে-থা করো নি কেন?

মেয়ে বিরক্ত এবং গম্ভীর। সোমেন কর জবাব দিল, মা বাবা কেউ নেই তো—কে আর মাথা ঘামিয়ে তোড়জোড় করে, আমি আমার তালে ছিলাম—সময় কেটেই গেল।

ভুরু কুঁচকে মায়ের উদ্দেশে ঝাঁঝিয়েই উঠল হেনা বোস।—তুমি এসব আলোচনা থামাবে?

মা বললেন, কিসে তোর রাগ হয় বুঝি না বাপু!

এরপর আবাব একদিন গঙ্গাব ধাবেব রাস্তায় দেখা। হেনা বোস গাড়িতে, সোমেন কর হাঁটাপথে। কিন্তু গাড়িটা দাঁড়াল না, পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ইচ্ছে করেই হেনা বোস যে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল তাও বোঝা গেল।

ব্যস, তারপর একটা মাস আর এ-পথ দিয়ে হাঁটলই না সোমেন কর। বিকেলে অন্য রাস্তায় বেড়াতে শুরু করল। ওই এক মাসেব মধ্যে আর তাদের বাড়িও গেল না।

দিনটা সেদিন মেঘলা ছিল। আকাশের কালো সাজ উপেক্ষা করেই সোমেন কব একমাস বাদে বিকেলে আবার গঙ্গার ধারেব রাস্তা ধরল। ওই একটা মাস ক্লান্তিকর দীর্ঘ মনে হচ্ছিল।

সেদিনের আশা সফল। ঝকঝকে গাড়িটা গজ দশেক এগিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। হেনা বোস মুখ বাড়াল। দু'হাত জুড়ে বেশ ঘটা করে কপালে ঠেকিয়ে বিনীত নমস্কার জানাল সোমেন কর।

ঠিক না বুঝে হেনা বোস একবার তার আপাদমস্তক দেখে নিল। অসুখ-বিসুখ হয়েছিল বলে মনে হল না। হালকা গাম্ভীর্যে বলল, টাকা রোজগারের গবম তো খুব, একটা গাড়ি কিনতে পারেন না?

—পারি তবে আপনার থেকে এ দুটো পায়ের ওপর আস্থা বেশি।

—আকাশ ভেঙে জল আসছে, পা দুটো আপনাকে বাঁচাবে?

অমায়িক হেসে সোমেন কর জবাব দিল, মেয়েদের শরীর তো নয়, জল-ঝড়ে এই পোড়া শরীবের কিছুই হয় না।

হেনা বোসের স্বভাব একটুও বদলায়নি। মেয়ে বলে তাচ্ছিল্যের কথা শুনলে এখনও কান জ্বলে। আর কলেজে পড়া অবধি এই লোকের মুখে ওই খোঁটা সব থেকে বেশি শুনেছে। দরজা আগেই খুলে দিয়েছিল, রুক্ষ স্বরে হেনা বোস জিজ্ঞাসা করল, তাহলে আপনি গাড়িতে উঠবেন, না বীরপুরুষের মত হাঁটবেন?

—আপনি বললে উঠব।

হাসি মুখেই উঠে বসে সোমেন কর দরজা বন্ধ করল। গাড়ি চলল।

—এক মাসের মধ্যে আসেননি কেন?

বিব্রত মুখ করে সোমেন কর জবাব দিল, তেলের কারবারীর ঘন ঘন যাতায়াত করাটা আপনার খুব পছন্দ নয় মনে হল সেদিন—

'আপনি' 'আপনার' শব্দগুলো আজ আরও বেশি খটখট করে কানে লাগছে হেনা বোসের। লোকটা যে তাকে জব্দ করার জন্যই সেই কবে থেকে এই করে আসছে তাও বুঝতে পারে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাস্তা দেখতে লাগল। বেশ প্রসন্ন মনেই আপিস থেকে ফিরছিল, হঠাৎ কেন যে মেজাজটা বিগড়ে গেল নিজেই জানে না।

ফেরা সম্ভব নয়। অবশ্য গাড়ি পাঠিয়ে তাঁকে নিয়ে আসা চলে, কিন্তু আন্দাজে কোন বাড়িতে গাড়ি পাঠানো হবে?

তাকে বসতে বলে হেনা বোস মুখে-চোখে জল দিয়ে এল।

বসল সোমেনের মুখোমুখি—কি খাবেন?

—যা খাওয়াবেন।

মুখের ওপর দু'চোখ থমকাল এক মুহূর্ত। আয়াকে যা আছে আনতে বলে আবার তার দিকে তাকাল। হঠাৎ হেসেই জিজ্ঞাসা করল, গঙ্গায় সাঁতার কাটেন এখনও?

—না, যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন আমার সাঁতার আসে না। আপনি নামেন তো চেষ্টা করে দেখি।

আয়া চায়ের ট্রে আর জলখাবার রেখে গেল।

খাবারের ডিশ হাতে তুলে নিয়ে হেনা বোস আবারও হেসে বলল, প্রতিদ্বন্দ্বী তো কোনোদিন আপনার সঙ্গে পারে নি—যোগ্য হল কি করে?

—হারটা দেখেছেন, জিতটা আপনার চোখে পড়ে নি।

হঠাৎ অদ্ভুত রেগে গেল হেনা বোস।

—ক'দিন আপনি-আপনি করতে বারণ করেছি!

খাওয়ার ফাঁকে হাসি গোপন করার চেষ্টা সোমেন করের। জবাব দিল, হুকুম করে তুমি থেকে আপনিতে টেনে তোলা যায়, আপনি থেকে তুমিতে ফেরানো যায় কি?

খাওয়া ছেড়ে হেনা বোস আবার চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। হঠাৎ রুষ্ট স্বরেই বলে উঠল, যদি হুকুম করি!

খাবার ডিশ সামনে নামিয়ে রাখল সোমেন কর। ঠোঁটের ডগায় হাসি ভাঙছে সামান্য। জবাব দিল, হুকুম করলে এই অধম তার বদলে কিন্তু আব্দার করবে। সে বলবে, ওই 'তুমি'টা দু'তরপেরই প্রয়োগ শর্তসাপেক্ষ। তারপর বলবে, দু'জনেরই যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, কিশোর-কিশোরীর মত আর বেশি সময় নষ্ট না করে মিস বোসকে মিসেস কর হয়ে এই অধমের ঘরে আসতে হবে।...তুমি বলার হুকুম করলে অনেক ঝামেলা।

হেনা বোস থমকে চেয়ে রলই খানিক। তার রাগ হচ্ছে, দুঃসাহস দেখে অবাক লাগছে, আবার তলায় তলায় কি যেন একটা হচ্ছে। শেষে হালকা ভ্রূকুটি করে বলে বসল, এই আব্দারের কথা মুখে বলার জন্যেই আপনাকে সোজা থানায় চালান করতে পারি, জানেন?

—পারি কেন, তাই করতেই হবে, এখনও বন্দি না করলে আমি ফেরারী হয়ে যাব।

প্রাণপণে রুষ্ট হতে চেষ্টা করেও হেনা বোস শেষ পর্যন্ত হেসেই ফেলল।

অবশেষে বিয়েটা হয়েই গেল। হেনা বোস হ'ল হেনা কর। বিয়েবাড়ির হৈ-চৈ, নানা রকম আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের শেষ হতে মুক্তি পেল হেনা-সোমেন। তখন রাত প্রায় দুটো।

নিজের তরপের আত্মীয়পরিজনদের বাসর জাগার ইচ্ছে এক ভ্রূকটিতেই হেনা নাকচ করে দিয়েছে। এখন একটু ঘুমুতে পারলে বাঁচে।

দরজা বন্ধ করে বিছানায় বসতেই লোকটা বেহায়ার মতো হাত ধরে টানল তাকে। সদ্য সদ্য হেনা করের ডি. এম-এর মেজাজ এখন। ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ওদিকে সরে থাকো। সমস্ত দিন অনেক নাকাল করেছ—যজ্ঞের সময় পিছনে দাঁড়িয়ে শয়তানী পর্যন্ত করেছ, আমি টের পাই নি, না?

—বা রে, আমি আবার কি করলাম, পুরুতঠাকুর পিছন থেকে জড়িয়ে ধরতে বলল না?

রাগত মুখে রমণী ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু তারপরেই যে দুঃসাহস দেখাল, সেটা যেমন অসহ্য তেমনি কল্পনার বাইরে। দস্যুর মতই অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। হেনার গায়ে শক্তি কম নয়, কিন্তু কিছুতে ঠেলে সরাতে পারল না দুরন্ত পুরুষটাকে। বুকের হাড়পাঁজর গুঁড়িয়ে দিতে চাইল, ঠোঁট দুটো ঝকাঝকির ফলে প্রায় ক্ষতবিক্ষত; দম বন্ধ হবার উপক্রম। লোকটা দুর্দম দুস্যর মতই ওর ওপর দখল বিস্তার করছে, আর পদ-মর্যাদায় সচেতন এই উনত্রিশ বছরের দেহটা ভেঙে দুমড়ে নতুন করে গড়ছে। আর যোঝা সম্ভব হচ্ছে না, সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে। শেষে আর পারল না। হাল ছেড়ে দিল, হাল ছেড়ে দিয়ে নিঃশেষে হারিয়ে যেতে লাগল।

পরদিন।

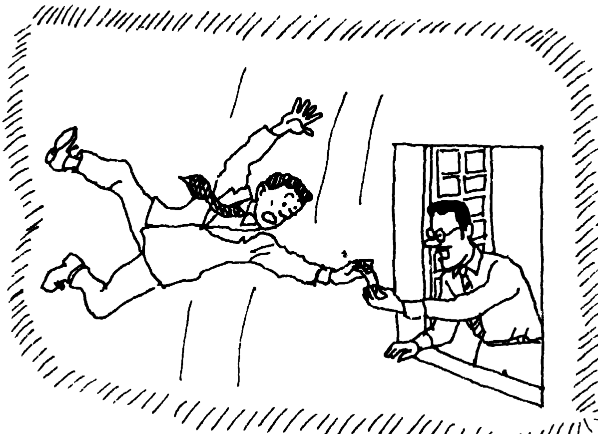
সকাল তখন ন'টা দশটা হবে। মফঃস্বল শহরে বিয়ের মতই বিয়ে একটা হয়ে গেল বটে। তাই পরদিনও ওই সময় সোমেন করের কিছু বন্ধু-বান্ধব এসেছে খোস-গল্প করতে। এ-বাড়ির রসিক অতিথিরাও ঘর জুড়ে বসে আছে বর-কনেকে ঘিরে।

অনেক রকম ঠাট্টা-ইয়ারকির পর সোমেনের এক বন্ধু তরল গলায় জিজ্ঞাসা করল, তা হাকিম-বউকে কি রকম মনে হল হে?

সোমেন কর জবাব দিল, নতুন আর কি মনে হবে, হাকিম হোক আর যাই হোক—পা থেকে মাথা পর্যন্ত আস্ত একটা মেয়েই তো!

অন্তস্তলের প্রতিক্রিয়া দেখে কনে নিজেই অবাক। ফোঁস করে ওঠার কথা, কিন্তু জ্বালা ধরা দূরে থাক, ওই কথা শুনে আজ এই প্রথম দু'কান যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে।





আপনাদের সাবধান করে দিয়েছিলাম, ব্রজরাজ কারফর্মা যখন মুখ খুলবেন তখন তাঁকে কোন-মতেই ডিস্টার্ব করবেন না। ব্রজদার কথা শোনবার একটাই মাত্র সর্ত আছে, কান পেতে শুধু শুনে যাওয়া। প্রশ্ন নয়, তর্ক নয়, পিছনে সামনে হাসি নয়, এমন কি চোখ টেপাটেপি পর্যন্ত নয়। অবিশ্বাসীর গন্ধ পেলেই ব্রজদার মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

ব্রজদা বাংলাদেশ ও জাতির উত্থানপতনের ইতিহাসের এমন নেপথ্য সব অধ্যায় জানেন (অনেক ক্ষেত্রে সেসব অধ্যায়ের স্রষ্টা ব্রজদা নিজেই) যেগুলো সাধারণ বাঙ্গালীর জানা নেই বলেই তো বাঙ্গালীর আজ এই দুর্দশা। আত্মবিস্মৃতির অতল অন্ধকারে বাঙ্গালী আজ তলিয়ে আছে। বাঙ্গালীকে ওঠাবার জন্য, জাগাবার জন্যই ব্রজদার কাহিনী বলা দরকার। বাঙ্গালীর উচিত বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান ব্রজদাকে চেনা।

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদে হাত দিয়ে ব্রজদাকে মাঝে মাঝে পড়ে শোনাতেন। একদিন কবি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্রজ, কি রকম বুঝছ? ব্রজদা কবিকে অভয় দিলেন, পড়ে যান না, ভয় কি? আমি তো আছি। এই আশ্বাস কবিকে যে কি পরিমাণ উৎসাহিত করেছিল এবং তার ফলে জগৎসভায় বাঙ্গালী যে শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পেরেছিল, বিশ্বের লোক আজ তার সাক্ষী। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাবার পিছনে ব্রজদার অবদান কতখানি। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য এ ইতিহাস আমরা জানিনে। আমরা এও তো জানিনে, বলাকা কবিতা লিখতে ব্রজদাই কবিকে খুঁচিয়েছিলেন।

সেদিন ব্রজদা সবিস্তারে যখন এই কাহিনী বলতে শুরু করেছিলেন, তখন কোন মূঢ় যেন পিছন থেকে খুক খুক করে হেসে ফেলেছিল। ফলে ব্রজদা তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ

করেছিলেন। পরে বহু কষ্টে আমাকে সে কাহিনী ব্রজদার মুখ থেকে বের করতে হয়েছে। তাই আপনাদের পই পই করে বারণ করি, ব্রজদার সামনে বেচাল হবেন না। বাংলা ও বাঙ্গালীর আশু সর্বনাশটি ঘটাবেন না।

বলাকা কবিতা লেখবার হিস্ট্রি এখানে বলতে বসিনি। আসলে এ কাহিনী ব্রজদার এফিসিয়েন্সির। তবু পাঠকদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য অতি সংক্ষেপে সেই হিস্ট্রিই আগে বলছি। ভাইসরয়ের জাঁদরেল এডিকং কর্ণেল ক্লিম্যান্টকে কুস্তিতে হারিয়ে দেবার পর ব্রজদা আর কর্ণেল সাহেবের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কর্ণেল সাহেবের নেমন্তন্ন পেয়ে ব্রজদা সেবার কাশ্মীরে বেড়াতে যান। কার্তিক মাস। পাহাড়ে পাহাড়ে শীত এসে পড়েছে। বরফ জমতে শুরু করেছে। চিনার গাছের পাতা ঝরে ঝরে শ্রীনগর শহরের পথে পথে খালে 'ডালে' ছড়িয়ে পড়েছে। হাউসবোটে আর শিকারায় ঘুরে ঘুরে ব্রজদা কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে হাঁস মেরে বেড়াচ্ছেন। ওঁরা দুজনেই মহারাজার গেস্ট। ব্রজদা শিকারা চালিয়ে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করায় মহারাজা ব্রজদাকে সুন্দর একখানা তলোয়ার উপহার দিয়েছিলেন।

ব্রজদা বললেন, প্র্যাকটিকেলি সেই তলোয়ার থেকেই কবি 'বলাকা'র প্রেরণা পান। তবে শোন, আমি আর কর্ণেল সাহেব একদিন শিকারার বাইচ খেলছিলুম।

সেই শিকারার বাইচ নিয়েই তো হঠাৎ একটা এক্সিডেন্ট ঘটে গেল। আর ধরতে গেলে বলাকার সূত্রপাত হল সেই এক্সিডেন্ট থেকে।

কর্ণেল সাহেবের খেয়াল চাপল শিকারার বাইচ খেলবে। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের রিগাটার কথা বোধ হয় মনে পড়ে গিয়েছিল কর্ণেল সাহেবের। সাহেব ছিল চ্যাম্পিয়ন হাল ধরিয়ে। বললে, ব্রজ, তুমি তো বেঙ্গলি, নৌকো বাইচ্ শুনেছি তোমাদের ন্যাশন্যাল স্পোর্টসের মত। হারলে যদি লজ্জা না পাও তো এস এক হাত লড়ে যাই। ন্যাশন্যাল প্রেস্টিজে ঘা পড়লে ব্রজদা আর স্থির থাকতে পারেন না। সে তো আমরা বরাবর দেখেছি। ব্রজদা তৎক্ষণাৎ বললেন, আই অ্যাকসেপ্ট।

ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে এক সাইজের দুখানা শিকারা মহারাজা বের করে দিলেন। গোটা শ্রীনগরে সে কি উত্তেজনা! কাতারে কাতারে লোক জুটে গেল ডাল লেকের ধারে ধারে। হাজার হাজার হাউসবোট ভাসল জলে। মহারাজা মহারানী আর মহারানীর এক ভাইঝি স্পেশ্যাল বোটে করে এলেন। ব্রজদা মহারানীর ভাইঝির যা বর্ণনা দিয়েছিলেন তাতে আমার মনে হয়েছিল, ফিল্মের স্টাররাও তার কাছে সীসের সিকির বেশি কিছু নয়। (ব্রজদা বলেছিলেন : খাস কাশ্মীরী বিউটি যে কি জিনিস সে তোরা আইডিয়া করতে পারবিনে। ওসব বর্ণনা করা যায় না। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ভাষায় বলতে হয়, প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই অতি উত্তম।)

শিকারায় উঠবার আগে রামকুমারী চম্পাকলি (চাঁপার কলিই বটে!) ব্রজদার হাত ধরে বলেছিলেন, মাই ডিয়ার বিরজু, জাতির প্রেস্টিজ তোমার হাতে। আমি শালিমার গার্ডেন থেকে ফুল তুলিয়ে রেখেছি, বেস্ট শাল যে পশমের সুতো দিয়ে তৈরী হয়, সেই সুতো আনিয়ে রেখেছি। তোমরা স্টার্ট দিলেই মালা গাঁথতে বসব। মনে রেখো, সে মালা তোমার জন্যে তোলা থাকবে।

ব্রজদা আত্মপ্রত্যয়ের হাসির ছিটে রাজকুমারীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হেসে শিকারায় এসে উঠলেন। ব্রজদা আর কর্ণেল সাহেব রেডি হয়ে বসতেই মহারাজা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে

স্টার্ট দিলেন। ব্রজদা মনে মনে বদর বদর বলে দাঁড়ে টান দিতেই দেখেন রাজকুমারী চম্পাকলি সুতোর সুচে একটি ফুল গেঁথেছেন। ব্রজদা ঘাড় ঝুঁকিয়ে ইশারা করতেই রাজকুমারীর মুখের হাসি শরতের রোদ হয়ে যেন লেকের জলে ছড়িয়ে পড়ল।

ব্রজদা ইজিলি জিতে গেলেন। কিন্তু কর্ণেল ব্যাটা নার্ভাস হয়ে একটা এক্‌সিডেন্ট বাধিয়ে বসল। শিকারার সেই তীরের মত গতি সামলাতে না পেরে এক হাউসবোটের গায়ে গিয়ে মারল প্রচণ্ড ধাক্কা। বোটটা পোক্ত ছিল বলে ক্ষতি কারও কিছু হল না। কিন্তু একটা অপূর্বসুন্দর বাঁধানো খাতা ছিটকে বেরিয়ে এল বোটের ভিতর থেকে। আকাশে একটা প্যারাবোলা এঁকে ব্রজদার মাথার উপর দিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে গেল। খাতার মলাটে সোনার জলে যে নামটা লেখা ছিল সেটা রোদের আলোয় ব্রজদার চোখে এসে বিঁধল। "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" হ্যাঁ, ও হাতের লেখা তো ভুলবার নয়। ব্রজদা মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফুল স্পীডে শিকারা চালিয়ে দিলেন। ঝপাঝপ দুখানা দাঁড়ে গোটা আষ্টেক হিঁচকে টান মারতেই তীরের বেগে শিকারাখানা এগিয়ে গেল। আর খাতাটা জলে পড়তে না পড়তেই ব্রজদা বাঁ হাতে খপ করে সেখানা ধরে ফেললেন। শিকারার স্পীডে সেদিন যে রেকর্ড সৃষ্টি করলেন ব্রজদা, আজও তা কেউ ভাঙতে পারেনি।

কবিকে খাতাটা নিয়ে দিতেই কবি বিস্ময়ে বলে উঠলেন, ব্রজ তুমি! খাতাখানা খুব বাঁচিয়েছ। নতুন ধরনের কাব্য রচনা করব বলে ওখানা যত্ন করে বাঁধিয়ে এনেছি, আজকেই ট্রাঙ্ক থেকে বের করলাম। আর তার পরেই এই বিপত্তি, ওঃ খুব বাঁচিয়েছ।

ব্রজদা কথা না বলে কবির পায়ের ধুলো নিলেন। তারপর থেকে কবি যতদিন শ্রীনগরে ছিলেন ব্রজদা রোজ, সন্ধ্যেয় কবির সঙ্গে গল্প-গুজব করতে তাঁর হাউসবোটে যেতেন। কর্ণেল সাহেব যতবড় বন্ধুই হোন, আর রাজকুমারী চম্পাকলি যতবড় সুন্দরীই হোন (রাজকুমারী ব্রজদার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। কিছুতেই কাছছাড়া করতে চাইতেন না। এদিকে অফিসে এন্তার কামাই হচ্ছে। নতুন চাকরী। প্রিভিলেজ লীভ্, ক্যাজুয়েল লীভ্ শেষ হয়ে গেল, মেডিকেল লীভ্ গেল, শেষ পরে যখন লীভ্ উইদাউট পে হবার উপক্রম, তখন ব্রজদা মরীয়া হয়ে পালিয়ে আসেন। সে আরেক হিস্ট্রি। পরে বলা যাবে।) বাংলায় কথা বলতে না পারলে বাঙ্গালী হাঁপিয়ে মরে। নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা। এ বিষয়ে বাঙ্গালী আবার বড্ড গোঁড়া। এতদিন ইংরেজী বলে বলে ও ভাষাটার উপর ব্রজদার অরুচি ধরে গিয়েছিল। তাই কবিকে পেয়ে ব্রজদা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। সন্ধ্যেবেলায় বোটের ছাতে বসে বসে ব্রজদা কবিকে লেখার বিষয়ে আইডিয়া দিতেন। সেই সময় একদিন এক ঝাঁক হাঁস উড়ে যেতে ব্রজদা বললেন, আচ্ছা আপনি এই হাঁস নিয়েই তো একটা পোয়েট্রি লিখতে পারেন। সাজেশানটা সেদিন কবির খুব মনঃপুত হল। বললেন, চেষ্টা করে দেখব।

তারপর অনেকদিন ব্রজদা কবির ওখানে গিয়েছেন। ব্রজদার কোমরে রাজকুমারী চম্পাকলি নিজের হাতে তলোয়ারটা বেঁধে দিয়েছেন। আবার তারও একটা হিস্ট্রি আছে। কিংখাবের খাপখানার সঙ্গে রঙ মিলিয়ে রাজকুমারী নিজের হাতে ব্রজদার জন্য কাশ্মীরী শালের একটা সবুজ পান্না রঙের কোমরবন্ধ বুনে দিয়েছিলেন। সেই কোমরবন্ধে তলোয়ার ঢুকিয়ে ব্রজদার কোমরে বেঁধে দিয়েছিলেন রাজকুমারী। নিজ হাতে।

কবি তলোয়ারখানা দেখে খুব খুশী, বার বার নেড়ে-চেড়ে দেখেন আর বলেন, এটা তো বেশ জিনিস হে ব্রজ। কি চমৎকার, কেমন সুন্দরভাবে বাঁকানো।

ব্রজদারও সেদিন কেমন যেন ভাব লেগে গেল। কোমরবন্ধে রাজকুমারীর ছোঁয়া। তার উপর কবির প্রশংসা। যেমন বাল্মীকির মুখ দিয়ে মা নিষাদ শ্লোকটা ফস করে বেরিয়ে গিয়েছিল, তেমনি ব্রজদার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আজ্ঞে ঠিক যেন ঝিলমের বাঁকা স্রোতেরই মত।

কবি চমকে উঠলেন। দি আইডিয়া। থ্যাঙ্ক ইউ ব্রজ। পেয়ে গেছি। ইউরেকা। তারপর ধ্যানমগ্ন হয়ে বোটের ছাতে তক্ষুনি তক্ষুনি বসে গেলেন। বসে বসে সেই বাঁধান খাতার প্রথম পাতায় মুক্তোর মত হস্তাক্ষরে ফস্-ফস্ করে লিখে গেলেন :

সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার...

এই হল বলাকা কবিতা লেখার সংক্ষিপ্ত হিস্ট্রি। এর মধ্যে, এই তিনটে ছত্রের মধ্যে বাঙ্গালীর যে গৌরবময় ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, কজন বাঙ্গালী তার খবর রাখে! নিজেরা তো খবর রাখেই না, ব্রজদা যদি উপযাচক হয়ে বলতেও যান, অমনি তারা হেসে উড়িয়ে দিতে চায়।

ব্রজদা বললেন, এই একটা দোষেই বাঙ্গালী গেল।

বলাকার কথা থাক, এফিসিয়েন্সির কথা বলি।

সেদিন কথা হচ্ছিল জীবনবীমা নিয়ে। এফিসিয়েন্সির কথা উঠল। যদুদা বলছিলেন, ন্যাশনালাইজ করবার পর জীবনবীমা অফিসের এফিসিয়েন্সি জাহান্নামে গিয়েছে। প্রিমিয়াম জমা দিলে এক বছর লাগে রসিদ আসতে।

সুনীল বোস টাইপ মেসিনের খটখটি থামিয়ে বলল, ন্যাশানালাইজ করবার পর কোন জিনিসেরই বা এফিসিয়েন্সি থাকে। স্টেট বাস বল, রেল বল, গভর্নমেন্টের হাতে গিয়েছে কি তার বারটা বেজে গেল।

সুনীত ঘোষ বলল, এ আমাদের ন্যাশন্যাল ক্যারেক্টারের দোষ মশাই। সাহেব কোম্পানীর মত এফিসিয়েন্সি দেশী কোম্পানী দেখাতে পারে না।

ব্রজদা চুপচাপ শুনছিলেন। এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি। কিন্তু আর থাকতে পারলেন না. বললেন, তোদের জেনারেশানটাই দেখছি বড্ড ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সে ভোগে। আমাদের আমলে এটা ছিল না।

এখন তোরা স্বাধীন হযে যেসব কথা বলিস, সেই পরাধীনতার আমলে সাহেবরা ওসব কথা বলত। আর আমরা তাদের থোঁতামুখ ভোঁতা করে দিতাম।

সেই স্বদেশী আমলে একটা স্বদেশী বীমা কোম্পানী খোলা হয়েছিল। তখন রুল ব্রিটানিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর খুব প্রতাপ। ওদের স্যার ফোরটোয়েন্টি বলে ঝানু এক স্কচ সাহেব ছিল ফিল্ড এজেন্টদের কর্তা। সেই সাহেব কোম্পানীর দাপটে স্বদেশী বীমা কোম্পানী যখন লাটে ওঠার উপক্রম হল, তখন স্যার রাজেন আমাকে রিকোয়েস্ট করলেন, ফিল্ড এজেন্টদের পরিচালনার ভার নিতে। বলেছিলেন, এটাকে কেউ যদি দাঁড় করাতে পারে, তবে তুমিই পারবে, ব্রজদা। আমি ওটাকে প্রফেশন নয়, মিশন হিসাবে টেক আপ করলাম।

একদিন স্যার ফোরটোয়েন্টিকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাহেব, তোমাদের কোম্পানীর এত

পসার কেন বলতে পার? অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে।

স্যার ফোরটোয়েন্টি বললেন, আপত্তি কিসের। এ তো ওপেন সিক্রেট। এফিসিয়েন্সি ম্যান, সেরেফ্ এফিসিয়েন্সি। আমাদের ক্লায়েন্ট মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হিসাব-পত্র পরিষ্কার করে রাখি। শ্মশান থেকে ফেরবার পথেই তার ওয়ারিশকে চেক দিয়ে দিই। ইউ ইন্ডিয়ানস্, এম্পারার অব্ আইড্‌ল্‌নেস, মানে কুঁড়ের বাদশা, পানের পিক ফেলতে তোমাদের ছয়মাস লাগে, তোমরা জীবনেও আমাদের কোম্পানীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। নেভার, নেভার, নেভার।

তোরা তো জানিস ব্রজরাজ কারফর্মার ন্যাশন্যাল স্পিরিটে যদি কেউ ঘা দেয় তাহলে সে ফিউরিয়াস হয়ে ওঠে। সাহেব ব্যাটার কথা শুনে আমি তাই মরীয়া হয়ে উঠলাম। নতুন সিস্টেম ইনট্রোডিউস্ করে এফিসিয়েন্সি আমরা একশগুণ বাড়িয়ে ফেললাম। ফল মিলল হাতে হাতে।

উইদিন সিক্স মান্থ সাড়ে সাত লাখ টাকার বিজিনেস দিলাম।

খবর পেয়ে সেই স্কচ্ সাহেবের চোখ কপালে উঠল। একদিন আমাকে ডেকে বললে, বাবু, তুমি যে মিরাকল্ করলে। তোমার সিক্রেটটা কি বলবে, অফকোর্স যদি আপত্তি না থাকে।

হেসে বললুম, সাহেব, আপত্তির আর কি আছে। তোমার কোম্পানীর মূলমন্ত্র যা, আমার কোম্পানীরও তাই। এফিসিয়েন্সি। তবে এফিসিয়েন্সি তোমাদের থেকে আমাদের হাজারগুণ বেশি। এ তো স্কচ ফার্ম নয়, বাঙ্গালী ফার্ম।

সাহেব বলল, হোয়াট! কি বললে?

আমি বললুম, ঠিকই বলেছি। একদিন এসে দেখেই যাও না।

সাহেবের বাচ্চা তো, এল একদিন। কাজকর্ম দেখে সত্যিই খুশি হল খুব। আমার ঘরে জানালার ধারে বসে দুজনে কফি খেতে খেতে গল্প করছি, এমন সময় পাঁচতলার ছাত থেকে আমাদের এক পলিসি-হোল্ডার পা ফস্কে পড়ে গেল। প্রিমিয়াম জমা দিতে এসেছিল। রাস্তা থেকে গেল গেল রব উঠল। লোকটা পাঁচ হাজার টাকার বীমা করেছিল। আমার ঘর তেতলায়। আমার জানালার পাশ দিয়ে পড়বার সময় তার হাতের মুঠোয় পুরো পাওনার বেয়ারার চেক্‌খানা গুঁজে দিলাম। পুরো টাকা হাতে নিয়েই সে আছাড় খেয়ে মরল।

সাহেবের চোখ ছানাবড়া। অনেকক্ষণ গুম মেরে বসে রইল। তারপর উঠে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললে, চোখে না দেখলে ভাবতাম গুল ঝাড়ছ। তোমাদের সঙ্গে আমরা পারব না। আমাদের বাবসাটা গুটোতেই হবে দেখছি।



শুভ বিবাহ

সমরেশ বসু

শুভ বিবাহ কথাটি খুবই চলিত। আমি যে বিয়ের কথা বলতে যাচ্ছি, সেটা ঠিক আপনাদের মতে শুভ বিবাহ নাও হতে পারে। মনে হতে পারে খানিকটা অভিনব। অভিনব বিয়ে।

বেশ কিছুদিন আগের কথা বলছি। একটি ছোটখাটো বেকারী ফ্যাক্টরির হিসাবরক্ষকের কাজ করতুম। আসলে, হিসাবরক্ষা, মালখানা পাহারা দেওয়া এবং সাপ্লায়ার—এই ত্রিবিধ কাজই আমাকে করতে হত। মাইনে পেতুম গোটা তিরিশ। আমার মালিকের এক শালা ছিল, কলকাতা থেকে প্রায় ষাট-বাষট্টি মাইল দূরে, ছোট মফঃস্বল টাউনে। মনোহারি দোকান ছিল তার। আমাকে মাঝে মাঝে মাল নিয়ে, সেইখানে পৌঁছে দিয়ে আসতে হত। সেই সময়টাতে ময়দা পুরো র‍্যাশনিং। পারমিট ছাড়া এক চিমটি ময়দাও পাওয়া যায় না। সেই জন্য, আমার মালিক দূরে মালটা পাঠিয়ে বেশ ভাল রোজগার করছিল।

কিন্তু কাজটা বড় বিশ্রী। অবশ্য মালটা বহন করবার জন্য আমায় কুলির পয়সা দেওয়া হত। তবু, এত দূরে গিয়ে মালটা দিয়ে আসতে হত যে, আমার ধৈর্য থাকত না এক একদিন। দায়িত্বও ছিল কম নয়। মালের দায়িত্ব, তা ছাড়া পাইপয়সাটি পর্যন্ত গুনে গুনে হিসাব দেওয়ার দায়িত্ব সবই করতে হত। তারপর, মালিকের শালাটি পয়সার ব্যাপারে—

যাক্‌গে ওসব কথা। সেখানে যাওয়ার সারাদিনে তিনটি গাড়ি আছে। তার মধ্যে একটি আমাদের শহরতলির স্টেশনে দাঁড়ায় না। সকালের গাড়িটি ফেল করলে, রাত্রি সাড়ে সাতটায় আর একটি। সেইটিতে গেলে, মালিকের শালাকে ঘুম থেকে তুলতে হয়। অবশ্য শ্যালক যদি ঘরে থাকে। তার বসতবাড়ি আবার সে শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে। কোন কোনদিন সে সেখানে যায়। কোনদিন বা সেই শহরেরই মেয়েমানুষের পাড়ায়—

যাক্ সে কথা। আমাকে নানান রকম ভোগান্তি পোয়াতে হয় প্রায়ই, তবে মাগ্‌না নয়, তিরিশটি টাকার বিনিময়ে। আর খুব খিদে পেলে, রুচি থাকলে কারখানার ছাড়্ অর্থাৎ খারাপ কিংবা ভাঙাচোরা রুটি বিস্কুট খেতে পাওয়া যেত। এইটি বিনা পয়সায় পাওয়া যেত। একমাত্র উপরি রোজগার।

একবার আমাকে যেতে হল সেই সাড়ে সাতটার গাড়িতে। সেদিন আকাশের অবস্থাটা ভাল নয়। শ্রাবণ মাস। জলটা ঠিক জোরে হচ্ছে না। হাওয়াও নেই। সারাটি দিন দিনের মুখ ভার হয়েছিল মেঘ অন্ধকারে। বৃষ্টি হচ্ছে ফিস্‌ফিস্ করে। যেমন রাস্তার অবস্থা, তেমনি গাড়িগুলির তৃতীয় শ্রেণীর অবস্থা। তার উপর ছিল সেদিন বিয়ের লগনসা—বর আর বরযাত্রীরও ভিড় ছিল। বাজার গাড়িগুলির তো কথাই নেই। হয় আঁশটে, নয় ছানার বোটকা গন্ধে ভরা। তার উপরে অন্ধকার। যেন ওই গাড়িগুলিতে বাতি জ্বলতে নেই। ভাল কামরাতেই জ্বলে না। আমার সঙ্গে ছ'টিন মাল। এস, পাপা, লেড়ো, নানান রকমের দেশী বিস্কুট, রুটি, কেক্ ভরা। আমাকে বাজার গাড়িতে উঠতে হল। থার্ডক্লাসের যাত্রীরা এত মাল নিয়ে উঠতে দিতে চান না।

বেরুলাম, সেখানে পৌঁছলুম প্রায় রাত্রি এগারটার সময়। সেই একই ফিস্‌ফিসে জল আর গুমোট। মাঝে মাঝে চোখ ঝলসে দিচ্ছে বিদ্যুৎ। সারা স্টেশনে কুলি নেই একটিও। মালটা নামালুম নিজের হাতেই। মাগনা নয়। কুলির পয়সাটা লাভ হল নিজের।

স্টেশনটা নদীর পারে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয় অনেকখানি। নামি কি করে এত মাল নিয়ে। নিচে উঁকি দিয়ে দেখলুম, রিক্‌শাওয়ালা নেই একটিও। টিকিট কলেক্টর চিনতেন আমাকে। মালগুলি রাত্রের মত অফিসে রাখতে দিলেন। টিনগুলি অবশ্য তালাবন্ধ ছিল।

বসে বসে কি করি। নিচে নেমে গেলুম, যদি কোন দোকানে একটু চা পাওয়া যায়। টিকিট কলেক্টর বললেন, 'কি, শহরে রাতটা কাটিয়ে আসা হবে বুঝি?'

বলার ভঙ্গিটি খুব স্পষ্ট। বললুম 'দেখি কি হয়।'

উনি হাসলেন। আমি নেমে এলুম। ইস্! কী বিদ্যুৎ! যেন নির্ঘাত বাজ পড়বে মাথায়।

স্টেশনটা অনেক উঁচুতে। নিচের জমির সঙ্গে গিয়ে মিশেছে প্রায় এক মাইল দূরে। স্টেশনের লাইনের তলা ইট সিমেন্ট দিয়ে জমানো। যেন উপরে ব্রীজ আর নিচে রাস্তা। কিন্তু রাস্তা ঠিক নয়। তলা দিয়ে সরু সরু নালাঁ ঢাকা গলির মত হয়েছে এক একটি খিলানের তলায়। চামচিকের বাস। ইঁদুর, আরশোলা, সাপখোপ, সবকিছুরই যাতায়াত আছে এই সুড়ঙ্গগুলিতে।

নিচে নেমে দেখি, চায়ের দোকান খোলা নেই। শহরটা গুটিসুটি হয়ে ঘুমোচ্ছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে খানিকটা উত্তরদিকে একটু আলোর আভাস চোখে পড়ল। এগিয়ে গেলুম।

দেখলুম আলো জ্বলছে স্টেশনের নিচের একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে। তার মধ্যে কিছু লোক! তা বেশ কিছু, প্রায় জনা চোদ্দ পনর হবে। গোটা দুয়েক সাইকেল রিক্‌শাও ঢোকানো রয়েছে।

আমাকে দেখে সবাই তাকাল। আলো বলতে সাইকেল রিক্‌শার দুটি আলো। বসানো হয়েছে খিলেনের দেয়ালে ছোট ছোট খুপরির মধ্যে। একটি চামচিকে নরকে আবদ্ধ আত্মার মত এপাশে ওপাশে ছট্‌ফট্ করে উড়ছে। আর মানুষগুলিকে ঠিক মানুষ মনে হচ্ছিল না। যেন কতগুলি কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি এক ভিন্ন ভয়াল অন্ধকার রাজ্যের কোণে বসে কিসের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত ছিল, একটি নতুন জীব দেখে চমকে উঠেছে। মুখগুলি যেন অদ্ভুত রং মাখা, বাঁকাচোরা ভাঙা, নাকমুখহীন দলা দলা। শরীরগুলিও সেইরকম। নিজেদের ছায়ার সঙ্গে মিলেমিশে আর একটি প্রাকৃতিক রূপ যেন।

এক মুহূর্ত পরেই নজর করে দেখলুম, সবাই ঘিরে বসেছে দুজনকে মাঝখানে রেখে। একজন পুরুষ আর একজন মেয়েমানুষ। একমাত্র তাদের দুজনেরই নতুন কাপড়।

পুরুষটি কালো, রোগা। খোঁচা খোঁচা চুল, খালি গা। বয়স অনুমান করা যায় না। মেয়েমানুষটির ঘোমটা আছে, তবু মুখ দেখা যায়। সেও কালো, চুলগুলি জট পাকানো। চোখগুলি কোটরে ঢুকে গেছে, দৃষ্টি একটু রোখা রোখা। গায়ে জামা নেই। শরীরের পুষ্টতা চোখে পড়ে। তবে বয়স বলা কঠিন।

আমার মনে হল, এদের অনেককেই আমি চিনি। কিন্তু কোথায় দেখেছি, মনে করতে পারছি নে। আশ্চর্য! তাহলে কি জন্মান্তর বলে কিছু আছে নাকি? এরা কি আমার গতজন্মের চেনাশোনা, নাকি আগের মৃত্যুর পর পৃথিবীর কোন এক অদৃশ্যলোকে এদের দেখেছিলুম।

হঠাৎ একজন বলল আমাকে, 'কে? কি চাই?'

যে বলল, সে একজন আধবুড়ো। তাকে আমি যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে। বললুম. 'কিছু চাইনে। একটু চায়ের দোকানের খোঁজে এসেছিলুম।'

একটি বুড়ির খন্‌খনে গলা শোনা গেল, 'চা তো এখেনে পাবেন না গো বাবুমশাই। এখেনে একটা শুভ কাজ হচ্ছে এখন!'

বলেই বুড়ি হেসে উঠল কেশো গলায়। আরে, বুড়িটা তো চেনা। ও হো! হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। এই বুড়িটি তো, এই স্টেশনের সিঁড়িতে ভিক্ষে করে।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'নিবাস কোথায়? কোথায় যাওয়া হবে?' যে জিজ্ঞেস করল, তাকেও এবার চিনতে পারলুম। সে এখানকার একজন রিক্‌শাওয়ালা। অনেকবার আমার মাল বয়েছে। বললুম, 'যাব তো শ্রীহরির মনোহারি স্টোর্সে। কিন্তু রাত হয়ে গেছে—'

রিক্‌শাওয়ালা অমনি বলে উঠল, 'ও হো! আপনি? সেই রুটি বিস্কুটওয়ালা বাবু তো! সাঁতরাবাবুর দোকানে তো অনেকবার আপনাকে নিয়ে গেছি। তা এত রাতে আর কোথায় যাবেন রুটিওয়ালা বাবু, বসে যান না এখানেই।'

আরও কয়েকজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বসে যান।'

কিন্তু বসব কোথায়। ছাট অবশ্য লাগছে না, লাগবার কোন সম্ভাবনাও নেই। যে কোন ভাল বাড়ির থেকে এ আশ্রয়টি খারাপ নয়। আর বসতে যাবই বা কেন? জিজ্ঞেস করলুম, 'ব্যাপারটা কি হচ্ছে?'

জবাব দিল সেই রিক্‌শাওয়ালাটিই। বলল, 'আপনি অনাথকে চেনেন তো? অনাথ আর কালার বউকে?'

অনাথ আর কালার বউ! কই মনে পড়ছে না তো। তারপরে বুঝলুম, অনাথ আর কালার বউ, দুজনেই ভিক্ষুক। এই শহরেই ভিক্ষে করে। স্টেশনটা তাদের কেন্দ্রস্থল। অনাথ নিতান্তই অনাথ। সে নাকি নদে জেলারই কোন গ্রামের খাঁটি ব্যাঘ্রক্ষত্রিয়দের পূজারী বামুন ছিল। কপালগতিকে এখানে এসে ভিক্ষুক হয়েছে। এমন কি, তার নাকি ভিটেমাটিও ছিল এককালে! বিয়েথা আর হয়নি। কেউ ছিলও না দেবার। এখন 'দরিদ্দর বোরাম্ভনের ছেলেকে একটি পয়সা দিন' বলে ভিক্ষে করে। বয়স দেখায় প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মত। কিন্তু সে বলে, একুশের বেশি নয়।

আর কালার বউ যে কোন্ কালার বউ, তা কেউ জানে না। বৃন্দাবনের কালা নয়, এটা সবাই জানে। গত মন্বন্তরের সময় থেকে এ শহরে আছে। কালা বলে তার এক স্বামী ছিল। সে মারা গেছে। ছেলেমেয়ে ছিল কয়েকটি। তারাও মরে গেছে।

কিছুদিন থেকে অনাথ কালার বউয়ের কাছে প্রেম নিবেদন করছে। এ নিয়ে রাস্তাঘাটে কালার বউ অনাথকে গুষ্টিশুদ্ধ উদ্ধার করেছে। এখনও তার গতর আছে, ভিক্ষে করতেও পারছে। শুধু শুধু অনাথের কাছে থেকে আবার এক গাদা বিয়োবে কেন? অনাথ তাকে খাওয়াবে পরাবে কি? ছেলেপুলে হলে কি পুষবে? ন্যাড়া বেলতলায় যায় কবার! অতই যদি দুঃখ সইতে পারবে কালার বউ, তবে এই শহরে অনেক বাবুর কাছেই সে যেতে পারত। পয়সাও মিলত। কিন্তু রেলপুলের তলায় বিয়োতে হত—

যাক্। কিন্তু অনাথ ভিক্ষে বন্ধ করে প্রায় অনশনে মরতে বসল। কালার বউকে সে ভালবেসেছে, তাকে না পেলে নাকি মরবে।

মরুক। কালার বউ বলেছে, যদি তাকে পেতে হয়, তবে বিয়ে করতে হবে, দরকার হলে খাওয়াতে পরাতে হবে। অনাথ তাইতেই রাজী। মিছিমিছি নয়। ফাঁকি হলে তাকে

কালার বউ এ শহরছাড়া করে ছাড়বে। মেরেধরে তুলো- ধোনাও করতে পারে।

স্টেশনকেন্দ্রের ভিক্ষাজীবী মেয়ে-পুরুষেরা গভীর অভিনিবেশ সহকারে ব্যাপারটি ভেবেছে। তারপর এক বাক্যে রায় দিয়েছে, ভিক্ষুক বলে কি তারা মানুষ নয়, না তাদের আর বিয়ে-থা বলে কিছু নেই! সুতরাং বিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে। সকলে তাদের রুজির পয়সাও দিয়েছে বিয়ের খরচের জন্য। এখানে একটি মন্দিরের সামনে, কপালে সিঁদুর লাগিয়ে আর গলায় রুদ্রাক্ষ দিয়ে একজন ভিক্ষে করে। সে ব্রাহ্মণ। বিয়ের মন্ত্র পড়ার পুরোহিত সে। রিক্‌শাওয়ালা দুজন আছে, তাদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই রাত্রে। মালিকের ঘরে রাত্রে ফিরে না গেলেও ক্ষতি নেই। তারাও বিয়েটা দেখে যাবে। তাছাড়া স্টেশনের লাইসেন্স-বিহীন দুজন কুলি আছে এই বিয়েবাসরে। গুটি তিনেক কুকুর। তারপরে আবার আমি এসে হাজির হলাম আর একজন বাইরের লোক।

এতক্ষণে আমি ভাল করে সকলের মুখের দিকে তাকালাম। চোখাচোখি হতেই অনাথ সলজ্জ হেসে মাথা নিচু করল। কালার বউ ঘোমটা টেনে দিল।

শুনলুম মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে! এবার সাত পাক ঘোরা হবে। এমন সময়ে আমি এসেছি। দেখলুম, শালপাতায় ঢাকা রয়েছে কি সব। বোধ হয় কিছু তেলেভাজা জাতীয় খাবার আনা হয়েছে। কেন না কুকুরগুলি ওই দিকেই চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে।

এখন তর্ক হচ্ছিল বিয়ের অনেক নিয়মকানুন নাকি ঠিক হয় নি। এখানকার অনেকেই এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং রীতিমত বিবাহিত। সাত পাকের আগে সেইটার বিহিত হোক।

বসতে পারলুম না। দাঁড়িয়েই রইলুম। জীবনে যে এমন বিয়ে দেখতে হবে, কোনদিন ভাবিনি। এমন বিয়েও যে আবার হয়, তা জানতুম না। এখানেও যে নিয়মকানুন নিয়ে আবার বাক্‌বিতণ্ডা হতে পারে, সেটাও কল্পনাতীত ব্যাপার।

এবার একটি আধাবুড়ি বলে উঠল, 'আমার কাছে চালাকি চলবে না। সস্তাগণ্ডার দিনে আমার বাপ একশো, এক-আধ টাকা নয়, একশো টাকা খরচ করে বিয়ে দিয়েছিল। ওসব বিয়ের আচার-বিচার আর আমাকে শিখুতে হবে না।'

খনখনে গলা বুড়ি. সননুড়ি চুল দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, 'সে কি তোর একলার। আমার বেতে একশোটা নোক খেয়েছিল। ঢাক ঢোল কাঁসি বাদ্যি বাজনা, সে একেবারে কি কাণ্ড!'

রিক্‌শাওয়ালাটা এবার চটে উঠে বলল, 'আরে দুত্তোর নিকুচি করেছে বাদ্যি বাজনার। আমি এবার আমার গাড়ির বাতি নিয়ে চলে যাব কিন্তু। বলছি তখন থেকে যে, এটা বেওয়ারিশ বিয়ে, চালিয়ে নেও যা হোক করে, তা নয়, এখন আবার আচার-বিচার!' একজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, সময়মত আবার ভোরবেলা গিয়ে কাচারির কোণটাতে আমাকে বসতে হবে। নইলে গাঁয়ের বুড়ো কানাটা এসে বসে পড়বে।'

একটা খোঁড়া ভিখারি বলে উঠল, 'ওদিকে তেলেভাজাগুলি চুপসে জল হয়ে গেল।'

বসন্তের দাগ ধরা ভয়ঙ্করমুখো লোক একটি বলে উঠল, 'অমনি নোলা দিয়ে জল ঝরছে। শালা ভিখারি কোথাকার!'

উপযুক্ত গালাগাল! কিন্তু খোঁড়া গেল ক্ষেপে। বলল, 'কী, জাত তুলে গালাগাল! জানিস, ওকথা বললে বাবুদেরও ছেড়ে দিইনে?'

রিক্‌শাওয়ালা আমার দিকে ফিরে হেসে বলল, 'দেখছেন তো শালাদের কাণ্ড। ভেবেছিলাম আজ এট্রু বায়স্কোপ দেখব। তা'পর ভাবলাম যে, না এ ব্যাটাদের বিয়েটাই দেখে যাই। তা কি ঝগড়াটাই লাগিয়েছে তখন থেকে।'

কিছু বলতে পাবলুম না! হাসতেও পারলুম না। যদি কিছু মনে করে বসে। এরা সকলেই নিজেদের মধ্যে জানাশোনা। আমি অজানা। তা ছাড়া সব মিলিয়ে, এদের সেই করুণ, দয়াভিক্ষা করা কাঁদা কাঁদা ভিখারি মনে হচ্ছিল না এখন। বরং রাগে বিদ্রূপে এই অদ্ভুত পরিবেশে এক অন্য জগতের মানুষ মনে হচ্ছিল। দেখাচ্ছিল আরও ভয়ঙ্কর।

ইতিমধ্যে দুই বুড়িতে তর্কাতর্কি জমে উঠেছে। পুরোহিত হাঁ করে দেখছে সব। কালার বউয়ের চোখে রাগ। অনাথের ব্যস্ত অস্থিরতা।

তারপর অনাথের আর সহ্য হল না। সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'বে-টা হতে দেবে, না উঠে পড়ব! এ তো আর গাঁয়ে ঘরে বিয়ে হচ্ছে না যে নিয়মকানুন সব মানতে হবে। আর যদি বাগড়া দাও তো বল, উঠে পড়ি।'

সব চুপ। কেবল একজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এবার ঘুরিয়ে দেও, ঘুরিয়ে দেও সাত পাক। রাগারাগির দরকার নেই।'

হঠাৎ একটা বাতি নিভে গেল। তেল নেই আর। আরও অন্ধকার হল। একটি বাতির আলোয় আরও ভয়ঙ্কর হল মূর্তিগুলি। আমার ছায়াটা আলাদা আলাদা করে খুঁজলুম, পেলুম না।

খনখনে গলা বুড়ি বলল, 'কত আলো জ্বলেছিল আমার বিয়েতে—'

আধা বুড়ি বলল থেমে থেমে, 'আমার সময়ে আটটা হ্যারিকেন জ্বলেছিল।'

এক চোখ কানা একজন মোটা গলায় বলে উঠল, 'আঃ এবার থামাও ওই কথাগুলি। আমি আর সহ্য করতে পারি না।...'

'আচ্ছা, আচ্ছা ঘোরাও। কালার বউকে তুলতে হয় যে! কে কে তুলবে?'

রিক্‌শাওয়ালা বসেছিল রিক্‌শার উপরেই। হঠাৎ সীটটা চাপড়াতে আরম্ভ করল। বাজনা বাজাচ্ছে।

খোঁড়া উঠল আগে। কালার বউকে তুলবে।

কিন্তু আবার গণ্ডগোল। কনে কালার বউ বলল, 'সাতপাক হবে না, বে হবে না। আমার মন নেই।'

এক মুহূর্ত সব চুপ। অবাক গুলতানি। কেন, কি হল! সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে এখন সীতা কার বাপ!

কালার বউ নীরব। কিন্তু তার রাগ নেই, চোখা চোখা কথা নেই। খালি নীরব। ঘোমটা খসে পড়েছে, জট পাকানো চুলগুলি ছড়িয়ে পড়েছে ঘাড়ে। মুখের একদিকটা দেখা যাচ্ছে না একেবারে। আর একদিক ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা। মানুষ বলে মনে হয় না।

তার পাশে অনাথেব অবস্থা কহতব্য নয়। তিন ভাগ অন্ধকার, এক ভাগ আলোয় অনাথকে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। তার সারা মুখে বোবা অস্থিরতা ও যন্ত্রণা। সে প্রায় ছেলেমানুষের মত চিৎকার করে উঠল, 'ওলো কেন বল...তোর পায়ে পড়ি।'

মনে মনে বললুম, ঠিকই। এছাড়া বরোচিত কথা আর কি বলতে পারত অনাথ।

কালার বউ পরিষ্কার বলে দিল, 'আমি বে করে আর ভিক্ষে মাগতে পারব না। আর কারুর ভিক্ষের ভাতও খেতে পারব না। তা এখন যাই বল।'

সবাই তো হাঁ। তবে কি করতে হবে?

কালার বউ বললে, 'সোম্‌সারে যা করে নোকে। কাজ করে, সোম্‌সার করে। ভিক্ষেই যদি করব, তবে আবার এসব কেন। না বাপু না, এই নেও তোমাদের নতুন শাড়ি—'

বলতে বলতে সে তার ছেঁড়া ধোকড়া ন্যাকড়াটা টেনে নিল পরবে বলে। এখনও

পরনে তার সকলের দেওয়া লালপাড় শাড়ি।

সবাই স্তম্ভিত। অনাথ দেখছে সকলের মুখ। আমার পাশে রিক্‌শাওয়ালাটিও গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

কালার বউ আবার বলল, 'সব গেছে বলেই না আজ ভিখিরি হয়েছি! যদি থাকত! আর আবার যদি হবেই...'

থেমে হঠাৎ ফোঁসফোঁস করে উঠল,...'পেথম যখন বে হয়েছিল।'

রিক্‌শাওয়ালা আরও গম্ভীর; কিন্তু চাপা খুশী চোখে সে কালার বউকে দেখছে। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে খুব বিজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকাতে লাগল। অর্থাৎ, দেখছেন তো।

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে উঠছিল। তিরিশ টাকা আর ছাড়্ মাল খেয়ে আমি বিয়ে করিনি। ভিক্ষুকের বিয়েতে কোথায় একটু মজা দেখছিলুম, তা নয়, ভিখারি বেটির আবার মান। আসরটাকে দিলে জুড়িয়ে।

কালার বউ কাপড় খুলতে যাবে, রিক্‌শাওয়ালা তার গাড়িতে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'দ্যাখ অনাথ, তুই কাজ করতে পারবি?'

অনাথের চোখে আলো দেখা দিল, বললে, 'পারব।'

'চুরি করবিনে?'

'আমি বেরাম্ভনের ছেলে—'

'থাক্, ঢের বেরাম্ভন দেখেছি। ঘর ঝাঁট দিতে পারবি?'

'পারব।'

'বাবুর সঙ্গে কলকাতা থেকে মাল বয়ে নিয়ে আসতে পারবি?'

'খুব খুব।'

'বেশ, আমাদের রিক্‌শা-মালিকদের গদিতে কাল তোকে নিয়ে যাব! কাজ মিলিয়ে দেব।'

এবার আমারই হাঁ হওয়ার পালা। অন্যান্য লোকগুলি পাথর। তারপর হঠাৎ সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'তা হলে অনাথ আর ভিখিরি নয়?'

রিক্‌শাওয়ালা বলল, 'হ্যাঁ, এখনও ভিখিরি। সাতপাকটা দেও ঘুরিয়ে।'

'তা হলে? কি বলিস কালার বউ?'

কালার বউ ঘোমটা টেনে বললে, 'তা হলে হোক্।'

অনাথের আর হাসি ধরে না মুখে। খোঁড়া উঠল সকলের আগে, তারপরে এক চোখ কানা।

সাতপাক ঘোরানো হচ্ছে আর সবাই চীৎকার করছে, 'এবার আমরাও একটা করে বে করব মাইরি-ই-ই...।' তারপর শুভদৃষ্টি। 'আমি ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছি। কেননা বিয়েবাসরটা কেমন যেন ভিজে গেছে। ভিজে ভিজে, কান্না মাখা। একটা অন্য রকমের চাউনি সকলের চোখে। ঠিক ভিক্ষুকের আসর আর নেই।

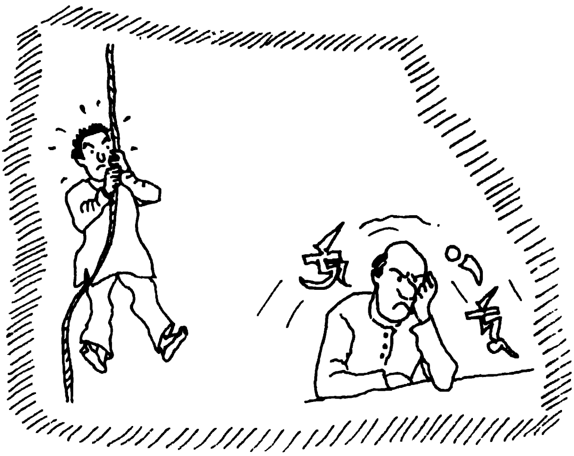
রিক্‌শাওয়ালাটি পেছন পেছন এসে বলল, 'সাঁতরাবাবুর দোকানে যাবেন?'

বললুম, 'হ্যাঁ।'

ওরা তখন খাচ্ছে আর কুকুরগুলি করুণ গলায় কোঁ কোঁ করছে।

পূজা সংখ্যা বনাম প্রেস

হিমনীশ গোস্বামী



রাস্তায় দেখি আমাদের পাড়ার একটি প্রেসেব ম্যানেজার দ্বিজেনবাবু কি সব আপন মনে বকছেন। দূর থেকে তেমন শোনা গেল না, তাই কাছাকাছি গেলাম। তখন শুনতে পেলাম দ্বিজেনবাবু বলছেন, ‘‘দুশো ‘‘র্জ’’ ছশো ‘‘ং’’ একশো ‘‘গু’’ দুশো ‘‘র্ক’’। আমি বললাম, ‘‘দ্বিজেনবাবু আপনি কি বলছেন, আপনার হল কি?’’

দ্বিজেনবাবু বললেন, ‘‘এই তো, মাটি করে দিলে সব। আমি সব এক এক করে ভাবছিলাম, আর তুমি এসে সব গুলিয়ে দিলে!’’

আমি বললাম, ‘‘কি ভাবছিলেন আপনি?’’

দ্বিজেনবাবু বললেন, ‘‘ভাবছিলাম লোকে দু-মুঠো খাবার জন্য কত কি করে।’’

বললাম, ‘‘তবে আপনি র্জ, ং, গু, র্ক, এ সব কথা কি বলছিলেন? ও সবের কোনও মানে হয়?’’

দ্বিজেনবাবু বললেন, ‘‘মানে হবে না কেন—বুর্জোয়ার র্জ, পিকিং এর ং, লণ্ডনের গু, আর নিউ ইয়র্কের র্ক, কিন্তু এতে তো হবে না। আরও বাড়াতে হবে।’’

আমি বললাম, ‘‘ঠিক বুঝতে পারছি না।’’

দ্বিজেনবাবু বললেন, ‘‘ওয়াশিংটনের ং এসে যাবে। আরও ং-এর দরকার হবে।’’

আমি বললাম, ‘‘ওয়াশিংটনের ং এসে যাবে কেন?’’

দ্বিজেনবাবু বললেন, ‘‘ং ছাড়া ওয়াশিংটন আপনি কি দিয়ে লিখবেন? তা ছাড়া এবং-এর ং আছে। ছশোয় কুলোবে কিনা সন্দেহ।’’

আমি বললাম, ‘‘ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন?’’

দ্বিজেনবাবু আমার কথা বোধহয় শুনতেই পেলেন না। তিনি বলতে লাগলেন, ‘‘এর

পব আছে আবার হংকং, ইয়াং-সিকিয়াং। হাজার খানেক ং দরকার।"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "আর বলো না ভাই। এই আমার ব্যবসা। পুজোর সময়ে পত্রিকা ছাপিয়ে যা হয়, বছর প্রায় চলে যায়। তারপর কাজ পাই না তা নয়, কিন্তু সে সব টাকা আটকে থাকে—বহুদিন তাগাদা দিতে হয়, তাই আমাদের চেষ্টা এই যে, যত বেশি সম্ভব পুজো সংখ্যার পত্রিকা ছাপি। কিন্তু ছাপাতে গেলে টাইপ কিনতে হয়—নিজে তো টাইপ বানাই না। কিছু কিছু টাইপ অবশ্য মজুদ থাকেই—কিন্তু হঠাৎ এক এক টাইপের বেশ দরকার হয়ে পড়ে! তখন হঠাৎ সেরকম টাইপ না পেলে কাজের ক্ষতি হয়। তাই হিসেব করছিলাম এবারে কি টাইপ বিশেষ প্রয়োজন হতে পারে!"

আমি বললাম, "ও, বিশেষ টাইপের কথা ভাবছিলেন বুঝি?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "হ্যাঁ ভাই, ভাবছিলাম। কত রকম যে এর হিসেব আছে, তার কি সীমা আছে? পুজো সংখ্যা যখন, তখন সুন্দর, শক্তি, ভক্তি এসব কথার বান ডাকবে। অতএব এক মাস আগে থাকতেই আমি ন্দ, ক্ত, এসব জমিয়ে রেখেছি। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধে হয় ঐ কমিউনিস্টদের বেলায়। ওরা আমাকে দিয়ে মাঝে মাঝে কাগজ ছাপিয়ে নেয়—কি করি, ব্যবসার খাতিরে সবাইয়ের সঙ্গেই ভাবটাব রাখতে হয়। কিন্তু ওদের ঠিক থাকে না সব সময়। কত ফর্মা হবে, কে লিখবে, এক বই ঘণ্টায় ঘণ্টায় পালটে যায়, কিন্তু ওরা টাকা দেয় ভাল—ওদের জন্য 'র্জ' কিছু রাখি। রাখতেই হয়।"

"কেন?"

"বুঝলে না? ওরা প্রবন্ধ লিখলেই বুর্জোয়া কথাটা ব্যবহার করবেই। প্রতি তিন লাইনে একটা বুর্জোয়া। ষোল পাতার ফর্মা, ওখানেই চলে গেল আটচল্লিশটা র্জ, অন্তত তিন চার ফর্মার জন্য 'প্রস্তুত থাকতে হয়, তাই শ দুই র্জ আনতে হবে, তাই ভাবছিলাম। এ গেল এক্সট্রা—আমার র্জ একেবারে নেই তা নয়। কবিরাও র্জ তো কম ব্যবহার করে না!"

"কবিরাও? ওরাও কি কমিউনিস্ট?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "সব কবিই যে কমিউনিস্ট তা নয়—তবে মোটামুটি আমার ধারণা, অধিকাংশ কমিউনিস্ট, নইলে ওরা প্রায়ই জর্জর হয় কেন? কবিতা পড়লেই দেখবেন কবিরা বেদনায় ধুঁকছে। অধিকাংশই জর্জর।"

"আর আপনারও র্জ-এর প্রয়োজন বেড়ে যায়?"

"প্রয়োজন আরও অনেক কারণে বাড়ে। আরে সেবার সমস্ত লেখা কম্পোজ হয়ে গিয়েছে—একদল এসে বলল একটা পুস্তিকা ছাপাবে—ষোল পাতার। লিখবে তারাপদ।"

"ঐ যে রেস্তোরাঁয় বেয়ারাগিরি করে সেই?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "সেই তারাপদ। ওর দেশ ভক্তি এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে কিছু ছাপতে না পারলে ও ঠিক থাকতে পারছে না। আমি ভেবেছিলাম ও যখন লিখবে তখন খুব বিরাট কিছু হাঙ্গামা বাধাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি তর্জন গর্জন!"

"তর্জন গর্জন?"

"ভারি তর্জন গর্জন। অসম্ভব তর্জন গর্জন। দেশে নাকি কালোবাজারী কুমির আর টাটা বিড়লার উৎপাত সুরু হয়েছে, যে জন্য দেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে, এই সব বড় বড় বাত মশাই। তারাপদ যে আমাকে ডোবাবে ভাবিনি!"

"আপনাকে তারাপদ ডুবিয়েছে?"

"মশাই, ওর জন্য সেবার একটি ফর্মায় দেড়শো র্জ লেগেছিল!"

"দেড়শো?"

দ্বিজেনবাবু আক্ষেপের সঙ্গে বললেন, "দেড়শো। প্রথম দু-পাতা ধরে তো বিদেশি জিনিস বর্জন সম্বন্ধে বিরাট বক্তৃতা। তারপর বৈপ্লবিক কথাবার্তা—সার্জারি কথাটা ব্যবহার করলো পঁচিশবার। তাও ভাল অস্ত্রোপচার করেনি—তাহলে যেতাম।"

"অস্ত্রোপচার করলে আপনি যেতেন কেন?"

"অস্ত্রোপচার করলে কেউ বাঁচে? যাই হক্—সে কথা ঠিক নয়। আমার স্ত্রী মাত্র দশটা ছিল শেষমেষ।"

"শেষমেষ কেন? এর আগে স্ত্রী খুব ব্যবহার করে ফেলেছিলেন বুঝি?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "আমি ব্যবহার করব কেন? এইটুকু পুচকে মেয়ে—হারুদার মেয়ে চপলা, সে পাড়ার ম্যাগাজিনে স্ত্রী স্বাধীনতা নিয়ে এক পেল্লাই প্রবন্ধ লিখেছিল, বাস আমার স্ত্রী খতম। এবারে প্রচুর স্ত্রী মজুদ রেখেছি ফিডেল কাস্ত্রোর জন্য।'

দ্বিজেনবাবু বললেন, "না। স্ত্রী স্বাধীনতা হয়ে গেছে। আর বোধহয় প্রয়োজন হবে না।"

বললাম, "শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় ভাবছেন স্ত্রী স্বাধীনতা এসে গেছে?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "না তা নয়, কয়েক মাস আগে চপলার বিয়ে হয়ে গেছে। ভাল বিয়ে হয়েছে। বাবা দেখে শুনে পাত্রটি যোগাড় করেছিলেন ভাল।"

আমি বললাম, 'জানি।"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "প্রেসের কাজে বড় ঝন্‌ঝাট মশাই। আমরা কয়েকটা র্দু রাখি। সেবারে আমাদের প্রেস থেকে একটি নতুন লোক র্দু চুরি করে সরে পড়ল। দু-সের র্দু ছিল মশাই। অত ভাল র্দু কি আর পাব? সেই ইংরেজ আমলের র্দু। ভাল র্দু মশাই!"

"দূর মশাই, কি বলছেন?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "র্দু মশাই বলেছি। দূর মশাই বলিনি।"

"কিন্তু আমি শুনলাম যেন..."

"ভুল শুনেছ।"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "কত আর বলব। বেশি টাকা নেই যে একটা ফাউন্ড্রি বানাই। তাহলে কি আর এই পচা প্রেসের কাজ করতে হয়? রাজার হালে বসে বিন্দু বানাও, বিসর্গ বানাও, চন্দ্রবিন্দু দেওয়া যত রকমের অক্ষর বানাও। সেরকম কাজ করে সুখ আছে মশাই, সুখ আছে। কিন্তু প্রেস চালানোর মত বদ কাজ আর নেই।"

বললাম, "তবে যে শুনি সম্পাদকদের মত বদ কাজ আর হয় না?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "ভুল। ভুল শুনেছ।"

বলতে না বলতেই চলতি একটা ট্রামে উঠে পড়লেন।

হঠাৎ কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল। এমন সময় দেখি প্রিয়ব্রতবাবু দৌড়ুতে দৌড়ুতে একটা থামের আড়ালে গেলেন, আর সেখানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগলেন।

বললাম, "ও প্রিয়ব্রতবাবু, হল কি?"

প্রিয়ব্রতবাবু একজন লেখক। তাঁর দু-খানা বই সিনেমাওয়ালা কিনেছে, আর দু-খানা বই পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে—বিরাট নামকরা লোক।

আমি গিয়ে বললাম আবার—"ও প্রিয়ব্রতবাবু, হল কি?"

প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, "দড়ি বেয়ে নেমে এলাম।"

"আপনি তো তেতলায় থাকেন? সেখান থেকে দড়ি বেয়ে নেমে এলেন?"

"নেমে এলাম।" তিনি বললেন।

"কেন? পুলিশ?"

প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, "পুলিশ হলে মশাই হাসিমুখে দাঁড়ানো যায়। এক সম্পাদক দেখা করতে এসেছিলেন।"

"কেন?"

"মশাই, আর বলবেন না। উপন্যাস দেব বলেছিলাম—দিয়েছি, কিন্তু ভুল করে, নেহাত ভুল করে একটা ছোটগল্পও ওর মধ্যে চলে গিয়েছে—সে গল্পটা অন্য একটি কাগজের জন্য লিখেছিলাম। এখন মুশকিল হয়েছে কি, এরা তো আমার উপন্যাসের মধ্যে ছোটগল্পটা ছেপে দিয়েছে—ছাপা হয়ে গিয়েছে—আর উপায় নেই—কি রকম অসংলগ্ন ব্যাপাব বুঝতেই পারছেন। তাই আর কি, সম্পাদকের চাকরি যায় যায়। এখন তিনি একটা পকেট হাতুড়ি নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন, তাই দেখেই দড়ি বেয়ে নেমে এসেছি।"

"দড়ি বেয়ে! দড়ি কোথায় পেলেন?"

"বহুদিন আগে থেকেই দড়ির খেলা শুরু করেছি। গোলমাল তো আজ নতুন হল না। একবার একটি ছোট গল্প লিখেছিলাম, তার নাম দিয়েছিলাম 'ভুবন তো আজ হল কাঙাল'। বাস্ আমাব প্রাণ অতিষ্ঠ।

"কেন?"

"মাসিকপত্রের মালিকের নাম ভুবন জানতাম না। শেষ পর্যন্ত নাম বদলে দিতে বাধ্য হলাম!"

"কি নাম দিলেন?"

"সুবীর তো আজ হল কাঙাল!"

"কেল্লা ফতে?"

"না। শেষ পর্যন্ত আর্টিস্ট হেডপীস করল, 'সুবীর তো আজ হল বাঙাল'! কেউ লক্ষ্য করেনি। যখন ছাপা হল তখন মালিক বললেন সম্পাদককে, 'এ কিডা লিখছে?' বুঝুন ঠ্যালা, সম্পাদক দুজন গুণ্ডা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ দড়ির খেলায় বেঁচে গিয়েছিলাম।"

আমি ভাবছিলাম পুজো সংখ্যার লেখকের দুরবস্থার কথা। জিজ্ঞেস করলাম, "এবারে কতগুলো লিখছেন?"

প্রিয়ব্রতবাবু বললেন. "সাতখানা উপন্যাস, পনেরোটা গল্প আর ছটি কবিতা।"

"কবিতা?"

"কবিতা লিখতে পারি জানতাম না। একবার একটি সম্পাদক আমাকে লেখার জন্য চিঠি লিখলেন, পঁচিশ টাকা দেবেন একটি পুজো সংখ্যার গল্পের জন্য। আমি লিখলাম : ভাই, কি করে লিখি। টাকাও তো বেশি নয়। জামা কাপড় ইত্যাদি বাবদ যা খরচ হবে তার জন্য পঁচিশ টাকা অতি সামান্য নয় কি? পঞ্চাশ হলে দেখতে পারি। ইতি।

তারপর আর কোন সাড়া নেই। দেখি ওরা কবিতা বিভাগে ঐ চিঠিটাই ছেপেছে—

ভাই,
গল্প কি করে
লিখি?
টাকাও তো বেশি নয়।
জামা কাপড়
ইত্যাদি বাবদ
যা খরচ হবে তার
জন্য পঁচিশ
টাকা অতি
সামান্য।
নয় কি? পঞ্চাশ হলে
দেখতে পারি।

তারপর থেকে কবিতাও লিখতে শুরু করেছি।"

বললাম, "কিন্তু অতগুলো উপন্যাস লেখা কি কম পরিশ্রমের?"

প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, "বড় উপন্যাস তো লিখি না। ঐ এক-একখানা দশবারো পাতার উপন্যাস লিখি।"

আমি বললাম, "অত ছোটকে উপন্যাস বলেন কেন?"

প্রিয়ব্রতবাবু বললেন, "এককালে যেগুলোকে রসমুণ্ডি বলা হত তার নাম আজকাল রসগোল্লা হয়েছে, দেখেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"এও তাই। শুনছি দু-একজন বড় ঔপন্যাসিক তিন পাতার উপন্যাসও লিখতে লেগে গিয়েছেন।"

তারপর প্রিয়ব্রতবাবু দেখলেন দূরে, কে যেন চলে যাচ্ছে। তারপর বললেন, "আজ আসি?"

বললাম, "যান, আপনার কাজ পড়ে রয়েছে!"

প্রিয়ব্রতবাবু চলে গেলেন।

খানিকপর দেখি দ্বিজেনবাবু ফিরছেন রিকশোয় করে। আমাকে দেখে রিকশো থামালেন। বললেন, "সর্বনাশ হয়েছে, সব পেলাম কিন্তু ং আর পেলাম না। খুব কাটতি হয়েছে ঐ ং-এর। ভারত তিব্বত আর চীন সীমান্ত নিয়ে সব পত্রিকাতেই দুটো করে গড়ে প্রবন্ধ যাচ্ছে।"

বললাম, "এবারে তাহলে কি করবেন?"

দ্বিজেনবাবু বললেন, "এবং গুলো কেটে ও করব। আর কিছু কিছু ঙ দিয়েও কাজ চালাব। চালাতেই হবে! উপায় কি?"

তীর্থের ফল

শঙ্কু মহারাজ

হিমালয় শুধু শিবালয় নয়, তপোভূমিও বটে। যুগে যুগে সংসারপ্রিয় মানুষ হিমালয়ে গিয়ে মায়ামুক্ত হয়েছেন। দলে দলে সাধু-সন্ত হিমালয়কে তাঁদের নিবাস নির্বাচিত করেছেন। অসংখ্য সংসারী হিমালয়ে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে শ্রদ্ধেয় স্বামী সারদানন্দজীর কথা। পণ্ডিত মানুষ ছিলেন সারদানন্দ এবং তাঁর পাণ্ডিত্য কেবল বেদ-পুরাণ কিম্বা রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সন্ন্যাসপূর্ব জীবনে তিনি ছিলেন একজন গ্র্যাজুয়েট-ইঞ্জিনিয়ার। সন্ন্যাস-জীবনে গঙ্গার সৃষ্টি ও প্রবাহ নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। মানুষের দেহে ও মনে উচ্চতা ও শীতের প্রভাব উপলব্ধির জন্য তিনি সারা শীতকাল তুষারাবৃত গোমুখীতে (১২,৭৭০ ফুট) কাটিয়েছেন। সেইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপরে প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

এই সুপণ্ডিত স্নেহশীল সমাজসেবী সন্ন্যাসীর কিন্তু প্রথম জীবনে সন্ন্যাস নেবার কোন বাসনা ছিল না। সমাজের অন্য দশজন কৃতী যুবকের মতো তিনিও লেখা-পড়া চাকরি-বাকরি ও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে জীবন কাটাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেপথে এগিয়েও ছিলেন অনেকটা। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ভাল চাকরি পেয়ে গেলেন। প্রায় সমবয়সী এক নিকট আত্মীয়াকে ভালবাসতেন তিনি। তাকেই বিয়ে করতে চাইলেন। প্রবল বাধা এল পরিবারের প্রায় প্রত্যেকের কাছ থেকে। প্রেমিক-প্রেমিকা আত্মীয়স্বজনদের অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁরা কিছুতেই সম্মত হলেন না। শেষ পর্যন্ত যুবক-যুবতী বলতে বাধ্য হলেন, বিয়ে না দিলে তাঁরা দুজনেই আত্মঘাতী হবেন। সমাজ সংস্কারকগণ তাতেও মত পরিবর্তন করলেন না।

আত্মহত্যা করতে পারলেন না সারদানন্দ। ব্যর্থ প্রেমিক গৃহত্যাগ করলেন, পালিয়ে গেলেন হিমালয়ে। গিয়ে উঠলেন ঋষিকেশের শিবানন্দ আশ্রমে। ধ্যানমৌনী হিমালয় তাঁর দেহ ও মনে এক অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার শুরু করে দিল। হিমালয়ের প্রভাবে তিনি তাঁর সেই প্রিয়তমাকে প্রায় বিস্মৃত হয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে হিমালয় তাঁকে সংসারের সকল চাওয়া ও পাওয়ার উর্ধ্বে স্থাপিত করল। স্বামী শিবানন্দের কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

পাত্র ও পাত্রীর পিতা-মাতা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। প্রথমে নিজেরা এবং পরে মেয়েটিকে নিয়ে ঋষিকেশ এলেন। অনেক বোঝালেন তাঁকে কিন্তু ইতিমধ্যে প্রেমিক ইঞ্জিনিয়ার সর্বত্যাগী স্বামী সাবদানন্দে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রাক্তন প্রেয়সীকে পরামর্শ দিলেন—ঘরে ফিরে যাও। আর কাউকে বিয়ে করে সুখী হও। আমাকে ক্ষমা করো।

পাছে আবার তাঁরা এসে তাঁকে বিরক্ত করেন, তাই স্বামীজী ঋষিকেশ থেকে গঙ্গোত্রী চলে গেলেন। এবং সেখানেই স্থায়ী হলেন।

এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে আমাদের দেশে। হিমালয় অসংখ্য সংসারীকে সন্ন্যাসী করেছে। কিন্তু হিমালয় কাউকে সংসারী করেছে, এমন সংবাদ আপনাদের জানা আছে কি?

নেই বোধকরি। কিন্তু আমার আছে। আর সেই কাহিনী শোনাবার জন্যই আজ আমি এখানে এসেছি। ঘটনাটি কিন্তু বেশ পুরনো। প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার।

সেটি হিমালয়ের পথে আমার প্রথম পদযাত্রা, কেদার-বদ্রী যাত্রা। হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ ও দেবপ্রয়াগ হয়ে আমি বাসযোগে রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছলাম। আর সেখানেই ধর্মশালায় আলাপ হয়ে গেল ওদের সঙ্গে—নিতাইদা, শ্যামলদা ও নির্মল। নির্মল আমার চেয়ে কিছু ছোট, বছর একুশ। শ্যামলদা কয়েক বছরের বড়, বছর বত্রিশ। নিতাইদা আমাদের চেয়ে অনেক বড়, তাঁর বয়স পাঁচের ঘরে। তিনি স্বেচ্ছায় শিং ভেঙে বাছুরের দলভুক্ত হয়েছেন।

আমার ও নির্মলের তখনও বিয়ে করার সময় হয় নি। শ্যামলদা বিয়ে করেছেন কিন্তু নিতাইদা অকৃতদার। তাঁর মাথায় টাক, মুখে কাঁচাপাকা বড়-বড় দাড়ি। তিনি বামুন মানুষ। ঠাকুর-দেবতার প্রতি গভীর বিশ্বাস। তাঁর পেশা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতা আর নেশা তীর্থদর্শন।

ঋষিকেশে ওদের তিনজনের আলাপ হয়েছে। এক বাসে রুদ্রপ্রয়াগে এসেছে, একসঙ্গে কেদার-বদ্রী দর্শন করবে। এবং নিতাইদা ওদের নেতা। পরিচয়ের পরে তিনি আমারও নেতা হয়ে গেলেন। আমি ওদের সহযাত্রী হলাম। ভালই হল। একা ছিলাম, চারজনের একজন হয়ে গেলাম।

তাছাড়া নিতাইদার কেবল বয়স বাড়েনি, সেইসঙ্গে অভিজ্ঞতাও। তিনি অবিবাহিত। ঘরে বৃদ্ধা মা ছাড়া আর কেউ নেই।

দুর্গম গিরিতীর্থের পথে রান্নাকে অবশ্য সবাই যতটা সম্ভব সরল করে নেয়। এরই মাঝে একদিন নিতাইদা 'অর্ডার' দিয়ে বসলেন—আজ ডাল-ভাত আর আলুপোস্ত হবে।

—আলুপোস্ত! অবাক নির্মল প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে—পোস্ত কোথায় পাব?

—আছে, আছে। কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছি।

—রাঁধবে কে?

—আমি, নিতাইদা।

—তাহলেই হয়েছে।

—কী হবে?

—আলু-পোড়া!

নিতাইদা নির্মলের দিকে তেড়ে যান। নির্মল ঘরের বাইরে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।

ব্যর্থ নিতাইদা ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসেন নিজের কম্বলশয্যায়। তারপরে মন্তব্য করেন, ছেলেটা খারাপ নয়, তবে বড্ড ডেঁপো।

আমরা মৃদু হাসি। তিনি শুয়ে পড়েন। একটু বাদে বলেন—চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছ?

শ্যামলদা মাথা নাড়েন।

নিতাইদা আবার বলেন—চা খেয়ে আমি একটু ঘুমিয়ে নেব। বড্ড 'টায়ার্ড' লাগছে। শরীরের কী দোষ বল। সারাদিন যা ধকল গিয়েছে। তার ওপরে ঐ ছেলেটা আবার

ছোটাছুটি করিয়ে ছাড়লে। যাকগে, চা খেয়ে নিয়ে তোমরা ডাল-ভাত ফুটিয়ে ফেলো। তারপরে আমাকে ডেকে দিয়ো। আমি ফটাফট আলুপোস্ত বানিয়ে ফেলব।

ফেলেছিলেন। তবে তা মুখে দিয়ে নির্মল বলে উঠেছে— আগে ভেবেছিলাম তুমি অন্তত আলু-পোড়া রাঁধতে পারবে, এখন দেখছি তাও পারনি। আলুগুলো সেদ্ধই হয়নি, কাঁচা রয়েছে। এটা হয়েছে পোস্ত-পোড়া।

তাহলেও আমরা কিন্তু নিতাইদার পোস্ত-পোড়া ফেলে দিতে পারি নি। সবটুকু নিঃশেষে গলাধঃকরণ করে জঠরাগ্নির জ্বালা কমিয়েছি।

এই প্রসঙ্গে একটি দিনের ঘটনা বললেই তাঁর হিন্দিজ্ঞানের সম্যক পরিচয় দেওয়া যাবে। সেদিন সন্ধ্যার আগে আমরা কেদারনাথ থেকে বদ্রীনাথের পথে উখীমঠে পৌঁছেছি। উচ্চতা কম, মাত্র ৪৩০০ ফুট। আর এই উচ্চতা জানার পরেই নিতাইদার মনে হল, এখানে মশা থাকতে পারে। কথাটা জিজ্ঞেস করলেন আমাদের। আমরা তো আগে কখনও উখীমঠে যাইনি। তাই তাঁকে মশার খবর দিতে পারলাম না।

আমাদের অজ্ঞতা নিতাইদাকে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ করতে পারল না। তিনি বললেন—ঠিক আছে। তোমরা চা বানাও, আমি ধর্মশালার চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করে আসছি।

—কিন্তু মশা যদি থেকেই থাকে, তুমি তাদের কী করবে? নির্মল নীরব থাকতে পারে না।

নিতাইদা সহাস্যবদনে উত্তর দেন—মশার বংশ ধ্বংস করব।

—কেমন করে?

—গন্ধক পুড়িয়ে।

তিনি ছুটলেন চৌকিদারের কাছে। শ্যামলদা চায়ের জল চড়িয়ে দিলেন।

চা হয়ে যায়, নেতার দেখা নেই। একসময় আমাদের চা-পান পর্বও শেষ হয়। নিতাইদা ফিরে আসেন না। এদিকে তাঁর চা জুড়িয়ে জল। এত দেরি তো হওয়া উচিত নয়। ছোট ধর্মশালা। সদর দরজার সামনেই চৌকিদার বসেছিলেন। না, আর দেরি করা উচিত হবে না।

নির্মলকে নিয়ে বেরিয়ে আসি বাইরে। দেখতে পাই তাঁকে। অনতিদূরে চৌকিদার। দুজনকেই ঘিরে আছে কয়েকজন। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, যাতে তাঁরা হাতাহাতি না করতে পারেন। দুজনেই সমানে চিৎকার করছেন। অর্থাৎ এখনও নিতাইদা তাঁর মুঙ্গেরি হিন্দি চালিয়ে যাচ্ছেন।

তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে আসি। আমাদের দেখতে পেয়ে তাঁর গলার জোর আরও বেড়ে যায়। তিনি আবার বলে ওঠেন—আরে ছোড় দেও ঐসব ওস্তাদিকা বাত। হামলোক তোমারা কই পরোয়া নাহি করতা। নিকাল দেগা ধর্মশালা থেকে। হামলোক যাত্রী হ্যায়। যাত্রীকা জন্যই তো ধর্মশালা।

অনেক কষ্টে হাসি সামলে তাঁকে শান্ত করতে সমর্থ হই। তারপরে জিজ্ঞেস করি—কী হয়েছে বলুন তো?

—কী আর হবে? আমি মশার কথা জিজ্ঞেস করতেই লোকটার কী মেজাজ। বলল, চুপচাপ রহো। বেশি কথা বললে ধর্মশালা থেকে নিকাল দেগা। মামদোবাজি...

কিন্তু মশার সংবাদ জানতে চাওয়ায় চৌকিদার তাঁকে চুপচাপ থাকতে বললেন কেন?

কেনই বা বললেন যে বেশি কথা বললে আমাদের ধর্মশালা থেকে তাড়িয়ে দেবেন? এটা তো জৈন-ধর্মশালা নয় যে মশা মারা পাপ বলে বিবেচিত হবে।

—আচ্ছা আপনি ওকে কী বলেছিলেন? নির্মল আবার জিজ্ঞেস করে।

—কী আর বলব? বললাম, ভাইসাব এখানে মশা...

—না, না, বাংলা নয়। আপনি হিন্দিতে কী বললেন?

—বললাম, ভাইসাব ইধারমে মচ্ছি মিলতা হায়?

—মচ্ছি বলেছেন?

—হ্যাঁ। মশাব হিন্দি তো মচ্ছি।

—না মশাকে হিন্দিতে মচ্ছর বলে।

—তাহলে মচ্ছি মানে কী?

—মাছ। আর তাতেই এই নিবামিষ অঞ্চলের নিরামিষাশী চৌকিদারজী রেগে গিয়েছেন। উনি কেমন করে জানবেন যে আপনার মুঙ্গেরি হিন্দিতে মশাকে মচ্ছি বলে।

—ইস! তাহলে তো আমারই ভুল হয়ে গেছে! যাকগে, তোমরা লোকটাকে একটু বুঝিয়ে দাও। আমি আবার কী বলতে কী বলে ফেলব।

নিতাইদার আরেকটা বড় ব্যাপার হল প্রতিদিন প্রত্যুষে গীতা পাঠ। জগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত একখানি পকেটগীতা ও একখানি বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম-পদ্ধতি তাঁর ঝোলায় থাকে। তিনি নিয়মিত তাদের সদ্ব্যবহার করেন। ফলে সেই শীতের সকালে আমাদের মৌ-ঘুমটি মাঠে মারা পড়ত। তাঁর চিৎকারে ঘুম ভেঙে যেত।

পূজা-পাঠের ওপবে প্রবল আকর্ষণ ছিল নিতাইদার। কেনই বা হবে না? একে অকৃতদার, তার ওপরে বয়স্ক ব্রাহ্মণ। তাই কেদারেব পথে গুপ্তকাশী থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর পুজোর পালা। আর প্রায় প্রতিদিনই পুজোর সময়ে নির্মলের সঙ্গে গোলমাল বেঁধেছে।

ঠাকুর দেবতার ওপরে তাঁর যেমন আকর্ষণ, তেমনি বিকর্ষণ মেয়েদের প্রতি। প্রায় বলতেন—WOMAN মানে WOE OF MAN। দেখিস নি, ওদের জন্য সোনার লঙ্কা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, ট্রয়নগরী ধ্বংস হল।

পথে কোন মহিলা, বিশেষ করে যুবতী যাত্রীর দিকে তাকালে আমাদের আর রক্ষে থাকত না। আর দুষ্টু নির্মল তাঁকে রাগিয়ে দেবার জন্য ইচ্ছে করে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলত। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইদার লেকচার— ক্যারেকটার মানে চরিত্র হচ্ছে আসল কথা। চরিত্র ঠিক রাখতে না পারলে, জীবনে কিছুই করতে পারবি না। আরে এ হল দেবতাত্মা। হিমালয়ের পুণ্যপথ। এ পথ চরিত্রহীনদের জন্য নয়। আর কাকেই বা দোষ দেব? সর্বনাশ করেছেন প্রবোধ সান্যাল। তিনি নিজে মহাপ্রস্থানের পথে এসে এক রানী জুটিয়ে নিয়েছিলেন। ছেলে-ছোকরারা এখন রানী খুঁজতে হিমালয়ে আসছে।

বিয়ের ব্যাপারেও বড়ই 'অ্যালার্জি' নিতাইদার। ফলে আমাদের দলের একমাত্র বিবাহিত সদস্য শ্যামলদাকে কম কথা শুনতে হয় নি। পথের ক্লান্তি কিম্বা অন্য কোন কারণে শ্যামলদা কিছুক্ষণ কথা না বললেই নিতাইদা জিজ্ঞেস করে বসতেন—কিরে বউয়ের কথা মনে পড়েছে বুঝি?

লাজুক শ্যামলদা তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েছেন—না না। কী যে বলেন?

—বাপু হে, ঠিকই বলি। আর তাই তো জিজ্ঞেস করি, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয

কেন? বিয়ে মানেই তো পরাধীনতা, একটা মাথামোটা মেয়ের পায়ে আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়া। সারাদিন ঘ্যানঘ্যানানি, প্যানপ্যানানি আর মায়াকান্না শুনে লাইফ-কে হেল করে তোলা। দেখিসনি, অমন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রকেও সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে হয়েছিল।

শ্যামলদা শান্ত মানুষ, তিনি নীরব থাকেন কিন্তু নির্মল প্রতিবাদ করে—সীতা দেবীর মতো আদর্শ স্ত্রী কিন্তু যে কোন সমাজের গৌরব।

—তোর আর কথা কী? তুই তো এখন সব মেয়েকেই সীতা বলে মনে করছিস, পরে বুঝবি ঠেলা।

—আপনি বুঝি ঐ ঠেলার ভয়েই বিয়ে করতে সাহসী হলেন না?

এসব সত্ত্বেও নিতাইদার নেতৃত্বে আমাদের কেদার-বদ্রী যাত্রা বড় আনন্দময় হয়েছে। তিনি যেমন শাসন করেছেন, তেমনি সর্বদা আমাদের নিরাপত্তার প্রতি নজর রেখেছেন। এক কথায় নিতাইদার পরিচালনায় আমাদের তীর্থযাত্রা সার্থক ও আনন্দময় হয়ে উঠল।

হাওড়ায় ফিরে এসে মন খারাপ হয়ে যায়। এতগুলো দিন সুখে-দুঃখে একসঙ্গে কাটিয়েছি, এবারে নিতে হবে বিদায়। তাই বিদায় বেলায় দুজনেই কেঁদে ফেলল। আর ওদের কান্না দেখে আমাদের চোখে জল এসে গেল।

সেদিন হাওড়ায় হাসি আর কান্নার মাঝে বিদায় নিলেও নিতাইদার বাড়িতে যেতে আড়াই মাস কেটে গিয়েছিল। জৈষ্ঠ্যের শেষে আমরা কেদার-বদ্রী থেকে ফিরে এসেছি, আষাঢ় ও শ্রাবণ চলে গেল। ভাদ্রের এক রবিবারে সকালে নিজের থেকে নির্মল আমার বাড়িতে এসে হাজির হল। না হলে হয়ত আর যাওয়া হত না। এবং তাহলেই বোধকরি ভাল ছিল।

কিন্তু সেকথা এখন থাক। তার আগে নিতাইদার নেমন্তন্ন রক্ষা করার কথাই বলা যাক। ঢাকুরিয়া থেকে শেয়ালদা হয়ে আমরা নৈহাটি এলাম, স্টেশনে নেমে হাঁটাপথে প্রায় মাইলখানেক। কাঁচা রাস্তা, ভাদ্র মাস। সুতরাং জল-কাদার পথটুকু পেরোতে কষ্ট কিছু কম হল না। তাহলেও একসময় আমরা নেতার বাড়ির সামনে পৌঁছে গেলাম।

উদ্বাস্তু-উপনিবেশের বাড়ি। টিনের চাল আর দরমার বেড়ার ঘর। মেঝে বাঁধান। বিদ্যুৎ আসে নি। তাই দরজায় কলিং-বেল পেলাম না। কড়া নাড়তে হল এবং নির্মল খুব জোরে জোরে নাড়তে থাকল। উদ্দেশ্য, দেখা হবার আগেই নিতাইদাকে খানিকটা রাগিয়ে দেওয়া।

উদ্দেশ্য সফল হয়। ভেতর থেকে বিরক্ত কণ্ঠস্বর কানে আসে। আরে, এত জোরে কড়া নাড়ছেন কে? আসছি। আসতে তো একটু সময় লাগে।

হ্যাঁ, নিতাইদা নিজেই দরজা খোলেন। কিন্তু এ কোন্ নিতাইদা? তাঁর দাড়ি কোথায় গেল? অমন সাধের দাড়ি কামিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু এই বয়সে কি বয়স কমাবার ইচ্ছে হয়েছে? কিন্তু বয়স কি কখনও কমে?

দাড়ির চেয়েও বড় ব্যাপার কোথায় তাঁর সেই উচ্ছ্বাস? বরং আমাদের দেখতে পেয়ে যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। কোনমতে বলে ফেললেন—আরে তোমরা! তা বেশ, বেশ, এসো এসো, ভেতরে এসো।

এমন শীতল অভ্যর্থনা তো আশা করি নি। ভেবেছি, আমাদের দেখামাত্র চেঁচামেচি করে পাড়া মাতিয়ে তুলবেন।

তাহলেও ভেতরে আসি। এবং এসে আরও অবাক হই। এ তো ব্যাচেলারের গুহা নয়, সুসজ্জিত শয়নকক্ষ। ঘরখানি আকারে বেশ বড়। কিন্তু বিস্ময় সেজন্য নয়। বিস্মিত হচ্ছি গৃহসজ্জা দেখে। জানলা ও দরজায় সুদৃশ্য পর্দা। ঝকঝকে আসবাবপত্র-আলনা, আলমারি, ড্রেসিংটেবিল্, রেডিও আর গদিওয়ালা খাট, ডাবল বেড।

এ কার ঘর! কিন্তু নিতাইদা যে বলেছেন, বুড়ো মা ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই তাঁর। তাছাড়া নিতাইদা আমাদের এ ঘরেই বসতে বলেছেন। হ্যাঁ, এটাই নিতাইদার ঘর। তার মানে এতদিন যেমন ভেবেছি, নিতাইদা মোটেই তেমনটি নন। আসলে মানুষটি বেশ সৌখিন।

আমরা সেই নরম বিছানায় বসার পর নিতাইদা আমাদের সঙ্গে দু-চারটি মামুলি কথাবার্তা বললেন। তারপরেই একটু আসছি বলে ভেতরে চলে গেলেন। আমরা দুজনে আবার ঘরখানি দেখতে থাকি। হঠাৎ নজর পড়ে ড্রেসিং টেব্‌লে মেয়েদের সাজগোজ করার বেশ কিছু উপকরণ।

নিতাইদা ফিরে আসেন। বলেন—তোমাদের চা-জলখাবারের কথা বলে এলাম।

জলখাবার! এত বেলায় জলখাবার! তার মানে কি এখানে আমাদের দুপুরের ভাত জুটবে না! কিন্তু বাড়িতে যে দুজনেই 'নো মিল' করে এসেছি।

কিন্তু সেকথা বলতে পারি না। জিজ্ঞেস করি—কাকে বলে এলেন? মাকে?

—না। ...মানে অন্য লোক আছে।

—নতুন এনেছেন বুঝি?

—তা বলতে পার।

আমাদের কথাবার্তা চলতে থাকে। নানান কথা। হিমালয় থেকে বাজার-দর পর্যন্ত। আমরা দুজনে হিমালয়ের কথা বলি আর বাজারের কথা বলেন নিতাইদা। অথচ কথা ছিল, তিনিও হিমালয়ের কথাই বলবেন। না, মানুষটি দেখছি ইতিমধ্যে বড্ড সংসারী হয়ে গিয়েছেন!

আরেকটা কথাও কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তিনি দাড়ি কামিয়ে ফেললেন কেন আর তাঁর সেই প্রাণখোলা হাসিটি কোথায় গেল? তাহলে কি খবর না দিয়ে এসে তাঁকে আমরা এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেছি, যে তিনি কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছেন না? কিন্তু রান্নাবান্নার জন্য তো কোন চিন্তা নেই। তিনি যে বললেন, একজন লোক রেখেছেন!

না, না, তিনি নিশ্চয়ই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন অন্য কোন কারণে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি গত আড়াই মাসে আমাদের নিতাইদার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তিনি শুধু দাড়ি কামিয়ে ফেলেন নি, লুঙ্গির বদলে মিহি তাঁতের ধুতি পরেছেন, ফতুয়ার বদলে ধবধবে গেঞ্জিও গায়ে আর পায়ে বাটার বাথরুম স্লিপার এবং কথাবার্তাতেও কেমন একটা চাপা-চাপা ভাব। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

না, বুঝতে পারি কয়েক মিনিট বাদেই। সহসা বাড়ির ভেতর থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে আসে, পর্দাটা একটু তুলে ধরবে?

আসছি। নিতাইদা খাট থেকে প্রায় লাফিয়ে পড়লেন। ছুটে গেলেন দরজার কাছে। তাড়াতাড়ি পর্দাটা তুলে ধরলেন।

একজন বিবাহিতা যুবতী ঘরে ঢোকেন। না, পোশাক ও চেহারা দেখে তাঁকে তো কাজের লোক মনে হচ্ছে না। ভদ্রমহিলার হাতে একখানি ট্রে—দু-কাপ চা ও দু-প্লেট

খাবার, লুচি তরকারি ও মিষ্টি। কিন্তু আমাদের তো ভাত খেয়ে যাবার কথা।

পর্দা ছেড়ে দিয়ে নিতাইদা মহিলাটির পাশে এসে দাঁড়ান। বলেন, ট্রে আমার কাছে দিয়ে তুমি ওদের হাতে হাতে খাবারের থালা দিয়ে দাও। লজ্জার কী? এরা আমার কেদার-বদ্রীর সহযাত্রী, আমার ভাইয়ের মতো, তোমার দেওর।

দাদার ভাই হলে বৌদির দেওর হবেই হবে। কিন্তু এও কি সম্ভব? নারী-বিদ্বেষী বিবাহ-বিরোধী নিতাইদা বিয়ে করেছেন? তাও এই বয়সে, হিমালয় থেকে ফিরে এসে মাত্র আড়াইমাসের মধ্যে?

বৌদির হাত থেকে খাবারের থালা নিই। তিনি চায়ের কাপদুটো ড্রেসিং টেবলের ওপরে নামিয়ে রাখেন, তারপরে নিতাইদার হাত থেকে ট্রেখানি নিয়ে মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। কথা বলা তো দূরের কথা, আমরা তাঁর দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারি না। পরিস্থিতির প্রভাবে মাঝে মাঝে সাধারণ সৌজন্যবোধও লোপ পেয়ে যায়।

জলখাবারে মনসংযোগ করি। একসময় জলখাবার শেষ হয়, চায়ের কাপ হাতে তুলে নিই। সময় নিঃশব্দে বয়ে চলে। আমরা কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না। আর নিতাইদা নীরব।

নীরবতা নিতাইদার অসহ্য। তাই বোধকরি তাঁর পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব হয় না। তিনি কথা বলেন। অনেকটা যেন জবাবদিহির স্বরে শুরু করেন—মায়ের জন্যই আর পেরে উঠলাম না রে। শেষ পর্যন্ত সত্যই বিয়ে করে ফেলতে হল। তাড়াতাড়িতে তোমাদের আর খবর দেওয়া হয়নি। উপায়ও ছিল না, শ্রাবণে না করলে যে সেই অঘ্রাণ মাস।

একবার থামেন তিনি। তারপরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন—আচ্ছা, মা মরে গেলে আমার কী উপায় হবে, তা তোমরা অন্তত একটিবার ভেবে দেখেছ কী?

এমনভাবে প্রশ্নটা করলেন যেন আমরাই তাঁকে বিয়ে করতে দিই নি বলে তিনি এতকাল অকৃতদার রয়ে গিয়েছিলেন। এসব ক্ষেত্রে নির্মল ছেড়ে দেবার ছেলে নয়। কিন্তু সংবাদটি শোনার পর থেকে সেও এমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে তার স্বভাবসিদ্ধ কথাবার্তা বলতে পারছে না।

নিতাইদা আবার বলেন—তোমরা হয়তো বলবে, মানুষ হিমালয় গিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়, আর আমি কিনা হিমালয়ে থেকে ফিরে এসে এই বয়সে সংসারী হয়ে গেলাম। কিন্তু এতে অবাক হবার কী আছে? আরে বাপু, হিমালয় নিজে যেমন সন্ন্যাসী না, তেমনি কেদারনাথ আর বদ্রী-বিশালজীও তো অবিবাহিত নন। কেবল বলতে পারো, 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'। কারণ আমি ওর চেয়ে একুশ বছরের বড়।

—একুশ বছর!

—হ্যাঁ, আমার একান্ন আর ওর তিরিশ। তা কী করা যাবে বলো? 'বেটার লেট দ্যান নেভার।'

ঠিকই বলেছেন নিতাইদা। আর বোধকরি তীর্থপথের গীতাপাঠ তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিল। কর্মফলের কোন প্রত্যাশা করেন নি বলেই তিনি এমন হাতে হাতে তীর্থের ফল পেয়ে গেলেন।

বোকাডাক্তারের দুই রুগী

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

ডাকাতির জন্যে তিন বছর জেল খেটে সন্তোষ টাকি বেলা দশটা দশের ট্রেন ধরল। জেলে এতদিন সে ওয়ার্ডারদের ভাষায় এই ভাবেই মনে রেখেছে—তার খালাস পাওয়ার বাকি আর পাঁচোয়া মাহিনা—তিরিশটা দিন কাটতেই আর চারি মাহিনা বাকি! খালাস পেয়ে জেল গেটের বাইরে এসে দেখল কলকাতায় দিব্যি ট্রাম বাস চলছে। তারই একটা ধরে শেয়ালদা। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে ঘণ্টাখানেকের ভেতর নিজের দেশের স্টেশনে এসে নামলো।

ফাগুন মাসের দুপুর বেলা। মেঘ ইয়ার্কি মারতে আকাশে আসেনি। কখনও ছায়া দিচ্ছিল—কখনও কিছুটা সরে গিয়ে রোদ্দুর। তার ভেতর দিয়ে সন্তোষ টাকি স্টেশন বাজারে ভদ্রেশ্বর নাপিতের কাছে গিয়ে ইঁট পেতে বসল।

প্রথমটায় চিনতে পারেনি ভদ্রেশ্বর। কুমড়োর ফালি, কুচো চিংড়ি গামছায় বেঁধে বাড়ি যাচ্ছিল। দাড়িঅলা লোকটা নিজে থেকে সামনে এসে বসতে ভেবেছিল--আরও একখানা সিকি তার কাছে হেঁটে এল।

ক্ষুর খুলেছিল। গলার স্বর, চোখ সন্তোষ টাকিকে চিনিয়ে দিতেই ভদ্রেশ্বর ক্ষুর ভাঁজ করে বলল, ওই যাঃ! সাবান নেই যে—

জলে ভিজিয়ে কামিয়ে দে।

না বাপু। এ জেলখানার দাড়ি। মুখখানা একদম মৌচাক করে নে এসেছো। জলে এ দাড়ি রসে না।

সন্তোষের টাকে সামান্য রোদ এসে পড়ল। পাশেই মনোহারী দোকান থেকে তাড়িওয়ালারা নিশাদল আর মিল্ক পাউডারের পুরিয়া কিনে মেশাচ্ছে। কলকাতার বাবুদের ঘোলাটে ভাব দেখাতে পারলে ভালো বিকোয়। সামনে পঞ্চাননতলার আটচালায় পঞ্চানন অপেরার পালা মহলা দিচ্ছে ক'জনায়। দীনু ডাক্তারের ঘর অবদি হোমোপ্যাথির রোগীদের লাইন। বড় মানকচু পাতায় কচি পাঁঠার ভাগা সাজিয়ে বসে আছে কেষ্টর বড় ব্যাটা। খদ্দের নেই। কুকুর ঘুরছে। কেষ্টই প্রথম এ লাইনে হাতে খড়ি দিয়েছিল সন্তোষের। তার টাক দেখে নাম রেখেছিল সন্তোষ টাকি। কেষ্ট আর নেই।

ভয় নেই। পয়সা দেব। এই নে—

তখন একে একে সাবান বেরোল। ফটকিরি বার করল ভদ্রেশ্বর। কচ কচ করে কামিয়ে মুখভাতের মুখখানা বের করে আনল। 'কত বয়স এখন গো তোমার'—এই সব গো টো মিশিয়ে কথা বলতে পারে ভদ্রেশ্বর। তাতে গরম জিনিস ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

আয়নায় মুখখানা দেখে আপন মনেই সন্তোষ বলল, তা লঙ্গরখানার সময় বারো বছর বয়স ছিল। বাপের মুখে শুনিছি। নেঃ।

সিকিটা কুড়িয়ে নিয়ে ভদ্রেশ্বর বুঝলো—সন্তোষ এখন চল্লিশ ছাড়িয়েছে। মনে মনে হিসেব করে দেখল—তা সন্তোষ টাকি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করে আসছে প্রায় বিশ

বছরের ওপর। ডাকাতিটা অবশ্য মাত্র এই পাঁচ ছ বছর। প্রথম দিকে ভদ্রেশ্বরও সঙ্গে থাকত। বড়দরের ব্যাপারের আগেই সে মানে মানে সরে এসেছে। এখন সে শুধু খবরাখবর দিয়ে ভাগা পায়। সেবারে সন্তোষের সঙ্গে ননীবাবুর বাড়িতে হামলা দিল মাঝরাতে। মুখে গামছা বেঁধে শুধু চোখ বের করে রেখেছিল। পুরো হাতার শার্ট গায়ে। পায়ে চোরাই জুতো। ছাপ দেখে কেউ ধরতে পারবে না। জমি কিনবে বলে ননীবাবু তোষকের নীচে টাকা রেখেছিল। পেটাতেই বের করে দিল। ননীর গিন্নি গলার হার দিল। কানের দুলজোড়া সন্তোষ টাকি ছিঁড়ে নিল। আর দেরি করার উপায় ছিল না। পাড়া জেগে উঠেছে। কুকুরগুলো চেঁচাচ্ছে। পঞ্চাননতলায় সংকীর্তনের হরিবোল শোনা যাচ্ছিল। এখন কেউ বন্দুক বের করলেই চিত্তির।

ওরা মাঠ ভেঙে দৌড়তে শুরু করল। যাবার সময় ভদ্রেশ্বর একটা আধমনি চালের বস্তা পিঠে তুলে নিয়েছিল। ডাকাতির বড় কথা—বর্ষাকালে লোভ করতে নেই। বর্ষাকালে সব দেখে শুনে টেকে রাখতে হয়। ফাল্গুন হল গিয়ে ডাকাতের সুবর্ণ সময়। ধান কাটা সারা। যেদিক দিয়ে ইচ্ছে দৌড়োও। বর্ষাকালের মত পা পাঁকে গেঁথে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার বিপদ নেই তখন।

পুলিশ চৌকির হেড জমাদার তাবাপদ মালাকারের বউ হোমোপ্যাথির লাইন থেকে ওদের দুজনকে দেখছিল। সন্ধে রাতে এই সন্তোষ টাকি একবার তাদের ঘরে পাঁচ পালি নতুন চাল দিয়ে এসেছিল। সেদিন ঘরে কিছু ছিল না। তারাপদর দাড়ি কামিয়ে দেয় ভদ্রেশ্বর। দীনু ডাক্তারের ঘর অবধি লাইন। আর কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে বোঝা যাচ্ছে না।

দীনুকে এখানকার পুরোনোরা বোকা বলে ডাকে। ওরা তিন পুরুষের খ্রীষ্টান। ঘরের দেওয়ালে যীশুর ছবি। মাথার পেছনে নিজের মায়ের ছবি। রোগী পিছু এক টাকা নেয়। খাতায় নাম ঠিকানা—রোগের বিবরণ লেখা থাকে। রোগীরা নম্বর পায়। সেই নম্বর বললে—দীনু খাতা মিলিয়ে সব মনে করে ফেলে।

এক-এক রোগীকে সাতবার আসতে হয়। সাতবারে সাত টাকা। প্রতিবার রোগীর হাতে পুরিয়া তুলে দিতে দিতে দীনু ডাক্তার মাথায় ঠেকিয়ে তিনবার মা মা মা বলে। ওর আসল নাম বোকা। জিপিও-তে সর্টার ছিল। সেখানে থাকতেই হোমিপ্যাথির বই পড়তে শুরু করে। তারপর আস্তে আস্তে ডাক্তার। এখন বাড়িতেই সস্তার সময় আঙুর কিনে পচিয়ে ঘরোয়া ভাটিতে সুরা বানায়। রাতে একটি আস্ত দেশী মুরগীর রোস্ট খায়। পোলট্রির মুরগীর ফাইবার সেদ্ধ হতে চায় না। সমাজে ডাক্তারবাবু বলে পরিচিত। বড়দিনে ডাকঘরের পিওনরা ওর কাছে দশ টাকা করে বকশিস পায়।

মালাকারের বউয়ের বয়সটা কম। বোকা ডাক্তার তার হাতখানা নিজের হাতে অনেকক্ষণ চেপে ধরে বলল, রক্তচাপ প্রবল। ডুমুর খাও। থোড় খাও।

ঘরে তখন আর কেউ নেই। বাকি রোগীরা ওষুধ নিয়ে একটা পনেরোর ট্রেনে কেটে গেছে। মালাকারের বউ উমা হাত ছাড়িয়ে নিল না। আস্তে বলল, একটা ব্যবস্থা কর ডাক্তার। পেটে যে এখন ছেলে এসে গেল।

বোকা ডাক্তার মাথা না তুলেই বলল, তার আমি কি করব?

বাঃ! তোমার ছেলে না?

তারাপদ জানে?

সে জানে তার জিনিস। আনন্দে লাফাচ্ছে।

তা হলে তো মিটেই গেল।

না, মিটবে নি। ছেলে করে গন্ধ করে দিলে। এখন দায় চাপাচ্ছ জমাদারের ঘাড়ে? সে বেচারা দাইয়ের খরচ যোগাবে। আর মজা লুটবে তুমি। সে হতি দিচ্ছিনে—

এবার বইয়ের ভাষায় বোকা ডাক্তার প্রমাদ গুনলো। চেঁচাচ্ছিস কেন? আমি কি বলিছি পয়সা দেব না? কথা বলতে বলতে দেখল—জানলার ওপাশেই টানা বারান্দায় বসে কে একটা লোক শিকে মাথা রেখে সদ্য কামানো গাল চুলকোচ্ছে।

এই সময়টায় ডাক্তারখানায় কেউ থাকে না। কম্পাউন্ডারও সওয়া একটার ট্রেন ধরে পরের স্টেশনে বাড়ি ফিরে যায়। কে ভেবেছিল, এখন এখানে কেউ বসে থাকবে!

লোকটা উঠে দাঁড়াতেই বোকা ডাক্তার চিনতে পারল, তুই? কবে ফিরলি?

সন্তোষ টাকি সোজা দাঁড়িয়ে উঠেই বলল, তারাপদ জমাদারকে সব বলে দেব—

জমাদার-বউ তক্ষুনি চড়াৎ করে কম্পাউন্ডারের গলিপথ দিয়ে সটকে গেল।

কি বলে দিবি?

এই আর কি! তেমন কিছু না।

তবু?

জমাদারের নামে পেটে বাচ্চা করে যাচ্ছ—

সব শুনেছিস?

সব। নাও। এক্ষুনি দশটা টাকা ছাড়ো তো।

নেই। দু-টাকা নিয়ে যা—

ভাল করে খুঁজে দ্যাখো। অনেক তো ভিজিট পেলে। দাও না দশটা টাকা।

নিয়ে যা। কিন্তু একটা কথা শোন—

সন্ধের দিকে শুনতে আসব ডাক্তারবাবু।

পাটের গোছা মাথায় করে বদ্যিনাথের গোলায় যাচ্ছিল তিনজন। এখন একটু দাম উঠেছে। সন্তোষ একগোছা পাট নামিয়ে রাখল। নামিয়ে মনে পড়ল কি কাজে আর লাগবে। ঘর নেই যে খুঁটির সঙ্গে পাকিয়ে দড়ি করে নেবে। বরং তুলসীর দোকানে গোছাটা ফেলে দিলে বিড়ি দেশলাই হয়ে যাবে। আজ রাতটা প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে দিয়ে কাল ভোর ভোর গাঁয়ে ঢুকবে। এর ভেতর এক সময় গিয়ে চৌকিতে জমাদার সাহেবের ওখানে দেখা দিয়ে আসতে হবে। থানা থেকে তাই ব্যবস্থা। রোজ একবার—

তারাপদ জমাদার তিনটে আধুলি পেয়েছিল, বউকে বলল, ছ-খানা টেংরি এনেছি। গুঁড়ো কয়লার আঁচে বসিয়ে দে। এই নে—এক আধুলির ঘি দিস। এখন তোর ভাল ভাল জিনিস খাওয়া দরকার। কি বলিস—

উমা বলল, গুঁড়ো মশলায় সোয়াদ দেয় না—

আমি থাকতে তোর কি অভাব। এখুনি আনাচ্ছি।

বোকা ডাক্তারের বাক্যালাপ আরেকজনও শুনেছিল। সে হল গিয়ে ভদ্রেশ্বর। বারান্দার ওপরে ছিল সন্তোষ টাকি। বারান্দার নীচে ছিল ভদ্রেশ্বর। সে তখন বাজার গোছাচ্ছিল। কুচো চিংড়ি, পচাধচা আলু, বাজার কুড়োনো ভূতিসুদ্ধ কুমড়ো। গোছাতে গোছাতে বোকা ডাক্তারের সব কথা কানে আসছিল।

নিচু হয়ে সব কথা শুনেই ভদ্রেশ্বর হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় উঠে এসেছে। তারপর তড়িঘড়ি খালপাড়ের বাঁশবাগানে চলে যায়। সেখানে উবু হয়ে বসে নিজেকে বাগে

আনার চেষ্টা করেছে খানিকক্ষণ। নিজেই একবার চেঁচিয়ে উঠেছিল : ওরে বাবা গো! কি জানলাম গো! বলেই নিজের মুখ নিজের হাতে চেপে ধরেছিল। তারপর দৌড় দৌড়। সোজা ঘরে গিয়ে রান্না চাপাতে তাড়া দিল। তারপর কোনক্রমে নাকে মুখে গুঁজে নিয়ে একদম স্টেশনবাজারে। রেলগেট খোলা, এখন কোন ট্রেন নেই। গম-কলগুলো ভুট্টা ভাঙছে গোঁ গোঁ করে। ইঁটখোলার মেয়েরা কিনতে আসবে সন্ধে সন্ধে।

ভদ্রেশ্বর ঠিক করে উঠতে পারছিল না, কাকে চাপ দেবে? বোকা ডাক্তারকে? কিন্তু তার তো এখন ভাতঘুমের সময়। জাগিয়ে তুলে টাকা চাইলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তারাপদ জমাদারকে বলবে? বলে কত পয়সা পাবে? চাই কি পেটাতেও পারে। সে কি আর পয়সা দেবে! তাও এবার এই প্রথম পোয়াতি। হয়ত বিশ্বাসই যাবে না। চাই কি বউটা উল্টো কথা বলে বেদম ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

কোন্‌দিকে যাবে? ঠিক করতে পারছিল না ভদ্রেশ্বর। এমন সময় বদ্যিনাথের গোলার ছেঁচতলা থেকে সন্তোষ টাকি ডাকল।

তুমি এখানে এত বেলায়?

আমিও তো তাই ভাবছি। এই বাড়ি গেলি। এই ফিরে এলি। কারবার জোর চলছে, তাই না! বিকেলেও কামাচ্ছে সবাই!

সন্তোষের মুখের ওপর ভদ্রেশ্বর কখনই কথা বলতে পারে না। হাজার হোক সন্তোষ ডাকাতি করে। সে নিজে থেকে মোটে একবার ওর সঙ্গী হয়েছিল। সেই ননীর বাড়ি ডাকাতিতে। জীবনে সে বেশির ভাগই চুরি করেছে।

দু-জনেরই একসঙ্গে মনে পড়ল—বোকা ডাক্তার তো এখন উঠবে না। সরকারী বউয়ের সঙ্গে খুব ভাল করে দরজা জানলা আটকে ঘুমোচ্ছে। উঠবে সেই চারটেয়। আবার ওষুধের লাইন। চলবে রাত আটটা অবদি। মাথা পিছু এক টাকা ভিজিট।

তখন দু-জনই উসখুস করতে লাগল। ভদ্রেশ্বর জানে— সন্তোষ টাকি সব জানে। সন্তোষ জানে না—ভদ্রেশ্বর সব জানে।

আজই বিকেল বিকেল পুলিশ চৌকিতে গিয়ে সন্তোষকে হাজিরা দিতে হবে। জমাদারের রিপোর্ট থানায় যাবে। এসব সময় নিয়ম—সোজা গিয়ে চৌকির বারান্দায় বসতে হয়। জমাদার সাহেবকে একটু খাতির দেখাতে হয়।

ভদ্রেশ্বর কথা বলতে বলতে হাঁটা ধরতেই সন্তোষ বলল, কোথায় চলেছিস। জিরিয়ে যা একটু।

নাঃ, তার উপায় নেই। জমাদার খবর পাঠিয়েছে সকালে—

আমিও তো ওদিকে যাব। চল ঘুরে আসি।

ভদ্রেশ্বর মনে মনে বলল, তুমি আবার কেন? হাজিরা মারবে? সুলুক খুঁজবে? খবরটা ফাঁস করে কার ট্যাঁক ফাঁক করবে? জমাদার? না, তার গিন্নির?

সন্তোষ মনে মনে একটা ছবি দেখছিল। একজোড়া মুলো নিয়ে তারাপদ জমাদারের দাওয়ায় গিয়ে হাজির হয়েছে। জমাদার তাকে একটা আদরের লাঠির বাড়ি মারল। গায়ে লাগল। তবু সন্তোষ হি হি করে হাসতে লাগল। এই-ই নিয়ম।

হাঁটতে হাঁটতে সন্তোষ বলল, খবর টবর আন। কোথায় কি আছে দেখি।

খবর মানে—কোথায় কোন্ জিনিস সরাবার মত আছে। কে অসাবধানে সাইকেল বাইরে রেখে বাজার করতে ঢোকে। তার সাইকেলখানা রাতারাতি তিরিশ মাইল উজিয়ে

গিয়ে বেচে দিয়ে আসতে হবে। আউট লাইনে দাঁড়ানো ওয়াগনে চিনির বস্তা থাকলে তো কথা নেই। মিষ্টির দোকানগুলো হাঁ করে আছে। একবার এনে ফেলতে পারলে নগদ নোট। একখানা পুরো গজ—বড় পাতির। তখন চাইকি সে-পয়সায় টান্টু হবে—সঙ্গে মুরগী মেরে মাংস।

খবরাখবর দিয়ে ভদ্রেশ্বরের দু-পয়সা উপরি হয়। খবর সে দিয়েও থাকে। নানান জায়গায় কামাতে গিয়ে সে নানান রকমের খবর পায়। খবরগুলো শুধু কুড়িয়ে আনা। ডাক্তারবাবুর দাড়ি কামাতে বসে সেদিন স্বর্ণকারদের পুকুরের মাছের খবর পেল। সে-রাতেই স্বয়ম্বর কাওরা টানা জালে পুকুর সাফ করে ভোর ভোর তার বাড়ি নগদ পঞ্চাশ টাকা পৌঁছে দিয়েছিল।

স্টেশনবাজার এলাকা দু-জনেরই খুব সুন্দর লাগছিল। বাতাসে অল্প শীত। সারি সারি গুড়ের নাগরিতে মাছির ছররা। সন্তোষ পরিষ্কার বুঝল—বোকা ডাক্তারকে এবার ভালমত দোয়া যাবে। হাত ফুরোলেই হাজির হওয়া যাবে। উঃ কি আনন্দ! যাও আর টাকা চাও! কোন খাটাখাটনি নেই। না দিলে বলে দেব। মোচড়ালেই গাছ থেকে ফল পড়বে। টুপ টুপ করে।

বারোখানা গাল কামালে তবে তিনটে টাকা। ভদ্রেশ্বর মনে মনে ঠিক করে নিল—এবার থেকে কামানোর ঝামেলায় না গিয়ে একবেলার বাজার-হাটের টাকা বোকা ডাক্তারের কাছ থেকে নিতে হবে। আর ঘরবাড়ির ওষুধ-বিষুধ—সে তো আছেই।

তখন দু-জনেরই একসঙ্গে মনে হল—রিকশা সাইকেলের প্যাক প্যাক কী সুন্দর আওয়াজ!

উমা দরজার আড়ালে বসে টেংরি চুষছিল। বাইরে দাওয়ায় বসে তারাপদ জমাদার গরম জুসে সবে চুমুক দিয়েছে, এমন সময় দুজনে হাজির। চুমুক দিতে দিতেই ভদ্রেশ্বরের দিকে বাঁ পাখানা মেলে দিল তারাপদ।

ভদ্রেশ্বর পায়ের বড়ো আঙুলের নখ গোল করে কাটতে লাগল।

কাটতে কাটতেই বলতে লাগল, ঘরের মাগ থাকবে আড়ালে আবডালে। মাথায় তুলেছ কি—

কেন? তোর বউ কোথায় গেল?

ভেতরে উমার দাঁতে হাড়ের কুচি আটকে যাচ্ছিল। সে অবস্থাতেই বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, হাতের নখগুলো কেটে দাও তো। সারা পাড়া কামিয়ে বেড়ালে বউ থাকে ঘরে!

ও কথা বোলো না গো। অভাবের সংসার। তবু যত্নে রাখি।

ভদ্রেশ্বর ততক্ষণে তারাপদর পা ছেড়ে উমার হাত ধরেছে। বেশ নরম-সরম। এমন মেয়ে বেপথে গেল কি করে! বোকা ডাক্তারই বা অত ভিড়ভাট্টায় আড়াল আবডাল পায় কোত্থেকে? বোঝা মুশকিল। দাঁড়াও। পাই তোমায় একা। তখন গুমোর থাকে কোথায় দেখব। মুখে বলল, প্রথম পোয়াতি। সাবধানে থাকতে হয়।

মুখ-ঝামটা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল উমা। ঘুরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে দুপুরের দিকের সেই টেকোটা তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। দুই ভ্রূর মাঝে কাটা দাগ। দাড়ি গোঁফ একদম নিকিয়ে কামানো। একেবারে ছোবড়া ছড়ানো নারকোল। এই লোকটাই তো—

কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকেই উমা দেখল, তারাপদ জমাদার বলছে, রোজ এক জোড়া ডাব দরকার যে!

লোকটা ঝুঁকে গিয়ে বলল, কর্কচি ডাব তো। এ সময় ও ডাবে শরীরে কাজ দেয়—

উমা আরও কেঁপে গেল। দেশসুদ্ধ লোক জানে তাহলে—সে ছেলের মা হতে যাচ্ছে! এতটা চাউর হল কি করে। তারাপদর উপর তার খুব ভরসা। হাফপ্যান্টের বাইরে মানুষটার পায়ের থোড়া পাথর হয়ে থাকে সব সময়। বসে থাকা অবস্থাতেই আচমকা লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভিড় ভেঙে দেয়। এর আগে তারাপদ জমাদারের সঙ্গে সে তিন থানা ঘুরে তবে এখানে এসেছে। তারাপদর উপর তার খুব ভরসা। লোকটা করিৎকর্মা। স্বামী জিনিসটা তো এ-জন্যেই।

সন্তোষ টাকি তারাপদ জমাদারের হাতের একখানা আদরের থাপ্পা খেল। সব দিক নজর আছে তো তোর!

তা রাখি স্যার। আপনি এবারে বাবা হবেন—বলে মনে মনে সন্তোষ অঙ্ক কষে দেখল, হারামজাদা তার চেয়ে কম করেও আট ন বছরের ছোট। পহলা বারের বাবা—তাও ধোকা। জেলে থাকতে শেখা—স্যার স্যার ভাবটা মুখে চোখে বজায় রাখতে রাখতে সন্তোষ দেখল, মেয়েছেলেটার হাতে সোনার মোটা বালা। ভাল করে মোচড়ালে চাই কি একখানাও যদি হাতে আসে—তাহলে না হোক এক ভরির আন্দাজ সোনা তো হবে।

দু-জনের কেউই সুবিধে করতে পারল না। তারাপদর হাতের থাপ্পা বেশ ভারি। ভদ্রেশ্বর ভেবে দেখল— তারাপদকে বলে দিলে খানিক মারধোর জুটবে শুধু কপালে। বরং মেয়েছেলেটাকে একা পেলে সুবিধে করা যেতে পারে।

সন্তোষ টাকির বাড়লো শুধু অস্বস্তি। সে ডাকাতি পারে। ছিনতাই পারে। জিনিসপত্র মোটামুটি সরাতে পারে। এর বেশি আর কিছু না।

ওরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে রেল স্টেশনে এল। সন্তোষ বলল, এক কাঁদি কচি ডাব জোগাড় কর তো—

সে এখন কোথায় পাব?

কর না জোগাড়। কারও গাছ থেকে। তোকে একটা বড় খবর দেব।

সে খবর আমার জানা—

কেমন?

বোকা ডাক্তার পেটে ছেলে করে গন্ধ করে দিল তো—

সন্তোষ দাঁড়িয়ে গেল। উরি বজ্জাত! তুমিও কান পেতে ছিলে?

তারপর দু-জনই একসঙ্গে হাসতে হাসতে চোখ বন্ধ করে ফেলল। চারটে বত্রিশের লোকাল আওয়াজ করে এসে সে হাসি চাপা দিয়ে দিল। ওঠাউঠির ভিড়ে এক ডাবওয়ালার কচি এক কাঁদি ভদ্রেশ্বর নিমেষে হাবিশ করে দিল।

বদ্যিনাথ, দেবেন—দু-জনেরই ধানের গোলায় একটু একটু করে ধানের দর চড়ছে। জবেদ আলির মাছের খোটিতে ফাগুনের বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে চিংড়ি আসতে শুরু হয়েছে। চন্দনেশ্বরের গোহাটায় এবার হেলে বলদও আসছে ভাল ভাল।

বোকা ডাক্তারের চেম্বারে ধূপধুনোর ভেতর দেয়ালে দেয়ালে হ্যানিমান, যীশু, নেতাজী, নিজের মায়ের ছবি।

বোকা কাকে বোঝাচ্ছিল, প্রথমে হল গিয়ে মহাভারত। তারপর হোমোপ্যাথি। রামায়ণ। শেষমেষ ওই হল গিয়ে অ্যালোপ্যাথি। তা যার যা ভাল আমি তা নিয়ে থাকি।

ফোঁড়াফুঁড়ির ইঞ্জেকশনও দিয়ে থাকি। গরুর অ্যানিমিয়ার চিকিৎসাও কি বেলারমেল ইঞ্জেকশন দিয়ে করিনি?

লো ভোল্টেজের নিভু নিভু ইলেকট্রিকের আলো। তাতে ধূপের ধোঁয়া। দেওয়ালে ওনারা। তার ভেতর বসে বোকা ডাক্তার। নিজের মহিমার কথা বলছিল। অবসর পেলেই বোকা কিছুকাল ধরে এরকম নিজের কথা বলছে। বলে আর থামে। আবার বলে।

এরকম মহিমা কীর্তনের মাঝে ওরা দুজনে এসে ঘরে ঢুকলো। বোকা সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন বন্ধ করে বলল, কি ব্যাপার?

সন্তোষ টাকি কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, ডাক্তারবাবু, ভদ্রার পেটটা দ্যাখো তো। ফেঁপে আছে সারাদিন।

ভদ্রেশ্বর হাফ শার্ট তুলে ধরে বলল, সত্যি দ্যাখো তো।

ঘর ভর্তি লোকজন। কম্পাউন্ডার দাঁড়ানো। হাত কাঁপছিল। তবু সেই হাত বোকা ডাক্তার ভদ্রেশ্বরের নাইকুণ্ডুলিতে রাখল। হুঁ, খুব গরম দেখছি। কি খেয়েছিলি দুপুরে? গুরুপাক জিনিস—

সন্তোষ হাসতে হাসতে বলল, একদম হজম হয়নি। হাঁসফাঁস করছে ডাক্তার—

সন্তোষ টাকি আর ভদ্রেশ্বরের চোখ চকচক করছে দেখে বোকা ডাক্তার ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল। এবার যেন কম্প দিয়ে জ্বর আসবে, এমন কাঁপুনি।

সন্তোষ তখনও বলে যাচ্ছিল, ও কি হজম হওয়ার জিনিস! ও কি চাপা থাকে?

বোকা ডাক্তার সাততাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। চল চল পাশের ঘরে শুয়ে পড়। পেটটা বুকটা ভাল করে দেখব। গাদ মেশানো তাড়ি গিলবি! তা অমন হবে না?

ভদ্রেশ্বর, সন্তোষ টাকি—কেউই নড়ে না। ভদ্রেশ্বর বলল, এখানেই দ্যাখো না কেন। সবাই আছেন। পেটটা ফাঁপলো কেন শুধু শুধু। কি এমন গুরুতব জিনিস খেয়ে এ অবস্থা।

চল না শুয়ে পড়বি। তারপর তো দেখব।

সন্তোষ টাকি হাসতে হাসতে বলল, ও ডাক্তার, আমারও যে পেট ফেঁপে আছে দুপুর থে—

বোকার চেম্বারের পাশেই কম্পাউন্ডারের কাঠের ফোকর কাটা খুপরি। তার লাগোয়া ফিমেল কেস দেখার ঘর। সেখানে চাটাই পাতা চৌকি। দেওয়ালে থার্মোমিটার ঝুলছিল। পেছনদিকে একটা খিড়কির দরজা। এর পাশেই বোকা ডাক্তারের পুকুর। হাঁস রাখার ঘর। হাঁসেরা সেখান থেকে প্যাঁক প্যাঁক জুড়ে দিল।

তাই শুনে বোকার শীত আরও বেড়ে গেল। ঘরে ঢুকে খুট করে আলো জ্বেলে দরজা বন্ধ করতেই—দু-দুটো আস্ত রুগী সোজা দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে দুজনেরই চোখ বুজে এল। কোণাকুনি দেওয়ালে দুজনেরই উল্টো ছায়া কুঁজো হয়ে পাশে মোটা হয়ে গেল। কারণ তখন দুজনই প্রায় একসঙ্গে পেটে হাত দিয়ে ভাঁজ হয়ে ঝুঁকে আরও খ্যা খ্যা করছিল। সন্তোষ টাকির তো হাসি থামেই না। বুজে আসা ডান চোখের কোণে এক ফোঁটা জল এসে দাঁড়াল তার।

দুজনের মাঝখানে বোকা ডাক্তার দাঁড়িয়ে। পায়ে পাম্পসু। গায়ে ফুলহাতার শার্ট। ওপরে খয়েরি কোট। দু-কানের ভাঁজে কালো রঙের কিছু লম্বা লম্বা চুল। ভারী চিবুক। ধুতির কোঁচা মাটি থেকে অনেকটা ওপরে ঝুলে আছে। গালে গালে আরামের মাংস। নিজের পাতনে চোলাই হওয়া পাকা আঙুরের সুরাপানে ডাক্তারের দুই গালে দুটি লাল

ছোপ। স্বাস্থ্যের সেই লক্ষণ এখন লজ্জা, ভয়ে, শীতে বন্ধ ঘরের ভেতর বোকার গলা অবদি ছড়িয়ে পড়েছে। বোকা এখন ভালো বাংলায় একদম 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়'।

রুগীর পেট ফেঁপেছে। কিন্তু রুগী শোয় না। অথচ পেটটা টিপে দেখা দরকার। লিভার কোন্ স্টেশনে এখন না জানলে কি করবে?

নে শুয়ে পড়।

শুচ্ছি শুচ্ছি ডাক্তার। উরিঃ বাস্! এই শিয়রের একটা বালিশ পর্যন্ত নেই। বলতে বলতে ভদ্রেশ্বরের চোখ আবার বুজে এল। এখন আনন্দে, হাসিতে তারও চোখে জল। কতকাল পরে একটা ভাল ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। বাইরের স্টেশনবাজার থেকে একদম আলাদা—চাদ্দিক থেকে বন্ধ এ ঘর এখন শুধু আনন্দের। ভদ্রা হঠাৎ তিড়িং দিয়ে লাফিয়ে উঠল—আর খেউরি করতে হবে না গো। আর হবে না গো। বলতে বলতে তার ডান হাতখানা নিজেরই বাঁ বগলে বাজাতে লাগল। আর কোন চিন্তে নাইগো!

সেই তড়িৎ যত বাড়ে সন্তোষ টাকির খ্যা-খ্যাও তত বাড়ে। আর ভাঁজ হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেওয়ালে নিজের ছায়াকে কুঁজো—পাশে মোটা করে ফেলে। বোকা ডাক্তারের ছায়াটাই শুধু সিধে। কোন নড়নচড়ন নেই।

বাইরে অন্য রুগীরা বসে। কিরীটী বাউরির বউয়ের একটা ডেলিভারি কেস আসার কথা। সবাই তাকিয়ে আছে এ-ঘরের দিকে। মাঝখানে একটা শুধু বন্ধ দরজা।

সন্তোষ টিমেতালে গেয়ে উঠল। বোকার এবার খোকা হবে। হবে—এ—এ—

চৌদিক বন্ধ বলে টিমে গানটুকু ঘরের ভেতর গুমগুম করে উঠলো। স্টেথিসকোপ ফাঁস হয়ে গলা থেকে ঝুলছে সেই থেকে। বোকার নিজেকে গলায় দড়ির কেস লাগতে লাগল। কি চাস তোরা?

হবে। হবে। বলতে বলতে সন্তোষ ঘরের চাদ্দিক নিচু হয়ে খুঁজতে লাগল। আসলে যে এ একটা খোঁজার ভান তা যে কেউ দেখেই বলতে পারত। আচমকা খিড়কির শেকলটা আরও জোর করে চেপে দিয়ে বলল, এ পথ দিয়েই আসত। এ পথ দিয়েই পার করে দিতে? বাঃ! বাঃ! কী বুদ্ধি! হাজার হোক ডাক্তার তো। কি বলিস ভদ্রা?

একশো বার। উরিঃ সন্তোষদারে—আমার যে পেট ফেঁপে উঠল! আর হাসাস নে। না ওগরালে তো পেট ফেটে যাবে। মরে যাব সন্তোষদা, এবারে ঠিক মরে যাব।

শীত এখনও যায় নি। কণ্ঠমণি থেকে ঘামের ফোঁটাগুলো কাচিয়ে মুছে নিল বোকা ডাক্তার। কি হলে হবে তোদের—

হবে না। দাঁড়াও ডাক্তার।

তোদের পায়ে পড়ি। আর দাঁড়াতে পারছিনে আমি। বলতে বলতে ডাক্তার চৌকি ধরে বসতে যাচ্ছিল।

সন্তোষ বোকার কোমর ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, উঁহু, এখন কি? আগে বাইরে গিয়ে সুখবরটা দি। তোমার গিন্নি চাই কি খুশী হয়ে—

বসতে গিয়ে বোকার ধুতির কোঁচায় মেঝের ধুলো লেগে গিয়েছিল। নিভু ডুমের আলোয় মাথা নিচু করে ছোট খোকাটির পারা বোকা ধুলো ঝাড়ছিল। এ কথায় কোঁচা ছেড়ে দিয়ে বোকা চোখ বড় বড় করে তাকাল। কোঁচা বোধহয় খানিকটা খুলে গিয়ে থাকবে। তাই লোটানো ধুতির খুঁট আবার ধুলোয় মাখামাখি।

ওরে বাপ আমার, ওকাজ করিস নে। আমার বড় জামাই এখন এখানে।

তবে তো খুব ভাল সময়। ভদ্রেশ্বর হাসতে হাসতে কাছে এগিয়ে এল। নাকের কাছে নাক নিয়ে বোকার চোখের মণিতে দুই মণি দিয়ে তাকাল। তারপর সেখান থেকে মাথা দুলিয়ে পিছিয়ে এসেই ভাঙা গলায় গেয়ে দিল-বোকার এবার খোকা হবে—

সঙ্গে সঙ্গে দু-হাতে তালি দিয়ে উঠল সন্তোষ টাকি। একদম মহাষ্টমীর বলির বাজনার তাল। থামতেই চায় না।

সন্তোষ টাকির হাতের এক একটা তালি গদাম গদাম বুকে এসে পড়তে লাগল। এক একটা বুকে পড়ে আর বোকা ডাক্তারের মাথার পেছনে লিক করে বাতাস বেরোতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

নিভু আলোয় নিকোনো গালের সন্তোষ টাকি তখনও লাফাচ্ছিল। এক সময় ভোল্টেজ বেড়ে গিয়ে আলোটা দপ করে জেগে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বোকা ডাক্তার ধপ করে চৌকিতে বসে পড়ল। কি চাই তোদের খুলে বল আমায়। এবারকার মত বাঁচা। আব পারছিনে ভদ্রা—এই দ্যাখ আমার বুকটা শুধু লাফাচ্ছে।

সন্তোষ বলল. এখন তো নাফাবেই। পরে আরও নাফাবে দেখো।

বোকা পরিষ্কার দেখল—তার সামনের দেওয়াল শুধু দুটি লোক দিয়ে তৈরি। সেই দেওয়ালের আধখানা সন্তোষ টাকি। বাকি আধখানা ভদ্রেশ্বর। যে এতদিন তার পায়ের নখ গোল করে কেটে দিত। একবার ওর বাপের চিকিৎসা করায় টানা তিনমাস দাড়ি কামিয়ে ভিজিট, ওষুধের পাওনাগণ্ডা শোধ করে। সে কি না এখন—

সন্তোষ টাকি খোঁচা দিল ভদ্রেশ্বরকে। দ্যাখ দ্যাখ, এখন কেমন খোকা করে ফোঁপাচ্ছে। অ্যাই দ্যাখো। আবার কাঁদে। হচ্ছে কি?

আমায় ছেড়ে দে তোরা। এই বাহাত্তরটা টাকা আছে, নে তোরা। আমায় ছেড়ে দে! আমার একটা মান আছে। আমি ডাক্তার।

সে তো জানি। আমার বাপকে চিকিৎসে করলে। তার বদলি তিনমাস ভোর দাড়ি কামালাম। সারা বাড়ির নখ কাটলাম। বগল কামালাম। তুমি ডাক্তার। এ আর বড় কথা কি? কি বল সন্তোষদা!

সন্তোষ টাকি মজা করে বলল, তা একটা কথার মত কথা তো। মানী লোকের মান আছে না। বাহাত্তর টাকার গোছাটা ফতুয়ার ভেতর পকেটে রেখে দিয়ে বলল, হাতের আংটিগুলো দাও তো—

এ তো গ্রহশান্তির—

কথা শেষ হল না বোকা ডাক্তারের।

ওগো দরজা খোলো গো। সঙ্গে দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা। না খুললে ভেঙে ফেলবো।

সন্তোষ গিয়ে একলাফে বোকা ডাক্তারের সামনে দাঁড়াল। ধাক্কাতে বারণ কর। আমার আবার ধাক্কাধাক্কি একদম পছন্দ হয় না।

ভদ্রেশ্বর এগিয়ে এসে বলল, বোকার সরকারী বউটা তো বড্ড চেঁচায়। থামতে বল—

ডাক্তারের কপাল, নাকের ডগা ঘামে ভিজে উঠেছে। কোঁচার ফুলকো ঝুল মেঝের ধুলোয় মাখামাখি। চৌকিতে নিজের শরীরটা যাতে একদম পড়ে না যায় সেজন্যে বসে পড়ে দু-খানা হাত পেছনে ফেলে ভর রেখে হেলে আছে। সেই অবস্থায় বলল, কিছু মাথায় আসছে না, কি করব বল? তোর পায়ে ধরছি ভদ্রা, বলে দে ভদ্রা—

সন্তোষ টাকি দরজা ধাক্কানোর শব্দের ভেতরেই বোকা ডাক্তারের আঙুল থেকে টুক টুক করে আংটিগুলো খুলে নিচ্ছিল।

আঁতকে উঠে বোকা একবার শুধু বলতে পেল, ওটা নিসনে সন্তোষ। ওটা পুরো এক ভরির—

ধমকে উঠল ভদ্রেশ্বর। দরজা খুলে মাকে গিয়ে বলব? বোকা আবার বাবা হবে। কঁ্যাথা সেলাই করেছো?

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের গেঞ্জির নীচের বুকখানায় ভিজে ন্যাকড়া কে মেলে দিল। সেই শীতের ছ্যাঁকায় চড়াৎ করে উঠে দাঁড়াল বোকা। কী বলব বলে দে না বাবা? তোরাই আমার সব। বলে দে লক্ষ্মীটি।

আবার দরজায় ধাক্কা।

তাড়াতাড়ি বল ভাই। আমি আর পারছি নে সন্তোষ। বলতে বলতে ধুলোভর্তি মেঝেতেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ডাক্তার জোড়হাতে সন্তোষের দিকে তাকিয়ে। হাঁটুর নীচে কাঁকর পড়ে বেদম চিনচিন করে উঠল। সে অবস্থাতেই বোকা আবার বলল, আমায় একটা পথ দেখা ভদ্রা—আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনে—

ঘরের ডুম আবার নিভু হয়ে এল। দরজায় ধাক্কাটাও বেড়ে গেল। তারই ভেতরে সন্তোষ একই রকমের খ্যা খ্যা হাসিতে নিজে নিজে ঝুঁকে পড়ল। চোখ বুজে এল। সেই ভঙ্গিতেই বলে উঠল, উরিঃ ব্যস্! ভদ্রা রে! আর পারছিনে, অন্ধকে পথ দেখা মাইরি—

ভদ্রেশ্বর ধমকে উঠল। এই আমি শুয়ে পড়লাম। যাও। দরজা খুলে বল—রুগী দেখছি।

সত্যি সত্যিই ভদ্রেশ্বর চৌকিতে শুয়ে পড়ল। শুতে শুতেই বলল—যাও না দরজা খোলো গে। ভয় নেই কোনও। সন্তোষদা—পকেটগুলো হাতড়ে দেখে নাও একবারটি—

সন্তোষ টাকি পকেট হাতড়ে একখানা দশ টাকার নোট পেল আরও। পেয়েই লাফিয়ে উঠল, ঠিক বলেছিস তো ভদ্রা!

ভ্যাবাচ্যাকা বোকা ডাক্তার বলল, দরজা খুলে কি বলব, বলে দাও তোমরা। তোমাদের পায়ে পড়ি বলো—

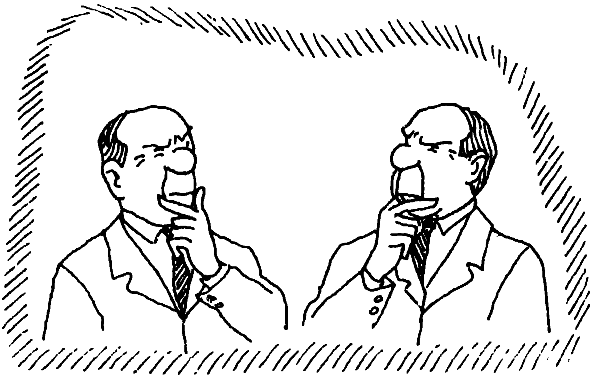
বোকাকে সন্তোষ ঘুরিয়ে দরজামুখো করে দিল। বলবে, পেট ফেঁপেছে। ডাক্তার না তুমি! যা ইচ্ছে বলে দাও না। তারপর সেই খ্যা খ্যা হাসি দিয়ে বলল, বলগে—গুরুতর জিনিস হজম হয়নি। ওগবাতে না পেরে ব্যথায় টাঁটাচ্ছে—

বোকা দরজার দিকে এগোতেই চৌকিতে চিৎপটাং ভদ্রেশ্বর সত্যি টাঁটাতে লাগল, ও মাগো—গেলাম গো—



অন্য মানুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



সোমেন রায়চৌধুরী রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় একটু নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একটু বেশি পান করা হয়ে গেছে। প্রত্যেকদিন ক্লাবে গিয়ে তিনি স্নুকার খেলেন আর তিন পেগ হুইস্কি খান। আজ এক বন্ধুর পীড়াপীড়িতে খেতে হয়েছে পাঁচ পেগ।

যাই হোক, তিনি সঠিক ভাবেই গাড়ি চালিয়ে ফিরেছেন বাড়িতে। গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে তিনি সদর দরজার কাছে এসে দেখলেন, দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক। রাত তখন প্রায় এগারোটা।

লোকটির চেহারা তাঁর খুব চেনা মনে হল। কিন্তু ঠিক ধরতে পারলেন না। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কে?

লোকটি দু-হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

সোমেন রায়চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, এত রাত্রে? কী ব্যাপার?

—আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?

—খুব চেনা চেনা লাগছে। ঠিক ধরতে পারছি না।

—ভালো করে তাকিয়ে দেখুন তো।

সোমেন রায়চৌধুরী ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন তো বটেই, তারপর নিজের গায়ে খুব জোরে একটা চিমটি কাটলেন। তিনি জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে পড়েছেন?

লোকটিকে তিনি বললেন, আপনার হাতটা বাড়িয়ে দিন তো?

লোকটি হাত বাড়িয়ে দিল। তিনি সেটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন. হুঁ, মানুষই তো বটে, ভূত-টুত নয়। এতটাই নেশা হয়ে গেল যে চোখে উল্টো-পাল্টা দেখছি? তুমি কে ভাই? কোথা থেকে এলে? আমার তো কোনও যমজ ভাই নেই?

লোকটি বলল, ব্যাপারটা আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।

সোমেন রায়চৌধুরী ওপরের দিকে একবার তাকালেন। তিনতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে

তাঁর স্ত্রী। স্বামীর ফিরতে বেশি রাত হলে রত্না বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে।

খানিকটা জড়ানো গলায় সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, ব্যাপারটা কী জানো ভাই, রাত্তিরবেলা নেশা করে ফিরি তো, তখন আমার কোনও বন্ধু-টন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে আমার স্ত্রী বড্ড চটে যান। কাল আবার অফিস আছে। তুমি বরং কাল সকালে এসো।

লোকটি বললো, আচ্ছা, ঠিক আছে।

সোমেন রায়চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আরে না, না, যেয়ো না! ব্যাপারটা রহস্যময় থেকে যাবে, রাত্তিরে আমার ঘুম হবে না। এসো, ভেতরে এসো! এটা আমার নিজের বাড়ি। বউয়ের ভয়ে কি একটা লোককে একটু বসিয়ে কথা বলতে পারব না? এসো, এসো—

বাবুর সাড়া পেয়ে চাকর আগেই দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল। এবার দুজনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে বিস্ময়ে তার মুখ হাঁ হয়ে গেল, চোখ দুটো এক টাকার রসগোল্লার সাইজের গোল গোল।

সোমেন চৌধুরী তার ঐ অবস্থা দেখে বললেন, কী রে ব্যাটা, অমনি করছিস কেন? তুইও নেশা করেছিস নাকি?

চাকরটি দৌড়ে ওপরে পালাল।

বসবার ঘরে ঢুকে, আলো জ্বেলে সেই স্পষ্ট আলোয় লোকটিকে দেখে তিনি দারুণ চমকে উঠলেন। তিনি ঠিক যেন একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য লোকটির পায়ের জুতো থেকে মাথার চুল পর্যন্ত অবিকল তাঁর মতন। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসেই সোমেন রায়চৌধুরীর মাথার চুল অর্ধেক পেকে গেছে, লোকটিরও তাই। তাঁর থুতনির কাছে একটা কাটা দাগ, ছেলেবেলায় ফুটবল খেলার স্মৃতি, এই লোকটিরও থুতনিতে হুবহু সেই রকম দাগ।

তিনি ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, কী ব্যাপার? তুমি... আপনি...কে? আমার সর্বনাশ করতে এসেছেন?

লোকটি বিনীতভাবে বলল, আপনি ভয় পাবেন না। আমি আপনার কোনও রকম ক্ষতি করতে আসি নি। আমার সব কথা শুনলেই আপনি বুঝবেন।

সোমেন রায়চৌধুরী তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বললেন, আমি ভয় না পেলেও আমার স্ত্রী দেখে ফেললে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত যদি আমাকেই চিনতে না পারে? আপনাকেই আমি ভেবে নেয়! এবার বলুন, আপনি কে? আমার মতন চেহারা পেলেন কী করে? আমি চোখে ঠিক দেখছি, না ভুল দেখছি?

লোকটি জিজ্ঞেস করল। তার আগে আমি জানতে চাই, স্ত্রী কাকে বলে?

সোমেন রায়চৌধুরী আরও অবাক হয়ে বললেন, সে কি মশাই? আপনি স্ত্রী কাকে বলে জানেন না? আপনি বিয়ে করেন নি?

—আমি বিয়ের ব্যাপারও জানি না!

সোমেন রায়চৌধুরী ফস্ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে মুচকি হেসে বললেন, আপনি স্ত্রীর সংজ্ঞা জানতে চান? মানুষ যেমন বাড়িতে গোরু পোষে দুধ খাবার জন্য, তেমনি বাড়িতে একটি করে মেয়েছেলে রাখে বিনে পয়সায় নানা রকম আনন্দ-টানন্দ পাবার জন্য। ভদ্রভাবে এরকম একটি মেয়েছেলে রাখার জন্য লাইসেন্স লাগে, তার নামই বিয়ে।

পরক্ষণেই জিভ কেটে তিনি বললেন, আরে ছি ছি, নেশার ঝোঁকে কী সব আবোল-

তাবোল কথা বলছি, আমার স্ত্রী এসব শুনতে পেলেই সর্বনাশ! না, শুনুন, স্ত্রী হচ্ছে শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে জীবন-সঙ্গিনী, সুখে-দুঃখে, সুদিনে-দুর্দিনে পুরুষের সমান অংশীদার। ছেলে-মেয়ের জননী...বাড়িতে এই স্ত্রী যদি একটু ক্ষেপে থাকে মশাই, বুঝবেন যে, জীবনের সব শান্তি তা হলে নষ্ট! এই যে দেখুন, আমি সামান্য দু-তিন পেগ ড্রিংক করি, তার জন্যই রোজ কত রাগারাগি!

লোকটি বসে কী যেন চিন্তা করতে লাগল।

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, আপনি আসছেন কোথা থেকে? জানেন, আমি ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত ছিলাম, আমার মা বলতেন, তোর মতন আর একজনও দুনিয়ায় নেই। কিন্তু এখন যে দেখছি, ঠিক আমার মতন আর একজন লোক? আপনি কি অন্য গ্রহ থেকে আসছেন নাকি?

লোকটি মুখ তুলে বললেন, ঠিক তাই।

সোমেন রায়চৌধুরী হোহো করে হেসে উঠলেন। তারপর বেশ তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, জানেন মশাই, যত রাত বাড়ে, ততই আড্ডা জমাতে বেশি ভালো লাগে। বাড়িতে একটু হুইস্কি আছে, এখন যদি সেটা নিয়ে বসা যেত, কিন্তু ঐ যে, জীবন-সঙ্গিনী আছেন। এক্ষুনি জীবন সঙ্গীন করে তুলবেন। কাজের কথাটা চটপট করে বলে ফেলুন। আপনি যাত্রাদলে পার্ট করেন নাকি? ভালো মেক-আপ নিয়েছেন তো!

লোকটি বললো, আপনাদের ভাষায় যাকে নীহারিকা বলে, সেই রকম এক নীহারিকা—সাত আলোক বর্ষ দূরে, সেখান থেকে আমি আসছি।

—ওসব গাঁজাখুরি কথা ছাড়ুন। কাজের কথা বলুন।

—জানি, আমার কথা আপনার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত, তাই আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমার দিকে তাকিয়ে থাকুন।

সোমেন রায়চৌধুরী দেখলেন, চোখের নিমেষে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি বললেন, যাঃ বাবা!

আবার ঠিক এক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল লোকটি ঠিক সেখানেই বসে আছে।

সোমেন রায়চৌধুরী খুব একটা অভিভূত হলেন না। হাই তুলে বললেন, এ তো ভেল্কি! পি সি সরকার এ রকম কত মানুষ অদৃশ্য করে দিয়েছে। হঠাৎ রাত্তির বেলা আমাকে ম্যাজিক দেখাতে এলেন কেন? পয়সা টয়সা পাওয়ার আশা নেই কিন্তু! আমি মহা কঞ্জুষ! কারুকে এক পয়সা দিই না।

লোকটি বলল, আমি আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জের একজন বিজ্ঞানের ছাত্র। পৃথিবীতে আমার মতন কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছে কয়েকটি পরীক্ষা চালাবার জন্য। প্রায় এক মাস ধরে আমি আপনাকে অনুসরণ করছি। আপনার বাইরের জীবন মোটামুটি সব জানি। এখন আপনার বাড়ির ভেতরকার জীবনটা জানতে চাই।

—আপনি আমার সম্পর্কে কী জানেন, শুনি তো!

—আপনি স্টিফেন ব্যাফকক অ্যান্ড কোম্পানির চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। অফিসে সাতটা পর্যন্ত থাকেন, আপনার অফিসের চেয়ারের মাথায় একটা তোয়ালে ঢাকা থাকে। আপনি দুপুরে লাঞ্চে খেতে যান একটা চীনে দোকানে। আপনি বেশি ঝাল পছন্দ করেন।

—এসব আর জানা শক্ত কী? এ তো আমার অফিসের বেয়ারাটাকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।

—ঠিক চল্লিশ মিনিট অন্তর আপনার বাঁ দিকের ভুরু কাঁপে, আপনি ইংরিজি ভাষা লেখবার সময় টি-র মাথা কাটতে আর আই-এর ডট দিতে ভুলে যান। আপনি অকারণে বাথরুমে বেশি সময় থাকেন, আয়নার সামনে দাঁড়ালেই অন্যমনস্ক হয়ে যান।

—ঠিক, ঠিক।

—আপনি সকালে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় থেকে ফেরার সময় পর্যন্ত আপনাকে সব জায়গায় অনুসরণ করেছি। আপনার সেই জীবন আমি সবটুকু জানি। এখন আপনার বাড়ির ভেতরের জীবনটা জানা দরকার আমার। আমার গবেষণার বিষয়বস্তু পৃথিবীর একজন মানুষের জীবন।

সোমেন রায়চৌধুরী এবার সোজা হয়ে বসে বলেন, আপনি সীরিয়াস? আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন না?

—না।

—আপনি সত্যি অন্যগ্রহ থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ।

—কত দূরে আপনাদের গ্রহ।

—আপনাদের হিসেবে পাঁচ আলোকবর্ষ দূরে।

—আপনার বয়েস কত? আপনাদের ওখানে সাধারণ মানুষের বয়েস কত?

—আমার বয়েস তেইশ। আমাদের ওখানকার গড় আয়ু একশো।

—দেখুন, আমিও খানিকটা লেখাপড়া জানি, সামান্য বিজ্ঞান বুঝি। আমি এটুকু বলতে পারি যে পাঁচ আলোকবর্ষের পথ তেইশ বছরের কোন ছেলের পক্ষে পেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। ডেঁপো ছোকরা কোথাকার! এক আলোকবর্ষ মানে কত মাইল দুর জান? ১৮৬০০০×৬০×৬০×২৪×৩৬৫ মাইল! এবার হিসেবটা কবতে পারবে? আমি পারি, কারণ আমি অ্যাকাউন্ট্যান্ট। গুল ঝাড়বার আর জায়গা পাও নি?

লোকটি তবু মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলল, আমি কিন্তু আপনাকে সত্যি কথাই বলছি।

—এত স্পীডে তোমাদের রকেট ছুটতে পারে? তা তোমার সেই রথখানা কোথায় রেখে এসেছ? কলকাতার গড়ের মাঠে?

—না, আমরা রকেটে আসিনি। কোনও রকেট সত্যিই এত জোরে ছুটতে পারে না। আমাদের সেরকম রকেট নেই। কিন্তু আমরা একটা জিনিস পারি, যা পৃথিবীর মানুষ এখনও পারে না। আমরা শরীরের প্রতিটি উপাদানকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি। অর্থাৎ ম্যাটার থেকে এনার্জি। তারপর সেই এনার্জি মিশিয়ে দিই আলোর সঙ্গে। এই রকম ভাবে ঠিক পাঁচ বছর আগে আমাদের গ্রহ থেকে যাত্রা করে আমরা এখানে পৌঁছেছি।

—আমরা মানে?

—আমরা একশো জন ছাত্র এসেছি পৃথিবীতে গবেষণা করতে।

—একদম সব নেশা কাটিয়ে দিলে ভাই! এ সমস্ত কী কথা এত রাত্রে? হঠাৎ এত লোক থাকতে আমার কাছেই বা এলে কেন?

—এমনিই এক একজন মানুষকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

—এখন কী করতে চাও?

—আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি আপনার বাড়িতে সাতদিন থাকতে চাই। আমি অদৃশ্য হয়েও থাকতে পারতাম, কিন্তু তাতে শারীরিক দুঃখ কষ্ট, আনন্দের অনুভূতি হয়

না। সেগুলোও আমার বোঝা দরকার।

—তুমি এই চেহারায় আমাদের বাড়িতে থাকবে?

—হ্যাঁ।

—যদি আমি না বলি? যদি আমার আপত্তি থাকে?

—কেন, আপনি আপত্তি করবেন কেন?

—এই বাজারে কেউ কোনও লোককে বাড়িতে রাখে? জানা নেই শোনা নেই, একটা লোককে রাখলেই হল?

—আপনার সেরকম আপত্তি থাকলে আমি চলে যাব। আমাকে আবার নতুন ভাবে কাজ শুরু করতে হবে। অনেকটা সময় নষ্ট হবে।

সোমেন রায়চৌধুরী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আরে আরে, তুমি অভিমান করলে নাকি?

—অভিমান? সেটা কী?

—তুমি অভিমান কাকে বলে জানো না? সাহেবরাও জানে না। যাই হোক, আমি তোমার মনে আঘাত দিতে চাই না। তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি জানো, আমার স্ত্রী সুন্দরী?

—আপনার সৌন্দর্যের ধারণা আর আমাদের সৌন্দর্যের ধারণা এক নাও হতে পারে।

—তোমাদের ওখানে কোন্ রকমের মেয়েদের সুন্দরী বলে?

—সেটা খুব জটিল ব্যাপার, আপনাকে এক্ষুনি বোঝানো যাবে না।

—যাই হোক, তুমি এখন পৃথিবীর মানুষ সেজে আছ, পৃথিবীর মেয়েদের তুলনায় আমার স্ত্রীকে যথেষ্ট সুন্দরীই বলা যায়। তুমি যদি আমার স্ত্রীর প্রেমে পড়ে যাও, তা হলে কী হবে?

—প্রেম?

—ও, তুমি প্রেমও বোঝো না? যাই হোক, মোট কথা তোমাকে আমার স্ত্রী যে-কোনও সময় নিজের স্বামী ভেবে ফেলতে পারে। তারপর? তুমিই রত্নার স্বামী হয়ে রইলে, আর আমাকে তাড়িয়ে দিলে এমন যদি হয়? আমি কী করে প্রমাণ করব যে আমি আমিই?

—আপনার সে বিষয়ে কোনও চিন্তা নেই। আপনাদের সময়ের হিসেবে ঠিক সাতদিন বাদে আমি চলে যাব।

—তাও না হয় বিশ্বাস করলুম। কিন্তু আমার স্ত্রী কি রাজি হবে? একই বাড়িতে একজন মেয়ের দুজন স্বামী, এটা কি সমাজ মেনে নেবে?

দরজার বাইরে আওয়াজ হল, বাবু, বাবু!

ভয়ার্ত গলায় বাড়ির চাকর ডাকছে।

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, ঐ দেখুন! ওপর থেকে ডাক এসে গেছে। রত্না ভেবেছে, আমি নিশ্চয়ই কোনও বন্ধুকে ডেকে এনে আবার বোতল খুলে বসেছি।

উঠে গিয়ে তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন, এই যা, দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আয় তো?

কিন্তু রত্না নিজেও নেমে এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে দরজার আড়ালে।

সোমেন রায়চৌধুরী ছুটে ফিরে গিয়ে সেই লোকটির পাশে গিয়ে বসে পড়ে বললেন, এই রঘু, তোর দিদিমণিকে ভেতরে আসতে বল।

রত্না দরজার সামনে দাঁড়িয়েই বলল, একি?

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, ভেতরে এসো, ভেতরে এসে ভালো করে দ্যাখো!

রত্না ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই।

সোমেন রায়চৌধুরী মজা করে বললেন, এইবার বেছে নাও তো কে তোমার স্বামী! চিনতে পারবে? মনে করো দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভা হচ্ছে। দময়ন্তী কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছিল নলকে।

রত্না এবার নিজের স্বামীর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললো, উনি কে?

—চিনতে পেরেছ তাহলে? দময়ন্তীর স্বয়ংবরের সময় যেমন স্বর্গ থেকে দেবতারা এসেছিলেন, তেমনি ইনিও এসেছেন গ্রহান্তর থেকে। দেখো, এঁকে তোমার পছন্দ হয়? এঁর কিন্তু বয়েস অনেক কম।

রত্না আবার জিজ্ঞেস করল, ইনি কে? বলো না, ইনি কে?

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে নমস্কার করল রত্নাকে।

রত্নার স্বামী বললেন, ইনি আমাদের গ্রহান্তরের বন্ধু। আমি এঁর নাম জানি না অবশ্য, তবে ধরে নাও, এঁর নামও সোমেন রায়চৌধুরী!

রত্না এবার সেই লোকটিকেই জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

লোকটি বলল, আপনার স্বামী ঠিক কথাই বলছেন!

—একরকম চেহারা? এরকম সত্যি হয়?

সোমেন রায়চৌধুরী স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, একদম হুবহু এক চেহারা নয়। রত্না, তুমি কী করে আমাকে চিনতে পারলে?

—তোমার গলার আওয়াজ শুনে।

—ওর গলার আওয়াজ তো আমারই মতন।

—কিন্তু ওঁর গলা শুনেই মনে হয় উনি অচেনা কারুর সঙ্গে কথা বলছেন! তোমার মতন স্বাভাবিক নয়!

—ইনি কী বলছেন জানো? ইনি কয়েকদিন তোমার স্বামী হিসেবে এখানে থাকতে চান। তুমি যদি রাজি থাকো, বলো, সেই সাতদিন ছুটি নিয়ে আমি অন্য কোথাও কাটিয়ে আসব।

—কী পাগলের মতন কথা বলছ? খুব বেশি নেশা করেছ আজ?

—অমনি নেশার দোষ হয়ে গেল! তুমি তো নেশা করো নি? তুমি সত্যিই আমার মতন আর একটা লোক দেখতে পাচ্ছ কিনা?

—তা তো পাচ্ছি। কিন্তু কে ইনি?

লোকটি এবার এক পা এগিয়ে এসে বলল, আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমি অন্য গ্রহ থেকে এসেছি, মানুষের জীবন নিয়ে কিছু গবেষণা করতে। আমি কয়েকদিন এ বাড়িতে থেকে আপনার স্বামীর মতন জীবন কাটাতে চাই।

সোমেন রায়চৌধুরী ইয়ার্কি করে বললেন, একেবারে ঠিক ঠিক আমার মতন জীবন কাটাতে গেলে, রত্নার সঙ্গে তোমাকেও ভাই এক বিছানায় শুতে হবে। আবার বকুনি খেতে হবে।

রত্না বলল, তুমি চুপ করো তো। বড্ড বাজে কথা বলছ।

—এই যে দেখছেন তো, শুরু হয়ে গেছে বকুনি।

লোকটি রত্নাকে বলল, আপনার যদি আপত্তি থাকে—

রত্না বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এ কখনও হয় নাকি?

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, বেশ মজার ব্যাপার হবে কিন্তু।

লোকটি বলল, আচ্ছা তা হলে আর একটা কাজ করা যায়। ধরুন যদি আপনার স্ত্রীর মতন ঠিক এক রকম আর একজন কেউ এখানে আসে?

—আর একজন কারুকে পাবেন কোথায়? ঠিক রত্নার মতন আর একটি মেয়ে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এরকম মেয়ে শুধু পৃথিবীতে কেন, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, মহাকাশের কোথাও পাওয়া যাবে না। কী রত্না, ঠিক বলিনি?

—আঃ, তুমি সব সময় বড্ড ইয়ার্কি করো!

লোকটি বলল, ধরুন যদি পাওয়া যায়।

—তা হলে কী হবে?

—তার সঙ্গে আমি স্বামী-স্ত্রীর মতন থাকব, আপনারা দুজনে যেমন ভাবে জীবন কাটান, ঠিক সেটা অনুকরণ করে যাব।

সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, পারবেন না। আমি বাজি রেখে বলছি, আর কোনও মেয়ে রত্নার মতন ব্যবহার করতেই পারবে না!

লোকটি দুবার শিস দিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে অত্যাশ্চর্য আর একটা কাণ্ড হল! প্রথমে আলো নিভে গেল ঘরের। রত্না ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরল স্বামীকে। তখন মনে হল ঘরের মধ্যে যেন একটা প্রবল ঝড় বইছে।

আবার দুটি শিসের শব্দ শোনা গেল।

অমনি আবার জ্বলে উঠল আলো। তাতে দেখা গেল, হুবহু, একেবারে পায়ের শেষ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত অবিকল রত্নার মতন একজন নারী দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে।

সোমেন রায়চৌধুরী আর রত্না দুজনেই স্তম্ভিত। সোমেন রায়চৌধুরী ভাবলেন, এরকম ভেল্কি পি সি সরকারও পারতেন না!

অন্য সোমেন বলল, আলাপ করিয়ে দিই, ইনি আমাদের গ্রহের একজন ছাত্রী। আমরা দুজনে একসঙ্গে এখানে থেকে গবেষণা করব।

রত্না অপলক ভাবে তাকিয়ে রইল দ্বিতীয় রত্নার দিকে। সেও দেখছে রত্নাকে। সোমেন রায়চৌধুরী দুই রত্নাকেই দেখতে লাগলেন বারবার। তারপর বললেন, চলুন, এই খেলাটা খেলে দেখে যাক। রত্না, ওকে ওপরে নিয়ে চলো।

রত্না অন্য রত্নাকে বলল, আসুন!

সঙ্গে সঙ্গে আবার আলো নিভে গেল। আবার সেইরকম ঝড় বইল। দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই যেন আবার জ্বলে উঠল আলো।

ঘরের মধ্যে সোমেন আর রত্না ছাড়া আর কেউ নেই। তখনও রত্না আসুন বলার ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে আছে। সোমেন রায়চৌধুরীও অন্য লোকটির পিঠে হাত রাখবার মত হাতটা শূন্যে তুলে রেখেছেন।

রত্না বললো, একি হল!

—তাই তো, কোথায় গেল ওরা?

—একি স্বপ্ন দেখলাম?

—দুজনে মিলে কি এক স্বপ্ন দেখা যায়?

দুজনে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। বাইরে তুমুলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। এক মিনিট আগেও বৃষ্টি ছিল না। রত্না জানলার গায়ে এসে দেখল, এত বৃষ্টি যে রাস্তায় জল জমে গেছে। এত বৃষ্টি সে টের পায় নি?

সোমেন রায়চৌধুরীও রাস্তার পাশের জানলার কাছে এসে বললেন, কখন বৃষ্টি হল কিছুই জানলাম না? ওরা দুজন আবার অদৃশ্য হয়ে গেল? রাস্তার মাঝখানে ওটা কি?

—পাড়ার ছেলেরা বিশ্বকর্মা পুজো করছে। ঐ তো ঠাকুর।

—বিশ্বকর্মা পুজো তো সাতদিন পরে। আজ থেকেই...

আসলে যেটাকে মনে হয়েছিল এক মুহূর্তে তার মধ্যেই হয়ে গেছে সাতদিন। খানিকক্ষণের মধ্যেই ওরা দুজনে বুঝতে পারল সেটা। মাঝখানে সাতদিনের কথা ওদের একদম মনে নেই।

ওপরে এসে ওরা দেখল, পাশের ঘরে দুটি আলাদা খাট বিছানা পাতা, বাথরুমে দুটি অতিরিক্ত টুথব্রাস। আরও অনেক চিহ্ন ছড়ানো। সত্যি তা হলে আরও দুজনে এসেছিল এখানে! কিন্তু ওরা কিছুই মনে করতে পারছে না।

বিছানার ওপরে দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ।

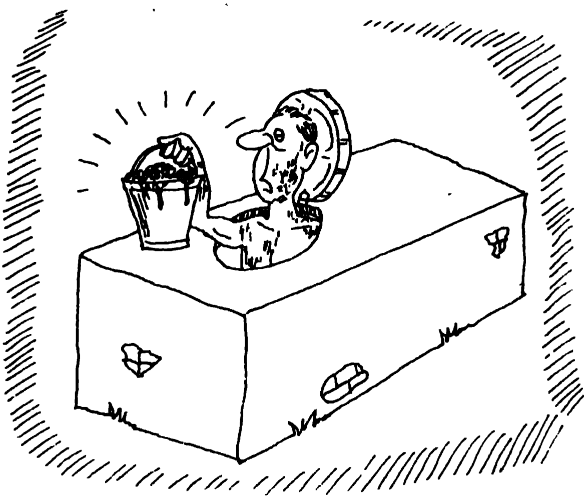
তারপর সোমেন রায়চৌধুরী বললেন, সাতটা দিন নিশ্চয়ই কেটে গেছে রত্না। আমি কেমন যেন টের পাচ্ছি, মানুষ হিসেবে আমি যেন খানিকটা বদলে গেছি। নিজেকে অন্য মানুষের মতন লাগছে। তোমার মনে হচ্ছে এরকম?

রত্না ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।



ট্যাংকি সাফ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



ট্যাংকি সাফ করতে ষাট টাকা চেয়েছিল মাগন। চল্লিশ টাকায় রফা হয়েছে।

তো মাগন সেপটিক ট্যাংকির লোহার চাক্তি কোদাল মেরে খুলে বুরবকের মতো চেয়ে রইল। আই বাপ! হাউস ফুল!

হাউস ফুল না হলে ট্যাংকি সাফ করায় কোন্ আহাম্মক? কিন্তু মুশকিল হল, মাগনের আজ কোনও পার্টনার নেই। কাল হোলি গেছে, আজ রবিবার, মরদরা আজও সব চলাচল জমি ধরে নিয়ে পড়ে আছে। এ বাত ঠিক যে মুর্দার কানে কানে টাকার কথা বললে মুর্দাও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। কিন্তু মাতালরা তো মুর্দা নয়। আর তাদের উঠিয়েও কোনও লাভ নেই। টাকার লোভে কেউ হয়তো গার্দা সাফ করতে এসে ট্যাংকির মধ্যে পড়ে গজব হয়ে যাবে।

প্রথম ট্যাংকিতে ময়লা, দু নম্বরে জল, তিন নম্বরেও জল। তিন নম্বরে পয়লা বালতি মেরে গান্ধা জল তুলে ড্রেনে ঝপাৎ করে ফেলে মাগন আপনমনে বলে—আই বাপ! হাউস ফুল! চালিশ টাকার তো সিরিফ পাসীনা চলে যাবে, ফিন ভিটামিন উটামিন দিবে কৌন?

বারান্দা থেকে দত্তবাবু দেখছেন, হেঁকে বললেন—কী বলছিস রে ব্যাটা?

মাগনা ঝপাং করে দুসরা বালতি মেরে মুখ তুলে এক গাল হেসে বলে—একটা বাংলা সাবুনের দাম দিবেন তো বড়বাবু? আর চায় পীনেকো পয়সা! আউর হোলির বখশিশ!

—ব্যাটা নাত-জামাই এলেন।

—এমন সাফা করে দিব না বড়বাবু। একদম বেডরুম।

—বকবক করিস না, হাত চালা। বেলা ভর তোর কাজ দেখতে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?

তিন নম্বর বালতি মেরে মাগনা বলে—গিয়ে আরাম করুন না, কুছ দেখতে হবে না। কাম পুরো করে পয়সা লিব।

দত্তবাবু স্টেটসম্যানটা খুলে পড়তে গিয়ে দেখলেন প্লাস পাওয়ারের চশমাটা চোখে নেই। চেঁচিয়ে বললেন,—মুনমুন, আমার পড়ার চশমাটা দিয়ে যা তো!

বলে কাগজের বড় হেডিংগুলো দেখতে লাগলেন। মন দিতে পারলেন না। চল্লিশ টাকার কাজ হচ্ছে সামনে। দু-ঘণ্টা বড় জোর তিন ঘণ্টা কাজ করে ব্যাটা চল্লিশ চাক্কি ঝাঁক দিয়ে নিয়ে যাবে। রোজ একটা করে সেপটিক ট্যাংক যদি সাফ করে তবে মাসে কত রোজগার হয়?

ভাবতে গিয়ে ফোঁস করে একটা শ্বাস বেরিয়ে গেল। বারোশো টাকা!

দত্তবাবু খুব জোর হেঁকে বললেন—জোরসে চালা! জোরসে!

ট্যাংকির ভিতরে বক বক করছে জল। গহীন গান্ধা জল। ঝপাঝপ বালতি মারে মাগনা আর বলে—চালাচ্ছে বাবা! বৃহৎ গান্ধা*বাবা, বহুৎ কাদো। চালিশ রুপিয়া ম্রিফ পসীনা মে গিয়া বাবা! ভিটামিন দিবে কৌন?

দুই

মুনমুন সাজছে। সময় নেই।

কদিন আগেও চুলের গুছির গোড়ায় একটা গারডার বেঁধে বেরিয়ে পড়তে পারত। আজকাল আর তার জো নেই। যাদবপুরের জল এত খারাপ যে গত দু-বছরেই চুল উঠে উঠে এই কটা হয়ে গেছে। এখন মাথায় হাত বোলালেও চুল উঠে আসে, একবার চিরুনি চালিয়ে আনলে উঠে আসা চুলের গোছা দিয়ে দড়ি পাকানো যায়! এখন বব করেছে। তবু চুলের পিছনে খাটতে কম হয় না। শুধু চুল? গায়ের রং মেটে হয়ে গেল। যে দেখে সে-ই বলে—ইস! কী কালো হয়ে গেছিস! কতবার বলেছে বাবাকে এবার যাদবপুর ছাড়ো। আর নয়, এর পর মাথায় টাক পড়বে, গায়ের রং হয়ে যাবে টেলিফোনের মতো। পাত্রপক্ষ দেখতে এলে ভুল করে বলে উঠবে হ্যালো!

সময় নেই। শুধু শাড়িটা পরা বাকি।

—ব্লাউজের হুকগুলো লাগিয়ে দিবি লক্ষ্মীটি? বলতে বলতে গিয়ে সে হুস করে চুনুর সামনে পিছু হয়ে উবু হয়ে বসে পড়ে।

চুনুর মুখ দেখে তার মন বোঝা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে সে এইটে অভ্যেস করেছে। মুখে একটা ভালমানুষী, আর বড় বড় চোখে ভাসানো দৃষ্টিতে সে চায় সব সময়। দিদিকে আসতে দেখেই চুনু একটা কাগজ লুকিয়ে ফেলল ফ্রকের ঘেরের নিচে।

—একক সংগীত তোর ভাল লাগে? বাব্বা! আড়াই ঘণ্টা ধরে একই গলার গান শুনতে শুনতে মাথা ধরে যায় না?...ইস, হুকগুলো সব চেপটে গেছে। লন্ড্রিতে দিয়েছিলি বুঝি ব্লাউজটা। আছড়ে কেচেছে, হুকের মাথাগুলো সব বসে গেছে।

মুনমুন অধৈর্য হয়ে বলে—তাড়াতাড়ি কর না!

—করছি তো। হুকগুলো ঘরে ঢুকছে না যে। একটা সেফটিপিন দে, খুঁটে তুলি।

মুনমুনের নতুন প্রেমিক এসে দাঁড়িয়ে থাকবে রবীন্দ্রসদনে। মুনমুন খুব ভাল জানে এও বেশিদিন টিকবে না। শেষ পর্যন্ত কে যে পাবে তাকে তা কি এখনই বলা যায়? সতেরো বছর বয়সে কী করে বলবে, আসল লোকটা কে? এখনও কত জন আছে, কত

রোমাঞ্চ আছে, কত রহস্য ও ঘটনা। তবু এখনকার মতো এই প্রেমিকটিকেও সে উপেক্ষা করতে পারে না।

সব সময়েই একটু দেরি করে যাওয়া ভাল। তা বলে বেশি দেরিও নয়। তাতে উৎকণ্ঠার বদলে বিরক্তি এসে যায়। মুনমুনের একটা হিসেব আছে, সে হিসেবমতো একটু বেশীই দেরিই হয়ে যাচ্ছে।

সে এক ঝটকায় সরে এসে বলে—ছাড় তো! তোর কম্ম নয়।

বলে সে নিজে নিজে ড্রেসিং টেবিলের দিকে পিছু ফিরে হাত পিছনে ঘুরিয়ে টপাটপ হুক লাগিয়ে ফেলে, বলে—কোথায় হুক চেপটে গেছে! আমার হাতে লাগল কি করে? মারবো থাপ্পড়—

চুনু ভাসা চোখে চেয়ে থাকে ভালমানুষের মতো। যেন জানে না, হুক ঠিক ছিল। বলল—সুচিত্রার গান রোজ তো শুনছিস বাবা, রেডিওয় গ্রামোফোনে, মাইকে। আর কত? ডাল-ভাত হয়ে গেছে।

—সুচিত্রা কখনও ডাল-ভাত হয়ে যায় না। আর হলেই কি? তুই রোজ ভাত খাস না? খারাপ লাগে? ভাত না পেলে তো কুরুক্ষেত্র করিস!

হঠাৎ কুঁকড়ে গিয়ে চুনু ফ্রক তুলে নাক চেপে ধরে রুদ্ধস্বরে বলে—এঃ মা! কী গন্ধ আসছে!

প্রচণ্ড সেন্ট মেখেছে মুনমুন। প্রথমে সে পায়নি, এখন পেল গন্ধটা। একটা 'ওয়াক' তুলে দৌড়ে গিয়ে বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে এসে 'উঁঃ উঁঃ' করে নাকে আঁচল চাপা দিয়ে বলল—সেপটিক ট্যাংক খুলেছে, শীগগির জানলা বন্ধ কর।

তিন

—একটা দড়ি দিবেন বড়বাবু? আব পানী নীচা হয়ে গেল, বালতিতে দড়ি লাগাতে হবে।

—ওঃ, দড়ির কথা আগে বলবি তো! দাঁড়া দেখি আছে কিনা!

মাগনা একগাল হেসে বলে—বারো আনা পয়সা দিন তো লিয়ে আসি।

—পয়সা দিলে পাওয়া যায় সে জানি। চালাকি করিস না। দেখছি দাঁড়া।

দত্তবাবু চেঁচালেন—কোথায় গেলে গো? এ ব্যাটা দড়ি চাইছে। আছে নাকি?

লীলাময়ী রান্নাঘরে নেই। খুঁজতে গিয়ে দত্তবাবু দেখেন, ফাঁকা রান্নাঘরে উনুনের ওপর ডাল ফুটছে। ডালের ফেনা উথলে উনুনের গায়ে পড়ে পড়ে ছ্যাঁক-ক্ ছ্যাঁক-ক্ শব্দ উঠছে।

দত্তবাবু ফিরে দাঁড়াতেই অন্যায়ের দৃশ্যটি দেখতে পেলেন।

দত্তবাবু তাঁর শ্বশুরমশাইকে 'বাবা' ডাকেন না বলে লীলাময়ীর বড় অভিমান। কিন্তু এ লোককে 'বাবা' ডাকা যায়? দত্তবাবু দেখতে পেলেন, ভিতরের দু-ঘরের মাঝখানকার প্যাসেজে তাঁর রোগা খুনখুনে বুড়ো শ্বশুরমশাই খুব গোপনে একটা গামছায় নাক ঝাড়ছেন।

শ্বশুরমশাইয়ের ভয়ে দত্তবাবু তাঁর পরিষ্কার গামছাখানা সবসময়ে লুকিয়ে রাখেন। কারণ শ্বশুরমশাইয়ের নিজের দু-খানা গামছা থাকা সত্ত্বেও গামছায় তিনি নাক ঝাড়েন না বা পায়ের তলা মোছেন না। ও দুটো কাজের জন্য তিনি সব সময়েই অন্যের গামছা চুরি করেন। এখনও করছেন। আরও আছে। নিজের হাওয়াই চপ্পল থাকা সত্ত্বেও

পায়খানায় যাওয়ার সময় শ্বশুরমশাই লুকিয়ে জামাইয়ের হাওয়াই দুটো পায়ে দিয়ে যান।

কার না রাগ হয়? কিন্তু মুখোমুখি চোটপাট করে কিছু বলাও যায় না। কুটুম মানুষ।

দত্তবাবু প্যাসেজটার মধ্যে এগিয়ে গিয়ে বললেন—গামছাটা আপনি পেলেন কোথায়?

'বাবা' ডাকেন না বলে যে শ্বশুরমশাই দত্তবাবুকে কম খাতির করেন তা নয়। বরং বেশিই করেন। বাবা ডাকেন না বলেই খাতির করেন। খাতিরের চেয়েও বেশি। ভয় পান।

বুড়ো মানুষটি ভয়ে হাঁ করে আছেন। আড়ষ্ট হাতে জামাইয়ের গামছা সামলে নিয়ে বললেন—এইখানেই ছিল। সরিয়ে রাখছি। দেখো, তোমার গামছায় যেন কেউ হাত না দেয়। কাউকে হাত দিতে দেবে না। আমিও সবাইকে বারণ করি, অধীরের গামছায় তোমরা কেউ...

দত্তবাবু মুখটা কুঁচকে সরে এলেন। গামছাটা আজ আর একবার কাচিয়ে নিতে হবে। সরে আসতে আসতেই শুনতে পেলেন, 'হ্যাক' করে থুতু ফেলার শব্দ। পিছনে আর তাকালেন না। তাকালে আর সারাদিন জল খাওয়া হবে না। প্যাসেজেই জলের কুঁজো রাখা। শ্বশুরমশাই সারাদিন বাড়ির সর্বত্র থুতু ফেলছেন। সর্বত্র।

লীলাময়ী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন বাইরের ঘরের দরজার পাশে। একটু গোপনীয়তার ভঙ্গি মাখানো তাঁর শরীরে।

গোপনীয়তাটা বাহুল্যমাত্র। বাইরের ঘর থেকে যে আসছে তা শোনবার জন্য কান পাততে হয় না।

চার

যতটা সুভদ্রাকে ততটা আর কোনও মেয়েমানুষকে ঘেন্না করে না অধীপ। গুয়ের পোকাও কি ওর চেয়ে ভাল নয়?

সুভদ্রা খাটে বসে আছে, সামনের দিকে জোড়া পা ছড়ানো, পিছনে হাতের ভর। মুখ সাদা, চোখ জ্বলছে। বলল—ন্যাকা—জানো না?

—তুমি বলতে পারলে? কোনও ভদ্রলোকের মেয়ে বলতে পারে ওকথা?

—নিজেরা কী? লোকে শুনলে থুতু দিয়ে যাবে গায়ে। ভদ্রলোকের মেয়ে! আমি ভদ্রলোকের মেয়ে না তো কী, তোমার মতো ইতরের বাচ্চা?

মেয়েমানুষকে মারা ভাল নয় অধীপ জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে বুঝতে পারে, মার—মারের মতো এমন নিরাময় আর কিছুতেই নেই। মারই বোধ হয় সবচেয়ে শান্তি। এক পা এগিয়ে সে শরীরে রিম-ঝিম রাগের নাচ শেষ কয়েক মুহূর্তের জন্য সহ্য করে প্রায় রুদ্ধস্বরে বলল—এই বজ্জাত মাগী! মুখ ঘষে দেব দেয়ালে!

—দাও না, দাও! বলে চোখের পলকে উঠে আসে সুভদ্রা। একদম কাছে এসে চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—ছোটোলোকের ইতরের গর্ভে যার জন্ম তার কাছে আর কী আশা করব? মারো!

অধীপ কথা বলতে পারে না। কাঁপে। স্ট্রোক হয়ে যাবে! পাগল হয়ে যাবে! ডিভোর্স...

সুভদ্রা ধকধক করতে করতে বলে—ন্যাকা! জানো না, তোমার শরীরে কিসের রক্ত! গুষ্টিসুদ্ধু বদমাইশ তোমরা, জানো না? তোমার ঐ আদরের লেংড়ী বোন চুনু কেন আমাকে বিয়ের পরদিনই বলেছিল—এই বৌদি, তুমি কেন আমার দাদার সঙ্গে শোবে!

অধীপের এ কথাটা মাথায় ঢোকে কিন্তু সুভদ্রাই কথাটা বলতে—এটা যেন বিশ্বাস হয় না। তার সমস্ত বিশ্বাসের ভূমি থেকে কে যেন তাকে তুলে ছুঁড়ে দেয় অন্য একটা হীন আর ক্লীব জগতে। সে কাঁপতে কাঁপতে কসাইয়ে গলায় বলে—কেন বলেছিল?

সুভদ্রা সে কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে দিগবসনা আক্রোশে প্রায় নেচে উঠে বলে—সহ্য হবে কেন? আদরের দাদার সঙ্গে অন্য কেউ শোয় তাতে বুক জ্বলে যাবে না? ছিঃ ছিঃ! তোমরা লোকসমাজে মুখ দেখাও কী করে?

অধীপ হঠাৎ পাথরের মতো শান্ত হয়ে গেল! খুন করার আগে যেমন মানুষ কখনও কখনও হয়। একটু বাদেই সুভদ্রা তার হাতে খুন হবে, সুতরাং সে নিশ্চিত সিদ্ধান্তের পর ঠাণ্ডা গলাতেই বলতে পারল—তুমি নর্দমার পোকা।

—তা তো বলবেই। নিজেরাই কিনা। শ্বশুর আমাকে ভালবাসে বলে তোমার মা বলেনি, শ্বশুর বলেই কী, পুরুষ তো! যুবতী বউয়ের সঙ্গে আর মাখামাখি কিসের? তুমিও বলোনি সুভ, তুমি বাবার সঙ্গে অত মেলামেশা কোরো না। বলো নি?

বলেছে। ঠিক কথা, মায়ের কাছে শুনে তারও এক সময়ে বিশ্বাস হয়েছিল বাবার সঙ্গে সুভদ্রার অত স্নেহের সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটা অসঙ্গতি আছে। বলেছে। কিন্তু মানুষের কি ভুল হয় না!

সুভদ্রা ঝোড়ো দ্রুতবেগে বলে—সন্দেহ করোনি নিজের বাবাকে? অমন মাতৃভক্তির কপালে ঝাঁটা। ডাইনী মুখে পোকা পড়ে মরবে, পচে-গলে মরবে।

ঠিক এই সময়ে দুর্গন্ধটা আসে। বহুদিনকার জমানো মল, ময়লা, জলের প্রচণ্ড গ্যাস। ঘরটার বাতাস পলকে বিষিয়ে ওঠে। কিন্তু তারা দুজন গন্ধটাকে টেরই পায় না। কিংবা পেয়েও উপেক্ষা করতে পারে। কিংবা হয়তো তারা ঠিক এই মুহূর্তে দুর্গন্ধটাকে উপভোগই করে।

আশ্চর্যের বিষয়, অধীপ হাসল। অবশ্য এটা হাসি নয়। খুন করার আগে অভ্যস্ত খুনী কখনও-সখনও এরকমই হাসে হয়তো।

তারপরেই সে চড়টা মারল। সুভদ্রা যে পাঁচ মাসের পোয়াতি তা মনে রইল না। লক্ষ্যও করল না যে তার দু-বছরের ছেলে দৃশ্যটা দেখছে।

পাঁচ

—চালা! জোরসে চালা জলদি।

—হচ্ছে বাবা, হচ্ছে। পাম্প তে নেহি যে ভটভট করে গার্দা খিঁচে লিবে!

দু-নম্বর ট্যাংকিতে ঘপ করে বালতি মারে মাগনা। হাউস ফুল।

দত্তবাবু চেঁচিয়ে বলেন—এই ব্যাটা ময়লা ফেলার গর্ত করবি না?

—হাঁ হাঁ, গোর্তো হোবে গোর্তো ভী হোবে। এক বোতল সরাবের দাম দিবেন তো বড়বাবু?

—নালীতে ময়লা ফেলবি তো পয়সা কাটব। নালী আটকালে বাড়িওলা পাঁচকথা শোনাবে। খুব সাবধান।

—কোই চিন্তা নাই বড়বাবু। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

প্লাস পাওয়ারের চশমাটা পরেও স্টেটসম্যানের খবরগুলো দেখতে পান না দত্তবাবু। পুরোটাই আবছা, অস্পষ্ট, হিজিবিজি এবং অর্থহীন। তবু মুখের সামনে কাগজটা ধরে

রাখেন, মুখোশের মতো।

মুনমুনকে চিঠি দিয়েছিল বাড়িওলার ছেলে মিলন। সেই চিঠি বাড়িওলা রসিকবাবুর হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন দত্তবাবু। সেই থেকে গণ্ডগোলের শুরু। রসিকবাবুর স্ত্রী ওপরতলা থেকে পরিষ্কার শুনিয়ে দিলেন—এ হতেই পারে না। নষ্ট মেয়েটার পাল্লায় পড়ে মিলুও গোল্লায় যাচ্ছে। তুলে দাও।

দত্তবাবুর কিছু বলার দরকার হয়নি, লীলাময়ী নিচতলা থেকে গুষ্টি উদ্ধার করলেন ওঁদের। কয়েকদিন দত্তবাবু বুকের প্যালপিটিশনে কষ্ট পেলেন খুব। তাঁর খুব ইচ্ছে করে, যে বাড়িওলার যুবক ছেলে নেই তার বাড়িতে উঠে যান। কিন্তু ইচ্ছে তো আর পক্ষীরাজ নয়!

এক বছর আগেকার সেই ঘটনা থেকেই অশান্তি চলছে। রান্না করতে করতে মাঝখানে কলের জল বন্ধ হয়ে যায়। আঁচাতে গিয়ে বেসিনে জল পাওয়া যায় না। লীলাময়ী নিচে থেকে দাপিয়ে চেঁচান। আর দত্তবাবুর ঝি বাসন মেজে কলতলায় ছাই ফেলে এলে ওপর থেকেও দাপানো আর চেঁচানোর শব্দ হয়।

শ্বশুরমশাই বকের মতো পা ফেলে বাথরুমে যাচ্ছেন জল ঘাঁটতে। এ বাড়ির জলকষ্টের মূলে এই লোকটার অবদান বড় কম নেই। সারাদিন জল ঘাঁটছে লোকটা। হাঁপানি আছে। সর্দির ধাত আছে। সারা রাতের কাশি আছে। আর সেই সঙ্গে জল ঘাঁটাও আছে। জল ঘাঁটুক, তাতে দত্তবাবুর আপত্তি নেই। তিনি শুধু শ্বশুরমশাইয়ের পায়ের চপ্পলটা লক্ষ্য করলেন, দত্তবাবুর চপ্পলের স্ট্র্যাপ নীল রঙের, শ্বশুরেরটা খয়েরি।

খয়েরি দেখে দত্তবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে আবার স্টেটসম্যানের মুখোশ পরলেন, পরার দরকার ছিল। কারণ লীলাময়ী আসছেন।

এসে একটা মুখ ছেঁড়া খাম দত্তবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—এই সেই চিঠি!

—কিসের চিঠি?

—বউমার বাক্স থেকে বোধ হয় চুনু নিয়েছিল।

—কেন?

—অন্যায় করেছে নিয়েছে। হয়তো লোভ সামলাতে পারেনি। এই নিয়েই অধীপের সঙ্গে ঐ ঝগড়া।

দত্তবাবু চিঠিটা হাতে নিয়ে বলেন—কবেকার চিঠি?

—বিয়ের আগে অধীপ বউমাকে যে-সব চিঠি লিখত তারই একটা। কী দরকার ছিল পুরোনো চিঠি জমিয়ে বুকে করে রাখবার? পুড়িয়ে ফেলা যেত না? ঘরে বয়সের ননদরা রয়েছে, কোলের ছেলেও বড় হচ্ছে...

—তুমি চিঠিটা পড়েছ?

খুব দৃঢ় গলায় নয়। ঝঙ্কার দিয়ে লীলাময়ী বললেন— পড়ব কেন?

—পড়োনি?

—ওপর ওপর দেখেছি একটু। কী এমন কথা যার জন্য মাগীর আঁতে ঘা পড়ল!...উঃ, এই দুর্গন্ধের মধ্যে বসে আছ কী করে? তুমি মানুষ না কী?

দত্তবাবু বললেন—পড়ে ভাল করোনি।

—কেন? ভাল না করারই কী? তুমিও দেখো না। বলে লীলাময়ী খাম থেকে চিঠিটা খুলে নিয়ে দত্তবাবুর হাতে দিয়ে বলে—পড়েই দেখ।

—বউমা কী করছে?

—কাঁদছে, ঘরে দরজা দিয়ে।

—তুমি যাও।

লীলাময়ী চলে গেলে দত্তবাবু চিঠিটা খোলেন।...অশ্লীল, খুবই অশ্লীল চিঠিটা।

মন থেকে আজ কেমন জোর পাচ্ছেন না। মনের জোরের জন্য খানিকটা নৈতিকতা দরকার। হ্যাঁ মর‍্যালিটি, তা কি তাঁর আছে?

লীলাময়ী দুর্গন্ধের কথা বলে গেলেন। কিন্তু তিনি দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন না।

ছয়

ডাক্তারকে খবর দেওয়া ছিল। সদর থেকে তাঁর হাঁক শোনা গেল এইমাত্র—কই বউমা কোথায়!

বাইরের বারান্দাটাই এখন বসার ঘর। অধীপের বিয়ের পরই বাইরের ঘরটার দরকার হল। তখন বারান্দাটা প্লাইউড দিয়ে ঘিরে সোফা সেট পাততে হল।

লীলাময়ী প্রমাদ গুনলেন। বউমাকে দেখতে এসেছে। সর্বনাশ! তার বাঁ গালে অধীপের পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে আছে এখনও, তার ওপর নাগাড়ে কাঁদছে। বাইরের লোকের সামনে বেরোবে না কিছুতেই। যদিও বা বেরোয় তো ডাক্তার সবই লক্ষ্য করবে।

উঠে গিয়ে তিনি ঘোমটা টেনে বললেন—বসুন।

—বেশি বসবার উপায় নেই। চেম্বারে রুগী বসে আছে।

লীলাময়ী নিঃশব্দে গিয়ে দরজায় সামান্য শব্দ করে চাপা গলায় ডাকেন—বউমা! বউমা! ডাক্তারবাবু এসেছেন, দরজা খুলে দাও। ঠিকঠাক হয়ে নাও।

সুভদ্রা পাঁচ মাসের পোয়াতি। বড় ছেলে দুই পেরিয়েছে। সে হতে বড় কষ্ট গিয়েছিল। অধীপ তাই ঘন ঘন ডাক্তার ডেকে চেক আপ করায়। কিন্তু অধীপটা রাগারাগি করে বেরিয়ে গেছে। অবস্থাটা সামাল দেবেন কীভাবে তা ভাবতে ভাবতে লীলাময়ী গিয়ে চায়ের জল চাপান। চৌধুরী পারিবারিক ডাক্তার, তাঁর কাছে তেমন লজ্জা নেই। তবু তো লজ্জা! আজকালকার বউয়েরাও ভারি নির্লজ্জ। কথায় কথায় পরপুরুষ ডাক্তারদের কাছে নিজেদের খুলে দেয়। ডাক্তাররা গোপন জায়গায় হাত দেয়, টিপ দিয়ে দেখে, অসভ্য সব প্রশ্ন করে। মাগো! লীলাময়ী মরে গেলেও পারবেন না। তাঁকে কয়েকবার লেডি ডাক্তারেরা দেখেছিল। তাতেই কী লজ্জা!

শচীলাল ডাক্তারের গন্ধ পেয়েছেন। থুতু ফেলার জন্য তাঁর একটা টিনের কৌটো আছে। সেইটে গিয়ে গোপনে বেসিনে ধুচ্ছিলেন। জল ঘাঁটছেন টের পেলে মেয়ে আজকাল বড় বকে।

ডাক্তারের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি কৌটো রেখে বাইরের বারান্দায় এসে বসেই বললেন—বুঝলেন ডাক্তারবাবু, গত দু-বছর যাবৎ আমার পেটের কোনও গোলমাল নেই।

চৌধুরী হেসে বলেন—বাঃ, খুব ভাল।

—যা খাই সব হজম হয়। ইঁটের মতো শক্ত পায়খানা। আপনি আমাকে রোজ সকালে দুটো করে মুর্গীর ডিম খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে যান।

—সে আমি বুঝব'খন। শ্বাসের কষ্টটা কেমন আছে?

—এটাই যা একটু কষ্ট দেয়, আর সব ভাল।

লীলাময়ী চা নিয়ে এসে বাবাকে দেখে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলেন—তোমার আবার কি?

শচীলাল একগাল হেসে চৌধুরীকে বলেন—বুঝলেন ডাক্তারবাবু, লীলা ভাবে আমি পেটখারাপের কথা লুকোই। কাল তাই প্যানের ওপর পায়খানা করে ডেকে দেখালাম। বল না লীলা ডাক্তারবাবুকে কেমন পায়খানা!

চৌধুরী বলেন—আচ্ছা, দেখা যাবে।

লীলাময়ীর মুখ ফেটে পড়ছে রাগে, চাপা গলায় শচীলালকে বলেন—এখন ঘরে যাও তো!

—চা করলি?

—তুমি এখন খাবে না চা। স্নান করো গে। একেবারে ভাত দেব।

—চালকুমড়ো পাতার পুর করবি না?

লীলাময়ীর হাত পা নিসপিস করে। গোপনে আবার এসে, বউমার ঘরের দরজায় নাড়া দেন—শুনছ বউমা?

ঘরে ছেলেটা কাঁদছে অনেকক্ষণ ধরে। বাপ মায়ের রুদ্রমূর্তি দেখেই শুরু করেছিল। তারপর থেকে ভ্যাবাচ্ছেই।

সুভদ্রার কান্না থেমেছে। গম্ভীর গলায় বলল—ডাক্তার বিদেয় করে দিনগে। আমি দেখাব না। আর বিরক্ত করবেন না আমাকে।

ভারি অসহায় বোধ করেন লীলাময়ী। কী করবেন? চৌধুরী এসেছেই যখন, রুগী দেখুক আর না দেখুক, ভিজিটের টাকাটা দিতেই হয়। কিন্তু অধীপ ভিজিটের টাকা রেখে যায় নি।

সাত

—ইসি ট্যাংকিমে আর কুছু নাই বড়বাবু।

—নেই মানে? ইয়ার্কি পেয়েছিস? ডাণ্ডা মার, মার ডাণ্ডা! দেখি কতখানি আছে!

মাগন বলে—হাঁ হাঁ দেখে লিন।

ডাণ্ডা মারতেই সেটা ভচাক করে দু-হাত পুরু ময়লায় ডেবে গেল।

—ঐ তো! এখনও অর্ধেক রয়ে গেছে। চালাকি করার আর জায়গা পাস না? চল্লিশ টাকা কি এমনি এমনি দেবো?

ডাণ্ডাটা তুলে ময়লার দাগ দেখিয়ে মাগন বলে—বাস, এইটুকু তো সব ট্যাংকিতে থাকে। ট্যাংকি কি কখনও পুরো সাফা হয় বড়বাবু? কুছ তো থেকেই যায়। ই তো শ্রিফ বালু আছে।

—বকবক না করে কাজ কর তো।

—হাঁ হাঁ কাম তো করছে বড়বাবু।

দু নম্বর ট্যাংকিতে জলের নিচে ময়লা এখনও থকথক করছে। শক্ত মাল। বালতি মারলে ডোবে না। পা গর্তে ঢুকিয়ে চেপে বালতি ডোবায় মাগন। বলে—বহোত পরেসান বাবা। একটা পুরানা জামা দিবেন তো বড়বাবু? ট্যাংকি বেডরুম বানিয়ে দিব।

লীলাময়ী আসছেন টের পেয়েই দত্তবাবু স্টেটসম্যানের মুখোশটা পরে নিলেন।

কিন্তু লীলাময়ী এলেনই। নাকে চাপা আঁচলের ফাঁক দিয়ে বললেন—চৌধুরী এসেছে। বউমা ডাক্তার দেখাবে না বলছে। কিন্তু ভিজিট তো দিতে হয়। অধীপ টাকা রেখে যায়নি।

বিরক্ত দত্তবাবু বলেন—আমার ব্যাগ থেকে নিয়ে দিয়ে দাও গে। অধীপ এলে চেয়ে রেখো।

—চাইব, কিন্তু সে দেবে কেন? তার বউকে তো আর দেখেনি।

—সেই তো ডেকেছে, আমরা তো কল দিই নি। রেসপনসিবিলিটি তার।

লীলাময়ী নাকটা ছেড়ে একটু দম নিতে গিয়েই দুর্গন্ধে শিউরে উঠে 'হ্যাক' শব্দ করে আবার নাকে চাপা দিয়ে বলেন—বলছি কী, ভিজিট যখন দিচ্ছিই তখন আর মাগনা ছাড়ি কেন। প্রেসারটা দেখিয়ে নিই। বাবার বুকটাও পরীক্ষা করুক। তুমিও তো পরশুদিন মাথা ঘোরার কথা বলছিলে, দেখিয়ে নেবে নাকি?

ঠিক এই সময়ে ওপর থেকে রসিকবাবুর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠে বলেন—এই জমাদার! নর্দমায় ময়লা ফেলছ যে বড়? নালী আটকে যাচ্ছে না?

মাগন মুখ তুলে বলে—নালী টেনে দিব মা। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

—কেন, গর্ত করতে কী হয়? বলা হয়নি তোমাকে গর্ত খুড়তে? টাকা মাগনা আসে?

—হাঁ হাঁ, গাড্ডা ভী হোবে।

রসিকবাবুর স্ত্রী বেশ চেঁচিয়ে বলতে থাকেন—ছ-মাস আগে ট্যাংক পরিষ্কার করানো হয়েছে, এর মধ্যেই যে কী করে ভরে যায় তা তো বুঝি না!

কথাটা গায়ে না মাখলেও হয়। কিন্তু লীলাময়ী মাখলেন।

—শুনলে?

দত্তবাবু স্টেটসম্যানের মুখোশ পরে ফেলেন। লীলাময়ী মুখটা সিলিং-এর দিকে তুলে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়েন—ময়লা কি শুধু আমাদের একার? ওপরতলায় বুঝি সব দেবতারা থাকেন, তাঁরা কেউ হাগেন মোতেন না? আর জমাদারের টাকার অর্ধেক তো আমাদেরও দিতে হবে। মাগনা কাজ হচ্ছে নাকি?

রসিকবাবুর স্ত্রী নাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। সব কথা বোঝা যায় না। শুধু স্পষ্ট করে শুনিয়ে বললেন—ঐ তো ছেলে ধরতে বিবি বেরিয়ে গেলেন। আর দোষ হল কি-না আমার মিলনের। গুষ্টিসুদ্ধু তেড়ে এসেছিলেন ঝগড়া করতে। বলি, মেয়ে কোথায় যায়, কার সঙ্গে কি রকম ঢলাঢলি তার খবর রাখছে কে? সে বেলা তো চোখে তুলসীপাতা এঁটে থাকা হয়।

লীলাময়ী এখন আর দুর্গন্ধটা পাচ্ছেন না। নাকের কাপড় কখন খসে গেছে। বড় বড় চোখে লীলাময়ী স্বামীর দিকে তাকান। মুখে কথা নেই।

দত্তবাবু এমন মুখের ভাবখানা করেন, যেন তাঁর মেয়ে বা তাঁর পরিবার নিয়ে কথা হচ্ছে না। এ যেন অন্য কারও কথা। প্রচণ্ড জিদবশত তিনি কাগজে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ দাঙ্গার খবর পড়তে থাকেন। এক বর্ণও বুঝতে পারেন না।

একবার ভাবলেন ডাক্তার চৌধুরীকে প্রেসারটা দেখিয়ে নেবেন।

আট

চুনুর একটা পা শুকনো কাঠি। একটা হাতও কমজোরি। বড় কষ্ট তার হাঁটাচলার। যে তাকে দেখে সে-ই দুঃখ পায়।

আর অন্যের এই দুঃখবোধটা খুব ভাল কাজে লাগাতে শিখে গেছে চুনু।

জানলার কাছে একটা সাইকেল থেমে আছে। সাইকেলের ওপর শিবাজী।

—ডলিকে আমি নিজের চোখে দেখেছি পাম্প ছাড়তে। চুনু খুব ভালমানুষের মতো বলে।

—কিন্তু আমার পিছনের চাকাটায় তো লিক বেরোলো।

—লিক? তবে ঠিক সেফটিপিন ফুটিয়ে দিয়েছিল। তুমি তখন মান্তুদের বাড়িতে ক্যারাম খেলছ। খেলছিলে না?

—ক্যারাম?

—মিথ্যে কথা বোলো না।

শিবাজী হেসে বলল—খেলছিলাম। তুমি ডলিকে বলেছ?

—না, মাইরি, কালীর দিব্যি।

—তবে বলল কে? ডলি জানল কি করে?

—বলব—সত্যি কথা একটা? কিছু মনে করঁবে না তো?

—বলো না।

—মান্তু। ঠিক মান্তুই বলেছে। মান্তু আজকাল ইউনিভারসিটির ঝিলে গিয়ে কার সঙ্গে বসে থাকে জানো? তপন।

—সেই বদমাশটা? গেলবারও আমাদের হাতে মার খেয়েছিল!...এই! তোমার বাবা!

বলেই শিবাজী জানলার নিচে ডুব দেয়। পরক্ষণেই তার সাইকেলের ঘণ্টি দূরের রাস্তার দমকলের ঘণ্টার মতো ঘন ঘন রি রি রিং রি রি রিং বাজতে থাকে।

চুনু আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। তার মুখে কোনও অপরাধবোধ নেই। বউদির চিঠি চুরির জন্য মা তাকে বকেনি। আসলে বকতে সাহস পায়নি। বাবাও পাবে না।

দত্তবাবুও জানেন চুনুকে শাসন করার ক্ষমতা তাঁর নেই। কাউকেই শাসন করার ক্ষমতা নেই। এ বাড়ির কেউই তাঁর কথা শোনে না।

—এ চিঠিটা চুরি করেছিস?

ঠাণ্ডা গলায় চুনু বলে—বেশ করেছি। একশ বার করব।

এই মেয়ের জন্যই দত্তবাবু আর লীলাময়ী গত পাঁচ বছর এক বিছানায় শুতে পারেন নি। চুনু তখন থেকেই তার মাকে প্রায়ই বলত—লজ্জা করে না তোমরা বুড়ো বয়সে একসঙ্গে শোও? কেন শোবে?

কী লজ্জা! সেই লজ্জায় লীলাময়ী দত্তবাবুকে বলেছিলেন—মেয়ে যখন চায় না তখন থাক না হয়।

দত্তবাবু গম্ভীর হয়ে ছিলেন। কিছু বলেননি। লীলাময়ীই আবার নিজে থেকে বলেন—ও তো জানে ওর সাধ-আহ্লাদ মিটবে না। তাই বোধ হয় হিংসে।

হবে। কিন্তু সেই আক্রোশটা দত্তবাবুর যায়নি এখনও। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—কী বললি?

তাঁর চেহারাটা কেমন দেখাল কে জানে! হয়তো খুবই ভয়ংকর। দত্তবাবু ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

ভয় পায় না, তবে এখন পেল। পিছনে হাত নিয়ে জানলার গ্রীল চেপে ধরে তবু ত্যাড়া ঘাড়ে চুনু বললে—গায়ে হাত দেবে না বলে দিচ্ছি! ইঃ তেজ দেখাতে এলেন!

মুরোদ জানা আছে। কই, বউদিকে তো চোখ রাঙাতে পারো না, যখন মাকে যা-তা বলে মুখের ওপর! তোমার উইকনেস জানি। বেশী তেজ দেখাতে এলে সবাইকে চেঁচিয়ে বলব।

দত্তবাবু অবশ হয়ে যান। ঘেমে যান। মুহূর্তের মধ্যে। মারবেন বলে হাত তুলেও ছিলেন। সেই হাত সজোরে নেমে ঝুলে পড়ল ফাঁসির মড়ার মতো।

আস্তে আস্তে ফিরে এসে স্টেটসম্যানের মুখোশ পরলেন।

এই সেদিন অধীপ যখন বিয়ে করবে বলে মাকে গিয়ে ধরেছিল সেদিন লীলাময়ীর কাছে সব শুনে কী রাগটাই না করেছিলেন তিনি। ছেলে তখন সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। ঢুকেই বিয়ে। পার্মানেন্ট হ। মাইনে একটু ভদ্রগোছের হোক। নইলে তো হ্যাপা সামলাতে হবে বাপকেই।

কিন্তু দত্তবাবুর ইচ্ছেয় কিছু তো হয় না এ বাড়িতে। যার যা ইচ্ছে তাই করে। অধীপেরও বিয়ে হল।

নতুন বউকে দেখে ভারি মুগ্ধ হয়ে গেলেন দত্তবাবু। বহুকাল এমন মিষ্টি মুখ দেখেননি। বউভাতের পরদিনই মাথাখানা বুকে টেনে বলেছিলেন—এখন তুমিই সংসারের কর্ত্রী।

আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। কথাটা বলা ঠিক হয়নি। সেই থেকে সংসারের অশান্তির সূত্রপাত।

মনের মধ্যে পাপ আছে কি?

কে জানে বাবা! কে জানে! তবে পাপের চেয়েও লজ্জা অনেক বেশি।

শ্বশুরমশাই কী একটা পিছনে লুকিয়ে নিয়ে চুপিসাড়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছেন।

উঁকি মারলেন দত্তবাবু। দেখলেন, তাঁর নীল স্ট্র্যাপের হাওয়াই চপ্পলজোড়া!

নয়

লীলাময়ী দুটো প্রেসারের বড়ি একসঙ্গে খেলেন। বেড়েছে।

একটা ছিটকিনি খোলার আওয়াজ পেয়েছিলেন যেন একটু আগে। মনের ভুলও হতে পারে। তবে কান খাড়া রাখছেন।

শচীলাল স্নান সেরে এসে নিজেই আসন পেতে জল থালা আর নুন নিয়ে বসে পড়েছেন ভিতরের বারান্দায়। ডাকছেন—লীলা, দিবি নাকি?

ঠিক এই মুহূর্তে লীলাময়ীর রাগ হল না। কদিন আগেও শচীলাল জামাইয়ের সঙ্গে ছাড়া খেতেন না। ভদ্রতাবোধ বরাবরই প্রবল। ইদানীং এই সব হচ্ছে। লীলাময়ী বললেন—বসে থাকো একটু। যাচ্ছি।

শচীলাল বসে থাকেন। দুর্গন্ধ পাচ্ছেন ঠিকই। গা করছেন না। বড় মেয়ে হিরণ্ময়ী বলেছে, নিয়ে যাবে শীগগিরই। হিরণ্ময়ীর অবস্থা ভাল, দু-বেলা মাছ হয়, মাঝে মাঝেই পোলোয়া। কতকাল পোলোয়া খান না শচীলাল!

লীলাময়ী টের পান, সুভদ্রা দরজা খুলল। প্যাসেজ দিয়ে নাতিটার পায়ের আওয়াজ ধেয়ে আসছে, কচিগলার ডাক এল—ঠানু! ও ঠানু আমরা যাচ্ছি।

সুভদ্রা গর্জায়—এই! খবরদার যাবি না। গলা টিপে মেরে ফেলব তাহলে।

ছেলেটা ফিরে যায়। একটু কাঁদে কি? লীলাময়ী উঁকি মেরে দেখেন, প্যাসেজ দিয়ে বাথরুমের দিকে গেল সুভদ্রা। ছেলের নড়া শক্ত হাতে ধরা। সাজগোজ সব হয়ে গেছে। যাওয়ার জায়গা বলতে বাপের বাড়ি। তা যাক। বাড়িটা জুড়োবে।

—লীলা দিবি? শচীলাল ডাকেন।

এবার রাগেন লীলাময়ী। চাপা গর্জনে বলেন—বড়দিরও আক্কেল দেখছি। কবে থেকে বাবাকে নিয়ে যাওয়ার কথা। সব যে যার স্বার্থ দেখছে। এই বুড়োর হ্যাপা যত আমাকেই সামলাতে হবে বরাবর? শরীর আমার বারো মাস খারাপ থাকে। স্বার্থপর, সব স্বার্থপর।

দ্রুতপায়ে বারান্দায় গিয়ে তিনি শচীলালের সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন—কেন তোমার গুণধর ছেলে বাবাকে নিয়ে কদিন রাখতে পারে না? নাকি তাতে বউয়ের মাথা ধরার ব্যামো বাড়বে!

দশ

উঠোনে কোমর পর্যন্ত গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে মাগন। ঘামে জবজব করছে। পায়ে কাঁচের টুকরো ফুটেছে একটা। সেই নখে টেনে তুলে ফেলল। কাটা জায়গাটা হাত দিয়ে ঘষে রক্ত লেপটে দিল।

—কী রে, দিন কাবার করবি নাকি?

—হচ্ছে বাবা, হচ্ছে। মাগন গর্ত থেকে উঠে এসে এক নম্বর ট্যাংকিতে বালতি নামিয়ে বলে—আভি দেখে লিন, সব সাফা।

রসিকবাবুর স্ত্রী ওপর থেকে এবং দত্তবাবু নিচ থেকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন—অনেক ময়লা রয়েছে এখনও!

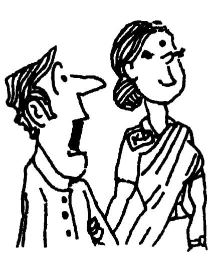
মাগন হাসে। বলে—ময়লা তো আছে মালিক, কিন্তু উ তো সব শুখা মাল আছে! মালটা শক্ত হয়ে গেছে বড়বাবু, উঠবে নাহি।

—নাম ব্যাটা ট্যাংকে, নেমে কোদাল মেরে চেঁছে তোল। টাকা কি গাছে ফলে?

—হাঁ হাঁ, বাত তো ঠিক আছে বড়বাবু। লেকিন পাঁচ রুপেয়া বকশিশ দিয়ে দেবেন। চালিশ টাকার তো পসীনা চলিয়ে যাচ্ছে। ভিটামিন দিবে কৌন?

মাগন ট্যাংকে নামে। গার্দা সব পাথরের মতো বসে গেছে। থকথক করছে পোকা, জল। বহোত গান্ধা।

কোদালে ময়লা চাঁচতে চাঁচতে মাগন আপনমনে বলে—কাম পুরা করে পয়সা লিব মলিক। বহোত গার্দা বাবা, বহোত গান্ধা। সব গার্দা সাফ থোড়াই হোবে বাবা। গার্দা কুছ জরুর থেকে যাবে মালিক। সব গার্দা কখনও সাফা হয় না।



তার প্রিয় আট নম্বর ঘণ্টা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈত্রের মাঝামাঝি আবার সেই লোকটার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তাকে বসতে বলল। সে এত বড় অফিসে দ্বিতীয়বার এসেছে। আগের মত ভয়টা আর নেই। বরং দু-একজনের মুখ দেখে ঠিক বুঝতে পেরেছে—কে তাকে কি উপদেশ দিয়েছিল।

জানালার নিচে একটা লোক তাকে লক্ষ্য করছে কখন থেকে। দু'বার চোখ তুলে বুঝেছে, জানালার নিচের লোকটা তাকে লক্ষ্য করছে। আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক। ঠিক, চোখে চোখ পড়ে গেল। একটা লোক এ-ভাবে তাকিয়ে থাকলে সে ভারি অস্বস্তিতে পড়ে যায়। আর প্রায় তাকাতে সাহসই পেল না। কারণ সে বড় হয়েছে গাছপালা মাঠের ভেতর, খোলা আকাশের নিচে, কোথাও কোনো বনভূমির অভ্যন্তরে, বাবা তার শেষ আশ্রয়ের জায়গাটুকু এ-দেশে এসে বেছে নিয়েছে। মানুষেরা বন কেটে বসতের মত প্রায় গঞ্জ বানিয়ে ফেলেছে জায়গাটাকে।

সে বলতে পারত, দেখুন আমি গাঁয়ের মানুষ, রুজি রোজগারের আশায় এই বড় শহরে চলে এসেছি। ঘুরছি। ফুটপাথে স্টেশনে থাকছি—আমার নোংরা জামা-প্যান্ট দেখে ঠিক ওটা আপনারা বুঝতে পারছেন। এই যে লোকটার সামনে বসে আছি, তিনি আমাদের গাঁয়ে জন্মেছেন, ভারি কৃতি মানুষ, একটু হাত বাড়ালেই আমার স্বর্গলাভ হয়ে যায় ভেবে বসে আছি।

—চা খাবে। চা তো খাও?

সে বলল, না। চা খাই না।

—তাহলে একটু মিষ্টি-টিষ্টি খাও।

বেশ কৌশল জানে এই টাকপড়া শশী মল্লিক। ওর ছেলে শরদিন্দু পড়ত এক ক্লাশে। দুলেন্দু শরদিন্দুর দাদা। সে ভাবল একবার বলবে, দুলেন্দু কি করছে কাকা? দুলেন্দু কি করছে সে গতবারেও জিজ্ঞেস করেছিল। দুলেন্দু রাণীগঞ্জে আছে। এই অফিসেরই কোনো লুপ-লাইনে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়েছে শশীকাকা। সে জানে দুলেন্দুর কথায় এলে শশীকাকা ভারি খুশি হয়। দুলেন্দু শিখা, শিখা দুলেন্দুর ছোট বোন। শশীকাকা পুজোর ছুটিতে একবার শিখাকে নিয়ে গিয়েছিল গাঁয়ে। সেই প্রথম সে দেখেছিল, বেশ সুন্দর মেয়েটির ববকাটা চুল, পায়ে সাদা জুতো, সাদা মোজা। ঢাকা জেলার সুদূর এক মহকুমার বিলেন অঞ্চলে এমন মেয়ে বারদীর জমিদার বাড়িতে থাকলে তবু মানায় কিন্তু ফ্রক পরা, উরুখালি, অথচ জোয়ারের জলে ভেসে যাচ্ছে—তাদের মত বয়সী বালকেরা ঠিক থাকে কী করে। একবার শিখার কথা বলবে বলবে করেও শেষ পর্যন্ত কি যে হয়ে যায়, জানালার লোকটা উঠে আসে, কাছে দাঁড়ায়, বলে শশীদা, ঠাকুরবাড়ির ছেলে?

—হ্যাঁ, মেজ ঠাকুরের ছেলে।

—খুব চেনা চেনা লাগছে তাই।

শশী মল্লিক বলল, চিনতে পারছ?

চুপচাপ তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার উপায় ছিল না।

—ঢালি বাড়ির পূর্ণ।

—তবু সে চিনতে পারল না। পূর্ণর ছোট ভাইটাকে চিনতে পারে। কিন্তু পূর্ণ কিছুতেই তার কাছে সম্পূর্ণ নয়, সে হাবা-কালার মত তাকিয়ে থাকল।

—রঞ্জিত আমার ছোট ভাই। পূর্ণ বলল।

ও সেই ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করা পূর্ণচন্দ্র ঢালি! এতক্ষণে সে মনে করতে পারল, পানাম হাইস্কুলের বিনোদবাবুর কণ্ঠস্বর। তাদের গাঁয়ের শেষ ভাল ছেলে পূর্ণচন্দ্র ঢালি। আর তেমন ব্রিলিয়েন্ট ছেলে গজাল না। বিনোদবাবু বি-এ। অংকের শিক্ষক। বিনোদবাবু কত ভাল অংক জানতেন, মেঘনাদ সাহা বলতে পারতেন। বিনোদবিহারী সাহা, মেঘনাদ সাহা ঢাকায় এক কলেজে পড়েছেন এবং বিনোদবাবু সেই সুবাদে পানাম হাইস্কুলের অংকের টিচার হয়ে গেলেন। সেই বিনোদবাবু কারো নাম হাফ হাতা করে রাখতেন না। একেবারে ফুলহাতা না হলে যেন নাম উচ্চারণ তাঁর তৃপ্তি নেই। বলতেন, পূর্ণচন্দ্র ঢালি। শ্রীযুক্ত হলে হাতে গ্লাবস পরার মত হত। ভাগ্যিস সেটা করতেন না এবং কোনো কারণে বিনোদবাবু হাতে গ্লাবস পরালে তার কপালে নির্ঘাত দুর্ভোগ লেখা থাকত।

একবার তাকেই গ্লাবস পরিয়েছিল, তাও রবারের না, চামড়ার। এই যে শ্রীমান, শুধু শ্রী নয় তার সঙ্গে মান এবং পরে পিতৃদত্ত সবটুকু নাম বলেই কানে এমন তীব্র চিমটি কেটেছিলেন যে সে লাফিয়ে প্রায় দুহাত ওপরে উঠে হাই বেঞ্চ হয়ে গেছিল। সেই বিনোদবিহারী সাহার প্রিয় ছাত্র পূর্ণচন্দ্র এখন তবে এই অফিসে! গাঁয়ের কোনো না কোনো বাড়ির কেউ না কেউ এ-অফিসে একটা কাজ করছে। রাজসূয় যজ্ঞের মত তখন বরাহনগরের এই বাড়িটার খুব বাড়বাড়ন্ত। মহলানবিশ মশাই দেশের যত মানুষ পেয়েছেন, প্রায় কাণ্ডারীর মত নৌকায় তুলে নিয়েছিলেন। সেই আশায় সেও এসেছিল শশী মল্লিকের কাছে—যদি কিছু একটা হয়ে যায়।

শশী মল্লিক এই নিয়ে বোধহয় দু'বার তাকে ঘোরাবে। কারণ এখন পর্যন্ত আসল কথাতেই আসা যায় নি।

—খুড়ামশাই'র শরীর কেমন আছে? শশী মল্লিক বলল।

ভাল আছে বলবে, না ভাল নেই বলবে কোনটা বেশি সুবিধা এবং কী বললে শশী মল্লিকের শরীরে দুঃখ সূচ হয়ে বিঁধবে সে ঠিক বুঝতে পারছে না। ভাল আছে, ভাল নেই—কোনটাই তার খুব ভাল জানা নেই। সেই যে বাড়ি থেকে অভাবের তাড়নায় ফেরার, আর কোনো খোঁজ-খবর রাখে নি। সে যে এতদিন এখানে-সেখানে ঘুরে বেরিয়েছে, বললে সম্মানজনক হবে না খুব। সে বেশ চটপট বলে ফেলল—ভাল নেই। বুঝতেই পারছেন কোনো আয় নেই আমাদের। এতগুলো পেট কি করে চলে! খুব করুণ চোখ মুখ এবং যতটা পারা যায়—চোখের কপালের কতটা চামড়া কোচকালে কতটা দুঃখ টের পাওয়া যায় নানাভাবে তার কসরত করতে গিয়ে ভারি বেয়াকুফ সে। আয়নায় সে অবশ্য ফাঁক পেলেই মুখটা দেখে নেয়। দাড়ি-গোঁফ ভাল করে গজায় নি তাই রক্ষে এবং সে কখনও ঘাড়ে গলায় দেখেছে পলাস্তারা ময়লার। এখানে আসার আগে একদিনের জন্য সোনাপিসির বাসায় উঠেছিল সুতরাং খুব না খেতে পাওয়া ফুটপাতের বাসিন্দা মনে হবে না। চামড়ার ভাঁজে অকিঞ্চিতকর ময়লা, হাত দুটো সে নামিয়ে রেখেছে। দুবার সার্টের হাতা কলার টান টান করে দিয়েছে, কিন্তু কোচকানো স্বভাব যার—সে সোজা হবে কি করে!

পূর্ণচন্দ্র বলল, বাড়ি কোথায় করেছে সেজ দাদু।

এত আত্মীয়তা, তবু কেন শশী মল্লিক আসল কথাটা পাড়ছে না? দ্বিতীয়বার দেখা করতেই বলেছিল, মাস খানের পরে আসতে। অথচ এখন কিছু বলছে না। শশী মল্লিক সম্পর্কে কাকাই হবে, সব সে গোলমাল করে ফেলেছে। দুলেন্দুর বাবা, দাদু বলবে নাকি, কাকুর চেয়ে দাদু বললে বেশি খুশি হবে, না দাদুর চেয়ে কাকু বললে বেশি খুশি হবে?

সে বলল, শশী দাদু।

—আ নিবারণ, কি করছ? এত দেরি কেন?

সে বলল, শশী কাকু।

—তোমার বাবা আর আমি বুঝলে—সে এক ঘটনা, সে বুঝলে, কী বলবান মানুষ ছিলেন। এখনও সে স্বাস্থ্য আছে? খুড়ামশাই আমার চেয়ে কিছু বড়। বামুন তো কাজেই খুব ভক্তি করতে হয়। খুড়ামশাই'র বাবা, বুঝলে আচ্ছা বেঁচে আছেন খুড়ামশাই'র বাবা?

সে মাথা নাড়ল।

—দেশে মারা গেল, না বিদেশে?

—দেশেই মারা গেলেন।

—খুব ভাগ্যবান মানুষ, দেশ ভাগ আর দেখে যেতে হল না।

পূর্ণচন্দ্র বলল, কোথাকার লোক আমরা কোথায় সব উঠেছি।

এইসব দার্শনিক কথাবার্তায় একদম চিড়া ভিজছিল না। সে সোজাসুজি কিছু বলবে ভাবল। নিজের খবর নেবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না, দাদুর খবর নিয়ে যে কী হবে! সে বলল, শশীকাকা, বাবা বার বার বলেছেন, যা শশীর কাছে, কিছু একটা ও করে দেবেই। সবটাই অবশ্য নিজের কথা। শশীকাকা কলকাতায় আছে এই পর্যন্ত বাবার জানা। অনেককে কাজ দিয়েছে তার অফিসে, বাবা তাও হয়তো জানে। কিন্তু দেশকাল এমন যে বাবার বিন্দুমাত্র বোধহয় কারো ওপর আর বিশ্বাস ছিল না। একমাত্র ঈশ্বর বিশ্বাস ইদানিং তাঁর বাড়ছিল। এত কথা বললে আবার কি ভাববে, বেশি বেশি কথা বলার স্বভাবে দাঁড়াবে কি-না কে জানে, সে চুপচাপ আস্ত সিঙ্গাড়া মুখে পুরে দিল। জঠরের জ্বালা আপাতত কিছুটা প্রশমিত হচ্ছে ভাবতেই দু'চোখে সব মনোরম দৃশ্য ভাসতে থাকল এবং শিখার কথা মনে এসে গেল ফের।

—শিখা কোথায় আছে?

চশমার ফাঁকে গোলমাল মানুষের মুখটা সামান্য কি ভাবল। তার পর চশমার আড়ালে একটুখানি তাকাল, তারপর বলল, আরে হ্যাঁ তুমি তো একটা কাজটাজ পেতেই পার। বেশ জায়গাটা। মনোরঞ্জন আছে ওখানে। শিখার মামা। হাবিলদার মেজর।

শিখা আছে, মনোরঞ্জন আছে, সে আর না বলতে পারল না। সে সুবোধ বালকের মত ঘাড় কাত করে দিল। বলল, বেশি দূর না। হালিশহর চেন, আরে পূর্ণ নেপালকে যেখানে পাঠিয়েছিলাম। মনোরঞ্জন ইচ্ছে করলেই পারে।

হা ঈশ্বর, সে ভাবছিল ইচ্ছেটা হয়ে গেলেই হয়। ঢোক গিলে জল খাওয়া দরকার, তাও বেমালুম সে ভুলে গেল। খুব ভাল হয় শশীকাকা, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে দমক মেরে কাশি উঠে এসে মুখের সবটাই সমূলে বিনষ্ট করে দিল।

শশীকাকা বলল, জল-খাও জল খাও। বিষম খেলে জল খেতে হয়। ওরে নিবারণ সব তো নষ্ট হল, তুলে নিয়ে যা।

সে কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত বসে থাকল। অফিসের সবগুলো লোক এখন তাকে

দেখছে। ফুলপ্যান্টের তালি মারা জায়গাটা সে কোনোরকমে ঢেকে বসল। এবং কিছু হয়নি, সবই স্বাভাবিক আছে, ভাগ্যিস জলটল উল্টে পড়েনি টেবিলে। সে কিছুটা আশ্বস্ত হবার ভঙ্গিতে বলল, মা হয়তো আমার কথা ভাবছে।

মার কথায় শশী মল্লিকের মনে পড়ে গেল খুড়িমার কথা। বললে, তোমার বাবার বিয়েতে আমি একা দুটো খাসি এক কোপে কেটেছিলাম। আটটা খাসি খাবি খাচ্ছিল, কাছাকাছি দুটো পেলাম, ব্যাস নামিয়ে দিলাম গলা। স্যাণ্ডো গেঞ্জি-পরা শশী মল্লিককে এক ডাকে চিনত তোমার মামার বাড়ির লোকেরা। খুড়িমা পরমা সুন্দরী ছিল হে। বলে হাঁ করা মুখে একটা বড় সাইজের পান ঢুকিয়ে চবর চবর করতে থাকল।

—তারপর কি হল শশীকাকা! খুব আগ্রহ দেখাল সে, শৈশবের যৌবনের গল্প কি মধুর। ধুস একটা আয়না, আয়না থাকলে মধুর ছবি মুখে চোখে লাগিয়ে বসে থাকতে পারত। মুখে শোনার আগ্রহ চামড়ায় কোন কোন ভাঁজে ফুটে ওঠে, বুঝতে পারত। কিছুই নেই, কেবল পূর্ণচন্দ্র টেবিলে ঝুঁকে আছে। শশী মল্লিকের গল্প—আহা কি মধুর, কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান, পূর্ণচন্দ্র মূল্যবান হবার আকাঙ্খাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে, শশী মল্লিক এখনও দড়ি ধরে রেখেছে। দড়ির গিঁট খুবই শক্ত। পূর্ণচন্দ্র বিনয়ী। শশী মল্লিকের কাছে পূর্ণচন্দ্র বিনয়ী। অবতার শশী মল্লিকের কাছে শিশু।

সেও শিশুর মতই সরল হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বকবক করল শশী মল্লিক। দেশের নামে শোক উথলে উঠল। আমগাছটা জামগাছটা মাঝে মাঝে নেচে গেল দু-চোখের পাতায়। সে যে একজন অফিসের বড়বাবু মান্যগণ্য করে সবাই সেটা বেশ ভাবভাবে টেব পাইয়ে দিল তাকে।

—তারপর শশীকাকা?

—তারপর তো আমাদেব ওখানে আর যাওয়া হল না। বেলঘরিয়াতে তোমার দিদিমার সখ মন্দির-টন্দির করে ভজনা করবে ঈশ্বরের। এক বিঘে জমি, বাড়ি দোতলা, এদিকে এলে একবার খুড়ামশাইকে বেড়িতে যেতে বলবে।

—মা, আপনার কথা খুব বলে!

—সবাই বলে, দেখতেও ইচ্ছে করে সবাইকে। ভেবেছি, একবাব লম্বা ছুটি নিয়ে গাঁয়ের কে কোথায় আছে খুঁজে বেড়াব।

শশী মল্লিক মুহূর্তে পর্যটকের ভূমিকায় নেমে গেল। ছুটি-ছাটায় তীর্থ করতে যায়। শশী মল্লিকের বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে, অবশ্য ঈশ্বর ভজনা তার শিশু বয়স থেকে। বাড়ির সবাবই গলায় তুলসীর মালা আছে। এবং দুলেন্দুর মা তো আবার এক মহিমান্বিতা শিষ্যা—পর্যটকের ভূমিকা সারতে তার লাগল পাক্কা বিয়াল্লিশ মিনিট। অফিসে কাজটাজ নেই, না বসে থাকাই কাজ, সে কিছুই বুঝতে পারছে না। শেষ কথাটা কিছুতেই বলছে না। ভয়ে সেও কিছু বলতে পারছে না। বললেই যদি মনোরঞ্জনের ঠিকানাটা হাতের কাছে হাতড়ে না পায়।

দেওয়ালে ঘড়ির দোলক নাকের ডগায় দুলেই যাচ্ছে। কেউ কেউ এসে সই করিয়ে নিচ্ছে কাগজপত্র। একবার একজন ছোটসাহেব, দু-জন মাঝারি গোছের সাহেব ডেকেও পাঠিয়েছে, এবং নির্বিচারে সব কাজ এক সঙ্গে করে এতটুকু হাঁপিয়ে উঠছে না। সে ভাবল, শশী মল্লিক কি খায়, কত খায়। এসব তো আর বলা যায় না। এবং সারাদিন বসিয়ে রাখবে নাকি শেষ পর্যন্ত। তবে কি সঙ্গে নিয়ে যাবে—মানুষটার মহিমা যত জটিল

হয়ে যাচ্ছে তত সে ঘাবড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তবু অপেক্ষা করতেই হবে। কোনো রকমে একটা আস্তানা না পেলে, ফুটপাতে সে শুকিয়ে মরবে। এত যখন হৃদয়গ্রাহী কথাবার্তা তখন বেশ মূল্যবান কাজ-টাজ ঠিক হাতের নাগালে এসে যাবে। তখনই শশী মল্লিক বড় বড় হাঁ করে তুড়ি দিল মুখে, আর গুরু গুরু বলে চিৎকার করে উঠল।

সে সোজা লাফ দিত, কিন্তু পূর্ণচন্দ্র ঝুঁকে আছে টেবিলে, তাই রক্ষে। গুরু এত গম্ভীর নিনাদ তুলতে পারে সে জানত না। মহিমা, মানুষের মহিমা। তখন শশী মল্লিক বলল, ভাই কাজটি বড় পরিশ্রম সাপেক্ষ।

এত সাধুভাষা ব্যবহার দেখে সে বুঝতে পারছে গতিক ভাল না। কখনও ভাই, কখনও ভাইপো হয়ে যাচ্ছে, এত কিছুতেও আসে যায় না, যদি সঠিক কিছু বলে দেয়। দুলেন্দুর বাবা শশী মল্লিক কলকাতায় থেকে ফেরব্বাজ হয়ে যায়নি তো!

সে বলল, যে কোনো কাজ, যা দেবেন তাই করব।

—ব্রাহ্মণ সন্তান, বড় দুঃখজনক। ললাট লিখন খণ্ডন করা দুষ্কর। কি আর করা।

কাজটা কি কিছু বললে না। এমনি হেঁয়ালী সহ্য করা যায় তবু। সাধুভাষায় হেঁয়ালী মারাত্মক।

—ওখানে একটা অগ্রগামী দল আছে। আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক। কোনো কাজই অসম্মানের নয়। কি বল পূর্ণ!

—সে তো বটেই। পূর্ণচন্দ্র জোর দিয়ে বলল।

—দু-তিন মাসের ট্রেনিং। ডব্লিউ, ভি, এন, ভি, এফ! ট্রেনিং শেষ হলেই কাজ, অগ্রগামী দলে কাজ দিয়ে দেবে। খাওয়া পড়ার দায় নেই, মাইনে তিরিশ টাকা। মুক্তপুরুষ।

সে বলল, বাঁচালেন।

পত্রবাহক আমার গাঁয়ের মেজঠাকুরের পুত্র। নাম বিধুভূষণ চক্রবর্তী। বয়স আঠারো। প্রয়োজন মত বাড়াইয়া কমাইয়া লইও। তোমারও অসুবিধা না হয়, তাহারও না হয়। গতবার নেপালের সাইত্রিশ বছর তুমি অতি সহজেই সাতাশ বছর করাইয়া লইয়াছিলে। ইহার ক্ষেত্রে কি প্রয়োজন ঠিক জানি না বলিয়া বিস্তারিত লিখিলাম। ম্যাট্রিক থার্ড ডিভিসানে পাশ করিয়াছে। জামাইবাবুর চিঠি শেষ করে মনোরঞ্জন বলল—তোমার নাম বিধুভূষণ চক্রবত্তি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বয়েস আঠারো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বামুনের ছেলে, এ-কাজ করতে পারবে?

কাজটা কি করতে হবে সঠিক সে এখনও জানে না। বলল, হ্যাঁ পারব।

আলাদা আলাদা কোয়ার্টার। খুবই নতুন মনে হয়। চুনকামের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সামনে বেশ কাঠা দুই জমি। আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটোর চাষ করেছিল, এখনও দু চারটে শুকনো টমেটো গাছে আছে। বিধুভূষণের পৌছতে বেলা এগারোটা হয়ে গেছে। শিয়ালদা থেকে হালিশহর, তারপর ক্যাম্প পর্যন্ত সে হেঁটে এসেছে। মনোরঞ্জন শুনে বলেছিল, কাঁচরাপাড়ায় নামলে না কেন! সোজা চলে আসতে পারতে। আবার এলে, কাঁচরাপাড়ায় নামবে।

তবে কি এবারে হচ্ছে না! আবার আসতে হবে! সে কেমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে। শিখা নেই, ওর মামীমাকে সে দেখছে, রান্নাঘর আর বাথরুম যাওয়া আসা করছে। আর ওটা যেটা সবচেয়ে খারাপ স্বভাব, সব মানুষের মুখের সঙ্গে সে কোনো না কোনো জীব-জন্তুর মুখের মিল খুঁজে পায়। সে সাধারণত নিজের মুখটা একটু সুচলো করে দেখেছে দুপাশের গালের পাশে আর সামান্য হাড় উঁচু হলেই খেঁকশিয়াল হয়ে যেতে পারত, মানুষের কাছে তার মুখটা এর চেয়ে বেশি কিছু না। কেবল চোখ দুটো চোখ তাকে কাহিল করেছে—চোখ দুটো মুখ অনুযায়ী বড়।

সে সেই থেকে কোনো মানুষের কাছাকাছি এলেই মানুষের সঠিক অরিজিন খুঁজে বেড়ায়। হাবিলদার মেজর মনোরঞ্জনের মুখ কিছুটা বাঘের মত। লুঙ্গি পড়ে আছে। লুঙ্গি খুলে ফেললে এবং হামাগুড়ি দিলে ঠিক বাঘ হয়ে যেতে পারে। হাতের থাবা ষোলআনা বিস্তার করে গালে বসালে তার মত মানুষ শেষ। সে কেমন ভীত সন্ত্রস্ত গলায় বলল, একটা কিছু করে দিন।

গলায় বড় মাদুলি, হাতে তাগা, অজস্র তাবিজ, একটা বাধানো রুদ্রাক্ষ তাবিজের সঙ্গে এবং সারা শরীর ভাল্লুকের মত লোমশ। জলচৌকিতে বসে হাঁক পাড়ল, জামাইবাবু আবার পাঠিয়েছে।

—আবার পালাবে। রান্নাঘর থেকে সোজা জবাব এলে বিধুভূষণ বলল, সত্যি বলছি পালাব না।

রান্নাঘর থেকে, এখানে যা সব কথাবার্তা হচ্ছে, সবই শোনা যাচ্ছে—কি নাম, বয়স এবং কেন আসা সেই শোকার্ত মহিলা টের পেয়ে গেছে। মহিলাটিকে দেখে বিধুভূষণের শোকার্ত বলেই ধারণা হয়েছিল। এত রোগা, আর লিকলিকে—ঠিক লম্বা বাণ মাছের মত—আগাপাশতলা সব বিশ ইঞ্চি। কমও না বেশিও না। এমন একটা লোমশ জীবকে কত সহজে ভগবৎ বৎসল করে রেখেছে।

একটা থানের মত সরু পাড় শাড়ি পরে, শরীর ঢাকে না, ছুচিবাই আছে কিনা কে জানে, শিখা থাকলে সে সামান্য সাহসী হতে পারত—কি যে করে, বের হয়ে আসছে শিখার মামীমা। সে বলল, আপনি আমারও মামীমা। শরদিন্দু আমার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ত। যুদ্ধের সময় দুলেন্দুরা তো দেশে চলে গিয়েছিল।

এখন মনে হচ্ছে সে বিধুভূষণ চক্কবত্তি না হয়ে বিধুভূষণ দাস হতে পারত। আহা উঠেই টিপটিপ প্রণাম, করজোড়ে পায়ের নিচে পড়ে থাকা, মা কালীর মন্দিরে হত্যে দেওয়ার মত, সরায় কে। কিন্তু কি যে করে—সে টিপ করে বনমানুষটা সহ শোকার্ত রমণীকে কিছু একটা করতে পারছে না। করে ফেললে উল্টো বুঝলি রাম হয়ে যেতে পারে—ওমা তুমি বামুনের ছেলে আমাকে এ-কি পাতকের ভাগী করলে বাছা।

বিধুভূষণ একটা কিছু করতে চায়। পৃথিবীতে এত ঘটনা ঘটে এই মুহূর্তে এখানে এমন কিছু ঘটনা—দুলেন্দুর মামী ভিরমি খেয়ে পড়ে যেতে পারে—সে ছুটে ডাক্তার ডেকে আনতে পারে, মাথার কাছে বসে সেবা শুশ্রূষা করতে পারে—হে ভগবান, একটা কিছু হয়ে যাক—নিদেন কিছু না হলেও বেড়া ডিঙ্গিয়ে পাঁঠা ছাগল গরু ভেড়া যা কিছু হোক ঢুকে যাক—সে তাড়িয়ে দিয়ে আসতে পারে—বললে খোঁয়াড়ে দিয়ে আসবে, একটা কাকও কি এ-অঞ্চলে উৎপাত করতে সাহস পায় না! সে অন্তত হুঁস করতে পারে—কত আপনজন সে এ-মুহূর্তে দেখাতে পারে!

তখনই মনোরঞ্জন চিৎকার করে ডাকল, ভূষণ আছো? ভূষণ!

বিধুভূষণ বলল, আছি স্যার।

—আরে তুমি বিধুভূষণ, ভূষণকে ডাকছি।

—স্যার ঐ একই হল, সে বলতে পারত। কিন্তু ততক্ষণে পাশের কোয়ার্টার থেকে জানালায় একটা মুখ দেখা গেল। বালিকা। ফ্রক গায়ে লম্বা হয়ে বলছে, বাবাতো ফেরেনি জ্যাঠা। এড্‌জুটেণ্ট সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে।

—এলে বলবি, আবার এসেছে।

—বলব।

সে তাজ্জব। কার কথা বলছে! সে তো আর এখানে আগে কখনও আসেনি। মনোরঞ্জন মামা, মামা না বিয়াইমশাই, কি যে সম্পর্ক পাতবে, সে বুঝতে পারছে না। দুলেন্দুর মামা। সুতরাং তারও মামা হলেই ভাল। সে বলল, মামাবাবু আমি আর তো আসিনি।

মনোরঞ্জন লুঙ্গি তুলে লোমের ভেতর সামান্য জায়গা চুলকে বলল, বোস। জামাইবাবুর যত্তো সব কাণ্ড। সব না বলেই পাঠায়, তোমাকে বলেছে কাজটা কি।

—বলেছে।

—অগ্রগামী দলের কাজটা কি জান?

—না জেনেও বলল, জানি।

—শেষে পালাবে না তো?

—সত্যি বলছি পালাব না।

—পালালে আমার মুখ থাকে না। সময় অসময় নেই, চিঠি দিলেই বুঝি হয়!

এ-ভাবে দুলেন্দুর বাবা কতজনকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে একবার জেনে নিতে পারলে হত। কতজন পালিয়েছে জেনে নিতে পারলে আরও ভাল হয়। ব্যারেক বাড়িগুলো পার হয়ে সে এসেছে। সেখানে সে দেখেছে বড় দুটি হ্যাঙ্গার। রোদ বেশ ঝলমল করছে। কংক্রিটের একটা পাকা রাস্তা সদর গেট থেকে মাইল খানেক ভেতরে ঢুকে গেছে। কাঁটাতারের বেড়া চারপাশে, ভারি মজবুত। পালাবার রাস্তাটা কোনদিকে সে ঠিক জানে না। একেবারে শেষ মাথায় এই সব কোয়ার্টার, নতুন এ্যাজবেস্‌টারের ছাদ, সামনে দু কাঠা মত ফাঁকা জায়গা, নম্বর লাগানো। দূরে দূরে ছড়ানো ছিটানো আলগা সব অফিসারদের কোয়ার্টার। বাংলোবাড়ির মত। নানারকম ফুল সেখানে ফুটে আছে। সব ফুলের নাম সে জানে না। চাঁদমারির উঁচু পাহাড়টা ডানদিক ঘেঁসে বেশ দূরে এবং বেঢপ সব জামা প্যাণ্ট পড়া রিক্রুটদের গোলমাল এখান থেকে একেবারেই শোনা যায় না।

তখনই আবার দেখতে পেল সেই মেয়েটা জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে। একেবারে ছোট্ট একটা কাঠবিড়ালীর মত যখন তখন জানালায় এসে সন্তর্পণে দেখছে।

মনোরঞ্জন মামা উঠে ভেতরে গেল। কৌটা থেকে বোধ হয় সযত্নে কিছু বের করছে। হয়তো খুব সুন্দর মত একটা রূপোর টাকা। তার হাতে দিয়ে বলবে, কোথাও কিছু খেয়ে নাও। বিকেলে দেখি ভূষণ কিছু একটা করতে পারে কিনা।

রূপোর টাকার বদলে বিড়ি, বিড়িটার মুখে চেপে ফু দিল একটা তারপর লেজের দিকটা জিভে আলগা করে লাগিয়ে রেখেছে, এবং তখনই মামির ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল। ভেতরে মামি পুজোআর্চা করছে। দুটো বাতাসা এনে একটা মামার হাতে, একটা ওর

হাতে। পেটে ভারি রহস্যময় খিদে জ্বালাতন করছিল বলে, সে সঙ্গে সঙ্গে মুখে পুরে দিতেই অবাক, মামা ভীষণ তদগতচিত্তে কপালে বাতাসা ঠেকিয়ে, কি সব স্মরণ করে মুখে ফেলে দিতেই বুঝল, ভুল হয়ে গেল। গেল গেল সব সে তাড়াতাড়ি খালি হাত মাথায় কপালে ঠুকে হাওয়া কিছুটা ছুঁড়ে মারল জিভে। তার এতটা দুঃসাহস মামী পছন্দ নাও করতে পারে। সে কিছুক্ষণ বসে বসে হাওয়া চিবোল।

এবং অনেক পরে সম্বিত ফিরে পাবার মত মামা বলল, ও ভূষণ এসেছ। এখনও আছে।

—আমায় ডাকছেন দাদা?

—আরে এস এস।

জানালায় এসে দাঁড়ালে বলল, তোমারে লিস্টি করা শেষ।

—আবার কেউ এসেছে বুঝি! এবং আমাকে সামনে দেখেই মুখ ভারি গম্ভীর করে ফেলল।—পাঠিয়ে দিন, হয়ে যাবে।

—বুঝলে ভূষণ, এবারে বিধুভূষণ এসেছে। জামাইবাবু লিখেছে, মূল বযস সতেরো। প্রয়োজন মত বাড়াইয়া কমাইয়া লইবে। তোমার তো একুশ বছরের নিচে হয় না। একুশ করে দিতে পার। দেখি মুখ। এবং মামা অনেকক্ষণ মুখ উল্টে পাল্টে দেখে বলল, কম বয়সে এত দাঁড়ি গোঁফ ওঠে কি করে। তোমার ভালই হল ভূষণ। কেউ বুঝতে পারবে না। বাইশ বত্রিশ যা খুশি লিখে নিতে পার।

হাবিলদার মেজর মনোরঞ্জন মামা, ভারি রসিক ব্যক্তি। সে মহাখুশি মামার ওপর।

তখন মামা বলল, কোম্পানীর কোয়ার্টার-মাস্টার আমাদের ভূষণ। ভূষণ দত্ত। তুমি স্যার বলবে।

সে বলল, আচ্ছা স্যার।

—অ ভূষণ, ম্যাট্রিক থার্ড-ডিভিসনে পাস। এত লিখাপড়া জানা লোক কেন যে আসে! বিদ্যের দৌড় আছে।

ভূষণ অতি অল্প সময়ে জামা প্যান্ট পাল্টে যখন সামনে এসে দাঁড়াল, বিধুভূষণের চোখ ছানা বড়া। সাদা কেডস্, সাদা মোজা, খাকি হাফসার্ট, হাফপ্যান্ট পরণে, মাথায় বোতাম আঁটা টুপি, কাঁধে ব্যাগ। লম্বা কালো ফিতা গলায়। তাতে ডবকা একটা হুইসিল ঝুলছে।

মনোরঞ্জন মামা উঠে দাঁড়াল। সেও উঠে দাঁড়াল।

মনোরঞ্জন মামা লুঙ্গি তুলে গোড়ালী দেখতে দেখতে বলল, যাও, অনুসরণ কর।

আর যেই না সে নেমেছে, সহসা বাজখাই গলায় হাঁক—এতটুকু মানুষ ভূষণ, ছিপছিপে—মনোরঞ্জন মামা যদি বোতল, তবে ভূষণ একটা ছিপি—সেই ছিপির গলায় এমন হাম্বা হাম্বা ডাক শুনে প্রথমেই চমকে গিয়েছিল বিধুভূষণ।—ডবলমার্চ।

ডবলমার্চ সে বোঝে না। সে দেখল ভূষণ দত্ত লাফিয়ে লাফিয়ে প্রায় একটা হায়েনার মত ছুটছে। ওর পায়ে চটি। ইট সুড়কির রাস্তা। ছুটতে গিয়ে জায়গায় জায়গায় ভীষণ নড়বড়ে দাঁত বের হয়ে কখন চটির বল্লা ছিড়ে ফিরে খালি পা নাঙ্গা সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, টেরও পায়নি। তাকে এমন দৌড় করিয়েছে, যে বাবার নাম নিজের নাম সব ভুলে হরেরাম হয়ে গেছে। চটি জোড়া বেওয়ারিশ মালের মত রাস্তায় কোথায় যে পড়ে থাকল!

সে এসে পৌঁছেছে বড় একটা আমবাগানে। সামনে লম্বা হ্যাঙ্গার—যুদ্ধের সময়ে

অতিকায় তিমিমাছের মত ফেলে রেখে গেছে কারা। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শ দুয়েক ওর বয়সী ছেলে। বেশি কম, ত্রিশ চল্লিশেরও আছে। গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি, খাকি হাফ-প্যান্ট, হাতে কলাই করা থালা মগ। বড় নিবিষ্ট সবাই। লাইনের শেষে যে আছে সে থালাতে ডুবকি বাজাচ্ছিল, সবার শেষে পড়ে গিয়ে মাথা ঠিক রাখতে পারছে না।

কেউ কেউ গাছ তলায় থালায় খিচুরি, বেগুন ভাজা একটা তরকারী নিয়ে বসে গেছে। বিধুভূষণ প্রাণ পাচ্ছিল। কোয়ার্টার মাস্টার দুটো প্যান্ট, দুটো সার্ট, এক জোড়া বুট জুতো, ব্রুস কালি, থালা মগ বের করে দিচ্ছে। বলছে, বুঝে নাও। সই কর। এবং সঙ্গে সঙ্গে হুইসিল বাজালে, সামনে এসে হঠাৎ একটা মানুষ লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। একটা ছোট ছিপির এত প্রতাপ! বোতলের কিনা হবে ভাবতেই গায়ে কাটা দিয়ে উঠল তার।

—সামন্তকো বোলাও।

সামন্ত এসে বলল, সেক্‌সান ওয়ানে রোল ষ্ট্রেংনথ বেড়ে গেল। হাবিলদার-মেজবেব গাঁয়ের লোক। স্নানটানের দরকার নেই। খেতে পাঠিয়ে দাও। খিচুরির গন্ধে আর নড়তে পারছে না। ওকে বসিয়ে দাও।

বিধুভূষণেব থালা মগ অশ্বিনি সামন্ত নিয়ে গেল। এবং কিছুক্ষণের ভেতর সে দেখল থালা ভর্তি খিচুরি, বেগুন ভাজা, তরকারি, সব গরম গরম। বিধুভূষণ তার সামান ফেলে নড়তে পারছে না। কি করে! দেবি সয় না। সে তার সামানের পাশেই উবু হয়ে খেতে বসে গেল। পাশে পুরোনা বুট জুতো জোড়া, এক জোড়া ফ্লানেলের কাপড়, খাকি জামা-প্যান্ট, কালি ব্রুস সব এবং সে খেয়ে যাচ্ছে। সে হাত চেটে থালা চেটে সবটুকু খেযে ফেলল। উঠে দাঁড়াল। কতদিন পর এমন পেটপুরে খাওয়া। এমন সুন্দর হলুদ রঙেব খিচুবি, বেগুন ভাজা ফেলে কেউ পালায় ভাবতেই কষ্ট হচ্ছিল তার। কোয়ার্টার মাস্টাব একটা কম্বল, খড়ের বালিস সতরঞ্চ একটা, বেডিং বলতে পুরু একপ্রস্ত রেখে দিল সামনে। খাওয়া, শোওয়া, পরার যাবতীয় কিছু কত সহজেই মিলে গেল তার। তার আব কি দুঃখ থাকতে পারে—দুঃখ শুধু তার চটি জুতো জোড়া ছিঁড়ে গেছে। হারিয়ে গেছে। ছেঁড়া চটি জোড়া এক ফাঁকে খুঁজে আসতে হবে। এখন সময় পাওয়া যাবে না, কারণ সামন্ত তাকে প্রায় কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবার মত চোখে চোখে রাখছে। বোধ হয ভয়, আবাব না পালায়।

সামন্ত বলল, বিধুভূষণ, মেজর সাব তোমার দেশের লোক বুঝি।

—আজ্ঞে ওস্তাদ।

—বিধুভূষণ তোমার রোল নম্বর কত?

—সতেরো।

—ভুলে যাবে না।

—আজ্ঞে না ওস্তাদ।

—সতেরো!

—আজ্ঞে হুজুর।

—সাবাস বিধুভূষণ। এবারে শরীরটা টিপে দাও।

বিধুভূষণের ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। স্নান না হলেও আহার হয়েছে। লম্বা সব সেডেব চারপাশে দরমার বেড়া। দু'সারি বিছানা, তাকালে কোনো প্ল্যাটফরমের মত মনে হয়।

অশ্বিনী সামন্ত বলল, সেকসান ওয়ান, রোল নাম্বার সতেরো, প্ল্যাটুন নাম্বার এক। মনে রাখবে।

বিধুভূষণ ঘাড় কাত করে দিল।

এ-ক'দিন যে-ভাবে কেটেছে তাতে ওর লটকে পড়ার কথা। যা হোক আহার বাসস্থান ক'মাসের মত অন্তত মিলে গেছে। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম। সারি সারি বিছানা পাতা। সবাই দুপুরের আহার শেষ করে ফিরে আসছে। লম্বা ঘুম। তিনটে বাজলেই আবার ফল-ইন। প্যারেড। গতকাল থেকে সব কিছু আরম্ভ হয়ে গেছে। সে একদিন পরে আসায় কিছুই ঠিক ঠিক বুঝতে পারছে না। এখন অশ্বিনী সামন্ত মানুষটিই তার জিম্মাদার। সে যা বলবে, তাই করতে হবে। আপাতত হাত পা টেপার কথা বলেছে। সে খাটিয়ার নিচে বসে সামন্তর লম্বা ঠ্যাং কোলে তুলে নিল। বসে বসে একসঙ্গে ঘুম, এবং পা টেপার কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা। সামন্তর খালি গা। পরনে হাফ প্যান্ট। পা দুটো ভীষণ লম্বা, সে একটা পা কোলে নিয়ে সামলাতে পারছে না। পা টা ঝুলে আছে। কিছুটা বাইরে বের হয়ে আছে। সে ইচ্ছামত, গোড়ালি হাঁটু রাং এবং কালো কুচকুচে ত্বকের ওপর নরম মৃদু আঘাত হানলে, সামন্ত প্রায় সেই ডাবল মার্চের মত চিৎকার করে উঠল, আউর জোরে।

সে আওর জোরে ভেবে হামলে পড়ল। সামন্ত খুশি হচ্ছে না, চিৎকার করে উঠছে, বারো, বারো।

বারো নম্বর বেড থেকে একটা ফুটবল সাইজের গোলগাল লোক উঠে এল।—এই তুম্ উসকো দিখলাও তো।

সে লোকটা বিধুভূষণকে দেখাতে থাকল। কতটা চাপ দিলে আরাম, কতটা চাপ দিলে অস্থি মজ্জা আরাম পেতে থাকে—বারো নম্বর উবু হয়ে দেখাল। বারো নম্বরের পেটের গলসি দু হাঁটুর ফাঁকে ঝুলে পড়েছে। সে খুব হাঁপাচ্ছিল।

তখন সামন্ত কেমন খুশি গলায় বলল, বিধুভূষণ দেশে তোমার কে আছে।

বিধুভূষণ বলল, ওস্তাদ মা বাবা ভাই বোন সবাই আছে।

বিধুভূষণ তুমি লম্বা একটা পাশ দিয়েছ শুনেছি।

সে জিভ কেটে বলল, ভুল হয়ে গেছে ওস্তাদ। আর হবে না।

সে বারো নম্বর তখন সমীহ করছে তাকে। সে বলছে প্যান্ট সার্ট পরে দেখেছ!

—না দেখিনি।

—আমি টিপছি। একবার পরে দেখ, ঠিকমত লাগে কিনা।

অশ্বিনী সামন্ত এবার সহসা উঠে বসল।

—হারে বিধুভূষণ, তেরা কৌন হায়!

—জি ওস্তাদ।

—তোমারা আখের লটপট হোগা।

বারো নম্বর বলল, আখের জরুর লটপট হোগা হুজুর।

—আওর গাধ্বে, বিধুভূষণ কো পিরান ঠিক হ্যায় কি নেই—তেরা কেয়া হ্যায়।

—কুছ নেহি হ্যায়।

—তব। যো কুছ বলেগা, হাম বোলে গা।

—জরুর আপ বোলেঙ্গে ওস্তাদ।

আরও যারা ছিল, প্রায় ষাট বাষট্টি জন, এবং লম্বা মত শুয়ে পড়বে বলে খুব সন্তর্পণে

ঢুকছে ঘরে। তিনজন ওস্তাদ, এ-প্রান্তে অশ্বিনী সামন্তর খাটিয়া, ও প্রান্তে মণ্ডল আর মদন ওস্তাদের খাটিয়া। নিরিবিলি ঘুমের কেউ ব্যাঘাত ঘটালে কি সাজা হবে কেউ বলতে পারে না। মরার মত সবাই শুয়ে বসে আছে। টুঁ শব্দটি নেই। এতগুলো মানুষের এই শয্যা প্ল্যাটফরমের মত আবাসে বিন্দুমাত্র সোরগোল নেই দেখে বিধুভূষণ বুঝতে পারছে—অশ্বিনী সামন্ত মানুষটি খুব কড়া ধাতের। সে ভাবল, সামন্ত ওস্তাদ না বললে পিরান পরে দেখার এক্তিয়ার তার নেই। সে একটা পিরান টেনে কি যে ভুল করে ফেলেছে!

সামন্ত তখন বলল, জলদি জলদি।

কি জলদি, জলদি ফেলে দেবে না ছুঁড়ে দেবে—সে ঠিক বুঝতে না পেরে আরও আহম্মক হয়ে গেল।

—বিধুভূষণ তুমি মেজর সাবের দেশের লোক, তুমকো বুদ্ধু ভি বলা যাবে না। তুমকো সাধু ভি বলা যাবে না ক্যায়া বলে তুমকো?

তখন আধা হিন্দি-বাংলা মিশ্রিত শব্দ বিধুভূষণের ভারি মজার উদ্রেক করে। সে বলল, পরেগা ওস্তাদ।

—জরুর পরেগা।

সে পরে ফেলল। পরে বুঝেছিল, এরা সবাই বাঙালী, কিন্তু হিন্দি ভাষায় হুকুম জারি. কথা বলার নির্দেশ আছে ওপর থেকে।

—বহুত খুবসুরৎ দেখাবে। লাগা লাগা।

সে বুঝতে পারল, প্যান্ট পরে দেখতে বলছে। ছোট বড় হলে বদলে নেওয়া যাবে। পরেই হতবাক। হাঁটুর নিচে হাফ-প্যান্ট। এবং যা মাপ, দুজন লোক গলে যাবে অনায়াসে। ভারি ঢলঢলে পোশাকের ভেতর হাফ জোকার মনে হচ্ছিল বিধুভূষণকে। সে যথার্থই এবার বেকুফ হয়ে গেল।

সামন্ত ওস্তাদ এবার উঠে বসল, তারপর দাঁড়াল। মজার মানুষ বিধুভূষণ হয়ে গেছে। মজা করা যাক। সময় বড় এখানে একঘেয়ে। সামান্য কিছুতেই মজা লুটে নিতে হবে। সে জানালায় গিয়ে ফিচ্ করে থুথু ফেলে এল। তারপর হাঁকল, মদন হ্যায় রে। মদন। ওস্তাদ মদন ও-প্রান্ত থেকে বলল, হ্যায়।—দ্যাখারে কিয়া চিজ মেরা সামনে খাড়া হ্যায়।

আর যারা ছিল, চুপি চুপি দেখছে। চোখ তুলে মজা ভেবে সোজাসুজি তাকাচ্ছে না। ওরা একদিনেই বুঝেছে, ওস্তাদ লোক বহুত খামখেয়ালী। ওরা চুপচাপ, কেউ সেজন্য জোরে হাসতেও পারছে না। হাসলেই ডিসিপ্লিন ব্রেক হবে। আও, আও। নাঙ্গা হোকে খাড়া হোনা হ্যায়। কাঁহাসে জংলী আয়ারে। বলেই সটান, প্রথমে এটেনসান হতে বলবে। তারপর দু গালে দু থাপ্পর। তারপর স্ট্যাণ্ড এট ইজি, তারপর স্ট্যাণ্ড-ইজি। শেষে ফিরে যাও বিস্তারায়।

—জোয়ানলোক ইয়াদ রাখ না, শ্রেফ ডিসিপ্লিনসে সব কাম হোতা হ্যায়। সামন্ত বেশ কড়া ভাষায় সবার উদ্দেশে কথাগুলো বলে বিধুভূষণকে হেঁটে যেতে বলল। বিধুভূষণ ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গেছে। সামন্তই তার সব। সে তার কথা বিন্দুমাত্র খেলাপ করতে পারে না। সে থপ থপ করে হেঁটে যেতে থাকল। আসলে বিধুভূষণ ঠিকঠাকই হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু এ-ভাবে শব্দ হচ্ছে কেন, এভাবে বোকা বোকা দেখাচ্ছে কেন, আর মনে হচ্ছে কেন, সে যেভাবেই হেঁটে যাক, জোকার হয়ে যাবে। দু-পাশের দাঁতের পাটি বের করে সব সতীর্থরা ওকে দেখছে। হাসতে পারবে না, হাসলেই যে কেউ আসামী হয়ে

যাবে। কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তাকেও বিধুভূষণ হয়ে যেতে হবে।

সামন্ত আবার জোরে হাঁকল।—ঠিকসে হাঁটো। হাত হিলাও মাৎ।

সে হাত হেলাল না। সে সোজা হেঁটে যেতে থাকল। পিরাণ আর প্যাণ্ট হাঁটু ছাড়িয়ে চলে গেছে। পা খালি। বেশ মজা করছিল তাকে নিয়ে—তিন ওস্তাদ হাসছিল ওর চোখ মুখ দেখে। একেবারে নীলবর্ণের শেয়াল সে বুঝি। সে বলল, ওস্তাদ আউর হাঁটে গা।

—মাত হাঁটো।

সে খাড়া হয়ে গেল।

সামন্ত বলল, কিরে মদন চলবে তো।

—চলবে। কত অচল মাল চালিয়ে দিলাম।

—আভি বিধুভূষণ নিদ যাও। ছুটি।

বিধুভূষণের দুপুরের মত ছুটি হয়ে গেল। ছুটির সঙ্গে দুপুরের এমন ঘুমটাও চোখ থেকে চলে গেল। সে বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারল না। গোপনে সে কাঁদছিল।

•

ঢং ঢং করে ঘড়িতে তিনটে বাজতেই হুড়মুড় করে উঠে বসল সবাই। যে যার বিস্তাবা তুলে ফেলল, একেবারে ঘড়ির কাঁটায় তিনটে বাজতে ত্রিশে ফল-ইনে যেতে হবে। হুইসিল বাজবে তখন। ব্যারাক বাড়িগুলোর ভেতরেই বড়মত মাঠ। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধোওয়া, এবং যাবতীয় কাজ সেরে ইউনিফর্ম পরে রেডি থাকার কথা সবার। ফুরুৎ ফারুৎ হুইসিলের শব্দ উঠবে মাঠটায়। আর এক ঝাঁক পাখির মত বেল্ট পরতে পরতে, কেউ মাথার টুপি ঠিক করতে করতে হাজির হবে। এবং লাইনে দাঁড়ালে সবাই নিমেষে ভালমানুষ হয়ে যাবে। কে বলবে দুপুর একটা বাজতে পনেরোয় বিধুভূষণ নামক এক ছোকরাকে নিয়ে বেশ মজা করা গেছে। প্ল্যাটুন কমাণ্ডার বিষ্টুপদ মস্ত ব্যস্ত মানুষ তখন। চারটে সেক্‌সানের অধীশ্বর। অশ্বিনী সামন্ত, মণ্ডল ওস্তাদ, মদন ওস্তাদ দৌড়ে যাবে, সামনে এ্যাটেনসান-ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রিপোর্ট করবে। রোলকল হবে। একদিকে এ-ভাবে বিধুভূষণের দল, অন্য দিকে অন্য সব প্ল্যাটুন কমাণ্ডররা দাঁড়িয়ে ওদের লাইন ঠিকমত হচ্ছে কিনা, এবং যে যার মত ডাইনে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা লক্ষ্য করছে। বিধুভূষণ লাইনে দাঁড়িয়ে কিছুতেই কাঁধ মেলাতে পারছে না। কেন যে এমন হয়, পেছনে না হয় সামনে পড়ে যাচ্ছে। অশ্বিনী সামন্ত রেগে গিয়ে হয়ত কিছু বলত, কিন্তু ঠিক তখনই হাবিলদার-মেজর মনোরঞ্জন, ওরে বাপস্ এতক্ষণে বুঝতে পারছে বিধুভূষণ, হাবিলদার-মেজর কি জিনিস! সব প্ল্যাটুন কমাণ্ডাররা দৌড়ে যাচ্ছে। সরল বৃক্ষের মত দাঁড়িয়ে সম্মান জানাচ্ছে। আর তখনই বাঘের মত গলায় গর্জন করে—দুলে দুলে দৌড়ে দৌড়ে এগোচ্ছে পিছুচ্ছে হাবিলদার-মেজর। কত রকমের লাল নীল রিবণ, গলায় কোমরে বগলে। কত রকমের তকমা আঁটা মানুষ। বুট জুতো জোড়া চকচক করছে। রোদ এসে পড়ায় ঠিকরে আলো বের হচ্ছে জুতো থেকে। এ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে মনোরঞ্জন, লুঙ্গি তুলে চুলকে দেয় যখন তখন মানুষটা, এখন দেখলে কে বিশ্বাস করবে। বিধুভূষণ এত সব দেখে একেবারেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

—'জোয়ান লোগ্।' বলেই যেন দম নিল হাবিলদার-মেজর মনোরঞ্জন। 'ইয়াদ রাখ না।' আবার দম নিল। 'পিটি, প্যারেড, ডিসিপ্লিন তিন চিজকা ইয়াদ রাখ না।'

বিধুভূষণ তখন দেখছে অশ্বিনী সামন্ত কড়া চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সে কি

যে দোষ করল! হাবিলদার-মেজরও বেশ দুবার চোখ বুলিয়ে গেল। এতগুলো জোয়ানের ভেতর দু-দুবার চোখ কেবল তারই ওপর বুলিয়ে গেল ভাবতেই সে আরও সতর্ক হয়ে গেল। ঠিকঠাক আছে কিনা, কি করবে, জামা ঢোলা, প্যাণ্ট ঢোলা, লাইন থেকে জামাপ্যাণ্ট ফুলে ফেঁপে বের হয়ে যাচ্ছে, টেনেটুনেও কিছু করতে পারছে না, অশ্বিনী সামন্ত ছুটে আসছে, তার কি যে দোষ সে নির্ণয় করতে পারছে না, অশ্বিনী সামন্ত কাছে এসেই চুলের মুঠি ধরে ফেলবে বোধ হয়, সে ভয়ে মাথা সরিয়ে নেবার সময় মনে হল, ঘাড়ের রগফগ সব ফুলে যাচ্ছে—একনাগাড়ে এটেনসান হয়ে থাকা কি যে কষ্ট!

অশ্বিনী সামন্ত দাঁত চেপে খুব কাছে এসে বলল, এই ইৎনা হিলতা কিঁউরে!

সে বুঝতে পারল ঘাড় গলা যখন তখন তার নড়ে যাচ্ছে! এটা ভাল না। সে সোজা তাকিয়ে থাকল।

হাবিলদার সাব আবার গর্জন করে উঠল—যোয়ান লোগ হাম লোগ আজ স্বাধীন দেশ কী নাগরিক। দেশ কী ইজ্জৎ হামারা ইজ্জত। কৈ কাম, ছোটা বড়া নেহি হ্যায়। সব কামকে লিয়ে তৈয়ার হোনা চাহিয়ে।

কামটা যে কি কিছুতেই খুলে বলছে না। বিধুভূষণের ইচ্ছে হাবিলদার সাব একটু দয়ালু হোক। কথাটা খুলে বলুক। কাল থেকে সে অস্বস্তির ভেতর আছে। কেউ কিছু খুলে বলছে না। মাথার ওপরে যে এতবড় আকাশ, এবং চারপাশে লম্বা ব্যাবাক বাড়ি অথবা ইতস্তত সব ছড়ানো ছিটানো আমবাগান লিচুবাগান—বাগান পার হয়ে গেলে চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া আছে—তারপর লম্বা সড়ক চলে গেছে শহরে, সড়ক ধরে গেলে ইস্টিসান, রেলগাড়ি আসে, রেলগাড়িতে চেপে বসলে পাঁচ-সাত ঘণ্টা লাগে তার বাড়ি, কিছুই মনে করতে পারছে না। এমনকি শিখা এই নীরস হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ভূমণ্ডলে পদ্মের মত ফুটে আছে কাছে কোথাও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

তখন দলে দলে আলাদা হয়ে চলে যাচ্ছে এক একটা দল আমবাগানের ছায়ায়। দুপুরের রোদ, এবং চৈত্র মাস বলে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, সেই রোদের ভেতর অশ্বিনী সামন্ত আগে আগে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। পিছু পিছু সেকসান ওয়ান। সতেরো জন লম্বা ফাইলে দৌড়াচ্ছে। সামন্ত যেদিকে যাচ্ছে, ওরা পিছু নিচ্ছে তার। প্রথমে এক নম্বর ব্যারেক বাড়ি পার হয়ে একটা পুকুরের পাড় দিয়ে, তারপর কিছু গাছপালার ভেতরে ঢুকে গেল। বেশ বড় বড় কটা আম গাছ এবং কদমফুলের গাছও সে একটা দেখতে পেল।

চারপাশে এমন সব টিবি, উঁচু জায়গায় দলে দলে ভাগ হয়ে গেল তারা। আর কতদূর গেলে কাঁটাতারের বেড়া সে এখনও বুঝে উঠতে পারছে না। এবং বেশ নির্জন মনে হলেও দূরের সব গাছপালার ভেতর এমনি আছে আরও সব সেকসান। বেসিক-ক্যাম্পে যারা এসেছে, তারা এদিকটায়—যতদূর চোখ যায়, বিধুভূষণের মনে হল তারাই আছে। বেসিক ক্যাম্পে মোটমাট চারটা প্ল্যাটুন। নেভিক্যাম্প ওদিকটায়। ওদেরও হবে হয়তো এমনি চারটা প্ল্যাটুন। এখন ব্যারেক বাড়িগুলো ফাঁকা। কোয়ার্টারগুলোর দরজা জানালা বন্ধ। এবং যিনি এখানে সবচেয়ে বড় মানুষ, বিধুভূষণ তাকে দেখেই নি। অনেক দূরে লাল রঙের একটা বাড়ি সকালে সে সদর রাস্তার পাশে দেখেছিল, দুজন সেন্ট্রি রাইফেল নিয়ে কটমট করে তার দিকে তাকিয়েছিল। ভেতরে ফুলের সব নানারকম কারুকার্য করা বাগান, গাড়ি বারান্দা, জানালায় সব ফুল-ফল আঁকা পর্দা এবং সেখানেই মনে হয়েছিল সেই বড় মানুষটা থাকে। দূরে যে লাল রঙের বাড়ি, গাছপালা, সেটা হয়তো বাড়ির পেছনের দিকটা।

অশ্বিনী সামন্ত বলল, নেহি, হাত ঠিক নেহি। বলে সে দৌড়ে গেল। পেছনে কোন হাতের ওপর কোন হাত হবে, কে কি-ভাবে ভুল করছে ঠিক করে দিল। আবার দৌড়ে সামনে এসে হাত কিভাবে রাখতে হবে, লাইন কি-ভাবে সোজা রাখতে হবে, এটেনসান, স্ট্যাণ্ড ইজি, স্ট্যাণ্ড এট্ ইজ্ কি, এবং কতটা কাঁধ বরাবর, দূরত্ব কার থেকে কতটা সব বুঝিয়ে, চিৎকার করে উঠল, যোয়ান লোগ, এটেনসান।

সতেরো নম্বর পারছে না। সতেরো নম্বর ভুল করছে। সে এটেনসান বলার সঙ্গে স্ট্যাণ্ড এট্ ইজ করে ফেলেছে। নতুন। গতকাল মোটামুটি ঝালাই গেছে ষোল জনের—এই সতেরো নম্বরই যত গোল বাঁধাচ্ছে।

সামন্ত আবার কম্যাণ্ডের গলায় বলছে—কিয়া হোতা হ্যায়রে তেরা?

বিধুভূষণ বুঝতেই পারছে না ভুলটা কোথায়। সে ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে পারছে না। সোজা সামনে, চোখ এদিক ওদিক ঘুরলেই গণ্ডগোল। অথচ ওস্তাদ বিরক্ত হচ্ছে। সে ঘাবড়ে গিয়ে স্ট্যাণ্ড—ইজি হয়ে গেল।

অশ্বিনী সামন্ত ছুটে আসছে। লম্বা ছ'ফিটের চেয়ে উঁচু মানুষটা। পাকানো শরীর। মজবুত। চড় কসালে সব কটা দাঁত খসে যাবে। দৌড়ে কাছে আসতেই সে ভয়ে মুখ ঘুরিয়ে ফেলল, আর তখনই দেখল পাশের সবাই পায়ে পা লাগিয়ে সোজা বাজ পোড়া মানুষ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জিভে কামড় দিল বিধুভূষণ। কি সাংঘাতিক ভুল! সে সোজা এটেনসান হয়ে—যা থাকে কপালে—মুখ সোজা করে দিল। সামনেই যমদূতের মত অশ্বিনী সামন্ত লাফিয়ে পড়ছে, হেই।

সে কিছু বলতে পারে না।,কথা বলার নিয়ম নেই। খুব বিনয়ী চোখে তাকাল।—রক্ষা করুন ওস্তাদ, আর ভুল হবে না।

সে যাত্রা রক্ষে পেল বিধুভূষণ। অশ্বিনী সামন্ত কটমট করে একবার তাকাল শুধু। তারপর দু'পা সরে গিয়ে বলল, স্ট্যাণ্ড এট্ ইজ্।

সবই গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। বিধুভূষণের মাথাটা কেমন করছিল। স্ট্যাণ্ড এট্ ইজ্, আর স্ট্যাণ্ড-ইজি বড় কাছাকাছি নাম। নামের মত মাথার ভেতর কাছাকাছি সব গণ্ডগোল বেঁধে যায়। একটা করতে আর একটা করবে ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে করতে পারছে না। আড়-চোখে পাশের লোক কি করছে দেখে, করছে—এবং এতেই দেরি বয়ে যাচ্ছে। শকুনের মত চোখ অশ্বিনীর; ঠিক ধরে ফেলেছে। সে সামান্য দেরি করে ফেলছে। একসঙ্গে মিলছে না। গড়বড় হয়ে যাচ্ছে। আর তখন আবার সেই ভয়ঙ্কর চিৎকার, পাট্‌ঠে ঠিক সে কোরো।

কেউ একজন ফিচ্ করে হেসে ফেলেই মুখ দাঁত শক্ত করে ফেলেছে। ফেলল কি হবে, অশ্বিনী সামন্ত সব টের পায়।—এই হাসতা কিউরে! ইধর আও। খাড়া হো যাও।

হায় হায়, বিধুভূষণের ভারি কষ্ট হচ্ছিল। মূলে সে আছে। তার এমন সাংঘাতিক ভুল না হলে সামন্ত ওস্তাদ বিগড়ে গিয়ে যা তা বলত না। মানুষটাও হাসত না। লাইন থেকে যখন বের করে নিয়ে গেছে তখন কি করবে বোঝা যাচ্ছে না। আরে এ যে সেই বারো নম্বর।

সামন্ত বলল, এটেনসান।

বারো নম্বর এটেনসান হয়ে গেল।

—স্ট্যাণ্ড এট্ ইজ্।

বারো নম্বর স্ট্যাণ্ড এট্ ইজ্ হয়ে গেল।

—স্ট্যাণ্ড-ইজি!

বারো নম্বর স্ট্যাণ্ড ইজি হয়ে গেল। এখন সে স্বাধীন, কারণ মাথা মুখ, হাত সবই হেলাতে পারবে।

সামন্ত বলল, দেশ কোথা?

—তমলুক।

—আরে তমলোক! কোন পাড়া'র?

—বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে। দাদার মণিহারী দোকান আছে। লক্ষ্মী ষ্টোরস্।

—সনাতন বাবু কে হয়?

—দাদা।

—অ।

—হুজুর ব্যাটেলিয়ান ঢুকিয়ে দিন না। এক জিলার লোক।

—এটেনসান।

মরতে কেন যে বারো নম্বর এক জিলার লোক বলতে গেল!

তারপর বারো নম্বর বলে কেউ আর আছে পৃথিবীতে, সামন্তকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না। সে দৌড়ে আসছে। কমাণ্ড করছে, সেকসান—স্ট্যাণ্ড এট্ ইজ্ স্ট্যাণ্ড ইজি। সেকসান—দৌড় লাগাও। সেকসান, জোড় কদমে পা চালাও। সেকসান—লাফাও। সেকসান—বসে পড়ো। বিশ্রাম।

তারপর সামন্ত নিজেও হাঁটু মুড়ে বসে বলল, তোমরা কে গান গাইতে পার?

বিধুভূষণ দেখছিল, সেই বারো নম্বর তখনও এটেনসান। সোজা। সামন্ত কি ভুলে গেছে! বারো নম্বর দূরে একটা গাছের নিচে এটেনসান, আর ওরা এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। বারো নম্বর নেই। কম কম মনে হওয়ার কথা। এবং সামন্তকে একবার মনে করিয়ে দেবে নাকি, ওস্তাদ, বারো নম্বরকে ডাকুন। বারো নম্বর গান জানে মনে হয়।

কেউ বলল না গান জানে। জানলেই, জানতে দিচ্ছে কে। তারপর তা নিয়ে আবার সামন্ত তাকে কি করবে কে জানে।

—ক্যারিকেচার কে করতে পার?

কেউ না। সবাই চুপ। পাশাপাশি সবাই হাঁটুমুড়ে বসে আছে। কেউ কেউ ঘাস চিবিয়ে খাচ্ছিল।

—তুনি নিমাই?

—না ওস্তাদ। আমি কিছু জানি না।

—তুমি অবিনাশ?

—ন্যা স্যার।

—জয়ন্ত?

—না স্যার। সত্যি জানি না।

কেউ জানে না, ভারি খারাপ। সামন্তর কপালে ঘাম জমে যাচ্ছে। তার মানে মাথা গরম হয়ে গেলে রক্ষা থাকবে না। বিধুভূষণ ভয়ে পেয়ে যাচ্ছে। কেউ বললেই পারে—হ্যাঁ হুজুর, জানি। গান ক্যারিকেচার সব। যা বলবেন। তবু দয়া করে কপালে ঘাম জমতে দেবেন না।

বিধুভূষণ ধা করে উঠে দাঁড়াল।—ওস্তাদ আমি জানি।

সামন্ত বলল, সাবাস। রোববার দেখা যাবে।

বিধুভূষণ সবাইকে রক্ষা করতে আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়ে গেল। সে আয়নায় আজ কিছু মুখের ভঙ্গি দেখে রাখবে। আয়না ঠিক কার কাছে আছে সে জেনে নেবে। তার কথাবার্তা শুনলে, কেউ কেউ এমনিতেই হেসে ফেলে। ওর মুখে সব সময় ভাঁড়ের ছবি, সে টের পায় না। যারা পায় তারা ঠিক ঠিক তাকে চিনতে পারে।

সামন্ত বলল, তোমার হবে।

সামন্ত এতক্ষণে যেন সঠিক তাকে চিনতে পারছে। খুব গম্ভীর গলায় বলল, সেকসান, ক্যামপ-ফায়ারে আমার সেকসান গেলবার ফাস্ট হয়েছিল। কমাণ্ডার সাব খুব খুশী। তোমরা যা কিছু পারো লিখে রাখবে। এই যেমন গান, আবৃত্তি, নাটক, ক্যারিকেচার। এ-সব মাঝেমঝো ব্যারেকে হবে। বিধুভূষণ মনে রাখবে, ইজ্জত বড় কথা। সেকসান ওয়ান, ইজ্জত, সেকসান ওয়ানের মত হওয়া চাই।

বিধুভূষণ বুঝতে পারছে, লোকটাকে যত খারাপ ভেবেছিল, তত খারাপ না। একটু রুটিন মাফিক মানুষ। সে ফের দাঁড়িয়ে বলল, অমূল্যদাকে দিয়ে হবে।

অমূল্য মানে বারো নম্বর। কি যে কসুর লোকটার। তাকালেই বোঝা যায় কাচ্চাবাচ্চার বাপ মানুষটা ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে। এবং এ-ধরনের কঠিন শাস্তি কত সহজে সামন্ত দিতে পারে।

সামন্ত তখন কমাণ্ডের গলায় হাঁকল, বারো নম্বর স্ট্যাণ্ড এট্ ইজ্। আবার হাঁকল, স্ট্যাণ্ড-ইজি। শেষে বলল, দৌড় লাগাও। শেষে আবার বলল, বোস।

বারো নম্বর হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল। পেট এবং শরীর উভয়ই এত ভারি যে কোনটাই সামাল দিতে পারে না সে। গাভীন গরুর মত লাগছে বারো নম্বরকে এখন।

আর তখন ঘুরে ঘুরে সব আমবাগানেব ভেতর প্যারেডের প্রথম পাঠ শেখানো হচ্ছে। এক ঝাঁক পাখির মত মনে হয় কোন সেকসান উড়ে যাচ্ছে বাতাসে। বিউগিল বাজছে। সাড়ে চারটে। আর আধঘণ্টা পার হলে ডিস্‌মিস্ করে দেবে। এবং তখনই মনে হল, সেই সদর রাস্তায় একটা রিকস। ক্রিং ক্রিং বেল বাজাচ্ছে। স্কুলের পোশাকে একটি মেয়ে। বসন্তের হাওয়ায় ওর মাথার চুল উড়ছে। এমন সুন্দর জ্যান্ত একটা মেয়ে নিষ্ঠুর এই পৃথিবীতে ঢুকে যেতে পারে কেউ কল্পনাই করতে পারে না। সবার চোখ এখন সেদিকে। সামন্তও কেমন হাসি হাসি গলায় বলল, বিধুভূষণ পৃথিবীটা ভারি মজার নারে?

ব্যারেকে ব্যারেকে আলো জ্বলে উঠেছে। হ্যাঙ্গারের সামনে বড় একটা আলো। দুটো বড় আমগাছ এবং অজস্র সব পোকার উপদ্রব উজ্জ্বল বাতিটার সামনে। বাতিটা জ্বেলে দিলে চারমাথাটা প্রায় দিনের বেলার মত দেখায়। কোয়ার্টার-মাস্টার ভূষণ দত্ত হ্যাঙ্গারে রসদ পাঠিয়ে দিচ্ছে। রাতে রুটি, ডাল, চার টুকরো করে মাংস, বড় একটা আস্ত আলু। রিক্রুটদের রেশন এক মাপের। কারো কম বেশি না। মোটা মোটা রুটি পাঁচখানা।

বিধুভূষণ ঝিল থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসেছে। স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়, পা খালি। ঢোলা হাফ-প্যান্ট। প্যারেডের প্যান্ট-জামা ভাঁজ করে বালিশের নিচে রেখে দিয়েছে। হাতে তেমন আর কোন কাজ নেই। কমন রুমে যে যার মত, তাস পাশা, পিং পং এবং কেউ কেউ বাঘবন্দি পর্যন্ত খেলতে বসে গেছে। উৎসাহী যুবকেরা ঠিক খুঁজে পেয়ে যায়,

কোথায় কি আছে। বিধুভূষণের কেবল খাব-খাব ভাব। পেটে এত খিদে যে আর্তনাদ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। শোনা গেল সন্ধ্যায় এক মগ চা পাওয়া যাবে। লাইনে দাঁড়াতে হবে। যতটা দ্রুত সম্ভব, সে হাতমুখ ধুয়ে ঘাসের ওপর মগ হাতে নিয়ে বসেছিল। ঘণ্টা পড়তে না পড়তেই এক দৌড়। সবার আগে পাবে এই আশা। কিন্তু বিধুভূষণ জানে না, তার চেয়ে দ্রুত দৌড়ায় মানুষেরা। কোথায় যে সবাই ঘাপটি মেরে বসেছিল, টেরও পায়নি। সে এত তাড়াতাড়ি করেও ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জনের পেছনে পড়ে গেছিল।

কিছুটা বেড়িয়ে, কোথায় কি কি আছে দেখার বাসনা জন্মাল তার। অথচ সে তখনও ঠিক জানে না, কতদূর সে একা হেঁটে যেতে পারে। সেই রাস্তাটায় হাঁটার সবার এক্তিয়ার আছে কিনা, গেলে আইন মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত হবে কিনা বুঝতে পারছে না। তার ছেঁড়া চটিজোড়া কোথাও পড়ে আছে। গেলেই পেয়ে যাবে। বেশ কিছুদিন আরও পরা যেত। একেবারে খালি পায়ে হাঁটতে কেমন মনে হচ্ছিল তার। রাস্তাটায় গেলেই শিখাদের কোয়ার্টার। শিখা জানালায় হয়তো পড়ছে। সব কিছু যখন নীরস, শিখা ফ্রক গায়ে জানালায় পড়তে বসেছে ভাবতে ভীষণ ভাল লাগছিল। দু-বছর পরে শিখা আর কত বড় হবে! দেখা হলে তাকে চিনতে নাও পারে। বিশ বাইশ দিনের স্মৃতি শিখার ভুলে যাবারই কথা। শিখাকে সে কদম ফুল পেড়ে দিয়েছিল, তাকে নিয়ে নৌকায় শাপলা তুলতে গিয়েছিল এবং বর্ষাকালে শিখার জলে সাঁতার কাটা, জলে ডুবে পানকৌড়ি হয়ে যাওয়ার কথা মনে আছে কিনা দেখা হলে একবার জেনে নিতে পারত।

তার আপাতত এত সাহস নেই। রাস্তায় নেমে চুপি চুপি একবার সন্তর্পণে চার পাশে তাকাল। কেউ তাকে চেনে না। কেবল ভূষণ দত্ত, হাবিলদার এবং অশ্বিনী সামন্ত বাদে। সেক্‌সানের সবাই তাকে চেনে। কেউ কাছে নেই। ওরা ঘরে শুয়ে বসে আছে। কেউ মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিধুভূষণের ভারি হাল্কা লাগছিল শরীরটা।

অথচ কেমন একটা ভয় ভয় ভাব। সবাই তাকে যেন বলতে পারে, এটেনসান। ডাবল মার্চ। সবাই যেন বড় বড় চোখে তার ওপর নজর রাখছে। হাবিলদার মেজরের লোক। এসেই পালায়—বদনাম কুড়োতে কতক্ষণ। সে রাস্তায় নামতে না নামতেই সাঁ সাঁ করে একটা জিপ বের হয়ে গেল। সামনে সাদা লম্বা ম্যাগ্‌জিন কোয়ার্টারে ঢুকে যাচ্ছে জিপটা। সে দুটো শিরীষ গাছের ফাঁকে লুকিয়ে পড়ল। ম্যাগ্‌জিনের গেটে সেন্ট্রি। খট্ খট্ শব্দমালা ভেসে যাচ্ছে। তার বুটের শব্দ নির্জন এই পৃথিবীতে ভারি কড়া হুমকির মত—মাৎ যাও উধার। সে কুর্নিশ জানিয়ে বলল, চটি জোড়া খুঁজতে যাচ্ছি স্যার।

অশ্বিনী সামন্ত আবার যদি খুঁজতে বের হয়। এ-সময়টা সবারই বিশ্রামের সময়। রাত আটটায় খাবার ঘণ্টা পড়বে। খাবার শেষে ফল-ইন শেষবারের মত। রোল-কল, নাইট গার্ড কে কোথায় থাকবে, একটা ডিউটি-চার্ট নাকের ডগায় ঝুলিয়ে রাখবে। বিধুভূষণকে বারো নম্বর অমূল্য সব বুঝিয়েছে। বারোনম্বরই বলেছে ফল-ইনের আগে কেউ তোমার খোঁজ খবর করবে না। জুতো জোড়া কে আবার তুলে নেবে। খুঁজে পাওতো নিয়ে এস।

বিধুভূষণ এবারে ভাবল, যা থাকে কপালে। বীরদর্পে হেঁটে যাওয়া যাক, সে আবার রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল। দম নিল। দূরে বড় মাঠ পার হয়ে গেলে নেভি-ক্যাম্পের সব মানুষজন। তাদের কথাবার্তা কানে আসছে না। ভূতুড়ে ছায়ার মত তাদের চলাফেরা সে দেখতে পাচ্ছে। এবং মনে হল তিন চারজন লোক দূর থেকে আসছে। জ্যোৎস্নারাত। সে ফাঁকা জায়গাতে এসে প্রথম এটা টের পেল। কি বড় আকাশ, এবং কত বড় চাঁদ, নক্ষত্র,

সবই আছে, অথচ কেমন ভয় ভয় ভাব। অস্পষ্ট কুয়াশায় তারা ভেসে এল, চলেও গেল। তাকে দেখে কেউ কিছু বলল না।

বেসিক-ক্যাম্প, নেভি-ক্যাম্প মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো মানুষের বাস। তার মনে হয় পাঁচশো মানুষই যেন বিধুভূষণ কোথায় যায়, কি করে, দেখছে। পাঁচশো মানুষের আর কোন ধনদ্ আছে, পাঁচশো মানুষের ভেতর চারশোই তার মত বিধুভূষণ—সে বিশ্বাসই করতে পারে না। সে বলল, বিধুভূষণ তোমার যাওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা ভেবে দ্যাখো।

—চটিজুতা জোড়া কে আবার তুলে নেবে!

সে বলল, বিধুভূষণ, আসলে তুমি ভারি বদ্জাত। ভেতরে ভেতরে আরও কিছু তুমি চাও।

বিধুভূষণ বড়জোরে জিভ কেটে বলল, সত্যি কিছু চাই না।

—ফের মিথ্যে কথা!

বিধুভূষণ হেসে ফেলল। তুমিতো সবই বোঝ কর্তা, তবে আর ঘাটাচ্ছ কেন।

সে হেঁটে যাচ্ছিল। দুচারজন তার পাশ কাটিয়েই চলে গেল। ওরা এসে পড়লেই সে খুব ভালমানুষেব মত রাস্তার নিচে নেমে দাঁড়ায়। কোথায় কতটুকু দৈর্ঘ প্রস্থের দরকার, তার যখন ভাল জানা নেই, তখন রাস্তা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল। এবং হাবিলদার মেজর, ভূষণ দত্ত, আর অশ্বিনী সামন্ত, এই তিন জন বাদে যে কেউ রাস্তায় যাওয়া আসা করলে বোধ হয় কৈফিয়ত দিতে হবে না। কিন্তু ক্যাম্পের বাবার বাবাতো আছে। সে যদি বলে, ওহে জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছে কেউ হেঁটে যাচ্ছে। দেখতো পালাচ্ছে কিনা। ক্যাপ্টেন বনবিহারীর বাংলোর কাছাকাছি এসে বিধুভূষণের এমন মনে হল। বলল, কর্তা কোথায় ফেলেছেন। অনেকটাতো এলেন। দেখছি না তো। আর যাওয়ার সাহস পাচ্ছি না।

সে বলল, চটি জোড়া কত দামী তুমি জানো!

—তাহলে আর একটু খুঁজে দেখি। বিধুভূষণ খুব সন্তর্পণে চারপাশটা খুঁজছে। ক্যাপ্টেনের বাংলোর লাল আলো জ্বলছে। ক্যাপ্টেন সাব নীল রঙের বেতের চেয়ারে বসে রয়েছে। মেমসাব পাশে দাঁড়িয়ে বোধ হয় মালিকে কিছু দেখাচ্ছে। সে একা-একা বেশ অনেকটা চলে এসেছে। আর একটু গেলেই শিখাদের কোয়ার্টার।

এক জোড়া বুট ছাড়া তার কিছুই আর নেই। সে তো আর বুটজুতা পরে শিখার সঙ্গে দেখা করতে পারে না। তার বেখাপ্পা ইউনিফরম, মাথায় টুপি আর লম্বা বুটজোড়া দেখলে শিখা ঘাবড়ে যেতে পারে। এবং সে বলল, বুঝলে বিধুভূষণ, এ-জন্যেই খুঁজে বের করা দরকার।

—তা ঠিক কর্তা। কি যে ঝামেলায় পড়ে গেলেন! বেশ তো স্বাধীন ছিলেন। খেতে না পেতেন, ফুটপাথ ছিল। শুতে না পেতেন স্টেশনের প্ল্যাটফরম ছিল। কেউ দেখবার ছিল না।

—বেশ ছিলাম কিন্তু বিধুভূষণ।

—খুব ভাল ছিলেন। মা বাবারে চিঠি লেখেন এবারে।

—আর মা বাবা! ঐ দ্যাখতো, আরে ঐ তো মনে হচ্ছে!

—না কর্তা। আপনার নয়। মনে হয়, সাতাশ না সাঁইত্রিশ লিখে শশী মল্লিক যাকে পাঠিয়েছিল, তার জোড়া।

—দ্যাখি। সে উবু হয়ে চটিজোড়া তুলে দেখল। ছেঁড়া স্ট্র্যাপ হাফ্সোল, অসংখ্যবার

মেরামতের জন্য ওটার আর কোন অস্তিত্বই নেই। তবু পা গলিয়ে দেখল ইউনিফরমের মতই ঢোলা। মেরামত করলে পায়ের আগে জুতো জোড়া চলে যাবে। এবং তখনই মনে হল হাবিলদার মেজরের কোয়ার্টার থেকে কেউ বের হয়ে আসছে। খুব অস্পষ্ট। বেশ দূরে, মায়াজালের মত কুয়াশার সাদা জ্যোৎস্নায় দুজন যখন, ভূষণ দত্ত আর মনোরঞ্জন না হয়ে যায় না। অনন্তর যে পালায় সে বাঁচে। সে বলল, বিধুভূষণ পালাও। আসছে।

বিধুভূষণ দু লাফে সামনের মাঠে নেমে দেখল, চাঁদমারির কাছাকাছি এসে গেছে। সে ভাবল খুব সন্তর্পণে হ্যাঙারের পাশে উঠে যাবে। তারপর যেন হ্যাঙারে জলটল খেতে ঢুকেছিল, অথবা ছলছুতোয় নানারকম কাজ তো একজন মানুষের থাকতেই পারে—যা হোক একটা অভিনয় করা যাবে।

দু লাফে চাঁদমারি পর্যন্ত ছুটে আসা যায় তবে! পায়ে একেবারে একটা আস্ত চিতাবাঘ ভর করেছিল। এতটা দূরে নিমেষে এসেই মনে হল, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে বসে পড়ল। এতটা দ্রুত সে দৌড়াতে পারে—ভয়ে মানুষের কিনা হয়! নিজের ওপর বিধুভূষণের ভারি আত্মবিশ্বাস জন্মে গেল। বলল, সাবাস বিধুভূষণ, তুমি পারবে। সতেরো নম্বর তুমি ডাহাবাজ লোক।

বিধুভূষণ বেশ সহজ গলায় বলল, কি যে বলেন স্যার!

—একটু আয়েস করা যাক—কি বল?

—সেই ভাল স্যার।

সে চারপাশে তাকিয়ে বুঝল, কাছে কোথাও কেউ নেই। ধুবিখানার মাঠে কেউ একজন ডিউটিতে ছিল। রাতে ডিউটি থাকার কথা নয়। তবু মনে হল, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা লাঠির মাথায় টুপি ঝুলিয়ে রাখলে যেমন দেখায়, অথবা কাক তাড়ুয়ার মত। রাতে এমন ঝিলের মাঠে কোন প্রহরী থাকতে পারে, সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। একটু হাত পা ছড়িয়ে সে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়বে, তাও পারছে না। খচ্ খচ্ করছে মনটা।

—বিধুভূষণ।

—হুজুর।

—ওধারে কিছু দেখতে পাচ্ছ?

—না তো হুজুর।

—আরে ঐ যে দেখছ না, তোমাকে তো দুটো একটা যুদ্ধের ছবিটবি দেখিয়েছি। মনে পড়ে না।

—সবই পড়ে।

—একটা কি ছবি মনে করতে পারছে না, যুদ্ধ শেষ। শুধু রাক্ষুসে মাঠ, পোড়া ঘাস, মরা গাছটাছ আর রাইফেল নিচু করা, বাঁটের ওপর টুপি আল্গা করে রাখা। মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ স্যার মনে পড়ছে।

—দ্যাখো ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে কিছু।

—এগিয়ে দেখলে হয়।

—আর পারছি না বিধুভূষণ। শরীরে বড় ব্যথা। যা দৌড়-ঝাঁপ করিয়েছে।

—সকালে টের পাবেন।

সে আর বিধুভূষণ এখন এক হয়ে গেল ফের। ধুবি মাঠের ওপর এসে দেখল কিছু

নেই। দুটো গাধা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখেই চেঁচাতে শুরু করছে। পা ছুঁড়ছে। একেবারে ভয়ঙ্কর হাঁকডাক।

বলল, বিধুভূষণ, এটা তুমি কি করলে? দ্যাখো গাধারা পর্যন্ত টের পেয়ে গেছে তুমি বিধুভূষণ। তোমাকে ধরিয়ে দিতে চাইছে।

বিধুভূষণ বলল, হুজুর সরে পড়া ভাল। আটটা বাজতে দেরি নেই। লোকজন ছুটে আসতে পারে। যা চেঁচাচ্ছে, মনে হয় পালে বাঘ পড়েছে।

সুতরাং সে আর চাঁদমারির পেছনে, নির্জন মাঠে, অথবা আমবাগানের ভেতর ঘুরে বেড়াতে সাহস পেল না। দূরে সব আলোয় সাদা হলুদ ডুম জ্বলছে। হ্যাঙারের মাথায় সার্চ লাইটের মত আলো। ঘুরিয়ে দিলেই এত দূরেও সব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এবং পাশেই কাঁটাতারের বেড়া। সে ক্যামপের শেষ মাথায় এসে গেছে বুঝতে পারল। কাঁটাতার মাথা সমান উঁচু, চৌকানো কংক্রিটের থামের ভেতর গলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতদূর যে ক্যামপের কোন সোরগোলও এখান থেকে সে শুনতে পাচ্ছে না। সে দৌড়াতে থাকল।

আসলে সে এখন দৌড়াতে দৌড়াতে হাজার রকমের কথা ভাবছে। শরীরে ব্যথা। হাড় মুড় মুড় করছে। এবং দৌড়াবার সময় সে টেব পাচ্ছিল, হাড়-পাঁজর সব আলগা হয়ে গেছে। এত সব ভেতরে থাকে, এই প্রথম সে যেন টের পাচ্ছে। পুরো আড়াই ঘণ্টা প্যারেড এ-ভাবে রোজ সকাল বিকেল, এবং কখনও ওস্তাদেরা মর্জি মত তাকে দিয়ে যা খুশি করাবে। সামন্ত ওস্তাদ তবু ভালো মানুষই মনে হচ্ছে। দুপুরে পা টিপে দিলে ওস্তাদ আর কিছু বলবে না। মোহন সিরিজের তিন খানা বই মাথার কাছে দেখেছে। নিদ আসার আগে সিরিজের যে কোন একখানা সামনে এগিয়ে দিলেই হবে। এটা ওস্তাদকে খুশি রাখার মোক্ষম অস্ত্র। মোহন সিরিজের সব বই তার শেষ, কি কি আর আছে, সে বলে দিতে পারলে ওস্তাদ তাকে, প্যারেডে, ফল ইনে বিস্তারা তোলার অসংখ্য নিয়মকানুনের বেড়াজাল থেকে সামান্য ছুটি অনুমোদন করতে পারে।

মাঠ, আমবাগান, চাঁদমারি, ধোবিমাঠ, পার হয়ে ব্যারেকের রাস্তায় উঠে আসতেই বারো নম্বরের সঙ্গে দেখা। কলপারে সে একটা পেতলের ঘটি মাজছে। ঘটি মেজে, এক ঘটি জল নেবে বোধ হয়। তারও জল তেষ্টা পাচ্ছে, জলের জন্য সে কলপারে এগিয়ে গেল, তখনই মনে হল গাধাগুলো মাঠে আর ডাকছে না! কি পাজি! বুঝে ফেলেছে, ঘাটের মরা ঘাটেই উঠেছে। জল খেতে খেতে বুঝল, পালানো সহজ নয়।

বারো নম্বর তখন বলল, আরে বিধুভূষণ। তোমাকে সামন্ত ওস্তাদ খুঁজছে।

—যা চ্চলে।

বিধুভূষণের আর জল খাওয়া হল না। চটি জোড়া খুঁজতে গিয়ে এত সব হবে জানলে যেতই না। দুর্মূল্য চটি জুতো জোড়ার জন্য কষ্ট মাথায় উঠেছে।

দু লাফে ব্যারেকে কাঁচুমাচু মুখে এসে দাঁড়াল বিধুভূষণ। চোখে মুখে ভয়। সে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। সামন্ত খাটিয়ার নিচে কালো ট্র্যাংকের ভেতর কি হাতড়াচ্ছে। সে যে দাঁড়িয়ে আছে, সামন্ত দেখেও যেন দেখছে না।

সে বলল, ওস্তাদ।

—আরে! কোথায় যাও। শিখা দ্যাখো হ্যাঙারের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ডাকছে।

অঃ। সেই বালিকা। একা রাতে এতদূর চলে এসেছে! হাবিলদার মেজর ডেকে পাঠাতে পারে। এতক্ষণ কোথায় ছিল! জামাইবাবুকে পই পই করে বলেছি, আজে বাজে লোক

পাঠাবেন না। তা না যত ফুটপাতের লোক সব এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

সে আবার ছুটতে ছুটতে চলে গেল, হ্যাঙারের ডানদিকে। রাস্তাটা হ্যাঙারের ও-পাশে। এ-পাশে লম্বা হ্যাঙারের গভীর ছায়ায় দুজনের মত মনে হয়। কাছে যেতে বিধুভূষণের বুক কাঁপছিল। আর কাছে গেলেও ওরা একটা কথা বলল না। লম্বা মত একটা মেয়ে, ছোট্ট মত আর একটা মেয়ে। এ-সব জায়গায়, এমন অবস্থায় দুজন বালিকা। ওর বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। ঐ তো শিখা! শিখা কি চিনতে পারছে না? সে কাছে গিয়ে বলল, আমি বিধুভূষণ।

শিখা দেখল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

সে বলল, বিধুভূষণ এতটা চঞ্চল হওয়া ভাল না।

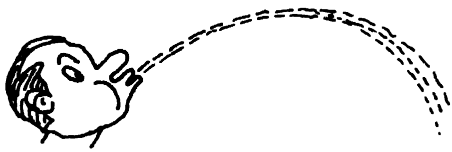
শিখা যেন চিনতে না পেরে পাশের বালিকাটিকে কাছে টেনে এনেছে। ভয় পাচ্ছে, এমন কিম্ভূতকিমাকার পোশাকের একটা ভূতের মত লোক এসে দাঁড়িয়েছে আবার না সেই গাধা দুটোর মত পা ছুঁড়ে দেয়। এবং এই যে বালিকাটির কাঁধে হাত রেখে শিখা দাঁড়িয়ে আছে, এত কাছে অথচ চিনতে পারছে না কেন? সে খুব জোর দিয়ে বলবে ভাবল, আমাকে তুমি চিনতে পারছ না? সত্যি আমি বিধুভূষণ। বিধুদা। কদমফুল পেড়ে দিয়েছিলাম।

শিখা অবাক হচ্ছে দেখে। মাথার কোন গণ্ডগোল হয়ে যায়নি তো। বিড় বিড় করে কথা বলছে কেন! ভয়ে ভয়ে সে ফ্রকের নিচ থেকে জুতোজোড়া বের করে বলল, বিধুদা, এ দুটো ফেলে এসেছিলে আমাদের রাস্তায়। দিয়ে গেলাম। যাক তবে চিনতে পেরেছে শিখা। বিধুভূষণের এটাই এখন সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

কাগজে মোড়া এমন দুর্লভ বস্তু দুটোর প্রতি ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সে দৌড়ে এসে আবেগে চিৎকার করে বলেই ফেলেছে চিনতে পেরেছে, চিনতে পেরেছে। তখন সামন্ত কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল, ইৎনা চিল্লাতা কিঁউ বিধুভূষণ?

বিধুভূষণ বুঝতে পারল বড় বেশি পুলক উথলে উঠেছিল ভেতরে। জিভ কামড়ে বলল, কসুর হো গিয়া ওস্তাদ।

এখন ঘণ্টা বাজছে। এক দুই তিন...তার প্রিয় আট নম্বর ঘণ্টা। বিধুভূষণের আর কিছুই খেয়াল নেই। যেখানে যা কিছু আছে সব ফেলে একমাত্র সম্বল থালা মগ সঙ্গে দৌড়ে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। এ-মুহূর্তে খাওয়া বাদে আর কিছু অস্তিত্ব আছে মানুষের জীবনে, বিধুভূষণ বিশ্বাস করতে পারে না। স্নায়ুতে কি যে উত্তেজনা। কতক্ষণে খাবে— এই ভেবে ভারি অধীর হয়ে পড়ছে সে।



বড়ি ও শ্বশুরমশাই

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

'এই শীতকাল, এমন মিঠে রোদ, একটু বড়িটড়ি ত দিতে পার।' ডাল দিয়ে ভাত চটকাতে চটকাতে অসীম ব্যাজার ব্যাজার মুখে কথা কটা স্ত্রীকে মিহি করে বলল। হুকুম-টুকুম নয়। একটা সামান্য অভিলাষ। এইটুকু বলে থেমে থাকলে ক্ষতি ছিল না। সে আর একটু এগিয়েই বিপদ ডেকে আনল। 'মাও গেছেন খাবার বারোটাও বেজে গেছে।'

মনোরমা মাথা নিচু করে সরষের তেল দিয়ে আলুভাতে মাখছিল। মুখ না তুলেই বলল, 'রাখো রাখো, মা যে তোমাকে রোজ পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খাওয়াতেন তা আমার দেখা আছে। মরা মানুষটাকে নিয়ে আর টানাটানি কোর না।'

'হ্যাঁ, মায়ের কথা বললেই ত তোমার গায়ে জ্বালা ধরবে। সেই লাস্ট নাইনটিন সেভেনটি সেভেনে একবার নারকোল, ছোলাটোলা দিয়ে মোচা হয়েছিল, সেভেনটি ফাইভে হয়েছিল থোড়। তারপর থেকে লাগাতার চলছে ভাত, ডাল, আলুভাতে, মাছের ঝাল; মাছের ঝাল, আলুভাতে, ভাত, ডাল। জীবনে ঘেন্না ধরে গেল।'

'আমারও।'

'হ্যাঁ আমার যা হবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমারও তাই হবে। শুধু হবে না, ডবল ডোজে হবে। বেশ কৌশল শিখেছ। তোমার ঘেন্না ধরার কারণটা কি?'

'কেঁচো খুঁড়তে যেয়ো না সাপ বেবোবে। খাচ্ছ খেয়ে যাও। মোচা, নারকোল, থোড় না নিয়ে এলে আমি কি জন্ম দেবো?' ধপাস করে আলুভাতের একটা টেনিস বল পাতে ফেলে দিয়ে মনোরমা উঠে গেল। রান্নাঘরে গনগনে উনুনে মাছ ভাজা হচ্ছে। সাঁড়াশি দিয়ে কড়াটা উনুন থেকে উপড়ে নিয়ে এল। গরম তেলে মাছ বিজবিজ করছে মনোরমার মেজাজের মত। একবার যদি সাঁড়াশির ঠোঁট আলগা হয়ে কড়া দুম করে মেঝেতে পড়ে মনোরমার ঠোঁট ফসকে বেরোনো বাক্যের চেয়েও অসীম আহত হবে। বড় ভয় পায় এই মুহূর্তকে। মনোরমা থালার সামনে উবু হয়ে বসে ভীত অসীমের পাতে একটি চারাপোনা ফেলে দিল। ন্যাজের দিকটা নুনের ওপর গিয়ে পড়ল। ভয় কেটে গেছে। এতক্ষণ আগের কথার যে উত্তরটা মনে মনে মকশ করছিল তা বলা যেতে পারে।

'গর্ভে মোচা ধারণ করতে গেলে কলা গাছের বীজ চাই, সে কথা আমি জানি; কিন্তু ওই তিন বস্তু বাজারের ঝোলা থেকে বেরোলে তোমার মুখ ত তোলো হাঁড়ির মত হবে। এ ত আর তোমার ড্রেসিং নয়। ঘাড়ে পাউডার, ভুরুতে পেন্‌সিল, কপালে কুমকুম। মোচা ড্রেস করার একটা আলাদা আর্ট আছে। সে আমার মা জানতেন।'

কড়াটা মাটিতে নামিয়ে রেখে মনোরমা বললে, 'হ্যাঁ তোমার মা সব জানতেন। কবিরাজের মেয়ে ছিলেন ত। শেকড়-বাকড়, পাতা-মাতা, কচু-ঘেঁচু।'

'আর তুমি হলে অ্যালোপ্যাথের মেয়ে মাছ, মাংস, লিভার পিলে।'

'আমি কার মেয়ে সে ত ভালো করেই জানো। অত ঠেস দিয়ে কথা বলার কি আছে? ডাক্তারের মেয়ে হলে তোমার মত মোচা-খেকোর গলায় কি আর মালা দিতুম। টাকার জোরে ব্যারিস্টার জুটত।'

অসীম হেসে ফেলল। দুজনের ঝগড়া এই ভাবেই শুরু হয়ে হাসিতে শেষ হয়। মনোরমা বড় ভাল মেয়ে। একা সংসারটাকে মাথায় করে রেখেছে। সহজ সরল মেয়ে। বেশি খাটাতে চায় না বলে অসীম সাবেক কালের খাবার ফ্যাচাং বাড়িতে ঢোকাতে চায় না আবার সুযোগ পেলে বলতেও ছাড়ে না।

অসীম অফিস চলে গেল। মনোরমা কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে ঠিক করে ফেলল, যা থাকে বরাতে, আজ সে সারা দুপুরে বসে বসে বড়ি দেবে। কি এমন হাতি-ঘোড়া ব্যাপার! ডাল বেটে, নুন দিয়ে ফেঁটিয়ে একটা সাদা কাপড়ের ওপর টুকুস টুকুস করে পেড়ে যাওয়া। সমস্যা নাক নিয়ে। নাক উঁচু উঁচু না হলে বড়ি দেখে নাক-উঁচু মানুষের মন ভরে না। থ্যাবড়া-নাকী মেয়ে যেমন বিয়ের বাজারে অচল, চ্যাপ্টা নাক বড়িও তেমনি সমঝদারের সমালোচনার বস্তু।

শঙ্করীর মা বাড়িতে কাজ করে। সেই হল মনোরমার উপদেষ্টা। উপদেষ্টা বললে, ‘আজ ত হবে না মা। ও রাতের বেলা ডাল ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকালে বাটতে হবে। তুমি আজ ভিজিয়ে রেখ, কাল সকালে আমি বেটে দোব।’ কাল মানে রবিবার। সেই ভাল। রবিবার ছুটির দিন। অসীমের সাহায্যও পাওয়া যাবে।

রবিবার বেলা একটা নাগাদ ডালবাটা রেডি হয়ে গেল। কালো জিরে ভাজছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ। এইবার শীতের রোদে পিঠ দিয়ে ডুরে শাড়ি পরে মনোরমা ছাদে বসে বড়ি দেবে।

‘তোমার এই ধুতিটা নিচ্ছি।’

অসীম লাফিয়ে উঠল, ‘কেন? আমার ওই সাধের নতুন ধুতিটা তোমার কোন্ কম্মে লাগবে?’

‘বড়ি দোব।’

‘বড়ি দেবে আমার ধুতিতে? মামার বাড়ি! নিজের শাড়িতে দাও।’

‘আটপৌরে নতুন শাড়ি নেই। তোলা শাড়ি একটা দেড়শো-দুটো টাকা দাম। সোনার বড়ি হলে দেওয়া যেত। ডালের বড়ি কি ফুল ভয়েলে দেওয়া যায়?’

‘তাহলে বিছানার চাদরে!’

‘চাদরে? অপবিত্র জিনিস। তোমার কোনও ভয় নেই। বড়ি খুলে নিয়ে কেচে দোব, ইস্তিরি করে নিলেই যেমন নতুন তেমনি নতুন। ধুতিটা ত পড়েই থাকে। তুমি ত প্যান্ট আর পাজামা পরেই সারা জীবন কাটালে।’

রাজি না হয়ে উপায় কি! বড়ির হুজুক সেই তুলেছিল।

বেলা তিনটে নাগাদ সার সার বড়ি অসীমের কাঁচি ধুতির ওপর থেবড়ে থেবড়ে বসে গেল। তেমন টিকোলো নাক সবকটার হল না। শঙ্করীর মা জ্ঞান দিলে, ‘ভগবানের সৃষ্টিতেই মা কত খুঁত। মানুষের হাতে সব কি সমান হয়। পাড়া বড়ির নাক ধরে আর টানাটানি করুনি; জন্মের পর মানুষেরই আর কিছু করা যায় না, এ তো ডালের বড়ি।’

বড়ির পুংলিঙ্গ বড়া। কিছু বড়া হল, কিছু বড়ি। যা হয়েছে বেশ হয়েছে। মনোরমা এসে অসীমকে বললে, ‘এই যে মশাই। তোমার কাগজপত্র নিয়ে ছাতে উঠে যাও। ইজিচেয়ার পেতে বসে বসে পড় আর বড়ি পাহারা দাও।’

‘যথা আজ্ঞা।’ ইজিচেয়ারে শরীর ছড়িয়ে অসীম কাগজ পড়ছে। কিছু দূরেই কাপড়ে সত্যাগ্রহীর মত বসে আছে সার সার বড়ি। মিঠে রোদ, মিষ্টি হাওয়া, পাখির ডাক। কেমন

যেন ঘুম এসে যাচ্ছে। চোখ জুড়ে আসছে। দু'একটা কাক মাঝে মাঝে পাশে হেঁটে হেঁটে খড়খড় করে বড়ি ঠোকরাতে আসছে।

অসীম হুস করলেই উড়ে পালাচ্ছে। এ এক ভাল জ্বালা যা হোক। একেই কি বলে, যমে মানুষে টানাটানি। কতক্ষণ আর জেগে থাকা যায়। অসীমের চোখ বুজতে বুজতে বুজেই গেল।

মনোরমার চিৎকারে অসীমের ঘুম ভেঙে গেল। 'এ কি? আমার বড়ি কোথায়?' মনোরমার হাতে বিকেলের চা। অসীম চোখ মেলে দেখলে, ফাঁকা ছাদ। কোথাও বড়ির নামগন্ধ নেই।

'তুমি তুলে নিয়ে গেছ।'

'তুলে নিয়ে যাব কি! ভাল করে শুকনোই হল না।'

'ভৌতিক ব্যাপার ত? আচ্ছা রসিকতা! আর কেউ এসেছিল?'

'কে আবার আসবে? তোমাকে পাহারায় রেখে গেলুম তাহলে কি জন্যে?'

'কাকের ত এত ক্ষমতা হবে না? দশহাতি ধুতি ঠোঁটে করে নিয়ে পালাবে!'

'পারে, ওরা সব পারে। একসঙ্গে একশো কাক ঠোঁটে করে নিয়ে উড়তে...।' মনোরমার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

'ওই দেখ, আমগাছের ডালে ওটা কি ঝুলছে?'

অসীম আমগাছের মগডালের দিকে তাকাল, সাদা একটা কাপড় ঝুলছে।

'হ্যাঁ, ওই ত তোমার সেই বড়ি। ওই ত আমার সেই নতুন কাপড়। ওখানে গেল কি করে?' হঠাৎ রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। পাতার আড়ালে তিনি বসেছিলেন ন্যাজ ঝুলিয়ে। কাপড়-সমেত এ ডাল থেকে ও ডালে লাফ মারলেন, হুপ করে।

'আরে এ ত সেই বীর হনুমানটা।'

'আমার কাপড়! সর্বনাশ হয়ে গেল মনোরমা। টেনে টেনে ফর্দাফাঁই করে দিলে।'

'আমার বড়ি? আমার এতক্ষণের পরিশ্রম। মুখপোড়া হনুমানে খেয়ে নিলে! কার জন্যে বড়ি দিলুম আর কার ভোগে গেল!'

'একছড়া কলা আনো, কলা। কাপড়টা অন্তত উদ্ধার করি।'

'কলা কোথায় পাব?'

'তাহলে?' তাহলে, দুজনে ছাদে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সাধ্যসাধনা করলে। 'হে বাবা রামের বাহন! হে পবনসুত! হে বাবা গান্ধীজীর চেলা! হে ভগবান হনুমান!' হনুমানের কোনও সুমতি দেখা গেল না। অসীম রেগে বলল, 'ঠিক আমার শ্বশুরমশাইয়ের মত একগুঁয়ে।'

'অ্যাঁ, কি বললে?'

'তখন তোমাকে কি বলেছিলুম? কাপড়ে দিয়ো না। কাপড়ে দিয়ো না। শুনলে?'

'কে বড়ি বড়ি করে লাফিয়েছিল?'

'ওই যে আমার শ্বশুরমশাই কাঁচি ধুতি পড়ে খাচ্ছেন।'

আবার ভীষণ ঝটাপটি হয়ে গেল দুজনে। আর সেই ছেঁড়া ছেঁড়া ধুতিটা আমগাছের ডালে ঝুলে রইল একটা সিজন ধর্মঠাকুরের নিশান হয়ে।

গরুর গল্প

তারাপদ রায়

দীনদয়ালবাবুর মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে তিনি মানুষ নন গরু। নানা ব্যাপারে ঠকে অনেকে নিজেকেই গরু ভাবে, কেউ কেউ অতিবুদ্ধিমান অন্যদের গরু ভাবে, কিন্তু দীনদয়ালবাবুর ব্যাপারটা এত সামান্য বা সাধারণ নয়। যদিও তাঁর লেজ নেই, তিনি দুধ দিতে পারেন না বা মাঠে হালচাষ করতে পারেন না, দীনদয়ালবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস গরু হিসাবে তাঁর এই সব অযোগ্যতার জন্যে সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর জনক-জননী দায়ী এবং আসলে তিনি দেহে-প্রাণে সর্বান্তঃকরণে সম্পূর্ণই গরু।

প্রথম প্রথম সবাই যখন একটু-একটু বুঝতে পারল যে দীনদয়ালবাবু নিজেকে গরু ভাবছেন, কেউ ব্যাপারটাকে তত গুরুত্ব দেয়নি। দীনদয়ালবাবু কাউকে বিরক্ত করতেন না, বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকতেন, অফিসেও যেতেন। কেউ তাকে ঘাঁটাতো না, তিনিও কাউকে ঘাঁটাতেন না। অফিস কাছারিতে এরকম লোক অনেক যায়, সবাই তাদের মেনে নেয়। কেউ নিজেকে সিরাজদৌল্লা ভাবে, বার্নার্ড শ ভাবে। এক বড়বাবু ছিলেন, তিনি নিজেকে রানী ভিক্টোরিয়া ভাবতেন। শাসনকর্ত্রীর যোগ্য রাশভারীয়ানা এবং রমণীসুলভ ব্রীড়ার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। আরেক আবগারির দারোগা নিজেকে ধরে নিয়েছিলেন হাওড়া ব্রিজ, কোনও অসুবিধা ছিল না। সব সময়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে লম্বা হয়ে হাঁটতেন, হাওড়া ব্রিজের মত টানটান, দু-দিকে দুটো হাত সমবাহু ত্রিভুজের মত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি প্রসারিত। তবে কোনওদিন বেশি পান-টান করলে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যেত রাত্রির দিকে, তখন গাড়িঘোড়া, লোকজনের চাপে হাওড়া ব্রিজের খুব কষ্ট হত।

সে যা হোক, দীনদয়ালবাবুকে নিয়ে বিশেষ কোনও অসুবিধা ছিল না। তাঁকে দেখলে অচেনা লোকের বুঝবার ক্ষমতা ছিল না যে তিনি একটি আস্ত গরু। কিন্তু ক্রমশ নতুন উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। একদিন অফিসের করিডোরে যেতে যেতে হঠাৎ তারস্বরে হাম্বা-হাম্বা করে চিৎকার করে উঠলেন। বড়সাহেবের খাস আর্দালি উমানাথ, তাদের বংশে সকলের হার্টের অসুখ, সে টুলে বসে ঝিমোচ্ছিল, হঠাৎ ঘুমের মধ্যে অফিসের বারান্দায় গরুর ডাক শুনে ঘেমেটেমে শেষ হয় আর কি! অফিসের লোকেরা এই-ই চায়—অফিস ছুটি হয়ে গেল। একদল লোক উমানাথকে স্ট্রেচারে চড়িয়ে অ্যাম্বুলেন্স করে হার্টের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল, বাকিরা জোরজবরদস্তি করে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দীনদয়ালবাবুকে নিয়ে গেল মাথার ডাক্তারের কাছে।

মাথার ডাক্তার হালদার সাহেব অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। বহুদিনের অভিজ্ঞতা তাঁর। অনেক রকম মাথার অসুখ তিনি দেখেছেন। অনেক বাঙালী-অবাঙালী স্ত্রী-পুরুষ, সাহেব-চিনেসাহেব-ছিনেসাহেব অনেকের চিকিৎসা তিনি করেছেন। কলকাতা শহরে তিনিই একমাত্র মানসিক চিকিৎসক যাঁকে একুশবার পাগলে কামড়িয়েছে। শতকরা দশজন পাগল চিকিৎসার শেষ পর্যায়ে একবার ডাক্তারকে কামড়াতে যায় এবং কামড়াতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে যায়। তাই পাগলের ডাক্তারদের প্রতিষ্ঠা নির্ধারিত হয় কতবার পাগলে কামড়িয়েছে তাই দিয়ে। বলাই বাহুল্য. আমাদের এই হালদার সাহেব এ বিষয়ে এখন

পর্যন্ত সর্বোচ্চ স্থানে আছেন। হালদার সাহেব আগে চিকিৎসা করতেন সামান্য একটা কড়াই-ধরা সাঁড়াশি দিয়ে। অবশ্য হালদার সাহেব বলতেন, ঐ সাঁড়াশিটা ভিয়েনা থেকে আনানো, তিনশো তিরিশ পাউন্ড দাম; কেউ তা বিশ্বাস করত না। সবাই বলত কালীঘাট বাজার থেকে কেনা। দাম দেড় বড় জোর দু-টাকা। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, সাঁড়াশির দামের সঙ্গে হালদার সাহেবের যোগ্যতার কোন সম্পর্ক নেই।

আজকাল হালদাব ডাক্তার একটু আধুনিক হয়েছেন। প্রায় ষাট টাকা খরচ করতে হয়েছে তাঁকে এই জন্যে। একটা তক্তাপোশ, একটা তোষক, একটা বালিশ, সাদা চাদর এবং পঁচিশ শক্তির একটা নীল বাল্‌ব। সেই তক্তাপোশের উপরে দীনদয়ালবাবুকে সবাই মিলে জোর করে শুইয়ে দিল। এতক্ষণ দীনদয়ালবাবু ধস্তাধস্তি করে কাবু হয়ে পড়েছিলেন, শুইয়ে দেওয়ামাত্র একবার নিস্তেজ কণ্ঠে ক্ষীণ 'হাম্বা-হাম্বা' করে নেতিয়ে পড়লেন।

রোগীর অবস্থা দেখে হালদার সাহেব সাহসী বোধ করলেন, তিনি সঙ্গীদের কাছ থেকে যতটুকু জানা সম্ভব জেনে নিয়ে সবাইকে বললেন, 'আপনারা এবার বাইরে যান, আমি দেখছি কি হয়েছে।'

সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি নীল বাল্‌বটি জ্বালিয়ে দিলেন, তারপর রোগীর দিকে এগোলেন। রোগী তখনও দুর্বল অবস্থায় চোখ বুজে পড়ে রয়েছে। হালদার সাহেব রোগীর মাথার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম?'

দীনদয়ালবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'হাম্বা-হাম্বা'।

ডাক্তার সাহেবের এরকম অনেক অভ্যাস আছে, তিনি অদমিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ঠিকানা?'

দীনদয়ালবাবু আবার হাম্বা-হাম্বা করলেন।

যেন খুব খুশি হয়েছেন এই রকম ভাব দেখিয়ে হালদার ডাক্তার বললেন, 'ও বুঝেছি, বুঝেছি; আপনি কোন্ অফিসে আছেন?'

দীনদয়ালবাবুর কণ্ঠে আরেকবার হাম্বা-হাম্বা ধ্বনিত হল।

এইবার ডাক্তারসাহেব কায়দা পালটালেন। তিনি বললেন, 'ও, বুঝতে পেরেছি আপনি গরু।'

প্রশ্নটা শুনে দীনদয়ালবাবু স্থির দৃষ্টিতে এক মিনিট নীল আলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর স্পষ্ট মানুষের ভাষায় বললেন, 'আজ্ঞে'। আবার এক মিনিট নীল আলোর দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন এবং এবার বললেন, 'হাম্বা-হাম্বা'।

হালদার সাহেব বুঝলেন ওষুধে কাজ হয়েছে এবং উৎফুল্ল হয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যে গরু এটা কবে থেকে বুঝতে পারলেন?'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে দু-বার হাম্বা-হাম্বার পর দীনদয়ালবাবু নির্বিকারভাবে বললেন, 'সেই ছোট বয়সে যখন বাছুর ছিলাম তখন থেকে।'

অভিজ্ঞ ডাক্তার বুঝতে পারলেন ব্যাধি কঠিন এবং অনেক গভীরে। সেদিনের মত বত্রিশ টাকা ফি নিয়ে তিনি দীনদয়ালবাবুকে সামনের সপ্তাহে আবার নিয়ে আসতে বলে সহকর্মীদের হাতে তুলে দিলেন। সহকর্মীরা আবার হৈ হৈ করে ট্যাকসি ডেকে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন।

দীনদয়ালবাবু কিন্তু আর ডাক্তারের কাছে গেলেন না, কাশীতে চলে গেলেন।

গরু বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের জন্য দীনদয়ালবাবু প্রায় তিন মাস কাশীতে রইলেন।

কাশীর যেখানে যত গলি-কানাগলি আছে, পাড়া-বেপাড়ায়, ঘাটে-মন্দিরে ঘুরে ঘুরে তিনি গরুদের আচার-আচবণ লক্ষ্য করতে লাগলেন। যত দেখেন ততই অবাক হয়ে যান এবং নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন।

কাশী যাওয়ার ফলে অবশ্য দীনদয়ালবাবুর একটা বড় উপকার হল, তিনি হাম্বা-হাম্বা করা একেবারেই প্রায় ছেড়ে দিলেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন, অধিকাংশ গরুই এবং বিশেষ করে ষাঁড়েরা প্রায় কখনোই ডাকে না। ডাকার ব্যাপারটা মোটামুটি বাছুর এবং বাছুর-জননীদের একচেটিয়া। দীনদয়ালবাবু ভালই জানেন, তিনি বাছুর বা বাছুরজননী নন, সুতরাং ডাকাডাকি ছেড়ে দিলেন। এখন শুধু কখনও কালেভদ্রে মনে খুব স্ফূর্তির ভাব এলে নাকটা যথাসাধ্য উলটিয়ে একটু হুঁ-হুঁ করেন।

এ ব্যাপারটা বিশেষ কিছু দোষের নয় এবং আশেপাশের লোকের এতে আপত্তির কোনও কারণ থাকা উচিত নয়। সুতরাং দীনদয়ালবাবু ভালো হয়ে গেছেন।

এর অবশ্য অন্য একটা কারণও ছিল। কাশীতে গরুদের সঙ্গে দিনের পর দিন মেলামেশা করে তিনি বুঝতে পেরেছেন শারীরিকভাবে তাঁর পক্ষে গরু হওয়া অসম্ভব। একদিন খড় চিবিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, গলা দিয়ে ঢুকবার আগে জিভ ছড়ে রক্ত বেরিয়ে গেল। আরেকদিন জামাকাপড় ছেড়ে ফেলে চার পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের ওখানে ঘুরে বেড়ালেন, কাশীর লোক এরকম জিনিস অনেক দেখেছে। তারা বিশেষ তাকিয়েও দেখল না। কিন্তু দীনদয়ালবাবুর হাঁটুতে, কোমরে তারপর তিনদিন প্রচণ্ড ব্যথা। নানাভাবে ঠেকে তিনি বুঝতে পারলেন এ জন্মে দৈহিক অর্থে গরুত্বপ্রাপ্তির ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হবে না।

তাই দীনদয়ালবাবু কাশী থেকে ফিরে এসে মনেপ্রাণে গরু হওয়ার সাধনা করতে লাগলেন। আত্মীয়বন্ধুরা কোনও প্রকাশ্য বিকার না দেখে ধরে নিল তিনি ভালো হয়ে গেছেন।

অবশ্য প্রকাশ্য বিকার একেবারে রইল না তা মোটেই নয়। কাশীতীর্থের ভুবনবিখ্যাত গরুদের সঙ্গে তিন মাস থেকে তিনি চমৎকার গুঁতোনো শিখে এসেছেন। বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছে এক চাঁদকপালে মারকুটে ষাড়ের কাছেই তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা নিচু করে আচমকা তীব্র বেগে হাঁটুর নিচে গুঁতো দিয়ে প্রতিপক্ষকে ফেলে দেয়া তিনি চমৎকার আয়ত্ত করে এসেছেন। প্রতিদিন গভীর রাতে মন্দিরচত্বরে শিং ওঠেনি এমন বাছুরদের সঙ্গে নিয়মিত গুঁতোগুঁতি অভ্যাস করেছেন তিনি।

কলকাতায় ফিরে দীনদয়ালবাবুর প্রধান অসুবিধা হল এই গুঁতোগুঁতির অভ্যাসটা রফা করা নিয়ে। মাঝেমধ্যেই কপালের যে দুটো জায়গায় শিং থাকার কথা সে দুটো জায়গা সুর্‌সুর্‌ করে ওঠে। অবশেষে অফিস থেকে ফেরার পথে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি গড়ের মাঠে যেতে লাগলেন বাছুরদের সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করবার জন্যে। গড়ের মাঠে গরু ভেড়া চরাতে নিয়ে আসে অনেক লোক কিন্তু তার মধ্যে বাছুরের সংখ্যা অত্যন্ত কম। একেকদিন এমন হয় একটা বাছুরের খোঁজে তিনমাইল চারমাইল হাঁটতে হয় দীনদয়ালবাবুকে।

সেদিন হঠাৎ ভাগ্য ভালো, রেডরোডের পাশেই একদঙ্গল বাছুরের দেখা পেয়ে গেলেন তিনি। প্রাণের আনন্দে সেই বাছুরের ভিড়ে নেমে পড়লেন।

হালদার ডাক্তার গাড়ি করে ময়দান দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখেন ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা

এক ভদ্রলোক বাছুরদের সঙ্গে প্রচণ্ডরকম মেলামেশা করছেন। মানসিক ডাক্তার তিনি, খুব কৌতূহল হল, তাছাড়া লোকটাকে কেমন চেনাচেনা মনে হচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে দেখেন তারই পুরনো রোগী। ডাক্তারসাহেব একটু এগিয়ে মাঠের দিকে যেতেই দীনদয়ালবাবু তাঁকে চিনতে পেরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। ডাক্তারসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে কি করছেন?' দীনদয়ালবাবু নিজের কপালে একটু হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'দেখছেন না শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকেছি।' উত্তর শুনে আশ্বস্ত হলেন হালদার ডাক্তার, রোগলক্ষণ এখনও একই আছে, অনেকের সময়ের সঙ্গে অসুখ বদলিয়ে যায়। তাঁর এক রোগী আগে নিজেকে আরশোলা ভাবতেন এখন জেটপ্লেন হয়েছেন। রোগীর অবস্থা দেখে খুশি হয়ে, 'আসবেন একদিন' বলে হালদার ডাক্তার চলে গেলেন।

গরু-হওয়া নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কারণ নেই দীনদয়ালবাবুর, সেটাই তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু শিগগিরই ডাক্তারের কাছে যেতে হল তাঁকে অন্য কারণে। পূর্ণ গরু হওয়ার পর থেকে তাঁর মনে ভীষণ গণ্ডারের ভয় ঢুকেছে, হঠাৎ কখন তেড়ে এসে আক্রমণ করে, সব সময় শঙ্কিত থাকেন। একটা সমাধান অবশ্য তিনি পেয়ে গেছেন, গণ্ডারের উপস্থিতি অনুমান করলেই পা দুটো মেজেতে দ্রুততালে ঠোকেন, জঙ্গলের গরুরা নাকি গণ্ডারের সামনে ঐরকম করে আর গণ্ডারেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু রাতেই খুব সমস্যা, উনি ঘুমিয়ে পড়লেই খাটের নিচে দলে দলে গণ্ডার ঢুকে যায়, তাদের সমবেত চিৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়, তখন অবশ্য আবার দ্রুত পা ঠোকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পালায়।

ডাক্তার হালদার সব শুনে বললেন, 'পা ঠুকলে গণ্ডার পালিয়ে যায়, একথা আপনাকে কে বলল?'

একবার সশব্দে পা ঠুকে দীনদয়ালবাবু বললেন, 'দেখছেন না এক চিড়িয়াখানার খাঁচার গণ্ডার কটা পালাতে পারছে না আর বাকিগুলো কোথায় চলে গেছে, কলকাতায় দুশো মাইলের মধ্যে এখন কোনো গণ্ডার নেই।'

ডাক্তারসাহেব বললেন, 'তাহলে রাতে কি করে আসে?'

'রাতে কি করে আসে, কে জানে?'

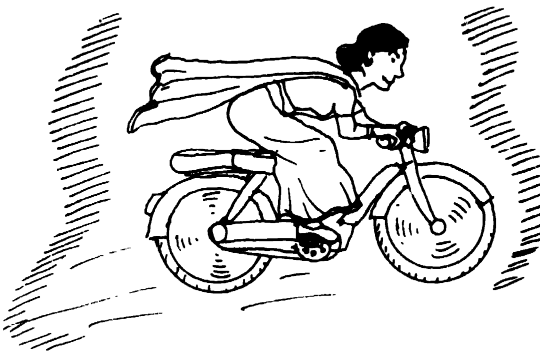
দীনদয়ালবাবু বলেন, 'আমি ঘুমোলেই সাহস পেয়ে যায়, খাটের নীচে পালে পালে ঢুকে পড়ে।' ডাক্তার হালদার ব্যর্থ হলেন, খাটের নিচ থেকে গণ্ডার তাড়ানোর যোগ্যতা তাঁর নেই।

কয়েকদিন পরে গড়ের মাঠের সেই জায়গায় আবার দীনদয়ালবাবুকে দেখতে পেলেন ডাক্তার সাহেব। কেমন যেন খুশিখুশি ভাব, বাছুরদের সঙ্গে আহ্লাদে ছুটোছুটি করছেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার দীনদয়ালবাবু?'

দীনদয়ালবাবু হেসে বললেন, 'আর ব্যাপার, সব গণ্ডারদের জব্দ করেছি। তারা আর খাটের তলায় ঢুকতে পারে না।'

ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন 'কি করে?'

দীনদয়ালবাবু বললেন, 'ছুতোর ডেকে খাটের পায়া সম্পূর্ণ ছেঁটে দিয়েছি, এখন ব্যাটারা জব্দ, আর নিচে ঢুকতে পারে না।'



মা বললেন, "খুকু, এ জিনিস চলতে পারে না। তুমি কিনা তোমার মেয়েকে খুন করবার সব ব্যবস্থা করে দিলে! কেন, চার চাকা চালালে কী দোষ ছিল?"

মেয়েকে তো লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছি সেই কবেই। সে কিছুতেই চারচাকা ছোঁবে না, তো আমি কী করতে পারি? আর মোপেড কি তাকে আমি কিনে দিয়েছি? একুশ হয়েছে, অ্যাকাউন্ট থেকে নিজেই টাকাটা তুলে কিনে ফেলেছে, বলেছে চাকরি করে শোধ করে দেবে, একদিন না একদিন। আরে, আমারই কি ইচ্ছে মেয়ে খুন করি? মার ধারণা আমি যেমন মার সব কথা শুনে চলি, আমার মেয়েও বুঝি তার মায়ের কথায় তেমনি ওঠে বসে। আরে জমানা বদল গয়া— এখন আমিই যে দুজনের কথাতেই উঠি বসি, একবার আমার মায়ের কথায়, আরেকবার আমার মেয়ের কথায়, তা মা বুঝেও বুঝতে চান না। আসলে আমার বড় মেয়েটি প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী। তাকে বকুনি দিতে আমার প্রবলা গর্ভধরিণীও সাহস পান না, তাই ঝিকে বকে নাতনিকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা। ওদিকে ব্যক্তিত্ব ব্যাপারটিতে আমার বেশ কিছুটা ঘাটতি আছে। কাক-চিলেও ঠুকরে যায় সুযোগ পেলে, মা জননী, কন্যাকুমারী এদের তো কথাই নেই।

"কী বলে এই ডেঞ্জারাস রিস্ক তুমি নিলে? রাস্তাঘাটে গাড়ির ছড়াছড়ি। লাইসেন্স সব নামেমাত্র, ঘুষ খাইয়ে বের করা। কেউই আর জানে না গাড়ি চালানোর প্রকৃত আইনকানুন। যার যেমন খুশি চালাচ্ছে—তারই মধ্যে এই কচি মেয়েটাকে তুমি একা ছেড়ে দিলে—গাড়িঘোড়ার এই অরণ্যের মধ্যে! অরণ্যেও তবু আইনকানুন আছে, বন্যপশুও কিছু কিছু নিয়ম মানে—কলকাতার গাড়িঘোড়া কোনও নিয়মই মানে না— সাইকেল যে কিছুতেই কিনে দিইনি তোমাকে ছেলেবেলায়, সে শুধু এইজন্যে আর তুমিই কি না আমার অমতে—" মার বকুনি চলতেই থাকে। আমি রীতিমতো গাঢ় অভিমান বোধ করি। এ কী অন্যায় বলো দিকি, আমি যা করিনি, যে ঘটনার দায় কোনমতেই আমার

নয়—তার জন্যেও আমাকেই মা বকবেন! উল্টো দিকে মন ধাইতে শুরু। অতএব :

"এমন কি আর ডেঞ্জারাস, মা? কত ছেলেমেয়েই তো মোপেড চালাচ্ছে। স্কুটার, সাইকেল, মোপেড এসব কি লোকে চালাচ্ছে না? আমি তো ভাবছি, পেট্রলের যা দাম বাড়ছে দিনকে দিন, এবার থেকে ওর মোপেডটা করেই কলেজে যাব। মাত্র একজন লোকের জন্যে গাড়িটা চালানো বেশি বেশি এক্সপেনসিভ হয়ে যাচ্ছে।"

মার মুখে অভাবনীয় এক স্বর্গীয় আহ্লাদের বিচ্ছুরণ ঘটে—"তুমি? তুমি চালাবে মোপেড? নাঃ, তুমি চালালে ভালোই চালাবে—রাস্তাঘাটে গাড়ি চালানো তোমার অভ্যেস আছে—সেই ভালো। মেয়েকে বরং গাড়িটা দাও, তুমিই মোপেড নাও। মেয়েটা ছেলেমানুষ, গাড়ি বড়সড় জিনিস, চার দেয়ালে ঘেরা থাকবে, সাবধান থাকবে। মোপেড বড্ডই খোলামেলা, কোনও আগল-বাঁধন নেই, ধাক্কা একবার লাগল তো গেল!"

অর্থাৎ আমি গেলে মার আপত্তি নেই তত, নাতনি না গেলেই হল। গাড়ি বেশ বন্ধ দুর্গের মতো, আর মোপেড যেন অশ্বারোহী। অরক্ষিত।

"মা? মা চালাবেন মোপেড?"

"হ্যাঁ। আর তুমি চালাবে মা'র গাড়িটা।" দিম্মার সান্ত্বনা মোটেই পছন্দ হল না মেয়ের।

"না, আমার গাড়ি চালাতে ভালো লাগে না দিম্মা। গাড়ি আমার চাই না। তবে মা যদি চান মাঝে মাঝে আমার মোপেডটা ওঁকে ধার দিতে আমার আপত্তি নেই, প্রোভাইডেড উনি ওটা নিয়ে কলেজে না যান।"

"কেন? কলেজে যাবে না কেন? কলেজেই তো যাবে। পেট্রল খরচা কমানোর জন্যে।"

"আচ্ছা দিম্মা—কী যে বলো না তুমি?" নাতনি হেসেই আকুল। "এখান থেকে যাদবপুর কতটা পেট্রল লাগে? আর এখান থেকে সেই সেন্ট্রাল এভিনিউ কতটা? আমাকে যে গাড়ি নিতে বলছিলে, তার পেট্রল খরচটা কি ভেবেছিলে?"

দিম্মা তাতেও অপ্রতিহত। "তুমি তাহলে মিনিবাসে যাবে। আর মা মোপেডে। আর যখন সবাই মিলে বেরুবে, তখন গাড়িও বেরুবে।"

"বারে বাঃ! আমি বলে এত কষ্ট করে মোপেড কিনলুম, হেলমেট কিনলুম, শাড়ি-গার্ড লাগালুম, সব মিনিবাসে করে যাব বলে! না, মোটেই না!" এবার আমাকে প্রবেশ করতেই হয়।

"আরে বাবা, আমি আগে চালাতে শিখি! আমি তো মোপেড কখনও চড়িইনি, চালানো দূরের কথা। চালাতে যদি পারি তবে তো নিয়ে বেরুব! কিন্তু কলেজে কেন যাওয়া বারণ সেটা শুনি?"

"কেন না আমার বন্ধুরা হাসবে।"

"হাসুক গে তোমার বন্ধুরা. লোকে অমন কত হাসে! কোনও ভাল কাজই করা যায় না লোকে কী বলবে ভাবলে। মোপেড যদি চালাতে পারি, তবে সর্বত্র যাব কিন্তু।"

"পারবে না কেন? না পারার কী আছে? খুব সোজা। অতি সহজ। গাড়ি চালানোর মতন নয়। অত রকম হাতেপায়ে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম একসঙ্গে কসরত করতে হয় না সারাক্ষণ, নাচ শেখার মতন। স্টার্টিংটাই কায়দা লাগে কেবল, একবার স্টার্ট করলে, চলতেই থাকে। প্যাডলও করতে হয় না। সাইকেলের চেয়েও সোজা। তুমি একবার দেখে নিলেই শিখে যাবে, মা। কিন্তু শিখে ফেলেই আমার গাড়িটা মোনোপলাইজ কোর না বাপু।

মাঝে মাঝে চড়তে চেয়ে নিও।"

এই চেয়ে নেবার ব্যাপারটা আমার মনের মতো হল না। কিন্তু আমি বললুম শুধু, "আগে তো শিখি।"

"চলো না, শিখবে? এখনই শিখিয়ে দিচ্ছি।" মেয়ে উদার সুরে আহ্বান জানায়। কিন্তু আমি কোথায় একপায়ে রাজি থাকব তা নয়, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "না, না। এখন থাক। এখন নয়। এখন ভর দুপুরবেলা, চাদ্দিকে লোকজন। সবাই দেখবে। রাত্তিরবেলা রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকবে, তখন সেফ্‌টিও বেশি। তখন শিখব। লোকে দেখলে কী ভাববে!"

"এই না বলছিলে, লোকের কথা ভাবলে জীবনে কোনও বড় কাজই করা যায় না?"

"এটা তো তেমন কিছু বড় কাজ নয়, তুচ্ছ কাজ, এর জন্য লোকের কথা ফেস্ করাটা নট ওয়ার্থ ইট। রাত্তিরে হবে এখন।"

হায়! রাত্তিব তো হবেই। কখনও বা কখনও। হলও। মা বললেন—"খুকু, এই তো দিব্যি রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে। যা এইবেলা মেয়ের কাছে চট্ করে মোপেড চালানোটা শিখে নে বরং।" আমারও পছন্দ হল কথাটা। বয়েস হয়ে, মা দিনে ঘুমোন, রাতে জাগেন। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অনেক রাত্তির অবধি জেগে জেগে গুলতানি করি। রাত তখন সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। পথঘাট সত্যি ফাঁকা। বাড়িবাড়ি আলোও নিবে গেছে। প্রতিবেশীরা নিশ্চিন্ত নিদ্রায়। কারুকে বিব্রত করার ভয় নেই। নিচে নামলুম। সঙ্গে দুই কন্যা ও কানাই। ঝকঝকে কালো ঘোড়ার মতো নতুন তেজী মোপেড দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটো মেয়ে সাইকেল দিব্যি চালায়, কিন্তু মোপেডে নিরুৎসাহ। ("ওরে ব্বাবা ও আমি পারব না!") বড় মেয়ে বলল—"এই দ্যাখো হ্যানডেল। এই হচ্ছে অ্যাকসেলারেটর, এই ব্রেক। দুটোই হাতে, পায়ের কিছুই নেই এতে। শুধু স্টার্টা পায়ে করে। ওদিকে ঘোরালে অ্যাকসেলারেট করবে, এদিকে ঘোরালেই বন্ধ। এটা হচ্ছে ব্রেক। দেখে নাও আর এই পায়ের কাছে এইভাবে এটাতে ঝাঁকি মেরে আর হাতে এইটে টিপে এই যে দেখে নাও, স্টার্ট করতে হবে। এটা কিন্তু শক্ত। ভালো করে দেখেছ?"

"গীয়ার টিয়ার? কোন্‌দিকে?"

"নেই। এটা গাড়ি নয়। এটা আসলে সাইকেলই। কেবল মোটরে চলে। প্যাড্‌লও আছে, তেল ফুরোলে প্যাড্‌ল করে চলে। তবে একটু ভারী লাগে, এই যা। নাও এদিকে দ্যাখো—কী দেখছ অন্যমনস্ক হয়ে? এদিকে তাকাও!"

"ওদের বাড়িতে একটা আলো জ্বলছে।"

"জ্বলুক, ওটা তো রোজই জ্বলে। ওটা ওদের সিঁড়ির আলো। স্টার্ট দেবার পরে, স্ট্যান্ডটাকে এই যে, এই জিনিসটা, আগে নামিয়ে দেবে। এমনি করে। এবার গাড়িটা চলবার উপযুক্ত হল। প্রথমেই স্টার্ট দেবে, এমনি করে, বুঝেছ? তারপর—আমি আগে চালিয়ে দেখিয়ে দিই বরং—তুমি দেখে শিখে নাও। দ্যাখো এইভাবে চড়ে বসবে—" মেয়ে তো ব্লু জিন্‌স পরা, লাফিয়ে উঠে বসল। আমি যতই উচ্ছে তুলি না কেন শাড়িটা, কক্ষনও ওভাবে উঠে বসতে পারব না।

"স্টার্ট দেবার পর গাড়ি স্ট্যান্ড থেকে নামিয়ে সিটে বসবে, একটু পরে উঠতে হয় এতে, বুঝলে? গাড়ির মত নয়, আগে উঠে বসে পরে স্টার্ট দেয় না—এমনি করে

অ্যাকসেলারেট...'' মেয়ের গলা আর শোনা গেল না। প্রবল ভট্-ভট্ শব্দের মধ্যে দূরে মিলিয়ে গেল। দ্যাখ্ না দ্যাখ্ ঐ মোড়ের কাছে পৌঁছে গিয়ে বাঁই করে ঘুরে আসছে। ফিরে এসে স্পীড কমিয়ে—''এই দ্যাখো, মা এইভাবে ব্রেক কষ্‌ছি—'' বলতে বলতে মেয়ে আস্তে করে থেমে গেল। অন্ধকারে অবশ্য কিছুই দেখা গেল না। কেমন ভাবেই বা সে স্টার্ট করেছিল ঐ গাড়ি, কেমনভাবেই বা সে অ্যাকসেলারেট করল, আর কেমনভাবেই ব্রেক কষেছে! কিন্তু সেটা মুখ ফুটে স্বীকার করতে আমার বাধলো। ইতিমধ্যে আমাদের বাড়ির রকে রোজ শুয়ে থাকে এক রিটায়ার্ড ঠিকে কাজের মেয়ে, রানী, সে মহা উৎসাহে উঠে এসেছে। আর উল্টোদিকের টিউবওয়েলে জল খাচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ ভিখারি—হাতে বাটি, লাঠি, বগলে পুঁটলি। তিনিও এসে কানাইয়ের সঙ্গে বাতচিত শুরু করেছেন। দুর্গা বলে এগিয়ে যাই। প্রথমে আমি মেয়ের দেখাদেখি ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতে চেষ্টা করি, কিছুতেই হয় না। মেয়েই স্টার্ট দিয়ে দিল। তারপর প্রায় হাঁটু অবধি শাড়ি উঠিয়ে ' যা থাকে কপালে'' বাঘের পিঠে জগদ্ধাত্রীর মতো তো অধিষ্ঠিত হলাম পাদপীঠে। পা রাস্তায়। ছোট মেয়েটা ভীতু। সরু গলায় ''ওমা? মা? পড়ে যাবে না তো?'' বলে উঠল। বড়টি সাহসিকা—''চুক্কর্ তো। পড়বেন কেন? মা তো সাইকেল চালাতেন কলেজে। সাইকেল প্রতিযোগিতার তিন তিনটে মেডেল আছে না!''

''হ্যাঁ তা থাক, কিন্তু শান্তিনিকেতনেই সেবার তো সাইকেল চড়তে গিয়ে ধাঁই করে মা পড়ে গিয়েছিলেন, মনে নেই?''

ছোটমেয়ের দ্বন্দ্ব ঘুচতে চায় না।

''সে অনভ্যাসের দরুন। সাঁতার আর সাইকেল কেউ ভোলে না, জানিস?''

''জানি। কিন্তু মা যে' আলাদা। মা তো সেবার মহালয়ায় সাঁতার কাটতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবেও যাচ্ছিলেন; আমরা স্বচক্ষে দেখেছিলুম না? অথচ মার তো লাইফ সেভিং সার্টিফিকেট আছে দিম্মার আলমারিতে। আছে না?''

আমি আর পারি না। ''ব্যাব্যাঃ—যত্তো সব বাজে কথা। হঠাৎ ডুবব কেন? শাড়িতে পা জড়িয়ে ধরেছিল তাই। আর সাইকেল যে আজকাল চড়তে পারি না সেটা তো কেমব্রিজে সেই অ্যাক্সিডেন্টের পরে, সাইকোলজিকাল ব্লক থেকে।''

''কী অ্যাকসিডেন্ট, মা?'' দুজনেই ব্যাকুল।

''ঐ যে, টিউটরের কাছে যাচ্ছিলাম তো, অন্যমনস্ক হয়ে চালাচ্ছি, হঠাৎ একটা পার্কড ভিহিকলের সঙ্গে একটা থেমে থাকা লাল দোতলা বাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে রাস্তায় পড়ে গেলুম। আর ঠিক সেইখানেই পুলিশ ব্যাটা ডিউটি দিচ্ছিল। ...সেই থেকে কেমন ভয় ধরে গেছে। চলে আসার সময়ে আমার লাল টুকটুকে সাইকেলটা বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পার্থ দাশগুপ্তকে দিয়ে এসেছিলুম। সে তখন ট্রিনিটিতে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্র। দেখা হলে জিগ্যেস করিস।''

''খুব হয়েছে। এখন এটা চালাও দিকি!''

''এই তো? এমনি করে তো? বেশ, একটু ঠেলে দে আগে, নইলে এগুবো কী করে?''

''ঠেলব কি গো? নিজে নিজে যাবে। স্টার্ট তো দিয়েই দিয়েছি, এবার দু-পাশে পা রাখো, হ্যাঁ,...র্যাকটা তুলে নাও.. হ্যাঁ...বাঃ, এবারে অ্যাকসেলারেট...''

বলতে না বলতেই গাড়ি তীরবেগে বেরিয়ে যায়। আমি সমেত। দু-পাশে দুই কন্যা প্রাণপণে ছুটছে, পিছনে পিছনে কানাই, তার পিছনে বাটি লাঠি পুঁটলি বগলে বৃদ্ধ

ভিখিরি, তিনিও খুবই জড়িয়ে পড়েছেন এই এক্সপেরিমেন্টে। আর রানী আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তার ওপরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গলা চিরে চেঁচিয়ে চীয়ার গার্লের কর্তব্য পালন করছে। চেঁচাচ্ছি অবশ্য আমরা সকলেই, কিন্তু ঠিক ঐকতানে নয়। যে যার স্বকীয়তা বজায় রেখে। একেই কি বলে হার্মনি?

বড় কন্যা—"ঠিক হচ্ছে মা, ঠিক হচ্ছে, চলতে থাকো"—

ছোট কন্যা—"ওরেব্বাবা মাগো পড়ে যেয়ো না যেন— দেখো বাবা! ওগো, মাগো, যেন পোড়ো না"—

ভিকিরি বৃদ্ধ—"ওগো তোমরা সবাই থামো না একটু। —তোমরা একটু থামো দিকিনি—আমার বৌদিদি ঠিকই চলে যাবে এখন, দুগগাঃ দুগগাঃ—অত কথা বললে কি আর মাথার ঠিক থাকে কাউর"—

রানী—"ও মাগো, কী হবে গো? এ কী কাণ্ড গো? বাড়ির গিন্নি যে মপেটও চালাচ্ছে গো"—

মোপেড—"ভটর্ ভটর্ ভ্যাট্ ভ্যাট্ ভ্যাট্ ভ্যাট্"—

আমি—(মনে মনে ইষ্ট মন্ত্র, আর মুখে)

"ওরে ওরে নামবো যে রে—ওরে নামবো—ওরে থামবো কী করে—ওরে এটা যে থামছে না রে"—

ছুটতে ছুটতে মোপেড শিক্ষিকা দ্রুত ইন্সট্রাকশন দিতে থাকেন—

"স্পীড কমিয়ে দাও, স্পীড কমিয়ে দাও, পা মাটিতে, পা মাটিতে ঠেকিয়ে দাও, মাটিতে পা ঠেকিয়ে—"

ছুটতে ছুটতে কাঁদো কাঁদো ছোট মেয়ে—"পা মাটিতে পা মাটিতে, ওমা গো, পা মাটিতে মা—"

ছুটতে ছুটতে কানাই—"দিদি, দাঁইড়ে পড়ুন—পা মাটিতে নাবিয়ে ফেলুন, দাঁইড়ে পড়েন—নাবিয়ে দ্যান-পা-টা—"

ছুটন্ত ভিকিরি—"বৌদিদি আপনিই লেবে পড়বে—তোমরা আর ওকে ঘাবড়ে দিওনি—বৌদিদি আপনিই লেবে যাবে'খনি—তোমরা চেঁচানি থামালিই উনি লেবে পড়বে—"

উচ্চকিত রানী—"আর উদিগে যেয়ে কাজ নি গো দিদিমুনি—ঢের হয়েচে—উদিগপানে আর যেয়োনি— উদিগে গরু—গুঁতিয়ে দিবে, উদিগে গরু"—

...আর 'যেয়োনি'! হুঁ, যেতে তো পড়েইছি। এক্কেবারে খাটালের সামনে। ফুটপাতের ওপরে গোল হয়ে বসে নিরীহ বিহারী গয়লারা ঢোলক বাজিয়ে গলা ছেড়ে ভোজপুরি রামাহো গাইছিল :

—"রোয়ি রোয়ি পাতিয়া—লিখল্বা রজমোতিয়া— আররে রোয়ি রোয়ি"—তারা প্রাণের আনন্দে আর ঢোলের শব্দে আমার প্রাণঘাতী ভ্যাট্ ভ্যাট্ শুনতে পায়নি। সহসা উদিত হয়ে তাদের জলসা থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে ঠাশ করে গাড়িটাকে ফেলে দিয়েই সার্কাসের কায়দায় সাড়ে তিন হাত লম্ফ দিয়ে ওদের উল্টোদিকে নেবে পড়লুম। সেও চমৎকার স্পেস সেন্সের প্রমাণ দিয়ে, গোবর গাদা থেকে আধ মিলিমিটার তফাতে। গাড়ি প্রপাত, গয়লারা অনাহত, আমিও অনাহত। সবাই ঠিকঠাক। শাড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবলুম—"অনেকটা সাইকেলের মতোই"—ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার

রেজিমেন্ট এসে পড়েছে। বীরগর্বে বলি—"বেশ সোজা। ঠিকই বলেছিলি, অনেকটা সাইকেলের মতোই।"

বড় মেয়ে (সস্নেহে)—"দেখলে তো? এই তো বেশ চড়তে পেরে গেলে। গুড!"

বৃদ্ধ ভিকিরি—"কিন্তু বৌদিদি অত ডাইনে বাঁয়ে প্যাঁচ কষছিলেন ক্যানে? সিধে যেতে পারেন নাকো? সিধে যাওয়াই তো ভালো।"

কানাই (সগর্বে)—"আরে একটু প্র্যাকটিশ কল্লিই সিধে যেতে পারবেন—ব্যালান্সটা এসে যাবে—প্রেথম বারেই দিদি প্রায়ই শিখেই ফেলেছেন"—

ছোট মেয়ে (সভয়ে)—"থাক, আর শিখে কাজ নেই। এই পর্যন্ত থাক। মা আর একটু হলেই গয়লাদের চাপা দিয়ে দিচ্ছিলেন। নিজেও গোবরগাদাতে পড়ে যাচ্ছিলেন, অল্প একটুর জন্যে, নেহাৎ বাই চান্স—"

রানী (দূর থেকে, অদৃশ্য দেবতাদের নমস্কার করে)— "দুগ্গা—দুগ্গাঃ! অ বড়দিদি ছোড়দিদি তোমাদের মা জননীকে এবার ডাকো—ভালয় ভালয় ঘরে ফিইরে নে এসো বাছারা—আর মপেট্ চালিয়ে কাজ নি গো মায়ের—ঈ কী পেহার"—

বাইরে রাজ্যজয়ের মতো মুখের ভাব হলেও আমার বুকের ভিতর দুরু-দুরু। সেই যে দোলনচাঁপার ক্ষুদে ছেলেটি বম্বেতে একটা সরু সাঁকো পার হতে হতে বলেছিল না, —"আই অ্যাম নট অ্যাট হল আফ্রেইড, —কিন্তু মনে মনে বিসোন ভয়—" ঠিক সেই অবস্থা।

গয়লারা তো গানবাজনা বন্ধ করে প্রাণভয়ে, "হায় রাম!" বলে ঢোল ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। গরুগুলো নেহাত খোঁটায় বাঁধা, কিন্তু তারা বহুদ্রষ্টা প্রাণী, ঠিকই বুঝেছে একটা কিছু ভয়ংকর কাণ্ডকারখানা সংঘটিত হতে চলেছে। একটা বেয়াড়া বাছুর ভয় পেয়ে গিয়ে অকস্মাৎ গলা ছেড়ে কেঁদেই উঠলো—"হাম্বু-উ-উ"...কী অলুক্ষুণে গরু রে বাবা।

নাঃ। এদিকটাতে সত্যিই আর প্র্যাকটিস কবা যাবে না দেখছি। ইতিমধ্যে আমাদের দলে রাস্তা থেকে আরও একজন কর্তাব্যক্তি, এপাড়ার প্রহরী সারমেয়টি, এসে যোগ দিয়েছেন। তিনি সবলে সরু ল্যাজ নেড়ে নেড়ে উৎসাহ দিচ্ছেন, আমি আত্মস্থ পদক্ষেপে, স্থিতধী-স্টাইলে মোপেডটি হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছি, সঙ্গী সারমেয়ও ধীরপদে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসছেন, মহাপ্রস্থানের স্মৃতি মনে না পড়ে উপায় নেই।

সে যাই হোক, এদিকটায়, আর নয়। এবার বরং পূর্বদিকে. মাননীয় জ্যোতিবাবুর বাড়ির ওদিকটায় যাই। ওঁখানটায় খাটাল নেই, গয়লা নেই, গোবর নেই, গরু নেই, বাছুর নেই। শুধু ঘুমন্ত পুলিশ আছে কিছু। কেননা ওখানে জ্যোতিবাবুও নেই।

যেমনি ভাবনা তেমনি কাজ। আমাদের বাড়িটা যেহেতু তিনমাথার মোড়ে, তাই সম্ভাবনা বহুমুখী। পশ্চিমে আর নয়, এবার পূব-দক্ষিণে। ও মোড়ে পৌঁছেই, হু-উ-শ্— সামনে টানা ফাঁকা রাস্তা...চালাও পানসি বেলঘরিয়া। স্টিয়ারিং হ্যানডেল এবার ডাইনে বাঁয়ে নয়, নাকের সিধে। এবারেই পারফেকশানে পৌঁছে যাব। চমৎকার রাস্তা। একদম ফাঁকা।

কিন্তু এ কী হল, হঠাৎ? বাপ্‌রে! মরে গেলুম, মরে গেলুম! ছ্যাঁক্ করে পায়ের ডিমে একটা গরম আগুনের ছ্যাঁকা কে যেন লাগিয়ে দিলে! ওমনি আপনা আপনি হাত কেঁপে উঠে অ্যাকসেলারেটর ঘুরিয়ে ফেলেছি ছ্যাঁকার চোটে, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় রোবটের স্টাইলে লাফিয়ে উঠে জ্যামুক্ত তীরের মতো নাকের সোজা ছুটল আমার সপ্ত-ঘোড়ার

বাহন, একেবারে পুষ্পকরথের মতো—মাটিতে না আকাশপথে তাও ঠিক বুঝতে পারছি না—কানে এলো পরিত্রাহি চীৎকার—সবার ওপরে আমারই গলা :

আমি—"আমি নামবোঁ, ওরে আমি নামবোঁ"...

ছুটন্ত বড় কন্যা—"ব্রেক, ব্রেক, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসেলারেটরটা উলটো দিকে ঘোরাও —ব্রেক, ব্রেক।"

ছুটন্ত ছোট কন্যা—"অ মা মাগো, নেমে পড়ো মা, ব্রেক দিয়ে দাও মা, ব্রেক—মা গো অ মা"—

ছুটন্ত কানাই—"ব্রেক ডান হাতে, অ দিদি, ব্রেকটা ডান হাতে, দিদি, ব্রেক ডান হাতে"—

ছুটন্ত ভিকিরি—"ওরে মুখপোড়া, তুই থাম না রে, বৌদিদি ঠিকঠাক বেরেক মারবে, তোরা থামলিই বেরেক মারবে, তোদেরকে চেঁচাতে হবে না ব্যাটারা"—

বাড়ির সামনে দণ্ডায়মান রানী—"হায় হায় হায়—হয়ে গেল! এইবার ঠিক সব্বেনাশ হবে গো—হে মা দুগ্‌গা—হে মা দুগ্‌গতিনাশিনি—রক্ষে করো মা—"

ছুটন্ত কুকুর—"ঘৌ ঘৌ ঘৌ ভৌ ভৌ ছৌ ছৌ ছোঃ ছোঃ"

উড়ন্ত আমি—"ওরে, এ যে থামচে না রে—ওরে এ যে থামচেই না—"

ছোট কন্যা—"হে ভগবান"—

ভগবান শুনতে পেলেন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়ি 'ইলাবাস' আর শিল্পী সুনীলমাধব সেনের বাড়ির মাঝ বরাবর ভগবান প্রচুর বালি ঢেলে রেখেছিলেন। যেন আমারই প্রতীক্ষায়। পাখির মতো উড়ে গিয়ে আমার মোপেড সেই ঐশ্বরিক বালুকাবেলায় সজোরে ঢুকে পড়লো। মোপেড সুদ্ধু আমি বালির মধ্যে নিঃশব্দে পড়ে গেলুম। চমৎকার চাঁদনি রাত। বালিতে শুয়ে শুয়ে মাথার ওপর চেয়ে দেখলুম চাঁদের মুখখানা হাসি হাসি। নক্ষত্রের শয়ে শয়ে চোখ টিপুনি। কী গো? কেমন হল? লাগল কেমন? বেশ ভাই!

ততক্ষণে পাড়ার সবগুলো বারান্দাতেই আলো জ্বলছে। একটা অডিয়েন্স তৈরি হয়ে গেছে। প্রতিবেশীরা সবাই বাইরে। শুধু পুলিশেরা ভিতরে। সার্কাস দেখার উত্তেজনা বাতাসে খেলে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকেই উত্তপ্ত, প্রত্যেকেই বিজড়িত, প্রত্যেকেরই একটা পয়েন্ট-অফ-ভিউ আছে। দীপঙ্করটা থাকলে একটা ওপিনিয়ন পোল নিয়ে নিত—ভাগ্যিস সে ব্যাটা অনুপস্থিত! পড়শীরা সকলে যার যতটুকুন সাধ্য উদ্দীপনা যোগাচ্ছেন—সেই যখন একটি ছেলে ওই কেয়াতলার মোড়ে সাত দিন টানা সাইকেল চালাবে বলে ঘোষণা করে তিন দিন একটানা সাইকেল চালিয়েছিল—ঠিক তেমনি টেন্‌স আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। উত্তেজনায় উলটো সিগারেট ধরিয়ে সামনের বাড়ির দাদা বলছেন—"পিকো, তোর মাকে চার চাকাতেই মানায় ভালো"—নাইটির ওপর হাউসকোট চড়িয়ে বৌদি বলছেন 'টুম্পা, মোপেডটা মাকে ধরতেই দিস না।" বালি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াই। চতুর্দিকে সহানুভূতি চাঁদের আলোর মত বয়ে যেতে থাকে।

"কী খুকুভাই? লেগেছে নাকি?"

"একটু আধটু না পড়লে হয়? জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার, সাইকেল শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড়"...

"ঘাবড়াস না রে খুকু, আর কটা দিন প্র্যাকটিস করলেই তুই ঠিক তোর মেয়ের মতন চালাতে পারবি—"

"ও কিছু না, লেগেছে ভাবলেই লাগবে—মনে কর পড়িসনি।"

কুকুর রূপী মহাত্মা বললেন—"নারদ নারদ লাগ্‌লাগ দূর দূর ভাগ্ ভাগ্ ভৌ ওউ যাও যাও ঘরের মেয়ে ঘরে আও।" লাঠি-বাটি-পুঁটলি সামলে কানাইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়েছেন বৃদ্ধ ভিকিরি। আমার এই পাবিলিক রথস্খলনে তিনি যারপরনাই বিমর্ষ। আমার মোপেড প্রশিক্ষণের যৌথ পরিশ্রম তো কম ক্লান্তিকর ছিল না। তিনি এখন কানাইকে ডেকে বলছেন—"ভাইটি একটু টিউকলটা পাম্প করে দেবে? টুকুনি জল খাব।" দিদির কীর্তিতে সলজ্জ, নির্বাক কানাই, হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটোনো। আমার মেয়ের মোপেড ঠেলে নিয়ে আসছে। দুই মেয়ে দুই পাশে ঘন হয়ে লেপ্টে এসে দুই কানে গুনগুন করে বলছে, "বেশি লাগেনি তো? মাগো? বেশি লাগেনি তো?" আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি না খুঁড়িয়ে, সহজভাবে, এবং গ্রেসফুলি হেঁটে বাড়িতে ঢুকে পড়তে। কপিলদেব ক্যাচ লুফে আউট করে দেবার পরে ইমরান খান যেভাবে আস্তে হেঁটে সেদিন প্যাভিলিয়নের দিকে আসছিলেন, (আহা আউট হয়েও কী গ্রেস, কী পয়েজ)—অনেকটা সেইভাবে একদিকে মাথা ঝুঁকিয়ে স্টাইলিশভাবে পা ফেলবার চেষ্টা করছি—পথের দু'পাশে চেনা-অচেনা উৎসাহী দর্শককুলের গার্ড অব অনারের মাঝখান দিয়ে। কিছু সদ্যোস্নাত রিকশোওয়ালার পাশাপাশি গয়লারাও ও-মোড় থেকে হেঁটে এ-মোড়ে চলে এসেছে, তামাশা দেখতে! এমনকি মহামান্য পুলিশরাও আড়মোড়া ভেঙে উঠে এসেছেন। কেবল গরুগুলোই যা খোঁটা উপড়ে ছুটে আসতে পারেনি।

কান গরম, পা জ্বলে যাচ্ছে, কোনরকমে যেন কিছুই হয়নি ভাব করে বাড়িতে এসে পৌঁছেই কাতরে উঠলুম—"বার্নল! বার্নল! আমার পা পুড়ে গেছে।"

"পা পুড়ে গেছে? সেকি? রাত দুপুরেও বালিটা গরম ছিল নাকি?"

"কেটেকুটে যায়নি, পুড়ে গেল? সে আবার কি?"

রানী কপাল চাপড়ে বলল—"পুড়বেনি? পুড়বেই তো! কলিকাল! দিনে দিনে আরও কত কী চোক্ষে দেখব কে জানে?"

কানাই বড় শান্ত ছেলে। ইতিমধ্যে গাড়িটা পরীক্ষা করে খুব গরম একটা জায়গা বের করেছে যেটা চামড়াতে ঠেকলে ছ্যাঁকা লাগবেই লাগবে। কিন্তু সেখানটা মোটেই চামড়াতে ঠেকার কথা নয়। আমার চড়ার গুণেই ঠেকে গেছে। কানাইয়েরও কখনও ছ্যাঁকা লাগেনি, পিকোরও না। ওরা তো দিব্যি নিরাপদে চালিয়েছে! ওদের নিঃশব্দ হাস্য অগ্রাহ্য করে মার কাছে চলে এলুম। খোঁড়াতে খোঁড়াতে। মা ঘরবন্দী মানুষ। বারান্দায় বেরুতে পারেন না। ওদিকে রাস্তায় যে কীদৃশ নৈশবিপ্লব ঘটে যাচ্ছে মা কিছুই টের পাননি। এক মুখ উজ্জ্বল হেসে মা আমাকে রিসিভ করলেন।

—"আয়। বোস। হোল শেখা?"

—"ওই একরকম।"

—"পারলি চালাতে?"

ঠিক এমন সময়ে কানাই এসে বললো :

—"দিদি, বার্নল।"

—"বার্নল? কেন রে, বার্নল কী হবে?"

—"পা পুড়ে গেছে দিদির।"

—"খুব লেগেছে, না মা? দেখি দেখি—"

—"আশ্চর্য! আমরাও চড়ি, কখনও পা পোড়ে না, তুমি পোড়ালে কেমন করে বলো তো?"

—"পা পোড়ালি কি না গাড়ি চালাতে গিয়ে? একি রান্নাবান্না? আশ্চর্য মেয়ে বাপু!"

—"ওই মোপেডের এগজস্ট পাইপে ছ্যাঁকা খেয়ে গেছেন।"

—"সেকি রে? খুকু? সত্যি!" কন্যার গাড়ি চালানোর চমৎকারিত্বে অপরিসীম বিশ্বাসী মা-বেচারির দুই চোখে বিস্ময়-বিস্ফারিত বেদনা। অর্থাৎ মার চোখ বলছে— "অ্যাদ্দিন কলকাতা শহরে গাড়ি চালিয়ে শেষে কিনা এ-ই?" গাড়ির এগ্‌জস্ট পাইপ থেকে যে পায়ে ছ্যাঁকা লাগতে পারে না মাকে সে ব্যাপারটা বোঝাই কী করে?

—"বেশি লাগেনি। একটুখানি ফোস্কা।" লজ্জিতভাবে বলি।

—"দেখি, দেখি? ও ব্বাবা! এ যে অনে—কখানি রে?" মা কিছুক্ষণ বিমর্ষভাবে চুপ করে থাকেন। মেয়েরা সযত্নে বার্নল লাগিয়ে দেয়। মা দ্যাখেন। ফার্স্ট এড শেষ হলে, মা ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন। আমি তাড়াতাড়ি বলি—"ফোস্কাটা সেবে গেলেই আবার"—

—"থাকগে, যাক্‌গে। ও আর হোল না। তোমার আর মোপেড চালিয়ে কাজ নেই মা, তুমি তোমার চার চাকার যন্তর নিয়েই থাকো। পিকো যেটা পারে, তুমিও সেটা পারবে, আমি এইটে ভেবেছিলুম।" মা মর্মাহত। অক্ষম সন্তানের উচিত সঙ্কোচেই আমি অনেকখানি মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে চুপ করে থাকি। সত্যিই তো। পারিনি। মোপেড আমি চালাতে পারিনি। তবু সাহস করে বলে ফেলি :

—"পায়ে ছ্যাঁকাটা যদি না লাগতো মা—"

—"পিকোর কি ছ্যাঁকা লেগেছিল?"

—"ও তো জীনস পরে।"

—"তোমাকে জীন্‌স পরতে কে বারণ করেছিল? যে দেবতার যা মন্তর।"

—"যাঃ বাবা! মোপেডের জন্যে জীন্‌স পরে শেষে যাদবপুরে? থাক্ মা, আমার ভাঙাচোরা গাড়িটাই ভালো!"

পরদিন কলেজে যাব, গাড়ি বের করছি। রানী রকে বসে মুড়ি খাচ্ছে।

আমাকে দেখে হেসে হেসে চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে বলল :

—"এই তো দিব্বি মাইনেচে এবারে। বলি পায়ের সেই ফোস্কাটা আজগে আচে কেমনি? বুইলেনি গা দিদিমুনি, ঝার কম্মো তারে সাজে অন্যঝনের নাঠি বাজে। ঝে বয়েসের ঝা!"

দাঁত

দিব্যেন্দু পালিত

দাঁত নিয়ে এক সময় আমার খুব গর্ব ছিল। গভীর পাথরের কাজের মতো নিখুঁতভাবে সাজানো সমান দাঁতের সারি, তেমনি ঝকঝকে, মুক্তোর সঙ্গে তুলনীয়। এক কস্‌মেটিক্‌স্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি তাদের টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেছিল আমাকে, দাঁত বের করে একরকম নির্বোধ হাসি হেসে বেশ টাকা পাওয়া গিয়েছিল তখন। সে-বছর ওই টুথপেস্টের বিক্রি দেড়গুণ বেড়ে যায়।

দাঁত নিয়ে এই অহঙ্কার অবশ্য বেশিদিন পোষায়নি। কিছুদিন থেকেই একটা অস্বস্তি টের পাচ্ছিলাম' মাড়িতে ব্যথা, জল খেতে গিয়ে দাঁত কনকন করে ওঠে হঠাৎ, মাঝে মধ্যেই জিব নেড়ে নেড়ে বাড়তি মাংসের অস্বস্তি কাটাতে হয়।

আসল ব্যাপারটা টের পেলাম পরে।

তখন আমার বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়। পুরোদস্তুর সামাজিক হবার রাস্তাটা ক্রমশ দীর্ঘ ও ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। এই নিয়ে কিছুদিন থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে মন কষাকষি চলছিল। অথচ আমি লোকটা খুবই শান্তিপ্রিয়, যে-কোনও রকমের ঝামেলা আমার ঘোরতর অপছন্দ। সেদিন মোটামুটি একটা আপোস সেরে ছুটতে হল বিছানায়।

গোলমালটা বাঁধল তারপর। চুম্বনে উদ্যত হতেই দাঁতমাড়িসুদ্ধ বাঁ গালটা কন্‌কন্ করে উঠল হঠাৎ, মনে হল দাঁতের গোড়ায় কেউ আলপিন ফুটিয়ে দিচ্ছে সজোরে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সরে এলাম।

কড়ায় মাছ চাপানোর মুহূর্তে গ্যাস ফুরিয়ে গেলে যা হয়—'কী হল!'—স্ত্রী রিঅ্যাক্ট করল তাড়াতাড়ি।

হাতে গাল চেপে বললাম, 'দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা—

'দাঁতে ব্যথা!' অসম্ভব রাগে, অপমানেও হতে পারে, নীলিমা তখন গরগর করছে। দূরত্বে থেকে বলল, 'মদ, মেয়েমানুষ আর পার্টিকেই যারা জীবন ভেবে নেয়, স্ত্রী সংসার তাদের ভালো লাগবে কেন! ওসব অজুহাত আমি বুঝি না!'

আমি গল্পলেখক নই, হলেও নিজেকে ব্যাখ্যা করা সহজ হত না। কিন্তু, মনে হচ্ছে, আমার স্ত্রীর কথাতেই আমি কি রকম তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এর অনেকটাই সত্যি।

সত্যি দাঁতের ব্যথাটাও। স্ত্রী ভুল বুঝুক, সারারাত ধরে যন্ত্রণাটা নির্ভুলভাবে টের পেলাম আমি। এমন কি গোটা কয়েক বড়ি গিলেও সকাল পর্যন্ত ব্যথাটা থেকে গেল এমন একটা স্তরে, যেখানে বাড়ছে না কমছে কিছুই বোঝা যায় না।

কিন্তু সামান্য দন্তকষ্ট নিয়ে আঁকুপাঁকু করা আমার সাজে না। ডাক্তারের কাছে ছুটব, সে-উপায়ও নেই। আমি ব্যস্ত মানুষ—কর্মী ও তৎপর, এ-সবের জন্যে তরতর করে ওপরে উঠে যেতে কোনদিনই কোনও অসুবিধে হয়নি। অফিসে আমার ওপর অনেক গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত। বিশেষত আজ—আজ আমাকে যেতেই হবে সময়মতো। বোনাস নিয়ে একটা

গোলমাল চলছে কিছু দিন ধরে, ইউনিয়ন থ্রেট করেছে তাড়াতাড়ি রফা না হলে স্ট্রাইক করবে। ম্যানেজমেন্টের ইচ্ছে ব্যাপারটা পিছিয়ে যাক—কিছুদিন সময় পাওয়া গেলে যা হোক তা হোক করে একটি রফায় আসা যাবে। কর্মচারীদের উত্তেজনা দেশলাইয়ের আগুনের মতো, নিবতে দেরি হয় না। এ-সব কাজে মধ্যস্থতা করতে হবে আমাকে।

আমাকে দিয়েই সুবিধে, কারণ, আমার কী কাজ আমি তা জানি। কর্মচারীরা, মায় ইউনিয়নের পাণ্ডারা পর্যন্ত, আমাকে মানে—কারণ আমি খুব ভালো হাসতে পারি। ম্যানেজমেন্ট একেই কনফিডেন্স বলেন।

কারণ অবশ্য আরও আছে। বছর দুয়েক আগেই হবে বোধ হয়, মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টারিতে কিছু লোক ছাঁটাই হবার পর বোর্ড মিটিং থেকে বেরুবার সময় ক্ষিপ্ত ছাটাই-কর্মচারীরা চেয়ারম্যানকে ছেঁকে ধরেছিল—প্রোটেকশান ছিল না কোনও, হয়তো মারধোর করত। ঠিক সেই সময় উপস্থিত হলাম আমি, সরাসরি গণ্ডগোলের মাঝখানে, দেশলাইয়ের আগুনের মতো হঠাৎ জ্বলে-ওঠা উত্তেজনা থামাতে এতটুকু দেরি হল না। বাড়ি ফিরে চেয়ারম্যান সাহেবের বউয়ের ফোন পেলাম, ইউ হ্যাভ সেভ্‌ড্ মাই হাসব্যান্ডস্ লাইফ। উই আর সো গ্রেটফুল টু ইউ ইত্যাদি।

সে-বছর একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। ষোলজন ছাঁটাই কর্মচারী পুনর্বহাল হল, আর আমার—বুঝতেই পারছেন, ফরচুন ফেভারস্ দ্য ব্রেভ্!

সে যাই হোক, দাঁথে ব্যথা নিয়েই সময়মতো অফিসে পৌঁছুলাম আমি। সকালে আয়নায় দেখছিলাম চোয়ালের নিচে গালটা ফুলে উঠেছে বিসদৃশভাবে, বাইরে থেকেও যে-কারুর চোখে পড়বে। কিন্তু দাঁতের ব্যথা কি আত্মবিশ্বাস নষ্ট করতে পারে! নিশ্চয়ই নয়। বরং আজকে অন্তত, ওইটেই আমাকে ট্রাম্পকার্ড হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

মিটিং শুরু হবার মুহূর্তেই অসম্ভব দাঁতের যন্ত্রণায় কাতরে উঠে আমি বললাম, 'যদি কিছু মনে না করেন, আজকে কি মিটিংটা বন্ধ রাখা যায় না! যদি খুব তাড়াতাড়ি আর একদিন—'

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল (আর কী করবে!), ব্যাপারটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। আমি জানতাম, রাজী ওদের হতেই হবে। যে-কোনও বিষয়েই সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগে ওদের, কিছু পরামর্শ ও আলোচনার দরকার হয়—দু-পা না পেছোলে কখনই তিন পা এগোতে পারে না। আকস্মিক প্রস্তাবে কিছুটা বিভ্রান্ত হবেই। সময় নিয়ে শেষ পর্যন্ত একজন বলল, 'তাড়াতাড়ি মানে, কবে জানিয়ে দিলে ভালো হয়। আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—।' ফাইলটা বন্ধ করে ফেললাম আমি।

ইউনিয়নের একজন পাণ্ডা আমাকে এগিয়ে দিতে এল। বলল, 'আপনাকে দেখে তো মনে হয় না দাঁতে কোনও রোগ আছে! ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'ডাক্তারের কাছেই যাচ্ছি—।' গাড়ির ভিতর বসে হাসলাম আমি। 'দাঁত যে কি জিনিস হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। অফিসে আসতে আসতে ভাবছিলুম, বিপ্লবের আগে কী ভাগ্যিস কমরেড লেনিনের দাঁতে ব্যথা হয়নি!'

লেনিনের নাম শুনে লোকটা খুশি হল। সুযোগ বুঝে রওনা হলাম আমি। হ্যাঁ, ডাক্তারের কাছে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। আশাতীতভাবে মিটিংটা শেষ হওয়ায় একটু আগেই এসে

পড়েছি। চেম্বারে তখনও কিছু লোক—একপাশে এক যুবতী বধূ, ঈষৎ গ্রাম্য চেহারা, মাফলারে গাল মাথা ঢেকে ঝিমুচ্ছে। আমি ছাড়াও আরও অনেকেই যে একই সময় দাঁত নিয়ে ভুগছে, হঠাৎ এই তথ্যটি আবিষ্কার করে আমার মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হল। অতি সাধারণ এইসব মানুষ; সত্যি বলতে, এ-রকম সাধারণ হয়ে যাবার কোনও বাসনা আমার নেই। বিরক্ত হয়ে খবরের কাগজটা টেনে নিলুম; তাড়াহুড়োয় পড়া হয়নি সকালে। কর্পোরেশন আর কাম্বোডিয়ার পর সবচেয়ে বড়ো খবর ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে—নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় একটা সংঘর্ষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ওই খবরের নিচে এক কারখানা মালিকের ওপর হামলার খবর। ঘুরে ফিরে কয়েকটা শব্দই ব্যবহার হচ্ছে; বুর্জোয়া, শ্রমিকের রক্ত, শ্রেণী সংগ্রাম, প্রত্যক্ষ লড়াই। মানুষ বোধহয় স্পষ্টই দুটো দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, যে-কোনদিন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। কাগজটা রেখে দিতে দিতে হঠাৎই একটা প্রশ্ন মাথায় এল, আমি কোন্ দলে? আর তখনই, অসাবধানে, মাড়িতে চিড় ধরে গেল আমার—দাঁতের ব্যথাটা মনে হল অসহ্য, ছড়িয়ে পড়ছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত, সর্বত্র।

হয়তো আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। একটা সিগারেট ধরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। প্রচুর লোকজন পরস্পরকে ওলটপালট করে হাঁটছে, ট্রাউজার্স ছাড়িয়ে যাচ্ছে ধুতিকে, ধুতির সংলগ্ন পায়জামা; প্রত্যেকটি মুখই নির্বিকার, নিষ্ঠুর, উপলক্ষহীন, উদাসীন। যুদ্ধ আসন্ন, এদের সকলকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, তুমি কোন্ দলে?

'বেশ একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলেছেন দেখছি!' অন্যমনস্কতার মধ্যে ডাক্তার আমার মুখে স্পুল ঠেলে দিয়ে বললেন, 'ব্যথাটা কতদিন চলছে?'

মুখের মধ্যে স্পুল, একটা ভ্যাবলা শব্দ করে আমি বললাম, 'এই তো, কাল থেকেই বেড়েছে—'

'আগে কখনও টের পাননি?'

'না, মানে—'

মাড়ির কোণে আয়ডিন-ভেজানো তুলো ঠুসে দিতে অসম্ভব জ্বালায় বাক্‌রোধ হয়ে গেল আমার।

ডাক্তার ততক্ষণে প্যাডের ওপর খসখস করে লিখতে শুরু করেছেন। লিখতে লিখতেই বললেন, 'কমপ্লেসেন্সির জন্যেই আপনাদের যত গণ্ডগোল। আরও আগে আসা উচিত ছিল আপনার। যা দেখছি, দাঁতগুলো তুলে ফেলতে না হয়!'

'বলেন কি!' আঁতকে উঠলাম আমি।

'হবেই যে তা বলছি না।' প্রফেশানাল গলায় বললেন ডাক্তার, 'তবে সব জিনিসেরই ক্ষয় আছে তো! রোগকে চাপা দিয়ে রাখতে নেই, একবার চেপে ধরলে সহজে ছাড়ে না। যাক, একটা ইঞ্জেকসন লিখে দিলুম, আজ থেকেই শুরু করে দিন। ব্যথা কমলে যা হোক করা যাবে।'

আমি খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। আমার চোখের সামনে কবেকার পুরনো এক টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মডেল দাঁত বের করে হাসতে লাগল—এই মুহূর্তে সে-ই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। আর, যুদ্ধ শুরু হবার আগেই বুঝতে পারলাম, আমি হেরে যাচ্ছি।

ডাক্তারের কি ভুল হতে পারে না! এই রকম একটা সান্ত্বনা খুঁজতে খুঁজতে আমি বাড়ি ফেরার কথা ভাবলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল নীলিমার মুখ—আমার স্ত্রী—আমার

ব্যবহারে কাল সে অসন্তুষ্ট হয়েছিল, সেই থেকে বাক্যালাপ বন্ধ। অন্য সময় হলে এটা আমার ভাবনার কারণ হত না। এখন হল; কারণ দাঁতের ব্যথা নিয়ে এখন আমাকে বাড়িই ফিরতে হবে। ডাক্তার গার্গল করতে বলেছেন, মাঝে মাঝে নুনের পুঁটুলির সেঁক, সে-সবের জন্যেও দরকার হবে নীলিমাকে। তার আগে একটা আপোস দরকার।

ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করে ফেললাম। পাবলিক টেলিফোনের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফোন করলাম অসীমাকে, নীলিমার ছোট, 'কী খবর তোমাদের?'

'আপনি যে খবর নিচ্ছেন বড়ো?' অসীমা যথারীতি শুরু করল, 'সূর্য কোন্‌দিকে উঠল!'

'কোথায় সূর্য!' আয়ডিনের গন্ধ ততক্ষণে শুকিয়ে এসেছে মুখের মধ্যে; হেসে বললাম, 'কথা বলতে পারছি না। এইমাত্র ডাক্তার দেখিয়ে ফিরছি। দাঁতে অসম্ভব ব্যথা—'

'তাই বুঝি আমাকে মনে পড়ল! দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝলেন না, এখন আর—', অসীমা একটা পুরনো রসিকতা চালিয়ে খুশি হচ্ছে মনে হল।

ব্যাপারটা হজম করে বললাম, 'সন্ধ্যের দিকে এসো না তোমরা? আসবে? অনেকদিন দেখা হয় না!'

'দেখি।' অসীমা বলল, 'ওর কথা বলতে পারি না। সম্ভব হলে আমি আসব।'

মানে আসবে। এলে, যেমন তেমন করে হোক, পারিবারিক আবহাওয়ায় নীলিমার রাগ কিছুটা পড়বে। আমিও তাই চাই, অন্তত এখন, একটু বিশ্রাম, কিছুক্ষণের নিরাপদ স্বস্তি।

বাড়ি ফিরতেই নীলিমা বলল, 'তোমাদের এম. ডি. ফোন করেছিলেন। ডাইরেক্ট লাইনে রিং করতে বলেছেন—'

'কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্‌।' ফোন করার পর এম. ডি. বললেন, 'ভালোভাবেই ব্যাপারটা ম্যানেজ করেছ; ওরা কিছুই বুঝতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত দাঁতের ব্যথা—'

'ব্যথাটা সাজানো নয়। সত্যিই আমার দাঁতে—'

'ও কে, ও কে। সত্যি হলে তো কথাই নেই। তুমি এখন কিছুদিন অফিসে এসো না। তাহলেই ইস্যুটা পেছিয়ে দেওয়া যাবে।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে নীলিমাকে বললাম, 'ব্যথাটা খারাপ। ডাক্তার বলছে হয়তো দাঁতগুলো তুলে ফেলতে হতে পারে।'

চুপচাপ আমাকে দেখল নীলিমা, যেন সন্দেহ নিরসন করতে চাইছে। চোখমুখের ভাব অন্যরকম। দেখে মনে হল দাঁতের ব্যথাটা নিয়ে সে আদৌ চিন্তিত নয়, বরং অন্য কিছু ভেবে যাচ্ছে। টুকিটাকি কাজ নিয়ে আমার সামনেই ক-বার ঘরবার করল। এক সময় হঠাৎই এসে বলল, 'তোমার মিসেস রায়চৌধুরী ফোন করেছিল—'

'কখন!'

'অফিসে না পেয়ে বাড়িতে ফোন, ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না!' নীলিমা বলল, 'তোমার মচ্ছব বাইরেই রেখে এসো। আর—'; অল্প থেমে' 'আমাকে যদি পছন্দ না হয় পরিষ্কার বলে দিয়ো। আমি নিজের ব্যবস্থা করতে পারব।'

আমার মুখে একটা জবাব এসে গিয়েছিল কিন্তু দাঁতের ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠতে সামলে নিয়ে বললাম, 'ওদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। নীনা আমাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আমি একটা গর্দভ নই, ও-রকম ন্যাগিং মেয়েমানুষ অনেক দেখেছি। আবার ফোন করলে

বলে দিয়ো কথা বলা সম্ভব নয়। আমি খুব ক্লান্ত—'

'সাধু, সব সাধু!' নীলিমা বলল, 'তোমার দাঁতগুলো যেন সত্যিই পড়ে যায়।'

পরের কয়েকটা দিন খুব দুর্ভোগের মধ্যে কাটল। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, ওপরে ও নিচে, গোটা মাড়ি জুড়ে এমনই ভয়াবহভাবে ক্যাভিটি ফর্ম করেছে যে সীল করে ওসব গর্ত বোজানো যাবে না।

'অসুবিধে কি!' ডাক্তার বললেন, 'ইউনিফর্ম নয় বলে কত সুস্থ লোক বিনা প্রয়োজনে আসল দাঁত ফেলে নকল দাঁত পরছে—আর, মশাই, আপনার তো রীতিমতো দরকার। তা ছাড়া একবার বাঁধিয়ে ফেললে কে আর বুঝতে পারছে! এখন শুধুই দাঁতে আছে, দু-দিন বাদে চোখ যাবে, লিভার নষ্ট হবে, এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত—'

আমি বললাম, 'না, না। তুলে দিন।'

দিন কুড়ির মধ্যে আমার মুখ খালি হয়ে গেল। গাল ঝুলে পড়ল। আয়নায় তাকালেই অসম্ভব নির্বান্ধব মনে হয় নিজেকে, আশ্চর্য নির্ভার, হয়তো একেই জরাগ্রস্ত বলে। সারাক্ষণ বাড়িতে থাকি। মদ্যপানে আমার বরাবরের আসক্তি, সুস্থির হয়ে পাঁচ মিনিট একসঙ্গে বসে থাকা আমার ধাতে সয় না। কিন্তু দাঁতের অভাবে আমি কার্যত অথর্ব হয়ে পড়লাম। অসীমা একদিন বলল, 'সত্যি জামাইবাবু, আপনার দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না!' আমি চুপ করে থাকলাম; কারণ মুখ খুললেই আমার বয়স্ক আল্‌গা আল্‌গা উচ্চারণ বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু করবে। নীলিমা আমার যত্ন নিচ্ছে। আর নীনা, দ্যাট ফ্যাবিউলাস বীচ্, ইচ্ছে করেই কদিন এড়িয়ে গেলাম তাকে। বাড়িতে বসেই খবর পাচ্ছি অফিসে ম্যানেজমেন্ট এখনও টানাহেঁচড়া চালাচ্ছে—একটা লোকের অসুস্থতায় অমন ইমপর্ট্যান্ট একটা ইস্যু ঝুলে থাকতে পারে না জেনেও। তবু চলছে, কারণ লিখিতভাবে একটা চুক্তি হয়েছিল তখন—আপসে আসা যায় কিনা দেখা, ম্যানেজমেন্টের পক্ষে আমার প্রতিনিধিত্ব ইউনিয়ন সাগ্রহে স্বীকার করে নিয়েছিল।

কিন্তু, এটা কি কোনও রাস্তা? বিছানায় শুয়ে কিংবা খবরের কাগজে চোখ রেখে মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যাই আমি। মুখের শূন্য গহ্বর জুড়ে হাওয়া খেলে, শূন্যতা ক্রমশ অধিকার করে নেয় আমাকে। আর তখনই মনে হয়, এর চেয়ে যন্ত্রণা ভালো ছিল; যন্ত্রণা সত্ত্বেও দাঁতগুলো ছিল পরিপাটি, দাঁত নিয়ে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ। কিন্তু এখন? এখন কি! সামান্য কয়েকটি দাঁত থাকা না-থাকার হেরফের কি একটা মানুষের অস্তিত্ব জুড়ে ধস্ নামতে পারে!

হয়তো পারে। ডাক্তারের চেম্বারে বাঁধানো দাঁতের সেট মুখে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমার এই উপলব্ধি হল। মনে হল আমার বয়স কমে গেছে কয়েক বছর, ক্লান্তির চিহ্নগুলো সব অদৃশ্য; খুব বাড়াবাড়ি না হলে বলা যেত অবিকল সেই আমি—টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে যাকে মডেল করা হয়েছিল। অভিজ্ঞতা তাকে আরও সপ্রতিভ করেছে। সত্যি বলতে, হঠাৎ, হঠাৎই আমি যেন আমার পুরনো প্রতিভা ফিরে পেলাম।

'এই তো, চমৎকার!' আমাকে খুশি দেখে ডাক্তার বললেন, 'এগুলো নকল। কিন্তু আপনি ছাড়া কেউই তা বুঝতে পারবে না—'

'জানি বলেই বুঝতে পারছি, না হলে—'

পুরোপুরি নিজেকে ব্যক্ত করতে পারলাম না। আনন্দে আমার শরীর ছটফট করে উঠল। অনেক দিন নিজেকে এমন ঝরঝরে, স্বতঃস্ফূর্ত লাগেনি। এখন আমি আবার

আগের মতো সহজ হতে পারি।

ডাক্তারের চেম্বার থেকেই তাড়াতাড়ি দুটো ফোন করলাম। প্রথমটা অফিসে।

'তোমার কথাই ভাবছিলাম।' ডিপ্লোম্যাটিক চালে কথা বলছেন এম. ডি., 'কাল একটা এজিটেশন হয়ে গেছে। ওরা আর অপেক্ষা করতে নারাজ—'

'স্যার, আমরা অনেক সময় নিয়েছি—'

'আমি জানি, ইয়েস। কিন্তু এখন আমরাও শক্ত; হুমকি দিয়ে টাকা ওরা আদায় করতে পারবে না। কাল ওরা আমার বাড়ির দেয়ালে পোস্টার লাগিয়ে গেছে, স্লোগান দিয়েছে। চেয়ারম্যানেরও একই অভিজ্ঞতা। বাট হোয়াই! উই নো হাউ টু—'

কানে রিসিভার লাগিয়ে আমি চুপ করে থাকলাম। কানের ভিতর অনর্গল রাগ, বিদ্বেষ ও জেদ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। কথা শেষ করার আগে এম. ডি. বললেন, 'দুপুরে আমরা একটা ডিসিশন নেব। তুমি কি সন্ধ্যায় একবার বাড়িতে আসতে পারো?'

'হ্যাঁ, বাই অল মীন্‌স্—'

'প্লীজ ডু কাম। দেরি করেই এসো—'

দ্বিতীয় ফোনটা করলাম নীনাকে। বিশেষ কিছু ভাবতে হল না। নীনা চান করতে যাচ্ছিল, ফোনে আগেভাগে সেই কথাটা বলে ফেলল। তারপর স্বর বদলে, ন্যাকা গলায়, 'সকাল থেকে মনে হচ্ছিল তুমি ডাকবে, তাই বাথরুমে যেতে দেরি হয়ে গেল। তুমি এত দেরি করলে কেন। ডার্লিং, কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে?'—ইত্যাদি।

ন্যাকামি আমি একদম পছন্দ করতে পারি না। কিন্তু, নীনার সঙ্গে আলাদা ব্যাপার। ভরাট গলায় বললাম, 'যত শীঘ্রি সম্ভব। আজকেই আমি নতুন দাঁত পেয়েছি, ধারটা তোমার ওপরেই পরীক্ষা করতে চাই।'

'মাই নটি চাম!' নীনা গলে গেল। 'পার্কে এসো বিকেলে। ছটার মধ্যেই পৌঁছে যাব আমি। কোন্ শাড়িটা পরব বলো তো?'

'কাম নেকেড—'

অনভ্যাসের জন্যেই সম্ভবত, মাড়িতে সুড়সুড়ি লাগছিল। ফোন ছেড়ে দিলাম।

অনেক দিন পরে নীনার সঙ্গে কথা বলে মোটামুটি ভালো লাগছিল। নিজেই বুঝতে পারছি এখন আমি অনেক বেশি সহজ, অনেক বেশি সাবলীল, শরীর ও মনের কোথাও এতটুকু আটকানো ভাব নেই। ফিরতে ফিরতে ভাবছিলুম, প্রয়োজনহীন, তবু কেমন এক একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় এর সঙ্গে ওর, যেমন নীনার সঙ্গে আমার। নীনা, অর্থাৎ মিসেস রায়চৌধুরী, বয়সে নিশ্চিত আমার চেয়ে বড়ো— নেহাত শরীরটা আঁটসাঁট আছে বলে চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য শরীর বা বয়েস-টয়েসের জন্যে আমার কোনও মাথা-ব্যথা নেই। ওর সঙ্গে আলাপ চালিয়েছি আমি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তাগিদে; এটা জেনেই যে রায়চৌধুরীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর আমার মতো একজন পুরুষকে দরকার হবে ওর। এবং যতদিন এই প্রয়োজনটা সক্রিয় থাকবে ততদিন অন্তত ও আমাকে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে টেনে নিয়ে যাবে। আমার জন্যে সব করবে। স্ট্যান্ডার্ড ফ্যানের সত্তর লক্ষ টাকার কন্ট্রাক্টটা যে আমরা পেয়ে গেলাম—যার লভ্যাংশ নিয়েই বোনাসের গণ্ডগোল শুরু, সেও তো নীনারই দান! 'সওব', নীনা এইভাবে বলে।

আমি কি খুব বেশি ভাবছি? না হলে, আশ্চর্য, এত অল্প সময়ের মধ্যে নতুন-পাওয়া

দাঁতের কথা ভুলে গেলাম কি করে! খানিক আগেও অস্বস্তি ছিল, মাড়ি জুড়ে একটা বিজাতীয় অনুভূতি—হাতের ওপর অন্য কারও নিঃসাড় হাত এসে পড়লে যেমন হয়—এ-সব আমি ভুলে ছিলাম কি করে! আর, মনে পড়ল একেবারে বাড়ির দরজায় এসে যখন হঠাৎই নীনাকে ভুলে নীলিমার কথা ভাবতে শুরু করেছি। নীলিমার সঙ্গে আমার অর্থাৎ দাঁতগুলোর কি আলাদা কোনও সম্পর্ক আছে! নাকি এতকাল ধরে যা অভ্যাস করেছি, অর্থাৎ নকল হওয়া—এই নকল দাঁতগুলোও আমার সেই স্বভাবের অংশ হয়ে গেল!

নিজেকে নিজে যত ভালো করে বুঝতে পাবি, আর কেউ তা পারে কি করে: সেটা অসম্ভব, ঈশ্বর দর্শনের মতোই ভুয়া।

সুতরাং, রাত্রে এম. ডি. যখন আমাব সামনে তাঁর প্রস্তাব রাখলেন, চুপচাপ শুনে গেলাম আমি; ইচ্ছে করেই চোখে আনলাম কিছুটা নেশার আমেজ, যাতে তাঁর সরল বক্তৃতায় ছেদ না পড়ে। আমি তো জানিই আমাকে কি করতে হবে এবং কতদূর করব, কি ভাবে করব। দিনে দিনে এ-সবই আমার স্বভাবে পরিণত হয়েছে, হচ্ছে। না হলে, আটটা থেকে নটা নীনার শরীরের সান্নিধ্যে থেকে সদ্য ঘুম-ভাঙা পরিচ্ছন্ন মানুষের মতো ঠিক সাড়ে নটায় এম. ডি.'র দরজায় কলিং বেল টিপতে পাবতাম না।

নিরুত্তর থেকে শুনে যাচ্ছিলাম সব। অস্বস্তি বলতে এই মুহূর্তে একটিই : গলায়, জিবে, স্বাদ পাচ্ছি না কোনও। ব্ল্যাকনাইটেব তীব্র, তরল স্বাদ মুখেব ভিতর কেমন পিছলে যাচ্ছে মনে হল—পানীয়ের সঙ্গে কোথায় একটা দূরত্ব থেকে যাচ্ছে। সে কি আমার নকল দাঁতের জন্যে! ঠিক বুঝতে পারছি না।

'তোমার কি কনসায়েন্সে লাগছে। বিবেক চাপ দিচ্ছে?' এম. ডি. বলছিলেন, 'সাকসেসফুল হবার পক্ষে ওটাই প্রথম বাধা। থাকা না-থাকা সমান। ধরো তোমার দাঁতের ব্যাপারটা—আমি তো বুঝতেই পারিনি ইতিমধ্যে দাঁতগুলো বদলে ফেলেছ তুমি, ইট ইজ সো ন্যাচারাল! বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ, তোমার সব দাঁতগুলো নকল হলেও তুমি ঠিক আগের মতনই থেকে যাচ্ছ। বরং একটা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলে—'

ভদ্রলোক বোধহয় ইউনিভার্সিটি ডিবেটে অংশ নিতেন। আর বেশিক্ষণ সময় দেওয়া উচিত হবে না। গা-ঝাড়া দিয়ে বলে উঠলাম, 'আপনি আমার ওপর ভরসা করতে পারেন, স্যার, আই শ্যাল অ্যাক্ট অ্যাকোর্ডিংলি। এই লোকগুলো সব সময় জবরদস্তি করতে চায়। কিছুতেই খুশি নয়, ভাবছে গায়ের জোরে আদায় করবে। কিন্তু, এই গায়ের জোর ওদের দিচ্ছে কে! উই, যাদের ওরা বুর্জোয়া বলছে, বলছে দালাল। আই হেট, আই হেট দিজ পিপ্‌ল। আট পারসেন্টের বেশি আর এক পয়সাও ওদের দেওয়া হবে না—'

'ও কে, ও কে।'

উত্তেজনায় অনভ্যস্ত মাড়ি থেকে দাঁতগুলো খুলে পড়ার উপক্রম হল।

বাড়ি ফিরে নীলিমাকে বললাম, 'জরুরি কাজে কাল সকালে বোম্বাই যাব। স্যুটকেস গুছিয়ে দাও; দিন সাত আট থাকতে হতে পারে। আর, শোনো, আমি না ফেরা পর্যন্ত তুমি অসীমাদের সঙ্গে থাকো না? অফিসে বোনাস নিয়ে গণ্ডগোল চলছে, স্টাফরা যদি বাড়ি পর্যন্ত এসে ডেমনস্ট্রেশন করে—'

'বাড়িতে আসবে কেন! তুমি কী করেছ?'

'কিছুই না, তবে—'

কাঁচের বাটিতে দু'পাটি দাঁত গুছিয়ে রাখতে রাখতে সন্দেহের চোখে আমাকে দেখল নীলিমা। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'দাঁত গেল, স্বভাব গেল না!'

কথাটার মানে কি বোধগম্য হল না আমার। অনেক সময় অনেক কথাই বলে নীলিমা, যার অর্থ খুঁজতে আমাকে তেপান্তরে ছুটতে হয়। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি। কিন্তু, এখন আমি কথা বলতে পারব না। কথা বললেই মুখের গহ্বর জুড়ে ফাঁকা হাওয়ার দাপাদাপি শুরু হবে, শব্দগুলো বিশ্রীভাবে জড়াজড়ি করবে পরস্পরের সঙ্গে। আমি চুপ করে থাকলাম।

নীলিমা জানল না, পরদিন সকালে গাড়ি আমাকে হোটেলে তুলে নিয়ে গেল।

এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলেছে। হোটেলের দায়বদ্ধ জীবনে এসেই প্রথম টের পেলাম, আমি লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পারলাম; স্টাফরা আমাকে খুঁজছে এবং তাদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে আমিই ম্যানেজমেন্টের হাতের তাস। এখন আমার আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই; দু'পক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক অনুভূতিহীন নীরেট দেয়াল। এটা কি ঠিক হল? এই স্বাতন্ত্র্য হারানো—আত্মগোপন করা? এইসব চিন্তায় অস্বস্তি বেড়ে গেল আমার। দাঁতটাও সুস্থির থাকতে দিচ্ছে না। যত দিন যাচ্ছে ততই অনুভব করছি দাঁত ও মাড়ির মাঝখানে পিচ্ছিল, ক্লেদাক্ত কিছু একটা—ঠিক জানি না কী—অনবরত ব্যবধান সৃষ্টি করে যাচ্ছে। অস্বস্তিটা সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত করে রাখে, কখনও বা বিমর্ষ; প্রায়ই রাতে খারাপ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায়। শেষে এমন হল যে অস্বস্তি কাটাবার জন্যে নিতান্ত খাবার সময় ছাড়া অধিকাংশ সময়েই দাঁতগুলো খুলে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখি; দেখি।

ইতিমধ্যে পর পর দু-দিনে দুটো ঘটনা ঘটল। আমি চলে আসার পর নীলিমা চলে গিয়েছিল তার বোনের বাড়ি। ঠিক তার পরের দিনই আমাদের ফ্ল্যাট আক্রান্ত হল। দোতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দা ঘেঁষে আমাদের শোবার ঘরের জানলার কাঁচগুলো ভেঙে পড়ল ইঁটের আঘাতে। বাড়ির সামনে এখন পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। আশ্বস্ত হয়ে আমি ভাবলাম, কী ভাগ্যিস নীলিমাকে চলে যেতে বলেছিলাম!

দ্বিতীয় ঘটনাটা অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। সমস্ত ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় ম্যানেজমেন্ট লক-আউট ঘোষণা করেছেন। খবরটা আমি কাগজে পড়ার পরই এম. ডি. ফোন করলেন আমাকে। 'এটা কি ঠিক হল, স্যার?' এম. ডি. বললেন, 'হয়তো হল না। কিন্তু আমাদের পার্সোনাল সেফ্‌টির জন্যেই করতে হল। লোকগুলো সত্যিই এমন ক্ষেপে যাবে বুঝতে পারিনি! কাল একজন দারোয়ান স্ট্যাব্‌ড় হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি ট্রাইব্যুনালে যেতে।...তোমার স্ত্রীকে কি কোন খবর দেবার আছে?' আমি বললাম, 'না।'

আমার স্যুইটে একটা টেলিফোন আছে। ইচ্ছে করলে এখান থেকে আমি যে-কাউকে ডাকতে পারি। প্রচুর, অফুরন্ত অবসর নিয়েই এখন আমার যত চিন্তা। কিন্তু কাকে ডাকব? নীনাকে? না, তাতে লোক জানাজানি হতে পারে। নীলিমা জানে আমি অন্যত্র গেছি, তার সঙ্গে নতুন কোনও প্রবঞ্চনা করতে ইচ্ছে করল না। বাইরে থেকেও যে হঠাৎ কেউ আমাকে ডাকবে তেমন ভরসা নেই। একা ঘরে নিজের সঙ্গী বলতে এখন আমি নিজে। একা, ভয়ঙ্কর রকমের একা।

সেদিন রাত্রে আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। আমার স্যুইটের দেয়ালের হাল্‌কা সবুজ রঙ

ক্রমশ পাল্‌টে যাচ্ছে। এক সময় সেটা সম্পূর্ণ পাল্‌টে গিয়ে ফ্যাকাশে, রক্তের মতো রঙ ধরল। না, আমি ভুল করেছিলাম। রঙ নয়, ওগুলো পিঁপড়ে, কোটি কোটি বিষাক্ত পিঁপড়ে ছেয়ে গেছে চতুর্দিকে। ক্রমশ তারা আমার বিছানা ছাড়িয়ে শরীর বেয়ে উঠতে শুরু করল, ক্রমশ আমার মুখের ওপর এবং ঠোঁটে এসে জড় হতে লাগল। বিষাক্ত কামড়ে আমি পাশ ফিরে শুলাম। আর তখনই দেখলাম, দু-ভাগে ভাগ হয়ে পিঁপড়ের দল মেঝের ওপর দিয়ে আমার দুপাটি দাঁত টেনে নিয়ে যাচ্ছে—

এই সময় ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্ন দেখে না অন্য কোনও কারণে প্রথমে ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার সর্বাঙ্গ জুড়ে ঘাম; প্রবল ঘামে বিছানার চাদর ভিজে গেছে। বাইরে থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসছিল। ভোর হয়ে গেছে, স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে স্যুইটে আলো এসে পড়ছে। ঘুমের জড়তা কাটতেই বাইরের কোলাহল, চিৎকার আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। বুঝতে পারলাম, আমি ধরা পড়ে গেছি।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে আমি বাথরুমে গেলাম, জল দিলাম চোখমুখে। এখন আমার কী করা দরকার, কী করলে উপদ্রুত এলাকা থেকে বেরুতে পারব—আবার প্রতিষ্ঠা করতে পারব নিজেকে, বুঝতে পারছিলাম না। ওদের প্রতিটি সবল, হিংস্র চিৎকারে আমার লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠল, কম্পন শুরু হল সর্বাঙ্গে, মনে হল সঙ্কুচিত হয়ে আসছে আমার সমস্ত শরীর।

হঠাৎ কলিং বেলের শব্দে চৈতন্য হল। দরজা খুলে দেখি বিব্রত, কিছু বা আতঙ্কগ্রস্ত মুখে ম্যানেজার দাঁড়িয়ে। 'সরি, জেন্টলম্যান। এই জনতাকে সামলানো অসম্ভব। এরই মধ্যে ওরা আমাদের রিসেপশন তছনছ করে দিয়েছে। আমি পুলিশে খবর দিয়েছি, কিন্তু—', অল্প থেমে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এত বড়ো রিস্ক আমাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। আপনাকে অন্য কোথাও যেতে হবে।'

ওরা কি এগিয়ে আসছে? অন্তত চিৎকার শুনে তাই মনে হবে। কোনরকমে নিজেকে সংযত করে বললাম, 'আপনি ভাববেন না। ওরা সম্ভবত ভুল করে আমাকে খুঁজছে—।' দাঁত না পরায় মুখ থেকে শব্দগুলো এলোমেলো হয়ে বেরুতে লাগল। বললাম, 'আমি ওদের ফেস করব।'

'আর ইউ ম্যাড!' বিব্রত ম্যানেজার আর দাঁড়ালেন না।

ঘরে ঢুকে আমি টেব্লিলের দিকে এগোলাম। দাঁতের পাটি দুটো পাশাপাশি সাজানো। মুখে ভরতে গিয়ে আমার হাত কাঁপতে লাগল। কোনোরকমে লাগিয়ে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে আল্‌গা হয়ে গেল—বোধহয আমার মাড়ির মাপ ছোট হয়ে গেছে! আমি আবার চেষ্টা করলাম এবং একইরকম অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘামতে ঘামতে ভাবতে লাগলাম, এখন কী করা উচিত, এখন কী করা উচিত!

বাঁধানো দাঁতগুলোকে বাগে আনতে ভীষণ সমস্যায় পড়লাম আমি। হয়তো ডাক্তারের কথাই ঠিক। আমি খুব দেরি করে ফেলেছি।

টিফিনের সময় ক্লাসে কেউই থাকে না। কাত্যায়নী টিফিনের বাক্স বের করে সুবর্ণাকে ডাকল, 'আয় ভাই, টিফিনটা সেরে নিই।'

সুবর্ণা তার ঝোলা থেকে একটি সুদৃশ্য কৌটো বের করল, 'এখানে না খেয়ে মেয়েদের কমনরুমে চল্। সেই হাঁদাকান্ত প্যাটপেটিয়ে চেয়ে আছে।'

কাত্যায়নীর মুখে গরম হাওয়া লাগল, 'দেখুক। এটা আমাদের ক্লাস, আমরা খাব।'

দুই সুন্দরী যখন মনোযোগ দিয়ে আহার শুরু করতে যাচ্ছে তখন কিঞ্চিৎ দূরে বসা শ্যামাকান্ত আর পারল না। তার বুক কেঁপে উঠল এবং দুই নাসারন্ধ্র কাঁপিয়ে বাতাস বেরিয়ে এল। ক্লাসরুমে একটা চমৎকার গন্ধ পাক খাচ্ছে। সেই গন্ধ যেন শ্যামাকান্তের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আঘাত শুরু করল। শ্যামাকান্ত উঠল। তার শরীর বলবান কিন্তু সেই সঙ্গে মেদের আধিক্য থাকায় বেশি ভারী দেখায়। প্রথমে সে প্যান্টশার্ট পরত। ইদানীং এক বন্ধুর পরামর্শে ধুতি পরে। মধু যেমন মৌমাছিকে টানে শ্যামাকান্ত সেই মতো হাজির হল সুন্দরীদের সামনে। আর তখনই কাত্যাযনী বলে উঠল, 'এই রে সেরেছে!'

সুবর্ণা মুখ তুলে তাকালেই শ্যামাকান্ত বলল, 'বড় মিষ্টি গন্ধ। আমাদের বাড়িতে তো আর এসব হয় না। গন্ধে গন্ধে চলে এলাম।'

কাত্যায়নী মুখঝামটা দিল, 'কেন হয় না?'

'কে করবে? আমাদের বাড়ি তো মরুভূমি।'

'মরুভূমি মানে?'

'বলছি। ওটা বুঝি ডিমের ডেভিল?' আঙুল বাড়িয়ে সুবর্ণার কৌটো দেখাল শ্যামাকান্ত।

সুবর্ণা হকচকিয়ে গেল, 'আপনি খাবেন?'

'ডিম আমার প্রিয়। খুব প্রিয়। আমি প্রায়ই ডিমের স্বপ্ন দেখি। সার সার ডিম, নাদুসনুদুস, নিটোল। আমি ডিমের ওপর শুয়ে আছি—।'

'আপনি শুলে কোন ডিমই আর আস্ত থাকবে না।' কাত্যায়নী মুখ ফেরালো।

সুবর্ণা একটু ইতস্তত করে ডিমের ডেভিল তুলে দিল শ্যামাকান্তের হাতে। খাদ্যদ্রব্য একটি মানুষের মুখ কতটা প্রফুল্ল করতে পারে এর আগে সে জানত না। শ্যামাকান্ত চিবোতে চিবোতে অস্পষ্ট গলায় বলল, 'নুনটা একটু কম কিন্তু জিনিসটা জম্পেশ।'

কাত্যায়নীর যেন একটু কৌতুক বোধ হল। সে একটা বড় 'আবার খাব' সন্দেশ এগিয়ে দিল, 'মরুভূমির কথা কি যেন বলছিলেন?'

ততক্ষণে সন্দেশ চালান হয়ে গেছে। শ্যামাকান্তর দুই চোখ আবেগে বুজে আসছিল, 'কেউ নেই। শুধু বাবা দাদারা আর আমি। আমরা সবাই মা-মরা। বোনও নেই। রান্না করে হরিদা। পোস্তর ঘাঁট আর ভাত। থার্ড আইটেম জানে না। মাছ আসে না বাড়িতে, জানেন?'

'সেকি? কেন?' সুবর্ণার ঠোঁট থেকে শব্দ দুটো ছিটকে এল।

'বাবা বলেন তিনি মরলে মা বিধবা হতেন। মা কি তখন মাছ খেতেন? খেতেন না।

এখন মা নেই তাই বাবা সেই অনারে মাছ খাবেন না। মেজদা ঠাট্টা করে বলে, বাবার নিশ্চয়ই অল ইন্ডিয়া বিধবা অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হবার ইচ্ছে।'

কাত্যায়নী ফোঁস করল, 'ইস্‌স!'

'আর কি বলব! বাড়িতে রোজ ভোরে চিরতার জল, দুটি বিস্কুট এবং হরলিক্স, নো চা। তারপর ফল, ফলের রস। তারপর পোস্ত অ্যান্ড ভাত—! আর একটি মিষ্টি হবে?' কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়ায় সুবর্ণা প্রথমে ধরতে পারেনি! শেষ পর্যন্ত নিজের সন্দেশ তুলে দিল সে শ্যামাকান্তর হাতে।

শ্যামাকান্ত বলল, 'আমার না, কারও সঙ্গে এখনও ভাব হল না। নতুন ক্লাস তো।'

কাত্যায়নী জানতে চাইল, 'আপনি বাড়ি থেকে টিফিন আনেন না কেন?'

'কে করে দেবে? হরিদা টাইম পায় না। বাবা রোজ একটা করে টাকা দেয়, তা সেটা কলেজে আসার আগেই শেষ হয়ে যায়। এক টাকার কোন দাম আছে, বলুন?'

দুই সুন্দরী স্বীকার করতে বাধ্য, না নেই।

পরদিন কলেজে বের হবার আগে সুবর্ণা তার মাকে বলল, 'মা, আজ টিফিন একটু বেশি করে দিও।'

'কেন রে?'

'আর বোলো না। আমাদের ক্লাসে এক হাঁদাকান্ত আছে, খাবার সময় এমন জুলজুল করে চেয়ে থাকে না যে খাওয়া যায় না।'

'সেকি? চেয়ে থাকে কেন?'

'কাল আমার সব খাবার খেয়ে নিয়েছে। মা বেঁচে নেই। বোধহয় পেটুক।'

সুবর্ণার ছোটবোন শুনছিল, বলে উঠল, 'ওর সামনে খাস কেন? অন্য জায়গায় গিয়ে খেতে পারিস না? হাঁদাকান্ত ওর সত্যিকারের নাম?'

সুবর্ণা হাসল, 'কাত্যায়নী ওকে তাই বলে। হাঁদা নয়, শ্যামা—শ্যামাকান্ত।'

সুবর্ণারা থাকে মফঃস্বলে। বালিব্রিজ পেরিয়ে গেলেই তো মফঃস্বল। সেখানকার মানুষ শ্যামবাজারে যাওয়ার সময় এখনও বলেন কলকাতায় যাচ্ছি। তাকে কলেজে আসতে হয় রীতিমত পরিশ্রম করে। দু'বার বাস পালটাতে হয়। কাত্যায়নী থাকে বাগবাজারে। নতুন কলেজে এই দুজনের খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। পরদিন টিফিনের সময় শ্যামাকান্তকে আর ডাকতে হল না। কৌটো খোলার আগেই সে সটান চলে এল। কাত্যায়নী বলল, 'আজ আবার কি মনে করে?'

'বাঃ, কাল বলে দিলাম না!' শ্যামাকান্ত বিন্দুমাত্র নিষ্প্রভ নয়।

সুবর্ণা হেসে বলল, 'আপনি খুব খেতে ভালবাসেন, না?'

'খুউব। তবে একেবারে বেশি নয়। একটু একটু করে। দু'তিনঘণ্টা পর পর খিদে পেয়ে যায় আমার। কি আছে আজ?'

সুবর্ণার কৌটোয় যদি ডিমের ওমলেট বের হল তো কাত্যায়নী একদম ডিমসেদ্ধ, নুন মরিচ মাখানো। সুবর্ণা লক্ষ্য করল ডিম দেখামাত্র শ্যামাকান্তর চোখ চকচক করে উঠল। একটা অপার্থিব খুশি ফুটে উঠল তার মেদজমা মুখে। যেন পৃথিবীর জাগতিক সুখ-দুঃখের বাইরে চলে গেছে সে এই মুহূর্তে। ঘাড় কাত করে বলল, 'দুজনেই ডিম! এত খাওয়া যায়! দিন, একটু একটু করে খাই।'

দুই সপ্তদশী দেখল একটা মানুষের তৃপ্তি কিসে হয়। শ্যামাকান্তর চোখ বন্ধ, দুই

চোয়াল নড়ছে। কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করল, 'বাগবাজারের রসগোল্লা খেয়েছেন?'

শ্যামাকান্ত সেই অবস্থায় ঘাড় নাড়ল। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'গিরিশ ঘোষের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকের গলিতে একটা দোকান আছে। সেখানে যা রসগোল্লা করে না! অনেকদিন খাইনি।'

'ওটা আমাদের পাড়া।' কাত্যায়নী সগর্বে জানাল।

'তাই? একদিন আনবেন তো!'

'ইস্! রসগোল্লা বয়ে আনব! খেতে হলে যেতে হবে।'

'যাব। কবে যাব? আমার কাছে কিন্তু পয়সা নেই।'

কাত্যায়নী খিলখিল করে হেসে উঠল। সুবর্ণার মনে হল ছেলেটি সত্যি সরল। কিন্তু খাওয়া ছাড়া সতেরো-আঠারো বছরের ছেলের অন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকবে না এ কেমন কথা! সেইসঙ্গে কাত্যায়নীর ঝরনা-হাসি তাকে কিঞ্চিৎ গম্ভীর করল। পয়সা নেই শুনে অত হাসির কি আছে?

বাগবাজারের পথটুকু শেষ হতে সময় লাগল না। কলেজ শেষ হলে সুবর্ণা বেশি দেরি করে না বাড়ি ফিরতে, আজ কাত্যায়নীর চাপে এল। গিরিশ ঘোষের বাড়ির কাছে সেই মিষ্টির দোকান দেখে হতভম্ব হল সে। কাত্যায়নীর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল এই জীর্ণ দোকানটিকে সে আগে দ্যাখেনি। কিন্তু সারা রাস্তা বকর বকর করতে করতে আসা শ্যামাকান্ত বলল, 'হেঁ হেঁ, এদের রসগোল্লা যেমন তুলতুলে তেমন টাইট। মুখে দিলেই টের পাবেন।'

মিষ্টিতে মেয়েদের সচবাচর আগ্রহ হয় না। দুই সপ্তদশী শ্যামাকান্তর অনুরোধ রাখতে পারল না। এক ডজন রসগোল্লা খেয়ে শ্যামাকান্ত বলল, 'আজ এই অবধি থাক। বেশি খেলে স্বাদটা ঠিক পাওয়া যায় না।'

কাত্যায়নীর বাড়ি বেশি দূর নয়। সুবর্ণাকে শ্যামবাজার থেকে বাস ধরিয়ে দিতে শ্যামাকান্ত হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল, 'নকুড়ের সন্দেশ খেয়েছেন?'

ঘাড় নড়ল সুবর্ণা, 'না।'

'আঃ ফার্স্ট ক্লাস! কিন্তু বড্ড দাম।'

'কত করে?'

'দু-টাকা আড়াইটাকার নিচে কড়াপাক মুখে দেওয়া যায় না।'

'আপনি বুঝি খুব মিষ্টি খেতে ভালবাসেন?'

'কেন, একথা মনে হল কেন?'

'বয়সের তুলনায় আপনি বেশি মোটা, আর সবসময় মিষ্টি মিষ্টি করছেন!'

'তা যদি বলেন আমি ঝালটালও বেশ ভালবাসি। ওই যেমন শ্যামবাজারের মোড়ে একটা কষা মাংসের দোকান আছে, দারুণ! গ্রে স্ট্রিট আর সেন্ট্রাল এভিন্যুর মোড়ে একটা দোকানে চিংড়ি মাছের ফ্রাই করে। খেলে মুখ জুড়িয়ে যায়। তারপর ধরুন বৌবাজারে—।'

সুবর্ণা তাকে থামিয়ে দিল, 'থাক। এটুকু বুঝেছি কলকাতায় যেখানে ভাল খাবার পাওয়া যায় তার সব হদিশ আপনি জানেন। আমি তো থাকি বালিতে। সেখানে কি ভাল পাওয়া যায় বলুন তো?'

শ্যামাকান্ত ঘাড় চুলকালো। বালির খবর তাব জানা নেই। সে বলল, 'ঠিক আছে।

দু-দিন সময় দিন। তবে ভাল জিনিস না হলে বলব না।'

শ্যামাকান্তর পরিবারের সর্বময় কর্তা তার পিতা কৃষ্ণকান্ত। পাকানো চেহারার এই মানুষটির জীবিকা ওকালতি। চারটি সন্তান হবার পর স্ত্রী গত হলে আর বিয়ে করেননি। কিন্তু অত্যন্ত সতর্কভাবে সন্তানদের মানুষ করতে চেষ্টা করছেন। তাঁর পরিবারে বেশ কিছু নিয়ম আছে। স্ত্রীজাতি সম্পর্কে অনাগ্রহ তাঁর একটি। বড় তিন ছেলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত কিংবা হতে চলেছে। তাদের বিয়ে দেবার কথা এখনও ভাবেননি কৃষ্ণকান্ত। ছেলেরাও বাবাকে ভক্তি এবং ভয় করে। কৃষ্ণকান্তর একমাত্র দুশ্চিন্তা কনিষ্ঠ শ্যামাকান্তকে নিয়ে। পড়াশুনায় মতি নেই। ইংরেজি কিংবা ইকনমিক্সের বদলে বাংলায় অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছে। ভবিষ্যৎ ঝরঝরে। কলেজের ক্লাস শেষ হলেই বাড়ি ফিরে আসার কথা, কিন্তু সে প্রায়ই দেরি করছে। এবং চাকর হরি তাকে জানিয়েছে শ্যামাকান্ত বৈকালিক জলযোগ বাড়িতে করতে চায় না। পি সি রায় বলেছিলেন, মুড়ি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু। শ্যামাকান্ত কিছুদিন হল সেই মুড়ি স্পর্শ করছে না। অথচ পেটুক এই ছেলেটি উপবাসে থাকার পাত্র নয়—এ বিষয়ে নিশ্চিত কৃষ্ণকান্ত। তাঁর কেবলই মনে হয় শ্যামাকান্ত মায়ের ধাত নিয়ে জন্মেছে। যখন বেঁচে ছিল তখন নিয়ত কৃষ্ণকান্তর সঙ্গে ঝগড়া করত। মরে গিয়ে সে তাকে টাইট দিয়ে গেল। কিন্তু কে কাকে টাইট দেয়!

মা-মরা ছেলেটির ওপর সুবর্ণার মায়ের স্নেহ পড়েছে। মেয়েকে তিনি ধমকেছেন, একটু না হয় খেতে ভালবাসে তাই নিয়ে অত ঠাট্টা কিসের! নিজের হাতে শ্যামাকান্তকে লুচি বেগুনভাজা খাইয়ে বলেছিলেন, 'সময় পেলেই এসো বাবা।'

খুব খুশি হয়েছিল শ্যামাকান্ত। সুবর্ণাকে বলেছিল, 'তোমার চেয়ে তোমার মা অনেক বেশি ভাল। ঠিক মা-মা ভাব।'

সুবর্ণা চোখ তুলেছিল ওপরে, 'ওমা, এই যে আপনাকে সারা কলকাতায় ঘুরে ঘুরে চপ কাটলেট ফ্রাই মিষ্টি খাওয়াচ্ছি তার কোনও মূল্য নেই, না?'

'তা বলিনি, তা বলিনি।' শ্যামাকান্ত ঢোক গিলল।

'আর কি বলতে বাকি রেখেছেন! কাত্যয়নী আজকাল আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না, জানেন?'

'কেন, কেন? কথা বলে না কেন? এই তো পরশু, তোমাকে ফড়েপুকুরের দই খাওয়ালো। বাসস্টপে দেখা হতেই বলল, কি খাবেন? তা ওখানে তো দই ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না।'

'আপনি দই খেলেন?' সুবর্ণা আঁতকে উঠল, 'কেন, আমাকে বললে আমি দই খাওয়াতে পারতাম না? সারারাজ্য ঘুরে ঘুরে কত কি খাওয়াচ্ছি আর সামান্য দই পেয়ে তা-ই খেতে যাওয়া হল! ছি ছি-ছি! যান আর আপনাকে আমি কিছু খাওয়াব না।'

'কিন্তু কাতু তো আপনার বন্ধু।'

'ইস্, আবার কাতু বলা হচ্ছে আদর করে! না, খাওয়ানোর ব্যাপারে কোনও বন্ধুটন্ধু নেই। খাওয়ানো ইজ খাওয়ানো। ওকে কাতু বললেন, আমাকে কি বলে ডাকবেন?' তীব্র গলায় জিজ্ঞাসা করল সে।

'কি বলে, সুবর্ণা! না, না। সুবু! সুবু! ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। কি কথা হল?'

'এই খাওয়া-দাওয়ার কথা। খিদিরপুরে—। ওই যাঃ, আপনাকে একটা কথা বলতে খুব ভুলে গিয়েছিলাম! বলব?'

'কি?'

'দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে নেমেই একটা দোকান পাবেন। চমৎকার ছানার জিলিপি করে। এরকম ছানার জিলিপি জীবনে খাননি।'

সুবর্ণা ঘাড় কাত করে তাকে দেখল। তারপর বলল, 'চলুন। আপনাকে আজ ছানার জিলিপি খাওয়াব। তারপর হেঁটে বালিব্রিজ পেরিয়ে বাড়ি ফিরব।'

এক ডজন ছানার জিলিপি কম নয়। সুবর্ণা দেখল শ্যামাকান্তর সেটা শেষ করতে বিলম্ব হল না। সে নিজে একটির বেশি খেতে পারেনি। এত মিষ্টি যে শরীর গুলিয়ে ওঠে। খাওয়া শেষ হলে ওরা হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে সুবর্ণা বলল, 'আপনি এত খবর পান কি করে, কোথায় কি আছে—-।'

'এইটেই তো আসল কথা। পেতে হয়।' শ্যামাকান্ত হাসল।

'আচ্ছা কাত্যায়নী আর আমি—কে বেশি ভাল?'

'আপনি।'

'কেন?' সুবর্ণার বুকের রক্ত চলকে উঠল।

'আপনি রোজ আমায় খাওয়ান। মাসীমা কি ভাল খাবার করেন!'

বালিব্রিজের ওপর ওরা দাঁড়াল। পাশাপাশি। রেলিং-এ হাত রেখে সুবর্ণা ঝুঁকে নদী দেখছিল। গঙ্গার বুক থেকে জলো গন্ধ উঠছে। বাতাসে হিমভাব। নৌকো ভাসছে ইতস্তত। দূরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখা যাচ্ছে। পবিত্র সময়। শ্যামাকান্তও নদী দেখছিল। দেখতে দেখতে খেয়াল হল বাবা বলেছেন যে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরতে। আজও দেরি হবে। কিন্তু ছানার জিলিপি বাবার চেয়ে বেশি মিষ্টি। সে কি করবে? সে শুনল সুবর্ণা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে গুনগুন করছে। রবীন্দ্রনাথের গান। সে নিজে অবশ্য একটা গান জানে। সেটা এইসময় গাওয়া ঠিক নয়। পেটভর্তি খাওয়ার পর গান গাইলে তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়। শ্যামাকান্ত বাঁ দিকে তাকাতেই সুবর্ণার কনুই এবং জামার ঠিক নিচের হাত দেখতে পেল। এবং তখনই তার চোখ স্থির হল। কনুই-এর ওপরে কিছু একটা আটকে আছে। মিষ্টির দোকানে যখন টেবিলে হাত রেখে সুবর্ণা বসেছিল তখনই কি ওটা হাতে লেগে গিয়েছিল? সুবর্ণাকে বলতে সঙ্কোচ হল শ্যামাকান্তর। তার কেবলই মনে হচ্ছিল ওটা ছানার জিলিপির একটা টুকরো। দুটো হাত ভাঁজ করে রেলিং-এর ওপর রেখে সে দাঁড়িয়েছিল। চোখ সামনে রেখে সে ডান হাত বাঁ দিকে একটু বাড়িয়ে দিল। না, তবু নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। সে আঙুলগুলো প্রসারিত করল। তারপর আরও চেষ্টার পর শরীর না নাড়িয়ে সে সুবর্ণার কনুই স্পর্শ করা মাত্র একটা কম্পন টের পেল।

সে দেখল সুবর্ণা আচমকা ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার চোখমুখ আরক্ত। যথাসম্ভব দূরে সরে গিয়ে সে ফোঁস করে উঠল, 'আপনি আমার হাত ধরলেন যে? কি পেয়েছেন আপনি? আমি ফালতু?'

'না, না।' শ্যামাকান্ত তোতলাতে লাগল।

'তাহলে? বলুন, কেন আমার হাত ধরলেন?'

'মানে—ইয়ে—ছানার—মানে আমি আপনার বন্ধু—।'

'বন্ধু? ওরকম বন্ধুত্ব আমি চাই না। আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?'

শ্যামাকান্ত নিমেষে স্থির হয়ে গেল। তার চোখের সামনে অজস্র জিলিপি, রসগোল্লা, সন্দেশ, ফ্রাই এবং বেগুনভাজা নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল। সে চকিতে সেইসব খাদ্যবস্তুর বাগানে সুবর্ণাকে বেনারসীর ঘোমটা পরিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এল। এইসময় সুবর্ণা আর একবার তর্জন করতেই তার ধন্দ কাটল। সে অত্যন্ত নিরীহ হয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'যাঃ!' চকিতে আরক্ত হল সুবর্ণা। গঙ্গার ওপরে বড় বেশি ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আপনি একটা যাচ্ছেতাই! অত মোটা ছেলেকে আমি—। তার চেয়ে কাতুর কাছে যান।'

'কাতু?' বিড়বিড় করল শ্যামাকান্ত। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

'খবরদার, কাল থেকে ওর সঙ্গে গম্ভীর হয়ে কথা বলবেন।'

শ্যামাকান্ত যে ঘন ঘন বালি যাচ্ছে এখবর কৃষ্ণকান্ত পেয়ে গেলেন। পেলেন পুত্রের মুখ থেকেই। সেদিন একটা বিশেষ দরকারে বেলুড়ে যাচ্ছিলেন তিনি, পথে ওদের দেখতে পেলেন। শ্যামাকান্ত এবং একটি সপ্তদশী বোকা বোকা ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে। এই ভঙ্গিটা খুব মারাত্মক।

কৃষ্ণকান্ত ॥ তুমি আজ বিকেলে কোথায় ছিলে?

শ্যামাকান্ত ॥ বিকেলের কোন্ সময়ে বলছেন?

কৃষ্ণকান্ত ॥ বালিব্রিজে কি করছিলে?

শ্যামাকান্ত ॥ বালিতে যাচ্ছিলাম বাবা।

কৃষ্ণকান্ত ॥ আমাকে না বলে তুমি বালিতে যাচ্ছিলে? তোমার এত পরিবর্তন? ছি ছি!

শ্যামাকান্ত ॥ ছি কেন বাবা! বালিতে যাওয়া কি অন্যায়?

কৃষ্ণকান্ত ॥ নিশ্চয়ই। সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকলে তো বটেই। সেখানে কি দরকার?

শ্যামাকান্ত ॥ সুবর্ণাদের বাড়ি। সুবর্ণার মা আজ আমাকে দুধপুলি খাইয়েছেন। পুলিটা যা জমেছিল না!

কৃষ্ণকান্ত ॥ সুবর্ণা! ওটি কে?

শ্যামাকান্ত ॥ আমার ক্লাসে পড়ে। খুব ভাল মেয়ে। তুমি লাউ-চিংড়ি খেতে ভালবাস শুনে বলেছে শিখে নেবে।

কৃষ্ণকান্ত ॥ চুপ কর। দ্যাখো শ্যামা, তুমি জন্মমাত্র মাতৃহারা, আমিই তোমার পিতামাতা। কখনও এইসব স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়ো না। নারী নরকের দ্বারী। ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে। তোমার কোনও দাদা স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়ায়নি। তুমি উনিশবছর বয়সেই—! আর যেন না শুনি। তুমি ওই মেয়েটির সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ কর, এই আমার আদেশ।

শ্যামাকান্ত নিষ্প্রভ হয়ে বসে রইল। সে সুবর্ণাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর ওই বাড়িতে তার খাতির দশগুণ বেড়ে গিয়েছে। নিত্য কত রকমের খাওয়া-দাওয়া। বাবার হুকুম পালন করতে গেলে সুবর্ণাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তুলে নিতে হবে। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে এতসব খাবার-দাবার—। শ্যামাকান্তর মন খারাপ হয়ে গেল। কৃষ্ণকান্তর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস হচ্ছে না। সে ঠিক করল শেষবার সুবর্ণার বাড়িতে যাবে। গিয়ে বলে আসবে আর নয়, এই শেষ।

আজ কলেজের ছুটি। কৃষ্ণকান্ত আদালতে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র বেরিয়ে পড়ল। কলেজ

না থাকলে পয়সা পাওয়া যায় না। অতএব হাঁটা শুরু। পথে তার তিনরকম প্রিয় খাবারের দোকান পড়ল। পকেটে পয়সা নেই, পাশে সুবর্ণাও নেই। শ্যামাকান্তর বুক টনটন করছিল।

ভরদুপুরে শ্যামাকান্তকে দেখে একই সঙ্গে আনন্দ এবং লজ্জা পেল সুবর্ণা। ঘরে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করল, 'খেয়ে এসেছ?'

শ্যামাকান্ত মাথা নেড়ে না বলল। সুবর্ণার মা আড়ালে ছিলেন। শুনে বললেন, 'সেকি! হাতামুখ ধুয়ে নাও। আজ মুরগীর মাংস আছে, তাই—।'

শ্যামাকান্ত সুবর্ণার তৃপ্ত মুখেব দিকে তাকিয়ে মত পালটালো। এখনই বলা ঠিক হবে না। খাওয়া-দাওয়া সারা হোক। অনেক সময় পাওয়া যাবে।

অপরাহ্ণে শ্যামাকান্তর মনে হল আর বিলম্ব করা ঠিক নয়। জলখাবারটা এলেই বলে ফেলবে। ঠিক তখনই সুবর্ণা বলল, 'ঠাকুমা বায়না ধরেছে। মা বলছেন তোমাদের বাড়িতে লোক যাবে। এ মাসেই যদি লগ্ন ঠিক হয়—।'

শ্যামাকান্ত॥ লগ্ন? কিসের লগ্ন?

সুবর্ণা॥ আহা ঢং! লগ্ন কিসের তা জানেন না?

শ্যামাকান্ত॥ মাইরি বলছি, আমাদের বাড়িতে এইসব কথা কেউ বলে না।

সুবর্ণা॥ ঠিক আছে। লোক গিয়ে যখন পিতৃদেবকে বলবে তখন জানবেন।

শ্যামাকান্ত॥ পিতৃদেব? ওরে বাবা, কেউ যেন বাবার কাছে না যায়। বাবা এসব পছন্দ করেন না। খুব রাগী। উনি আমাকে বলে দিয়েছেন কোনরকম সম্পর্ক যেন তোমার সঙ্গে না রাখি।

সুবর্ণা॥ তার মানে?

শ্যামাকান্ত॥ আমি আর আসব না, সুবর্ণা।

সুবর্ণা॥ বেশ, তাহলে আপনি এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান এখান থেকে।

সুবর্ণা দ্রুত ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর কিছু সময় চুপচাপ বসে থাকল শ্যামাকান্ত। জলখাবারের আগেই কথাটা বলা ঠিক হয়নি। এরপর আর অপেক্ষা করা উচিত নয় বলে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। তার পা ভারী, হৃদয় ভারাক্রান্ত।

গলি থেকে বের হওয়ার আগেই সে নিজের নাম শুনতে পেল। পেছন ফিরে দেখল সুবর্ণার বোন হাঁপাচ্ছে, 'শ্যামাদা, শিগ্‌গির আসুন, দিদি কুয়োর ওপর উঠে বসেছে আর কাঁদছে।'

শ্যামাকান্ত বলল, 'যাঃ!'

'মাইরি বলছি। এই না মাইরি বললাম, চলুন গিয়ে নিজের চোখে দেখবেন।' মেয়েটি ছটফট করতে লাগল।

শ্যামাকান্তর শরীর অবশ হয়ে গেল। সুবর্ণা কুয়োর ওপরে কেন? সম্বিত ফেরামাত্র সে ছুটে গেল বাড়ির পেছনে। সেখানে একটি ডুমুরগাছের ছায়ায় কুয়োর ওপরে দু-পা তুলে উদাসীন ভঙ্গিতে সুবর্ণা বসে আছে। যেন পৃথিবীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। শ্যামাকান্ত মৃদু গলায় ডাকল, 'এই, ওখানে কেন?'

সুবর্ণা মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে নিচের দিকে তাকাল। সেখানে কালো জল।

শ্যামাকান্ত॥ নেমে এসো। আঃ, কি হচ্ছে কি?

সুবর্ণা॥ কেন, নামব কেন?

শ্যামাকান্ত॥ জলে আমার খুব ভয়। সাঁতার জানি না।

সুবর্ণা॥ বসে আছি তো আমি। যেখানে যাওয়া হচ্ছিল সেখানেই যাওয়া হোক। আসতে কে বলেছে!

শ্যামাকান্ত॥ তাই বলে তুমি আত্মঘাতী হবে?

সুবর্ণা॥ ভালই তো। শ্রাদ্ধ খেতে পাবে।

শ্যামাকান্ত আর এক পা এগোল, 'সুবু নেমে এসো।'

সুবর্ণা কোনও কথা বলল না। তাকে আরও উদাসীন দেখাল। কিন্তু চোখে জল দেখা দিল। মুহূর্তে কৃষ্ণকান্তর মুখ বিস্মৃত হল শ্যামাকান্ত। এই বিশ্বচরাচরের সব দৃশ্য মুছে গিয়ে শুধু সুবর্ণার চোখের জল বড় হয়ে উঠল। গভীর আবেগে সে বলল, 'সুবু, তুমি নেমে এস, আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

সুবর্ণা বলল, ভ্যাট!'

শ্যামাকান্ত বলল, 'সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো।'

সেদিন বিকেলে কৃষ্ণকান্ত খবরের কাগজ পড়ছিলেন। শ্যামাকান্ত তাঁর পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'চললে কোথায়?'

'বালি।' কম্পিত গলায় উত্তর হল।

'আবার বালি?' কাগজ রেখে সোজা হয়ে বসলেন কৃষ্ণকান্ত, 'তোমাকে সেখানে যেতে নিষেধ করিনি নির্বোধ?'

'হ্যাঁ, সেইটে বলতেই যাচ্ছি। একবার তো জানানো দরকার আর আমি যাব না। আপনি তো অভদ্র হতে বলেননি।'

'হুঁ। বেশ, জানিয়ে এসো। আর হরিকে দুধপুলি করতে বলেছি।'

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে মন খারাপ হয়ে গেল শ্যামাকান্তর। দুধপুলি তার প্রিয় এবং সেটা থেকে আজ বঞ্চিত হতে হচ্ছে। এইসময় সে বন্ধুদের প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়েও কাউকে সে দেখল না। সে প্রত্যেক বন্ধুকে বলেছিল ধুতি পাঞ্জাবি এবং দশটা টাকা পকেটে নিয়ে আসতে। তারা বরযাত্রী যাবে। আজ শ্যামাকান্তর বিয়ে।

সুবর্ণার এক মামা থাকেন আলিপুরে। তিনি সব শুনে এই বিয়েতে উঠেপড়ে লেগেছেন। তাঁর মতে ছেলের বাড়ি যদি কড়া হয় তাতে কোনও অসুবিধে নেই। একবার বিয়েটা চুকিয়ে ফেললেই সবাই সুড়সুড় করে মেনে নেবে। সুবর্ণার বাড়ির কারও কারও কিন্তু-কিন্তু ভাব ছিল, মামা সেটাকে উড়িয়ে দিলেন এই বলে, আঠারো বছরের ছেলেমেয়ের মনের মিলটাই আসল কথা।

শ্যামাকান্ত আজ বন্ধুদের তাই সেজেগুজে আসতে বলেছিল কিন্তু কেউ এল না। সে নিজে কৃষ্ণকান্তের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে বলে ভাল পোশাক পরেনি। পকেটে একটাকা বারো আনা পড়ে রয়েছে। এটা তার জমানো পয়সা, তাই নিয়ে সে বাসে চাপল।

বালিতে নামতেই মহাকাণ্ড। একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল, মামা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে সেটায় তুললেন। 'তোমার বরযাত্রীরা কোথায়?'

শ্যামাকান্ত বিরস গলায় জানাল, 'কেউ আসেনি।'

মামা বললেন, 'কোই পরোয়া নেহি। আমি বরযাত্রী রেডি করে রেখেছি।'

শ্যামাকান্ত খুব নার্ভাস। কৃষ্ণকান্তর মুখ বারংবার সামনে ভাসছে। সেটাকে মুছিয়ে সুবর্ণাকে আনতে চেষ্টা করেও পারছিল না। গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল এক অচেনা বাড়ির

সামনে। সেখানে দুজন সুন্দরী মহিলা অপেক্ষা করছিলেন, তাঁরা বললেন, 'বাবা শ্যামাকান্ত, যাও স্নান করে নাও। সেখানে পোশাক আছে।'

'আমি কোথায়—?' হরিণের মতো প্রশ্ন করল শ্যামাকান্ত।

'এখান থেকেই বিয়ে করতে যাবে।'

চারধারে সুন্দরী রমণীদের ভিড়, সুগন্ধ এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে মোহিত হয়ে গেল শ্যামাকান্ত। জীবনে প্রথমবার সিল্কের পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, সোনার বোতাম এবং আংটি পরে নিজেকে রাজকুমার বলে মনে হচ্ছিল। বিয়ের পর সুবর্ণা গর্বিতা রাজকুমারীর মতো তার পাশে বসে ফিসফিস করে বলল, 'এখন যা খাবার দেবে তার দিকে বেশি নজর দিও না।'

'তার মানে?'

'নতুন বরের বেশি খেতে নেই।'

কথাটা মনে ধরল না। মহিলারা যখন খাওয়াতে এলেন মনে হল এতদিন কেন তার বিয়ে হয়নি! এত খাবার! এত সুন্দরীর খোঁপায় ফুল! আঃ!

সেইরাত্রে কেউ ঘর থেকে যাচ্ছিল না। মধ্যরাত্রে শ্যামাকান্তের খুব ইচ্ছে করছিল সুবর্ণার হাত ধরতে। এই হাত তাকে এখানে এনেছে। কিন্তু প্রকাশ্যে সে হাত ধরে কি করে? কে যেন ফোড়ন কাটল, 'জামাই কিভাবে তাকিয়ে আছে দ্যাখ্, যেন ছানার জিলিপি খাবে!'

রাতটা কাটল। কিন্তু খুবই ক্ষিপ্ত হল শ্যামাকান্ত। এবং তখনই তার মনে হল এই প্রথম সে একটা গোটা রাত বাড়ির বাইরে না বলে কাটাল। এখন কৃষ্ণকান্তর সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। সকালের জলখাবারের ব্যবস্থা দেখার পর স্থির করল বাবার সামনে দাঁড়াবার দরকার নেই। এত আরাম এত খাবার ছেড়ে কোন্ পাগল সেখানে যায়!

কিন্তু বেলা বাড়ার পর বিয়েবাড়িতে ব্যস্ততা দেখা দিল। মামা এসে বললেন, 'তৈরি হয়ে নাও। বউ নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে তো!'

'বাড়ি? কার বাড়ি?'

'কেন? তোমার বাড়ি?'

'মাথা খারাপ! আমি সেখানে যেতে পারব না।'

'সেকি! বউ না নিয়ে গেলে লোকে বলবে কি? আহা, বাবার ভয় পাচ্ছ কেন? বউ নিয়ে গেলে দেখবে তিনি জল হয়ে গেছেন।'

'আমি আমার বাবাকে চিনি। আর এমন তো কথা ছিল না।'

'মানে?'

'আমার বিয়ে করার কথা ছিল, বউ নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ছিল না।'

'কোথায় থাকবে?'

'এখানে।'

সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধদ্বার সভা বসল আত্মীয়-অতিথিদের কান বাঁচিয়ে। বর বাড়ি ফিরছে না শুনলে টি-টি পড়ে যাবে। কি করা যায়! মামা বললেন, 'ঠিক হ্যায়। আমি আমার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা এমনভাবে বের করে দিন যেন ও বউ নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। পাড়ার লোক টের পাবে না।'

বিকেলে শ্যামাকান্ত বরবেশে সুবর্ণার পাশে বসে চলে এল আলিপুরে। বিশাল ফ্ল্যাট। নির্জন। সুবর্ণার মামা বললেন, 'এখানে কিছুদিন থাকো, এর মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মামী বললেন, 'বাবার কাছে ক্ষমা চাইলেই—।'

শ্যামাকান্ত মাথা নাড়ল, 'সে আমি জানি না। আমার বিয়ে করার, করেছি।'

মামা-মামীর মুখে মেঘ জমল।

সে রাতে বৃষ্টি নামল। সুখাদ্য খাওয়ার পর শ্যামাকান্ত দেখল সুবর্ণা নেই। সে দরজায় দাঁড়াল, 'ঘুম পেয়েছে।'

মামী বললেন, 'আহা, পাবেই তো। কত খাটুনি গেল। শুয়ে পড় বাবা।'

'সুবর্ণা কোথায়?'

'সে শুয়ে পড়েছে।'

'ওমা, আমি বিয়ে করে একা শোব?'

জিভ কাটলেন মামী, 'আজ তো বাবা কালরাত্রি। স্বামী-স্ত্রীতে মুখ দেখাদেখি নেই।'

'আমি ওসব কালরাত্রি মানি না। ওকে ডেকে দিন।' শ্যামাকান্ত ঘরে ফিরে বিছানায় গ্যাঁট হয়ে বসল।

মামা এলেন, 'বাবা শ্যামাকান্ত, হিন্দুধর্মের নিয়ম—অত অস্থির হয়ো না।'

'ধর্মটর্ম আবার কি? আমি কি নিয়ম মেনে বিয়ে করেছি?'

'করোনি?'

'মোটেই না। আমার বাবা জানে না, দাদারা জানে না। আমি কালরাত্রি মানি না।'

শেষপর্যন্ত সুবর্ণা এল, 'কি পাগলামি করছ? আজ আলাদা শুতে হয়।'

শ্যামাকান্ত॥ আমি পারব না। কাল থেকে আমি তুমি আলাদা নই।

সুবর্ণা॥ এতে খারাপ হবে।

শ্যামাকান্ত॥ হয় হোক, আমি তোমাকে ছাড়ব না।

সুবর্ণা॥ একসঙ্গে শুয়ে কি হবে তোমার?

শ্যামাকান্ত জবাব দিতে পারল না। তার তীব্র ইচ্ছে হচ্ছে একসঙ্গে শুতে। কিন্তু তাতে কি হবে তা সে জানে না। সে বলল, 'তোমার হাত ধরব।'

সুবর্ণা হাসল, 'পাগল!'

আলো নিভিয়ে সুবর্ণা বয়স্কা নারীর মতো তার পাশে শুয়ে পড়ল। বালকের ভঙ্গিতে শ্যামাকান্ত সুবর্ণার হাত দুই হাতে নিয়ে বুকে চেপে বলল, 'আঃ! অতিরিক্ত চিন্তা এবং পরিশ্রমে সে অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মধ্যরাত্রে তার মনে হল হাতটা নেই। ঘর অন্ধকার। এবং সে ক্রমশ বিছানার একপ্রান্তে চলে এসেছে। তার নিম্নভাগ ঝুলছে। এবং বিছানার ওধার থেকে তীব্র নাসিকাগর্জন ভেসে আসছে। সে দু-হাতে সুবর্ণাকে জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলতে গেল, মেয়েদের নাক ডাকতে নেই, কিন্তু সেই মুহূর্তে সে একটি পুরুষ্টু গোঁফের খোঁচা পেল। সুবর্ণা নেই। দরজা খোলা। তার বিকল্প মামা ঘুমের ঘোরে মামীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আঃ, বিরক্ত করো না!'

রসনামঙ্গল

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ইস্কুল থেকে ফেরার পথে ভুবন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে দেখা। লাঠি হাতে গলায় চাদর ঝুলিয়ে সরকারদের বৈঠকখানায় দাবা খেলতে চলেছেন। আমাকে দেখে বললেন—এই যে পল্টু, ভালই হল দেখা হয়ে। সন্ধের দিকে একবার আমার বাড়ি যাস তো, তোর জেঠিমা ডেকেছেন—

—আমায় ডেকেছেন জেঠিমা?

—হ্যাঁ রে বাপু। কী একটা দরকারের কথাও যেন বলে দিয়েছিল, সেটা এখন আর মনে পড়ছে না। যা হোক, তুই একবার যাস—

ফুটবল খেলা সেরে হাতমুখ ধুয়ে ভুবন জ্যাঠামশায়ের বাড়ি গেলাম। জেঠিমা আমাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন—এই যে তুই এসেছিস। সব শুনেছিস তো কর্তার কাছে?

—আজ্ঞে না জেঠিমা। উনি শুধু বললেন আপনি ডেকেছেন—

—কেন তা বলেনি?

—না তো। বললেন কী একটা দরকারের কথা ছিল, কিন্তু মনে করতে পারছেন না!

আরামের নিঃশ্বাস ফেলে জেঠিমা বললেন—থাক্ তাহলে সব ঠিকই আছে। তাই ভাবি —কর্তাকে বলতে না বলতেই তোকে গিয়ে সব খবর দিয়েছেন মনে করে—এ কর্তার হল কী? শরীর খারাপ করল না তো? তা দেখছি ঠিকই আছে, আদ্দেক ভুলে গিয়েছেন—

—কী ব্যাপার জেঠিমা? কী হয়েছে?

—ভালই ব্যাপার বাবা। সামনের আষাঢ়ে মিনুর বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। পাত্তর সেই আমতলার নিবারণ চাটুজ্যের বড় ছেলে। এই বুধবার তারা মিনুকে আশীর্বাদ করতে আসবে। দুপুরে আসছে, আশীর্বাদ করে খাওয়াদাওয়া সেরে বিকেলে যাবে। পাত্তরপক্ষ বলে কথা, আমাদের মানসম্মান রাখবার ভার তোরই ওপর বাবা পল্টু—

সে আবার কী! মিনুদির বিয়ে হচ্ছে খুব ভাল কথা, বাঁড়ুজ্যেরা খাওয়ায় ভাল কিন্তু মানসম্মান রাখার দায় আমার ওপর কী রকম?

বললাম—আমায় কী করতে হবে বলুন, বন্ধুদের নিয়ে আদর-আপ্যায়ন বরং—

—না বাবা, সে সব নয়। সেদিন মাংসটা তোকে রাঁধতে হবে বাবা। গেল শীতে চড়ুইভাতির দিন তুই যা মাংস রান্না করেছিলি, খেয়ে সারা গাঁয়ের লোক ধন্য ধন্য করেছিল। সেই রকমটা আর একবার করতে হচ্ছে বাবা—

জীবনে প্রথম খ্যাতির আস্বাদ পেয়ে—হোক সে খ্যাতি মাংস রান্নার—গৌরবে আমার বুক ফুলে উঠল। বললাম— এ আর বেশি কথা কী জেঠিমা? মিনুদির বিয়ে হবে, আমাদের তো কাজ করতে হবেই। ক-জনের জন্য রান্না জেঠিমা?

—পাত্তরপক্ষের লোক আসবে জনাতিরিশ। তার ওপর বাড়ির লোক, গাঁয়ের দু-চারজন মুরুব্বি—সবমিলিয়ে ষাটজন মত হবে। রামহরিকে বলা আছে, সে মেদিয়ার হাট থেকে দুটো পাঁঠা কিনে আনবে আগের দিন। মশলা বাটা, জোগান দেওয়া—সব লোক ঠিক করা আছে। তুই শুধু মনোযোগ দিয়ে রান্নাটা করবি—

—ঠিক আছে জেঠিমা। আমি সকাল ৯-টা নাগাদ চলে আসব। আপনি রামহরিদাকে বলবেন মাংসটা সাইজমাফিক টুকরো করে রাখতে।

বুধবার পাড়ার কোনও ছেলেমেয়েই ইস্কুলে গেল না। কোলকাতা থেকে অনেক দূরে বলেই বোধহয় আমাদের এখানে এখনও মানুষে মানুষে ভালবাসা বজায় আছে। নটা বাজার বেশ কিছু আগেই ভুবন জ্যাঠার বাড়ি হাজির হয়ে দেখলাম রৈ রৈ কাণ্ড বেধে গিয়েছে। বিরাট উঠোনের ওপর রোদ্দুর আড়াল করবার জন্য চট টাঙানো হয়েছে। মাটিতে বড় বড় দুটো উনুন খুঁড়ে তাতে কাঠ সাজানো হচ্ছে। ভুবন জ্যাঠার দশ-বারোজন প্রজা এসেছে কাজে সাহায্য করতে আর নেমন্তন্ন খেতে। প্রজা মানে এরা ভাগে জমি চাষ করে। কিন্তু জ্যাঠামশাই মানুষ ভাল, কক্ষনো অন্যায্য তাগাদা করেন না, ঝগড়াঝাঁটি করেন না, সেজন্য এদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব সুন্দর। ওদিকে বৈঠকখানা ভরে গিয়েছে বুড়োমানুষদের ভিড়ে। ঘন ঘন কাঁচি সিগারেট চলছে। সবাই নানারকম পরামর্শ দিচ্ছে, ভুবন জ্যাঠা সবাইকে 'হ্যাঁ' বলছেন। একদিকে দুজন লোক বসে শিলে তাল তাল মশলা বাটছে।

আমি প্রথমে কিছুক্ষণ মাংস কাটার তদারক করলাম। তদারক করবার অবশ্য কিছুই ছিল না, কিন্তু আমি যে রান্নার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ সেটা বোঝাবার জন্য মাংসের টুকরো মাঝারি রাখতে বললাম, মশলা যেন যথেষ্ট মিহি করে বাটা হয় সে বিষয়ে কর্মরত দুজনকে সতর্ক করে দিলাম। হাঁটুর ওপব ধুতিপরা খালি-গা দু'তিনজন চাষাভুষো মানুষ একটু দূরে আমার দিকে সসম্ভ্রমে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজন অপরজনকে বলছে—এই দাদাবাবুকেই ডেইকে এনেচে রানবার জন্যি—

অপরজন বলছে—বয়েসডা কাঁচা মনে হতিচে না? পারপে তো?

—পাবপে রে, পারপে! চলনবলন দ্যাখ না, এলেম আছে—

গৌরবে স্ফীত বুকে আমি উনুনে বিশাল কড়াই চাপিয়ে মাংস কষবার উদ্যোগ করতে লাগলাম। একজন জোগানদারকে ডেকে বললাম—হাতের কাছে কাঠ তৈরি রাখবে, সবসময় সমান আঁচ না হলে রান্না খারাপ হয়ে যাবে। দেখি—না, অত মোটা নয়—মাঝারি কাঠ নাও, যাতে দিলেই জ্বলে ওঠে—

লোকটি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে কাঠ জড়ো করতে লাগল।

কষবার সময় অবশ্য একটু ঝামেলা উপস্থিত হল। চড়ুইভাতিতে বড়জোর পনেরো কি কুড়িজনের জন্য রান্না করেছি, ষাট-সত্তরজনের মাংস রাঁধবার অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। প্রায় শাবলের মত মোটা খুন্তি দু'হাতে ধরে নাড়তে গিয়ে দু-এক টুকরো মাংস কড়া থেকে ছিটকে আগুনে পড়ে গেল। জোগানদারটি বলল—এঃ হে বাবু, পইড়ে গেল—

গম্ভীরভাবে বললাম—পড়েনি, ইচ্ছে করে ফেলেছি। ওকে বলে ব্রহ্মার ভুজ্যি, রান্না শুরু করবার সময় ঠাকুরকে নিবেদন করতে হয়—

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা চাষী দুটির মধ্যে একজন তার সঙ্গীকে বলল—দেখলি তো? কী বলেছিলাম তোরে? এলেমদার লোক! কায়দা করে হাতের এমন এক মোচড় দেলে—ঠিক চার টুকরো গিয়ে আথায় পড়ল—

সন্ত্রস্ত হয়ে ভাবছি পরবর্তী দুর্ঘটনাটা কোন দেবতার নামে উৎসর্গ করা যায়, এমন সময়ে জেঠিমা এসে বললেন—রান্না চড়িয়ে দিয়েছিস দেখছি। বেশ ভাল। তা তোর সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল পল্টু—

—কি কথা জেঠিমা? বলুন—

—বলতে ভারি লজ্জা করছে, তুই আবার কী মনে করবি!

অবাক হয়ে বললাম—কী এমন কথা জেঠিমা?

—বাবা, পাত্তরপক্ষ যখন খেতে বসবে, তখন—ইয়ে, বলা হবে মাংস রান্না করেছে আমাদের মিনু, কেমন? মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে এসব একটু করতে হয়, বুঝলি না? রাগ করিস না বাবা, তোরই তো দিদি—

শহীদদের মনোভাব কেমন হয় বুঝতে পারলাম। তারাও তো নিজের জন্য কিছু করে না। দেশ স্বাধীন হতে হতে সাধারণত তারা দেয়ালে ছবি হয়ে যায়। বললাম—তাতে কী জেঠিমা, তাই বলবেন—

জেঠিমা পাকা লোক, কাছাকাছি যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মুখে মুখে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। তারপর বড়ছেলে সুধাংশুকে বললেন বাড়ির এবং পাড়ার যত ছেলেপুলে এসেছে তাদের একজায়গায় করতে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সুধাংশুদা গোটা সতেরো-আঠারো বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েকে তাড়িয়ে নিয়ে এলেন। জেঠিমা হেঁকে বললেন—এই সব লাইন দিয়ে দাঁড়া—প্রথমে জেঠিমা তাদের নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতার মাধ্যমে মূল বিষয়টি বোঝালেন, তারপর একে একে তাদের আলাদা করে তালিম দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রত্যেকে ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝে গেল। কেবল গোল বাধল পাঁচু হালদারের ছোট ছেলেকে নিয়ে। ঢিলে হাফপ্যান্ট কোমরের কাছে মুঠিয়ে ধরে নাক টানছিল আর বুঝতে না পারার দৃষ্টিতে ঘটনাবলীর ওপর নজর রাখছিল। সবশেষে জেঠিমা তার সামনে গিয়ে বললেন—এই কুচো, বল আজ মাংস কে রান্না করেছে?

ফোঁ করে নাক টেনে কুচো বলল—পল্টুদা।

জেঠিমার কামানগর্জন—না! রান্না করেছে মিনুদি। পাত্তরপক্ষ জিজ্ঞেস করলে তাই বলবি।

রন্ধনরত আমার দিকে নির্দেশ করে কুচো বলল—ওই যে পল্টুদা রাঁধছে!

—জানি, সে আমিও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তা বলবি না, বলবি মিনুদির রান্না। কুচো মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

—ও মাথা হেলালে চলবে না! কে মাংস রেঁধেছে জিজ্ঞাসা করলে কী বলবি?

—মিথ্যা কথা বলব।

একমুহূর্তের জন্য জেঠিমার মুখখানা কেমন যেন দেখাল। তারপর সামলে নিয়ে তিনি বললেন—পাকামি করিস না! শুধু যা বলতে বলছি, তাই বলবি—

এদিকে আমি একমনে মাংস কষে চলেছি। চারদিকে গ্রাম্য মানুষদের একটা ভিড় তৈরি হয়েছে। তারা আমার রন্ধনপদ্ধতি সম্বন্ধে নানারকম সশ্রদ্ধ মন্তব্য করছে।

কঠিন কাজে হাত দিয়েছি সেটা বুঝলাম মাংসে জল দেবার পরে। ছ্যাঁক করে একটা শব্দ হয়েই কড়া জুড়ে বুজবুজ করে ফেনা উঠতে লাগল। হাতা দিয়ে যত কেটে ফেলে দিই, তাতে আরও ফেনা ওঠে। জলটাও বেশি দেওয়া হয়ে গেল কিনা কে জানে, ঝোলে কোনো রঙ ধরলো না। কড়াইয়ের প্রায় কানায় কানায় ভর্তি ফ্যাকফেকে ঝোল—আর তার মধ্যে প্রচুর ফেনা।

সাহস বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বোধহয় আমার মুখের ভাবে কিছু একটা ফুটে উঠে থাকবে। কারণ একটু পরেই দেখি কে একজন জেঠিমাকে ডেকে নিয়ে আসছে।

কড়ার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই তাঁর মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল।—আমার মিনুর কী হবে বাবা পল্টু! ছেলের বাবা যে শুনেছি বড্ড খেতে ভালোবাসে—

মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বললাম—একটা উপায় আছে জেঠিমা।

জেঠিমা দৈববাণী শুনতে পাওয়ার মত মুখ করে আমার দিকে তাকালেন।

বললাম—আপনি বরং নিমন্ত্রিতদের বলুন মাংসটা আমিই রেঁধেছি। তাহলে দোষ কেটে যাবে। ওঁদের সামনে রান্না গোলমাল করে ফেলার জন্য বকাবকিও করতে পারেন, আমি তাতে কিছু মনে করবো না।

জেঠিমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বুঝলাম কথাটা মনে ধরেছে। পেছন ফিরে তিনি হাঁক দিলেন—সুধাংশু, ছেলেপুলেদের আবার ধরে নিয়ে আয়—

বাবাকাচ্চাগুলোকে পাকড়াও করে আনবার ফাঁকে সমবেত জনসাধারণকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করবার জন্য জেঠিমা যেই 'ওহে বাবা সকল' বলে শুরু করতে গিয়েছেন, অমনি চালাক চেহারার একজন শুঁটকোপনা লোক বলে উঠল—আর বলতে হবে না মা-ঠাকরোণ, মোরা বুঝে গিইচি—

বাচ্চারা এসে আবার লাইন দিয়ে দাঁড়াল। জেঠিমা তাদের বললেন—বল, মাংস কে রেঁধেছে?

সবাই সমস্বরে বলে উঠল—মিনুদি।

জেঠিমা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—না। মাংস রান্না করেছে পল্টুদা। ভাল করে বুঝে নে—

এই পরিবর্তিত আদেশে বেশ একটা জটিলতার সৃষ্টি হল। বাচ্চারা এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু জেঠিমার নেতৃত্বের কোনও তুলনা হয় না, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে, বকে, ভুলিয়ে এবং ধমক দিয়ে নতুন তালিমে দীক্ষিত করলেন। গোল বাধল ভুবন জ্যাঠাকে নিয়ে। সুধাংশুদা গিয়ে তাঁকেও ডেকে আনল। তিনি এসে হাসিমুখে বললেন—কিগো, কী হল? আবার ডাক পড়েছে কেন? তুমি ভেবেছ আমি বুঝি এর মধ্যেই সব ভুলে মেরে দিয়েছি? তোমরা যতটা মনে কর আসলে আমি ততটা ইয়ে নই। মাংস কে রান্না করেছে সেই কথা জিজ্ঞাসা করবে তো? কেন, মাংস রান্না করেছে আমাদের মিনু! হল তো? হাঃ হাঃ হাঃ—

জেঠিমা ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থেকে ভুবন জ্যাঠার উচ্ছ্বাস কমতে দিলেন, তারপর বললেন—হয়েছে? হাসি থেমেছে? উঃ, এক এক সময় ভাবি আমি মরলে তোমার কী দশা হবে! শোন, মাংস রেঁধেছে পল্টু—মিনু নয়!

ভুবন জ্যাঠার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন—সে কী! কিন্তু আগে যে—

—আগের কথা ছাড়ো। এখন এই বলতে হবে। যাও, ভাল করে ঠিক করে নাও—

ভুবন জ্যাঠা বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বৈঠকখানার দিকে চলে গেলেন। বাচ্চারাও এদিক ওদিক ছড়িয়ে গেল। আমি একমনে রান্না করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়তি জলটুকু ফুটে কমে যেতে একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম। রান্নায় বেশ রঙ ধরে আসছে।

জল বেশি দেওয়ার জনাই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক, ঝোলের যে বিবর্ণ ভাবটা ছিল, জল কমে আসতেই তা কেটে গিয়ে চমৎকার লালচে রঙ ধরল। দারুণ গন্ধও বেরুতে শুরু করল। বাঃ, তাহলে তো ভুল কিছু করিনি! মুগ্ধ চোখে নিজের সৃষ্টির দিকে

তাকিয়ে রইলাম। চোখের সামনেই ঝোলের রঙ ভাল থেকে ভালতর হতে লাগল।

এই সুসংবাদও বিদ্যুৎবেগে সর্বত্র প্রচারিত হল। চোখে সংশয় নিয়ে ছুটে এলেন জেঠিমা। কড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। আদরের গলায় বললেন —তাই তো বলি, পল্টুর এত নাম শুনেছি—সে কি কখনও আমাদের এমন করে ডোবাতে পারে? আঃ, গন্ধও সুন্দর বেরিয়েছে! তোকে আশীর্বাদ করছি বাবা—তোর সোনার হাতা-বেড়ি হোক—

এই আশীর্বাদ আমার ভবিষ্যৎ-জীবনে কতদূর সহায়ক হবে সে কথা ভাবছি, এমন সময় জেঠিমা আবার হাঁক দিলেন—সুধাংশু!

—কী মা?

—বাচ্চাগুলোকে আবার ডাক, লাইন দিয়ে দাঁড় করা। তোর বাবাকেও নিয়ে আয়—

গ্রামের বয়স্করা খেলাটা ধরে ফেলেছিল। জেঠিমা তাদের দিকে ফিরে তাকাতেই তারা সমস্বরে বলে উঠল—মিনু দিদিঠাকরুণ!

বাড়ি, উঠোন ও বাগানের বিভিন্ন স্থান থেকে বালক-বালিকাদের আবার ধরে আনা হল। তারা এবার সত্যিই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কেউ বলে মিনুদি, কেউ বলে পল্টুদা, কেউ কিছু না বলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। প্যান্ট মুঠিয়ে ধরা ছোট ছেলেটি মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে কান্না জুড়ে দিল। একটু ভেবে জেঠিমা বললেন— নাঃ, তোরা ঠিক সব গোলমাল করে ফেলবি। এক কাজ কর, তোদের সক্কলকে একটা করে টাকা দিচ্ছি—ডাল আর ভাজা যা হয়েছে তাই দিয়ে চটপট খেয়ে তোরা কালীতলায় মেলা দেখতে চলে যা। এবেলা তোদের আর আসার দরকার নেই। সবার ভাগের মাংস আমি নিজে তুলে রাখব, সন্ধের পর এসে খাবি এখন, বুঝলি? যা সব—

ভুবন জ্যাঠামশাই একদিকে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। জেঠিমা তাঁকে বললেন—তুমিও বুঝেছো তো? নাকি আলাদা করে বোঝাতে হবে?

জ্যাঠামশাই বিপন্নমুখে বললেন—তুমি তো জানো, প্যাচ আমার মাথায় একেবারে ঢোকে না। দাঁড়াও, একবার সড়গড় করে নিই। প্রথমে বলা ঠিক হয়েছিল মিনু রেঁধেছে, কিন্তু আসলে রান্না করেছিল পল্টু। তারপর ঠিক হল পল্টু রেঁধেছে বলা হবে, আসলে রান্না করছিল পল্টু—এটা বেশ সোজা, মনে রাখতে অসুবিধে হয় না। তারপর এখন ঠিক হল—কি যেন বললে?

—উঃ, আর পারি না! এখন বলবে মিনু রেঁধেছে—হল?

—এখন বলব মিনু রেঁধেছে। বেশ, আসলে রান্নাটা কে করছে?

—পল্টু।

—আচ্ছা তাহলে একটা ছকে ফেলে নিই। প্রথম, পল্টু-মিনু, দ্বিতীয়, পল্টু-পল্টু। তৃতীয়, মিনু-মিনু।

জেঠিমার গর্জন—না। আবার পল্টু-মিনু।

ভুবন জ্যাঠামশাই কিছুক্ষণ আপনমনে কিসব বিড়বিড় করলেন, তারপর করুণমুখে জেঠিমার দিকে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁগো, আমিও বরং মেলায় চলে যাই, কী বলো?

